তাফসীরে মাযহারী

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)

তাফসীরে মাযহারী

তাফসীরে মাযহারী

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় ও চতুর্থ পারা

কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

তাফসীরে মাযহারীঃ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

অনুবাদঃ মাওলানা মোহাম্মদ মহসীন
পুনর্লিখন ও সম্পাদনাঃ মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশকঃ হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

প্রচ্ছদঃ বিলু চৌধুরী

কাতেবঃ বশীর মেসবাহ্

মুদ্রকঃ শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৯৭ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশঃ আগষ্ট, ২০০২ ইং
তৃতীয় প্রকাশঃ মে, ২০০৯ ইং

বিনিময় ঃ তিন শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

TAFSIRE MAZHARI (Volume-II): Written by Hazrat Allama Kazi Sanaullah Panipathi (Rh.) Translated by Maulana Mohammad Mohsin and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia.

Exchange : Taka Three Hundred Fifty only. US$ 20.00

ISBN 984-70240-0002-6

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতাবা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এই মহাগ্রন্থ আল কোরআন। এতে রয়েছে পৃথিবীপূর্ব অবস্থার বিবরণ। রয়েছে পৃথিবীর ও পরবর্তী পৃথিবীরও দিক নির্দেশনা। এই জ্ঞান অনন্ত, অক্ষয়, অব্যয়। নিসর্গ, মহানিসর্গ — সৃষ্টির পূর্ণ পরিসরই এর বিবরণভূত। এই মহাবিস্ময়ের মুখোমুখি না দাঁড়ালে আমরা কীভাবে চিনবো

নিজেকে, কী করে জানবো আমাদের পরম প্রেমময় প্রভুপালয়িতাকে? হে উদাসীন বিশ্বাসী এবং অপরিণামদর্শী অবিশ্বাসী, এসো এই মহাজ্ঞানের পাদপ্রদীপে। আলোকিত হও।

চৌদ্দশ' বছর গত হয়ে গেলো। সময়সমুদ্রে ভাসমান কোরআনুল করীমের এই কিশ্‌তি হজরত নূহ্ আ. এর কিশ্‌তির মতোন এখনো পথান্বেষী পথিকদের আশ্রয় হয়ে আছে। থাকবে। তাই তো নিরবচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়ে চলেছে এর অধ্যয়ন, অনুশীলন — বিভিন্ন জনপদে, বিভিন্ন ভাষায়, সাহিত্যে। কিন্তু এক্ষেত্রে দূরারোগ্য একটি সমস্যাও রয়েছে। সেটা হচ্ছে, অধ্যয়ন ও গবেষণা রূপ নিচ্ছে দুটি ধারায়। একটি নেমে যাচ্ছে ভ্রষ্টতার দিকে, আরেকটি উত্থিত হচ্ছে হেদায়তের সোপানে। হেদায়েত প্রদানই কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার মূল উদ্দেশ্য। তাই দেয়ার দিক থেকে নয়, নেয়ার দিক থেকে ঘটে যাচ্ছে এই অনভিপ্রেত তারতম্য। যেমন একই ফুলের রেণু গ্রহণ করে মৌমাছি ও বোলতা, অথচ মৌচাকে জমা হয় মধু আর বোলতার চাকে জমা হয় বিষ। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'ইহা (এই কোরআন) দ্বারা কেউ হয় গোমরাহ্, আবার কেউ পায় হেদায়েত।' সুতরাং সতর্কতা একটি অতি আবশ্যকীয় বিষয়। কোরআন চর্চা করে যারা বিপথগামী হয়েছে, তাদের তথাকথিত তাফসীর ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে দূরে থাকতে হবে। অনুরাগী হতে হবে ওই সমস্ত তাফসীর এবং ধর্মীয় পুস্তকের — যেগুলোতে রয়েছে হেদায়েতের প্রচ্ছন্ন অনল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম যে জামাত হেদায়েতের মশাল নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তার নাম আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। আল্লাহ্পাক আমাদেরকে ওই জ্যোতির্ময় জামাতের আশ্রয়ে স্থিত করুন। আমিন।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের তাফসীর শাস্ত্রের দিকপাল যাঁরা, তাঁদের মধ্যে তিনি এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি আলেম ও আরেফ। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে নামের অক্ষয় মুদ্রণের রূপ এরকম — হজরত আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ্ আল ওসমানী আল হানাফী আল মোজাদ্দেদী পানিপথী র.।

প্রতিটি বিষয়ের অভ্যন্তরীণ অবস্থাটাই তার ভিত্তি, যা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। যেমন মানুষ — তার অস্তিত্ব দাঁড়িয়ে রয়েছে তার আত্মার উপর। তার সচলতা, সজীবতা, উদ্ভাবন-শক্তি, প্রকাশ, বিকাশ — সবকিছুর ভিত্তি রূহ্ বা আত্মা। আত্মার শক্তিমত্তা ও উৎকর্ষতার উপরেই তার মর্যাদা ও মহত্ত্ব। যে দ্বীপ জেগে থাকে তার ভিত্তি নিমজ্জিত রয়েছে মহাসাগরের অতলে। কোরআনও তেমনি,

যার আত্মা আকারবিহীন রূপে অবতীর্ণ হয়েছে মহানবী মোহাম্মদ স. এর পবিত্র বক্ষদেশে। তিনি ছিলেন উম্মী (অক্ষরের অমুখাপেক্ষী) । তাঁর বক্ষাধারে প্রজ্জ্বলিত কোরআনের নূর নিজেদের বক্ষদীপে জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর সম্মানিত সহচরবৃন্দ। তাই তাঁরা কোরআনের হক আদায় করতে পেরেছিলেন জীবন, যৌবন, সম্পদ, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতাকে উৎসর্গ করে। ওই নূর বুকে বুকে বহমান। এভাবেই রূহানী শিক্ষক ও ছাত্র (পীর ও মুরিদ) পরম্পরায় বয়ে চলেছে কোরআনের অন্তর্নিহিত আলোর স্রোত। এ কথা তো সর্ববাদিসম্মত যে, আলো ছাড়া গ্রন্থপাঠ সম্ভব নয়। বুঝতে পারা তো আরো পরের ব্যাপার।

আমাদের সম্মানিত গ্রন্থকার কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রঃ) রূহানিয়াতের এই প্রবহমানতাকে মান্য করেছেন। এটাকে প্রধান ভিত্তি বলে জেনেছেন। গ্রন্থের নামকরণেই সেকথাটি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। গ্রন্থের পবিত্র নাম হচ্ছে 'তাফসীরে মাযহারী'। তাঁর পীর মোর্শেদের নামেই তিনি এই গ্রন্থটির নাম রেখেছেন। তাঁর পীর মোর্শেদ ছিলেন জগদ্বিখ্যাত আলেম ও আরেফ হজরত মীর্জা মাযহারে শহীদ জানে জানাঁ — তাঁর পীর মোর্শেদ ছিলেন হজরত নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী — তাঁর পীর মোর্শেদ ছিলেন শায়েখ সাইফুদ্দিন সেরহিন্দি — তাঁর পিতা ও পীর মোর্শেদ ছিলেন উরউয়াতুল উস্‌কা খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দি — তাঁর পিতা ও পীর মোর্শেদ ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী শায়েখ আহমদ ফারূকী সেরহিন্দি রহমতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন। সম্মানিত গ্রন্থকার এভাবেই সর্বশ্রেষ্ঠ তরিকার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধকে প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে ইমামে আজম আবু হানিফা র. এর অনুসারী হয়ে সমান্তরালবর্তী করেছেন শ্রেষ্ঠতম মাজহাবকে। হানাফী ও মোজাদ্দেদি — এই দুই জ্যোতির্ময় ডানার সাহায্যে তিনি উড়াল দিয়েছেন প্রত্যাদেশের (ওহির) সীমাহীন নীলিমায়। তুলে এনেছেন অসংখ্য নক্ষত্রের রহস্যময় দ্যুতিচ্ছটা। দরদমিশ্রিত অক্ষরসজ্জায় উপস্থাপন করেছেন প্রজ্ঞা ও প্রেমের বহুবিচিত্র কল্লোল। অভিনিবেশী পাঠকেরা তাই বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারেন না। তিনি ছিলেন রেওয়ায়েত, দেরায়েত ও ফেরাসাতের এক অনন্য সমন্বয়। ছিলেন এলমে হুসুলী ও এলমে হুজুরীর যুগান্তকারী ভারসাম্য। এবার জেগে উঠতে হবে বাংলার জনতাকে। কারণ, প্রায় তিনশ' বছর পর এবার তাফসীরে মাযহারী বাংলায় কথা বলতে শুরু করেছে।

এই খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন এই নগণ্য ফকিরের প্রিয় রূহানী ফরজন্দ মাওলানা মোহাম্মদ মহ্‌সীন। হাকিমাবাদ খানকা শরীফের কতিপয় ফকির দরবেশকে অনুবাদ কর্মটি নিয়ে বসতে হয়েছে। গ্রন্থটিকে সুবিন্যস্ত করবার

অভিপ্রায়ে সুসম্পন্ন করতে হয়েছে পরীক্ষা, নিরীক্ষা, সম্পাদনা, পরামর্শবিনিময় ইত্যাদি। শেষে এই প্রকাশযোগ্য রূপ। বস্তুতপক্ষে এ হচ্ছে আমাদের এক যুথবদ্ধ প্রচেষ্টা।

আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা অসচেতন নই। কিন্তু আমরা জানি, যোগ্যতা আল্লাহতায়ালার দান। তিনিই শূন্যতাকে পূর্ণ করে তোলেন। যোগ্যতার আলো নিক্ষেপণের মাধ্যমে অযোগ্যতার অন্ধকার অপসারণের বিষয়টিকে নিশ্চিত করেন। সীমাবদ্ধতার পাপের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। তাঁর সন্তোষ লাভ ব্যতিরেকে অন্য সকল উদ্দেশ্যকে আমরা পরিত্যাগ করলাম। হে আমাদের পরম প্রেমময়, দয়াময় প্রভুপ্রতিপালক! আমরা তোমাকে ভয় করি। ভালোওবাসি। স্তবস্তুতি তোমারই। সকল দরুদ ও সালাম তোমার মাহ্বুব মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর। আমরা জানি, তোমার মাহ্বুবের প্রকৃত অনুসারীগণই অন্তহীন কল্যাণের অধিকারী — আমরা তাঁদের অধম, নগণ্য ভৃত্যকুল। আমাদের পরিত্রাণ নিশ্চিত করো, হে পরম পরিত্রাতা! আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

মূল তাফসীর গ্রন্থটি রচিত হয়েছে আরবীতে। আমরা অনুবাদ করেছি দিল্লির নাদ্ওয়াতুল মুসান্নিফিনের পরিচালক হজরত মাওলানা আব্দুদ্দাঈম কৃত উর্দু তরজমা থেকে।

উল্লেখ্য, আয়াত শরীফের বাংলা উদ্ধৃতি দিয়েছি আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 'কুরআনুল করীম' থেকে। আমাদের বিবেচনায় এই তরজমাটি অধিকতর সুন্দর। এজন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতি আমরা জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রত্যক্ষ পরোক্ষ আর্থিক শারীরিক — সকল প্রকার সাহায্যদাতাদের জন্য আমরা আল্লাহ্তায়ালার দরবারে উত্তম বিনিময় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্র বিনিময় তো উত্তমই। বরং সর্বোত্তম।

বিদগ্ধ পাঠককুলের প্রতি অনুরোধ, ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে জানাবেন। এরকম উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাবো। সকলের প্রতি শুভকামনা — ওয়াস্সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

সূচীপত্র

তৃতীয় পারা — সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৩ — ২৮৬

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১ — ৯১

চতুর্থ পারা — সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯২ — ২০০

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১ — ২৩

তাফসীরে মাযহারী

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় ও চতুর্থ পারা

সুরা বাকারাঃ আয়াত ২৫৩-২৮৬

সুরা আলে ইমরানঃ আয়াত ১-২০০

সুরা নিসাঃ আয়াত ১-২৩

তৃতীয় পারা

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৩

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

تِلۡكَ الرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ ۘ مِنۡهُمۡ مَّنۡ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيۡنَا عِيۡسَى ابۡنَ مَرۡيَمَ الۡبَيِّنٰتِ وَاَيَّدۡنٰهُ بِرُوۡحِ الۡقُدُسِ ؕ وَلَوۡ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقۡتَتَلَ الَّذِيۡنَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ الۡبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخۡتَلَفُوۡا فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ اٰمَنَ وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ كَفَرَ ؕ وَلَوۡ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقۡتَتَلُوۡا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيۡدُ ۝

❑ এই রসুলগণ, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে যাহার সহিত আল্লাহ্ কথা বলিয়াছেন, আবার কাহাকেও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। মরিয়ম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের পরবর্তীরা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পর পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইত না ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল। ফলে তাহাদের কতক বিশ্বাস করিল এবং কতক সত্য প্রত্যাখান করিল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইত না ; কিন্তু আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

'তিলকার রুসুল' অর্থ এই রসুলগণ — এখানে 'তিলকা' দ্বারা রসুলদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে — 'নিশ্চয়ই আপনি রসুলগণের একজন' — এই বাক্যটিতে রসুলদের সম্পর্কে জানা যাচ্ছে। 'আর রুসুল' এর লামটি লামে এসতেগরাকী (সমষ্টিভূতিজ্ঞাপক লাম)।

'তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি' — অর্থাৎ রসুলগণের মধ্যে একজন অপেক্ষা অন্যজনকে অধিক সম্মান দিয়েছি। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সম্মানবৃদ্ধি — সমস্ত বিশেষত্ব একত্র করে এক বিশেষত্বকে অপর বিশেষত্ব অপেক্ষা প্রাধান্য দেয়া। পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে মর্যাদা সমূহের এতবেশী পূর্ণতা লাভ যাতে পৃথিবীতে কল্যাণ এবং পরকালে পূণ্যার্জন হয়। তাঁদের মর্যাদা ও বিশেষত্বের ধরন ভিন্ন। কিন্তু সামগ্রিক সম্মান তাঁরই যিনি অধিক পূণ্যশীল এবং আল্লাহ্তায়ালার অধিক নৈকট্যধারী। সমস্ত নবী এবং রসুলগণ রেসালাত ও নবুয়তের গুণসম্পন্ন ও পূণ্যশীল হলেও পূণ্যার্জনে, মর্যাদায় এবং নৈকট্যে তাঁদের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। যে পার্থক্যের প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ্ই রাখেন।

তবে আল্লাহ্ যদি এ সম্পর্কে বলেন, তবেই তা জানা যেতে পারে। আল্লাহ্ এরশাদ করেন, 'তাঁহাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে যাহার সহিত আল্লাহ্ কথা বলিয়াছেন'—ব্যাখ্যাকারকগণ বলেন, এখানে হজরত মুসা আ. এর কথা বলা হয়েছে। কারণ অন্যস্থানে আল্লাহ্তায়ালা উল্লেখ করেছেন, 'অতপর যখন প্রতিশ্রুত সময়ে মুসা এলো এবং তাঁর প্রভূ তাঁর সাথে কথা বললেন।' তবে এই উল্লেখে মুসা আ. অধিক মর্যাদাশালী — একথা প্রমাণিত হয় না। শুধু প্রমাণিত হয় আল্লাহ্পাক তাঁর সাথে কথা বলেছেন। এরকম কথোপকথন অন্য কোনো নবীর সঙ্গেও হওয়া সম্ভব। কেউ কেউ বলেন, এই আয়াত দ্বারা হজরত মুসা আ. এবং রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম — এই দু'জনকে বোঝানো হয়েছে। হজরত মুসা আ. এর সঙ্গে কথা হয়েছে তুর পর্বতে। আর রসুলেপাক স. এর সঙ্গে কথা হয়েছে মেরাজের রহস্যময় রাত্রিতে যখন দূরত্ব ছিলো ধনুকের দুই প্রান্তের সমান। অথবা তার চেয়ে কম। এই দুই অবস্থার মধ্যে ব্যবধান অনেক।

'আবার কাহাকেও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন' — এখানে বোঝা যাচ্ছে, একজনকে অন্য একজনের উপর অথবা একজনকে অন্য সকলের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। একারণেই কোনো কোনো নবী অন্যান্য নবীগণের তুলনায় অধিক মর্যাদাশালী। আবার নবীগণ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী রসুলগণ। আবার রসুলগণ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী উলুল আজম রসুলগণ। আর সমস্ত নবী এবং রসুলগণের চেয়ে অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাশালী শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্মদ মুজতাবা স.। একথা বিশুদ্ধ হাদিস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত। এর উপর সমস্ত উম্মত একমত।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ সাল্লালালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানগণের নেতা হবো — একথা গৌরবপ্রকাশক নয়। তখন প্রশংসার পতাকা থাকবে আমারই হাতে —

একথাও গৌরবপ্রকাশক নয়। আল্লাহ্ ছাড়া সবাই আমার পতাকার নিচেই থাকবে এবং সর্বপ্রথম পুনরুত্থিত হবো আমিই — একথাও গৌরবপ্রকাশক নয়। আমিই সর্ব প্রথম সুপারিশকারী হবো। এবং আমার সুপারিশ কবুলও হবে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, সাহাবীগণ কথপোকথন করছিলেন, এমন সময় রসুলে আকদাস স. উপস্থিত হলেন। একজন সাহাবী বললেন, আল্লাহ্ হজরত ইব্রাহিম আ. কে খলিল বানিয়েছেন। দ্বিতীয়জন বললেন, আল্লাহ্ মুসা আ. এর সঙ্গে কথা বলেছেন। তৃতীয়জন বললেন, ঈসা আ. কলেমাতুল্লাহ্ এবং রুহুল্লাহ্। চতুর্থজন বললেন, হজরত আদম আ. সফিউল্লাহ্। রসুল স. বললেন, তোমরা ঠিকই বলেছো। কিন্তু আমি যে আল্লাহ্তায়ালার বন্ধু। একথা গৌরব প্রকাশার্থে নয়। আমিই প্রথম বেহেশ্তের দরোজায় করাঘাত করবো। আল্লাহ্ আমার জন্য বেহেশ্ত উন্মুক্ত করে দেবেন। বেহেশ্তে প্রথম প্রবেশকারী আমি। এসময় আমার সঙ্গে থাকবে একদল ফকির ও মিসকিন — একথাও গৌরব প্রকাশার্থে নয়। আমি সেসময় পূর্বাপর সকল মানুষের চেয়ে অধিক সম্মানিত হবো। একথাও গৌরব প্রকাশার্থে নয়। তিরমিজি, দারেমী।

হজরত জাবের রা. বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, রসুলে পাক স. বলেছেন, আমি সমস্ত নবী ও রসুলদের সর্দার — একথা আত্মগৌরবমূলক নয়। আমি শেষ নবী—একথাও আত্মগৌরবমূলক নয়। আমি সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং সর্বাগ্রে আমার সুপারিশ গৃহীত হবে — একথাও আত্মগৌরবমূলক নয়। দারেমী।

হজরত উবাই ইব্নে কাব রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে করিম স. বলেছেন, কিয়ামতের দিনে নবীদের ইমাম হবো আমিই। তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্যপ্রদানকারী এবং সুপারিশকারীও হবো আমি — একথা আত্মগৌরবমুক্ত। তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, মৃত্তিকা থেকে আমিই প্রথম উত্থিত হবো। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে বেহেশ্তি পোশাক পরাবেন। আমি আরশের ডানপাশে দাঁড়াবো। এখানে আর কেউ দাঁড়াতে পারবেনা। তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা হতে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে অসিলা করবেন। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল, অসিলা কী? রসুল স. বললেন, বেহেশ্তের উচ্চ স্থান, সেখানে একব্যক্তি পৌছবে। আমি ইচ্ছা করি সে ব্যক্তি হবো আমিই। তিরমিজি।

এই সমস্ত হাদিস একজন বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হলেও উম্মতেরা একে গ্রহণ করেছেন। ইমাম বাগবী র. লিখেছেন, অন্য নবীগণকে পৃথক পৃথক ভাবে দেয়া

মোজেজাসমূহকে সম্মিলিতভাবে দেয়া হয়েছে রসুলুল্লাহ্ স. কে। এছাড়া আরো অনেক মোজেজা তাঁকে দান করা হয়েছে। যেমন আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া, সতুনে হান্নানার কান্না, পাথর ও বৃক্ষরাজির সালাম, চতুষ্পদ জন্তুর নবুয়তের সাক্ষ্যদান, হাতের আঙ্গুল থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। আরো অনেক মোজেজা আছে। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে কোরআন মজীদ। আসমান ও জমিনের অধিবাসীগণ এসমস্তের বিবরণ দিতে অক্ষম। ইমাম বাগবী হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, নবীগণকে দেয়া মোজেজা মানুষের আয়ত্তাতীত। আমাকে তো সেই মোজেজা দেয়া হয়েছে যা আল্লাহ্র কালাম এবং যা আমাকে দেয়া হয়েছে ওহির মাধ্যমে। একারণেই আমি মনে করি, কিয়ামতের দিনে আমার অনুসারীদের সংখ্যা বেশী হবে। বোখারী ও মুসলিম।

ইমাম বাগবী হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্পাক আমাকে পাঁচটি বিশেষত্ব দান করেছেন যা ইতিপূর্বে কেউ পায়নি।

১. আমি একমাস সময়ের দূরত্বে থাকলেও শত্রুরা ভীত হয়।

২. জমিনকে আমার জন্য মসজিদ করে দেয়া হয়েছে — এজন্য আমার উম্মতেরা পৃথিবীর সকল মাটিতে নামাজ পড়তে পারবে (মসজিদ, বাড়ি, মাঠ যেখানেই হোক না কেনো)।

৩. আমার জন্য গণিমতের মাল হালাল করা হয়েছে যা অন্য নবীদের জন্যে হালাল ছিলোনা।

৪. আমাকে দেয়া হয়েছে সুপারিশ করার অধিকার।

৫. অন্যান্য নবীগণকে পাঠানো হয়েছে কেবল তাঁদের আপন সম্প্রদায়ের জন্য, কিন্তু আমাকে সমস্ত মানুষের জন্য।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত ইমাম বাগবী উল্লেখিত আরেকটি হাদিস, নবী করিম স. বলেছেন, ছয়টি বিষয়ে আমি অন্যান্য নবী অপেক্ষা স্বতন্ত্র।

১. আমাকে দেয়া হয়েছে এমন কতগুলো বাক্য যার শব্দাবলী সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থ ব্যপক, যা জ্ঞানীদের জ্ঞানকে পরিবেষ্টিত রেখেছে।

২. শত্রুদের অন্তরে আমার সম্পর্কে ভীতি ঢেলে দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।

৩. গণিমতের মাল হালাল করা হয়েছে।

৪. মাটিকে করা হয়েছে মসজিদ এবং পবিত্র।

৫. আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে জ্বিন ও মানুষ সকলের জন্যে।

৬. আমার মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়েছে নবুয়ত। মুসলিম।

'মরিয়ম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছি' — হজরত ঈসা আ. মায়ের কোলে থেকে মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন, জন্মান্ধকে চক্ষুদান করতেন, কুষ্ঠরোগ নিরাময় করতেন, মৃতকে করতেন জীবিত। আর আকাশ থেকে তাঁর জন্য খাদ্য অবতীর্ণ হতো।

'ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়াছি' — এর ব্যাখ্যা আগে দেয়া হয়েছে। ইহুদী এবং নাসারারা তাঁর ব্যাপারে সীমালংঘন করতো। ইহুদীরা বলতো, তিনি অসৎ মায়ের সন্তান আর নাসারারা বলতো তিনি আল্লাহ্‌র সন্তান (আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যপ্রার্থী)।

'আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের পরবর্তীরা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পর পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইত না; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল। ফলে তাহাদের কতক বিশ্বাস করিল এবং কতক সত্য প্রত্যাখান করিল'—'আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে' একথায় আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছার সর্বময়তা প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি হেদায়েতকারী, বিপথে পরিচালনকারী, ক্ষমাশীল, রোষসম্পন্ন, প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং করুণাময়। তাই তাঁর ইচ্ছার প্রতিফলনের কারণে মানুষও বিভিন্ন রকমের হয়। কেউ সত্যপথানুসারী। কেউ ভ্রষ্ট।

হজরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা সমস্ত সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদের উপর নিক্ষেপ করেছেন নিজের নূর। সেই নূর যে পেয়েছে সে হেদায়েতপ্রাপ্ত, যে পায়নি সে ভ্রষ্ট। তাই আমি বলি, আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞান অনুযায়ী কলমের লেখা শেষ। আহমদ ও তিরমিজি।

ইমাম বাগবী বলেন, একব্যক্তি হজরত আলী রা. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমিরুল মুমিনিন! আমাকে তকদীরের বিষয়ে বলুন। তিনি জবাব দিলেন, এপথ দুর্জ্ঞেয়। অগ্রসর হয়োনা। সে পুনরায় একই কথার অবতারণা করলে তিনি বললেন, এ এক গোপন রহস্য। অনুসন্ধিৎসু হয়োনা। লোকটি আবারো তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তখন তিনি বললেন, সে এক সুগভীর সমুদ্র। সেখানে প্রবেশ করতে চেয়োনা। মানুষের জ্ঞান গবেষণা এ বিষয়টিকে স্পর্শ করতে পারেনা। অতলান্ত সমুদ্রে ডুবে যাওয়া যেমন আত্মহনন বই কিছু নয়, তেমনি অদৃষ্টের অনুসন্ধানও নিশ্চিত ক্ষতিসাধন।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ স. কে বলতে শুনেছি, অদৃষ্টের বিষয়ে যে বাক্যালাপ করবে, কিয়ামতের দিনে সে জিজ্ঞাসিত হবে। যে এব্যাপারে প্রশ্ন করবেনা, তাকেও প্রশ্ন করা হবে না। ইবনে মাজা।

হজরত উবাই ইবনে কাব বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক যদি আসমান ও জমিনের অধিবাসীদের শাস্তি দেন তবে তাকে জুলুম বলা যাবে না। যদি দয়া করেন তবে

তাঁর রহমত তাদের আমলের চেয়ে উত্তম হবে। অর্থাৎ কর্মফলই শাস্তিকে অপরিহার্য করে। আর অপরাধীকে শাস্তি দেয়া জুলুম নয়। তাঁর অনুগ্রহ নিছক অনুগ্রহই, যা আমলের মুখাপেক্ষি নয়। বরং আমলের প্রতিফলের চেয়ে তাঁর দান উৎকৃষ্টতর। উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা দান করলেও আল্লাহ্ কবুল করবেন না যদি তোমরা তকদীরে বিশ্বাসী না হও। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, যা নেই তা হবে না — এ বিশ্বাস ব্যতিরেকে অন্য বিশ্বাসসহ মৃত্যু হলে দোজখ অনিবার্য। হজরত ইবনে মাসউদ রা. এবং হজরত হুজায়ফাও এবিষয়টির বিবরণ দিয়েছেন। ফরমানে নববীতে হজরত জায়েদ বিন সাবেতও একথা বলেছেন। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

পুনরালোচনা

একথা নিশ্চিত যে, কিছুসংখ্যক নবী অন্যদের চেয়ে শ্রেয়তর ছিলেন, কিন্তু হজরত আবু সাঈদ ও হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন — আল্লাহ্র নবীদের মধ্যে একজনকে অন্যদের চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করোনা। অন্য বর্ণনায় আছে, একজনকে দ্বিতীয়জনের উপরে সম্মান দিয়ো না। বোখারী ও মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রার আর এক বর্ণনায় আছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে মুসার চেয়ে উত্তম মনে করোনা। অন্য এক হাদিসে রয়েছে, আমি বলিনা যে, কেউ ইউনুস বিন মুতই হতে উত্তম। বোখারী, মুসলিম।

রসুল স. বলেন, আল্লাহ্তায়ালার বর্ণনা ব্যতিরেকে নিজ অভিমতে এক নবীকে অন্য নবীর উপরে সম্মান দেয়া বৈধ নয়। মর্যাদা নির্ভর করে সওয়াবের আধিক্য এবং আল্লাহ্তায়ালার অধিক নৈকট্যের উপর। মানুষের অভিমতে এর ফয়সালা হতে পারেনা। তবে কোরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলে তাঁদের সম্মানের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে। বরং দলিল অকাট্য হলে মর্যাদা দেয়া জরুরী। দলিল অনুযায়ী নবী ছাড়াও অন্যান্যদের প্রতিও সঠিক ধারণা রাখতে হবে। এই নিয়মেই সাহাবী, তাবেয়ী ও ওলামাদের মর্যাদা নির্ণিত হলে ক্ষতি নেই। যে হাদিসগুলোতে এক নবীকে অন্য নবীর উপরে সম্মান দিতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলো সম্ভবত ওই সময়ের, যখন তিনি এ বিষয়ে জ্ঞাত হননি। আল্লাহ্তায়ালাই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা ঃ মোতাজিলাদের মত এই যে, বান্দার হিতসাধন আল্লাহ্তায়ালার জন্য অপরিহার্য। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে, আল্লাহ্তালার উপরে কোনোকিছুই অপরিহার্য নয়। সমস্ত কিছুই আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীন। সকল কিছু করার ক্ষমতা তাঁর আছে। যেমন — ভালো মন্দ, ইমান, কুফর ইত্যাদি। এই আয়াতই আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামাতের এই অভিমতের দলিল।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রা. বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, সমস্ত মানুষের অন্তর আল্লাহ্তায়ালার দুই আঙ্গুলের মধ্যে। তিনি যেমন চান সেভাবেই সকলের অন্তরকে ঘুরিয়ে দেন। এজন্যেই রসুল স. প্রার্থনা করেছেন, হে আমার অন্তর আবর্তনকারী। আমাদের অন্তরকে তোমার দিকে ঘুরিয়ে দাও। মুসলিম, আহমদ, তিরমিজি এবং ইবনে মাজা। ইবনে মাজা হজরত আনাস থেকে এবং ইমাম আহমদ হজরত আবু মুসা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৪

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

❐ হে বিশ্বাসীগণ ! আমি যাহা তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা হইতে তোমরা ব্যয় কর সেই দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকিবেনা। এবং সত্য প্রত্যাখানকারীগণই সীমালংঘনকারী।

'ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকিবে না' — এখানে না (আরবী লা) এর পর এবং সুরা ইব্রাহিমের দুটি শব্দে (সে দিন কোনো কেনাবেচা নেই, বন্ধুত্ব নেই) এবং সুরা তুরের দু'টি শব্দে (যাতে অসার বাক্য নেই এবং পাপকর্ম নেই) আবু আমর ও ইবনে কাসীর র. ফাতার পরিবর্তে তানবীন পড়েছেন (অর্থাৎ জবরের পরিবর্তে দুই পেশ পড়েছেন)। আসল ব্যবহার এ রকমই। কোনো কোনো ক্বারী প্রত্যেক স্থানে 'লা'এর পরে 'পেশ' এর স্থলে 'তানবীন' পড়েছেন। কেননা এগুলো হচ্ছে উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নগুলো হলো, সেদিন কেনাবেচা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ হবে কি? উত্তর হচ্ছে, না। কেনাবেচা হবে না। বন্ধুত্ব হবে না। সুপারিশও হবে না।

'সত্য প্রত্যখ্যানকারীগণই সীমালংঘনকারী' — সীমালংঘনকারী কাফেররা অপাত্রে উপাসনা করে এবং অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন করে। তারা আল্লাহতায়ালার নির্দেশ লংঘনকারী। আযাবের উপযোগী। আত্মঅত্যাচারী। অতএব, হে ইমানদারগণ ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না। এই আয়াতে 'কাফিরূনা' শব্দটির দ্বারা ঐ কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা ফরজ জাকাতকে অস্বীকার করে। বায়যাবী র. লিখেছেন, এখানে কাফিরূন উদ্দেশ্য জাকাত দিতে অস্বীকৃত ব্যক্তি। জাকাত অস্বীকার করা কুফুরী। যেমন হজ অস্বীকার করাও কুফরী।

হজরত ওমর রা. বলেছেন, রসুল স. এর তিরোধানের পর আরবের কিছুসংখ্যক লোক কাফের অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে গেলো। তারা বললো, আমরা জাকাত দেবো না। হজরত আবু বকর রা. বললেন, তোমরা উটের সামান্য রশি দিতে অস্বীকার করলেও আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। আমি বললাম, আপনিতো রসুল স. এর স্থলাভিষিক্ত। মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করুন। হজরত আবু বকর বললেন, মূর্খতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। দুর্বলতামুক্ত হও। ওহি বন্ধ হয়েছে। দ্বীন পূর্ণ হয়েছে। আমার নিকটে এসে কি দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৫

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ
مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ
اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ
بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ
وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ○

❒ আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি, স্বাধিষ্ঠ, বিশ্বধাতা। তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার। কে সে যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাঁহার আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না; তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

'আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব'—অর্থাৎ আল্লাহ্ই একমাত্র উপাসনার উপযুক্ত। তিনি ছাড়া কেউ ইবাদত গ্রহণ করতে পারে না। তাঁর জ্ঞান, শ্রুতি, অলৌকিকত্ব, অভিলাষ — সকল গুণাবলীই তাঁর সত্ত্বানির্ভর। তিনি সর্বময় বৈশিষ্টমণ্ডিত। সদা বিদ্যমান। সদা বিদ্যমান ছিলেন। সদা বিদ্যমান আছেন। সদা বিদ্যমান থাকবেন। স্থান কাল পাত্রের ক্ষতি তাঁকে ছুঁতে (স্পর্শ করতে) পারে না। অমরতাই তাঁর সমস্ত গুণাবলীকে পূর্ণ করেছে।

'ক্বাইউম' (চিরঞ্জীব) অর্থ নিজ সত্ত্বায় বিদ্যমান থাকা এবং অন্যকে বিদ্যমান রাখা। আমর ইবনে মাসউদ উচ্চারণ করতেন 'আল ক্বিইয়ামু'। অল কামার পড়তেন 'আল ক্বাইয়িমু'। ইমাম বাগবী লিখেছেন, এগুলোরও অর্থ একই। 'ক্বিইয়ামু' অর্থ দৃষ্টিদানকারী (ইবনে মুজাহিদ)। অথবা সমস্ত কিছুর আমলের হেফাজতকারী (কালবী)। ক্বাইউম এর অর্থ ওই সমস্ত কার্যাবলী যা শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পাদিত হয়। হজরত আবু ওবায়দা রা. বলেছেন, ক্বইউমের অর্থ যার ধ্বংস নেই। বায়যাবী লিখেছেন, ক্বইউম এর অর্থ যা সবসময় সৃষ্টিকে সুসংগতরূপে রক্ষা করে। সুয়ুতী র. বলেছেন, যা সবসময় স্থায়ী থাকবে। আমি বলি, এসমস্ত কথার সম্মিলিত অর্থ এরকম — আল্লাহ্ ধ্বংসশীল নন। তিনি তাঁরই অস্তিত্বনির্ভর। তিনি সকল কিছুর সংরক্ষণকারী। অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দানকারী। তিনি ব্যতীত কেউ স্থায়ী থাকবে না। সৃষ্টি অস্তিত্ব, স্থায়িত্বের জন্য তাঁরই মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। প্রত্যেকের ছায়া যেমন মূলবস্তুর মুখাপেক্ষী। তাঁর চেয়েও বেশী মুখাপেক্ষী সৃষ্টি, তাঁর প্রতি।

'তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করেনা' — তন্দ্রা হচ্ছে নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব যা মস্তিষ্ককে অসাড় করে দেয়। আর নিদ্রা ওই অক্ষম অবস্থা যখন অনুভূতি অপসৃত হয়।

হজরত আবু মুসা আশআরী বলেন, রসুলে পাক স. একদিন আমাদের সম্মুখে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করলেন — আল্লাহ্ শয়ন করেন না। শয়ন করা তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত নয়। তিনি মিজানকে উচুঁ নিচু করান। রাতের পুর্বে দিনের এবং দিনের পূর্বে রাতের কার্যাবলী তাঁর সামনে উপস্থিত করা হয়। তাঁর নূর পর্দা আবরিত। পর্দা উঠে গেলে তাঁর সৌন্দর্যরাজি দৃষ্টিকে বিপন্ন করবে। মুসলিম।

'আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার' — এই কথা আল্লাহ্পাকের একত্ববাদের দলিল। তিনি এসবকে কায়েম রেখেছেন। আকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার জন্যই। আর তিনি স্বয়ং বিদ্যমানতা।

'কে সে যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে' — এখানে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সত্তার পরাক্রম প্রকাশ করেছেন। কার সাধ্য এই পরাক্রমের মোকাবেলা করে ?

'তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত' — অর্থাৎ অগ্র পশ্চাতের সমস্তকিছুই তিনি জ্ঞাত। মানুষের জ্ঞান কিন্তু এরকম নয়। তাঁদের কাছে কিছু বিষয় প্রকাশ্য আর কিছু বিষয় গোপন। আর আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান সমস্ত কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। সমস্তকিছুর অর্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু। জ্ঞানী ও অজ্ঞ সবাই এর অন্তর্ভূক্ত। কে আছে এমন—এই কথার ইঙ্গিত। জ্ঞানীগণের মধ্যে শামিল রয়েছেন নবী এবং ফেরেশ্তাগণ।

'যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না'-কোনো জ্ঞান তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না। সর্বপরিবেষ্টিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্যই। কামেল ব্যক্তিগণের জ্ঞানও এ রকম নয়। এখানে জ্ঞান বলতে এলমে গায়েবকে বোঝানো হয়েছে যা কেবল আল্লাহতায়ালার জন্যই বিশিষ্ট। এখানে কারো কোনো অংশ নেই। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্তায়ালা যাকে যতটুকু জ্ঞান দান করতে চান, সে ততটুকুই পায়। অন্যস্থানে আল্লাহপাক উল্লেখ করেছেন 'এবং আমি তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দিয়েছি।'

'তাঁহার আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত।'-ইমাম বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহতায়ালার পরাক্রম প্রকাশই এ বাক্যের উদ্দেশ্য। অন্যথায় তাঁর আসনও নেই এবং তিনি আসনে উপবেশনকারীও নন। হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের রা. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের মতে আসন হচ্ছে এলেম (জ্ঞান)। মুজাহিদের মতও তাই। কতিপয় আলেম 'আসন' অর্থ নিয়েছেন আল্লাহতায়ালার অলৌকিক রাজত্ব। আমি বলি আসন অর্থ, এলেম ও অলৌকিকত্ব দুইই। এই আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহতায়ালার অলৌকিকত্ব এবং শেষাংশে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে। মুহাদ্দিসগণের সুবিখ্যাত বর্ণনা হলো, আসন দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতা বিশিষ্ট।

হজরত আবু হোরায়রা বলেন, আসন (কুরসী) হচ্ছে আরশের ছাদ যা আকাশ ও জমিনের সমান প্রশস্ত।

ইবনে মারদুবিয়া হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত রসুল স. বলেছেন, সাত আকাশ ও সাত জমিন কুরসীর তুলনায় এ রকম, যেমন প্রকান্ড প্রান্তরে পড়ে থাকা একটি আংটি। আরশের তুলনায় কুরসীও তদ্রূপ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, কুরসীর নিকট সাত আকাশ এরকম, যেনো ঢালের মধ্যে সাতটি দেরহাম।

হজরত আলী ক. ও হজরত মুকাতিল রা. বর্ণনা করেন, কুরসীর প্রতিটি স্তম্ভ সপ্ত আকাশ ও সপ্ত জমিনের সমান। কুরসী আরশের সামনে আছে। চারজন ফেরেশতা এর বাহক। তাঁদের চারটি করে মুখ। তাঁদের পা স্থাপিত রয়েছে সপ্তজমিনের নিচে পাথরের উপর। এক ফেরেশতা হতে আরেক ফেরেশতার ব্যবধান পাঁচশত বৎসরের পথ। একজনের চেহারা হজরত আদম আ. এর মতো। তিনি মানুষের রিজিকের জন্য দোয়া করতে থাকেন। দ্বিতীয় জনের চেহারা চতুষ্পদ প্রাণীর মতো অথবা গাভীর মতো। তিনি দোয়া করতে থাকেন চতুষ্পদ জন্তুর রিজিকের জন্য। যখন বাছুরের পূজা করা হয় তখন তাঁর মুখ মলিন হয়ে যায়। তৃতীয় ফেরেশতার আকৃতি সিংহের মতো। হিংস্র জানোয়ারের রিজিকের জন্য দোয়া করাই তাঁর কাজ। চতুর্থ ফেরেশতার অবয়ব শকুনের মতো। পাখিদের

রিজিক প্রার্থনাই তাঁর কাজ। বিভিন্ন হাদিসে এসেছে, আরশ ও কুরসী বহনকারীদের মধ্যে সত্তুরটি নূরের এবং সত্তুরটি অন্ধকারের পর্দা আছে। প্রতিটি পর্দা পাঁচশত বছরের। পর্দাসমূহ না থাকলে কুরসী বহনকারীগণ আরশবহনকারীদের নূরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। প্রকৃত পক্ষে কুরসী এমন স্থান যাতে উপবেশন করা যায়। প্রশস্ত স্থানকে কুরসী বলা যায় না। কিন্তু কুরসী ও আরশ আল্লাহতায়ালার জন্যই বিশিষ্ট। অন্য কারো জন্য শব্দ দু'টি প্রযোজ্য হতে পারে না। অন্য একটি আয়াতের উল্লেখ এ রকম, 'অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন সাতটি আকাশ'—এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় আমরা লিখেছি আরশ বৃত্তাকার। হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, কুরসী আকাশসমূহকে বেষ্টন করে আছে এবং কুরসীকে বেষ্টন করে আছে আরশ। আর এক আকাশকে বেষ্টন করে আছে অন্য আকাশ। প্রত্যেক আকাশ গোলাকার। এ জন্য বিভিন্নজন বলেছেন, অষ্টম আকাশ কুরসী এবং নবম আকাশ আরশ। কিন্তু আল্লাহতায়ালা আকাশের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন সাতটি। আরশ ও কুরসীকে তিনি আকাশ বলেননি। সম্ভবত এর কারণ এই যে, আরশ কুরসী এবং আকাশের হকিকত পৃথক। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

'ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না' — আকাশ, পৃথিবী, কুরসী এবং কুরসী যে সমস্ত কিছুকে বেষ্টন করে আছে সে সমস্তের সংরক্ষণে তিনি ক্লান্ত নন। বিব্রতও নন। তাঁর জ্ঞান, পরাক্রম, স্থায়িত্ব এই আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ ইউনানী ও মিসরীয় আলেমগণ বলেন, পৃথিবী গোল। পেঁয়াজের মতো। যার পরত রয়েছে তেরটি। উপরের পরত ভিতরের পরতকে বেষ্টন করে আছে। নবম আকাশটি অত্যন্ত চাকচিক্যপূর্ণ। তার নিচে অষ্টম আকাশে রয়েছে স্থির তারকারাজি। তার নিচের সপ্তম আকাশের তারকাসমূহ ধীরগতিসম্পন্ন। ষষ্ঠ আকাশে রয়েছে একটি তারা। পঞ্চম আকাশে মঙ্গল গ্রহ এবং চতুর্থ আকাশে রয়েছে সূর্য। তৃতীয় আকাশের তারাটির নাম জোহরা, যে নামের রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের পদস্খলন ঘটেছিলো। দ্বিতীয় আকাশে আছে বুধ গ্রহ। আর চাঁদ ওঠে প্রথম আকাশে। এই আকাশই আমাদের নিকটতম। নবম আকাশের নিচে রয়েছে গোলাকৃতির আগুন। তার নিচে গোলাকৃতির বাতাস। তার নিচে পানি। তার নিচে জমিন। এই জমিনই পৃথিবীর কেন্দ্র। মিথ্যাকে আশ্রয় করে কোনো কোনো পন্ডিত আকাশগুলোকে চিরন্তন বলেছেন। কিন্তু ইসলামী আলেমগণ ইউনানী দার্শনিকদেরকে স্বীকার করেন নি।

দার্শনিকেরা কিছুসংখ্যক হাদিসকে তাদের অভিমত প্রমাণ করার কাজে ব্যবহার করেছে। তারা আরো বলে, আকাশগুলো চিরন্তন। এগুলো আল্লাহ্তায়ালার সমসাময়িক। আর আগুন পানি মাটি বাতাস বিনাশশীল নয়। এ রকম বিশ্বাস ও চিন্তা কোরআনের ব্যাখ্যার অনুকূল নয়। কোরআনের আংশিক অথবা বিপরীত অর্থ

করা কোরআন অবমাননার নামান্তর। ওই সমস্ত দার্শনিকেরা বিশ্বাসভাজন নয়। তারা একজন অপরজনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তারা কল্পনাবিলাসী। বর্তমানের বিজ্ঞানীরা আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। বলে, আকাশ নেই। কখনো বলে, আকাশ দশকোটি কখনো ত্রিশ কোটি। কখনো বলে, আকাশ চল্লিশ কোটি জরদা রঙের শূন্যস্থান। স্বাভাবিক সৃষ্টিকৌশলে ঝুলন্ত। উঁচু নীচু যা কিছু দৃষ্ট হয়, প্রকৃতপক্ষে তা চিহ্নহীন। এসবের দূরত্ব এতো বেশী যে বেষ্টন অসম্ভব। সূর্য, পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ এ সমস্ত গোলাকার। এগুলো আবর্তনশীল। কোনোটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। কোনোটি বৃহৎ। বিজ্ঞানীরা এমন নয় যে তাদের মতের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু কোরআন অপরিবর্তনীয়।

হজরত আবু জর রা. হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, কুরসীর বেষ্টন কোরআনের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। গবেষণা দ্বারা নয়। কুরসী হচ্ছে আল্লাহতায়ালার পরাক্রমের প্রকাশ। আকাশগুলো কুরসীর কাছে এতো ছোট যেমন ঢালের মধ্যে সাতটি আঙটি অথবা প্রান্তরে পড়ে থাকা কোনো ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়। কুরসীর বেষ্টন কি আকৃতিসম্ভূত। নাকি অলৌকিকতাচ্ছাদিত। নাকি জ্ঞানাবৃত। না হুকুম ও ইচ্ছাবরিত–তা অনুমান সাপেক্ষ নয়। ইমানদারদের অন্তরগুলো আল্লাহ রহমানের দুই আঙ্গুলের মধ্যে — এ অবস্থাটিও অননুমানীয়। যা সম্ভব নয় দার্শনিকেরা তাই করতে চেষ্টা করেছে। তাই তারা ভ্রষ্ট। অতএব এই ফকিরের দৃষ্টিতে প্রকৃত পথ এই যে, নিজেদের অভিমতানুসারে কোরআন মজিদ ও হাদিস শরীফের ব্যাখ্যাগুলোকে যেনো মেলানোর চেষ্টা করা না হয়। হ্যাঁ, যদি কোনো দার্শনিক কোরআনের ব্যাখ্যায় নির্ভর করে তবে তাতে দোষ নেই।

'তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ' — আল্লাহতায়ালাই শ্রেষ্ঠ ও মহান। কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। মর্যাদার দিক থেকে নয়। গুণের দিক থেকেও নয়। প্রশংসাকারীগণ তাঁর প্রশংসা করে। গুণ বর্ণনাকারীগণ গুণকীর্তন করে। কিন্তু তিনি তাদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন অপেক্ষা উচ্চ।

তাঁর মর্যাদা কেবল তাঁর জন্যই শোভনীয়। তিনি এমনই মহান যা সৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই আয়াতে (আয়াতুল কুরসীতে) আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের বর্ণনা আছে, কিছু গুণাবলীরও বর্ণনা আছে। আছে হায়াত (জীবন) এর অনুসরণে এলেম, কুদরত, ইচ্ছা, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি এবং বাকশক্তি — এসব গুণাবলীর বর্ণনা। তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তাদেরকে রক্ষা করছেন। কিন্তু সৃষ্টি তাঁর সঙ্গী নয়। কোনো কোনো আলেম বলেন, পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর দিকে মুখ করে আছে, কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে মিলিত নয়। আল্লাহর সঙ্গে সৃষ্টির সঙ্গতা এবং মিলনের ধরন আমরা অবগত নই। আল্লাহ আমাদের শাহরগের চেয়েও নিকটে। কিন্তু এই নৈকট্য আমাদের বোধবহির্ভূত। স্থান ও বস্তুর নৈকট্য থেকে তিনি

পবিত্র। তাদের দুর্বলতা হতেও মুক্ত। তিনি সকল কিছুর মালিক। তিনি কঠিন হাতেধারণকারী, প্রতিশোধ গ্রহণে কঠোর। তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে সুপারিশও উপস্থাপিত হতে পারে না। তাঁর অসীম জ্ঞান আমাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে। কোনোকিছু তাঁর হিকমত, কুদরত বহির্ভূত নয়। নির্দেশদান তাঁর পক্ষে কঠিন ও কষ্টকর নয়। কারো ব্যস্ততা তাঁকে অমনোযোগী করতে সক্ষম নয়। অনপযুক্ততা থেকে তিনি পূত-পবিত্র। তিনি প্রশংসার অতীত।

রসুলে পাক স. কিয়ামতের দিনে যাঁর হাতে থাকবে প্রশংসার পতাকা; তিনিও আল্লাহতায়ালার উপযোগী প্রশংসা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রার্থনায় বলেছেন, তুমি তেমনই যেমন তোমার বর্ণনা। মহান আল্লাহর তুলনায় সবকিছু অত্যন্ত নিকৃষ্ট। তাঁর মহত্বের সম্যক ধারণা সৃষ্টি জানে না। তাঁর উপযোগী ইবাদতও করতে পারে না। রসুলে পাক স. বলেছেন, আমরা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ইবাদত করতে পারি না। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রসুল, কোরআনের সবচেয়ে মর্যাদামণ্ডিত আয়াত কোনটি? তিনি বললেন, আয়াতুল কুরসী। তারপর বলা হলো, সবচেয়ে সম্মানিত সুরা কোনটি। তিনি বললেন, সুরা এখলাস। দারেমী। হজরত উবাই ইবনে কাব বলেন, আবুল মুনজার রসুলে পাক স. কে যখন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল, সবচেয়ে সম্মানিত আয়াত কোনটি? তিনি বললেন, আয়াতুল কুরসী। তারপর তিনি তাঁর বুকে হাত রেখে দোয়া করলেন, তোমার বরকতপূর্ণ জ্ঞানার্জন হোক। তারপর রসুলে পাক স. বললেন, ওই জাত পাকের কসম, আমার জীবন যাঁর হাতে, আল্লাহ তায়ালার আরশের পায়ের কাছে এক ফেরেশতা এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। আর আলমে মেসালেও ফেরেশতাগণ এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার প্রশংসা জ্ঞাপন করেন (জড় জগত ও রুহের জগতের প্রকাশিতব্য বিষয়সমূহ আলমে মেসালে বিদ্যমান)। ইবনে মারবিয়া, ইবনে মাসউদ এবং ইবনে রাহবিয়া তাঁদের সনদে হজরত আউফ বিন মালেক থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক বর্ণনা করেছেন হজরত আবুজর গিফারী থেকে। হজরত আবু হোরায়রা মারফু হাদিসে বর্ণনা করেন, আয়াতুল কুরসী কোরআনের আয়াতের সরদার। তিরমিজি, হাকেম।

হজরত আনাস রা. বলেন, আয়াতুল কুরসী সওয়াবের দিক দিয়ে কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। আহমদ।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী এবং হা মীম, তানযিলুল কিতাবি মিনাল্লাহিল আযিযিল আলীম–এই আয়াত দু'টি দিনে পাঠ করে, সে সমস্ত দিন আল্লাহতায়ালার

হেফাজতে থাকে। আর যে ব্যক্তি রাতে পাঠ করে, সে সমস্ত রাত হেফাজতে থাকে। তিরমিজি, দারেমী।

হজরত আবু হোরায়রা আরো বলেন, রসুলে পাক স. আমাকে জাকাতের মালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রাতে এক ব্যক্তি মাল চুরি করতে এলো। আমি তাকে ধরে ফেললাম। বললাম, তোমাকে রসুলুল্লাহ্র কাছে নিয়ে যাবো। সে বললো, আমি ছেলেমেয়েদের কারণে একাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। আমার দয়া হলো, আমি তাঁকে ছেড়ে দিলাম। সকালে আমি যখন রসুল স. এর খেদমতে হাজির হলাম তখন তিনি বললেন, আবু হোরায়রা তোমার বন্দি কোথায়? আমি বললাম, সে তাঁর ছেলেমেয়েদের দুঃখকষ্টের কথা বলেছিলো, তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান হও। সে মিথ্যা বলেছে। কাল সে আবার আসবে। আমি অপেক্ষায় রইলাম। সে এলো। আমি তাকে আবার ধরে ফেললাম। সে আবারো তার দুঃখ দুর্দশার কথা জানালো। আমি আবারো তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে রসুল স. ওই কথাই বললেন যে কথা তিনি প্রথমে বলেছিলেন। সে কিন্তু তৃতীয়বারও চুরি করতে এলো। আমি বললাম, দুই দুই বার তুমি চুরি করতে আসবে না বলেছো, তবু এলে। এখন আমি অবশ্যই তোমাকে রসুল স. এর কাছে নিয়ে যাবো। সে বললো, আমি তোমাকে কতকগুলো বাক্য শেখাবো যা তোমার উপকারে আসবে। শয্যাগ্রহণের সময় আয়াতুল কুরসী পড়ো। আল্লাহতায়ালা তোমার জন্য হেফাজত নির্ধারণ করবেন। ফলে সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। একথা শুনে আমি তাকে মুক্তি দিলাম। সকালে আমি রসুল স. এর খেদমতে হাজির হলে তিনি বললেন, রাতের কয়েদী কোথায়? আমি বললাম, সে আমাকে এমন কতগুলো বাক্য শিখিয়েছে, যাতে আমার উপকার হয়। রসুল স. বললেন, সে মিথ্যুক। কিন্তু সে তোমাকে যা শিখিয়েছে তা সত্য। তুমি জানো ঐ লোকটি কে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সে শয়তান। বোখারী, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান।

রসুল স. এরশাদ করেন, ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে মৃত্যু ব্যতীত আর পর্দা নেই। অন্য বর্ণনায় আছে, শয্যাগ্রহণের সময় আয়াতুল কুরসী পাঠকারী এবং তার প্রতিবেশীগণ নিরাপদ থাকে। শো'বুল ইমান কিতাবে ইমাম বায়হাকী হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি নামাজের পরে আয়াতুল কুরসী পড়ে নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত সে হেফাজতে থাকবে এবং তার প্রতি রসুল স. অথবা কোনো সিদ্দিক বা কোনো শহীদ খেয়াল রাখবেন।

'মোজালেস' গ্রন্থে হজরত হাসান লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, জিব্‌রাইল আমাকে বলেছেন, শয়তান নারীরূপে তোমাদেরকে ধোঁকা দিতে উদ্যত হয়, তাই শয্যাগ্রহণের সময় আয়াতুল কুরসী পড়ে নিও।

'ফেরদাউস' পুস্তকে হজরত কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে, অশান্তির সময় আয়াতুল কুরসী পড়লে আল্লাহ্ সাহায্য করেন।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর একদিন বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে বলে দিতে পারে সবচেয়ে মর্যাদামণ্ডিত, সবচেয়ে অনুগ্রহজ্ঞাপক এবং ভীতিপ্রদ ও সবচেয়ে আশাদায়ক আয়াত কোনটি?

হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, অত্যধিক মর্যাদামণ্ডিত আয়াত হচ্ছে — 'আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নাই তিনি চিরঞ্জীব।' সবচেয়ে অনুগ্রহজ্ঞাপক আয়াত 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক (সমগ্র মানবকে) সৎকার্য করতে, হিতসাধন করতে, আত্মীয় স্বজনদের প্রতি দান ধ্যান করতে নির্দেশ দিয়েছেন' সবচেয়ে ভীতিপ্রদ আয়াত 'সে দেখতে পাবে তাই, অনু পরিমাণ পুণ্য অথবা অনু পরিমাণ অন্যায়, যা সে করে' আর সর্বাধিক আশাপ্রদ আয়াতটি হচ্ছে 'আপনি বলে দিন, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছো ..... ।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৬

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

❒ দ্বীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নাই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করিবে ও আল্লাহে বিশ্বাস করিবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরিবে যাহা কখনও ভাঙ্গিবেনা। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।

'দ্বীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নাই' — আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে হাব্বান হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, ইসলাম প্রচারের পূর্বে মদীনার যে মহিলাদের সন্তান জীবিত থাকতো না, তারা মান্নত করতো, আমার সন্তান জীবিত থাকলে তাকে ইহুদী বানাবো। আনসার গোত্রের মহিলারা এরকম করতো।

যখন বনু নাজির ইহুদীদেরকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়, তখন তাদের সঙ্গে ছিলো আনসারদের কিছু সন্তান যারা ইহুদী হয়ে গিয়েছিলো। আনসারগণ

বললো, এরা আমাদের সন্তান। আমরা এদেরকে তোমাদের সঙ্গে যেতে দেবোনা। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। আয়াত নাজিলের পর রসুল স. বললেন, তোমরা তাদেরকে তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দাও। যদি তারা তোমাদের সাথে থাকতে চায়, থাকবে। আর যদি ইহুদীদের সঙ্গে থাকতে চায়, তবে তাদের সঙ্গে চলে যাবে।

মুজাহিদ র. বলেন, আউস গোত্রের কিছু লোক তাদের সন্তানদেরকে ইহুদীদের দ্বারা দুধ পান করাতো। ইহুদীদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার সময় তারা বললো, আমরাও চলে যাবো। অথবা কমপক্ষে তাদের ধর্মভুক্ত হবো। সন্তানদের অভিভাবকগণ বাধা দিলে এই আয়াত অবতীর্ন হয়। ইবনে জারীর, সাঈদ অথবা ইকরামার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, সালেম বিন আউফ গোত্রের আনসারীদের এক ব্যক্তির নাম ছিলো হোসাইন। তার দুই ছেলে খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিলো। কিন্তু তিনি হয়ে গেলেন মুসলমান। তিনি রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, আমার দুই ছেলে খৃষ্টান। আমি কি তাদেরকে জোর করে মুসলমান বানাবো? এসময় এই আয়াত নাজিল হয়।

এই আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হলো, জোর করে কাউকে ইমান দেয়া যায় না। কারণ, ইমান অন্তরের ব্যপার। ইমান ও অন্যান্য ইবাদতের আদেশ পরীক্ষামূলক। যেমন আল্লাহ্ বলেন, 'যেনো তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে উত্তম আমল করে।' আমলের বিষয়টি এখলাস নির্ভর। অন্যস্থানে আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমরা খাঁটি মনে (এখলাসের সঙ্গে) আল্লাহর ইবাদত করো, এটাই সঠিক ধর্ম।' জবরদস্তি করে এখলাস অথবা পরীক্ষা কোনোটাই সম্পন্ন হতে পারে না। এই হুকুমটি কি কতিপয় লোকের জন্য না সাধারণভাবে সকলের জন্য প্রযোজ্য? এর উত্তরে কোনো কোনো আলেম বলেন, এই আয়াত আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদীদের জন্যই নির্ধারিত। কেননা আনসারদের ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী সন্তানদের উদ্দেশ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

আমি বলি, এই হুকুম সাধারণ। কোনো কোনো আলেম বলেন, 'মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো' এবং 'কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো' — আল্লাহ্তায়ালার এই হুকুম দ্বারা উক্ত আয়াতটি রহিত হয়েছে। বাগবী এবং হজরত ইবনে মাসউদ এরকমই বলেছেন।

আমি বলি, রহিত ওই সময়ে হতে পারে, যখন দুটি হুকুমের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। কিন্তু এখানে একটি আয়াত অপরটির প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য বলপূর্বক ইমানদার বানানো নয়। বরং পৃথিবীতে অশান্তি ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দূর করার জন্যই জেহাদ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্পাক চান মানুষ সহজ সরল পথে চলুক এবং তাঁর ইবাদত করুক। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কাফেররা হিংস্র সাপ

বিচ্ছু ও উন্মাদ কুকুরের মতো। তাই তাদেরকে হত্যা করতে বলা হয়েছে। এজন্যই আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের উপর জিজিয়া কর বিধিবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, 'যে পর্যন্ত তারা অধীনতা স্বীকার না করে এবং প্রজারূপে জিজিয়া কর দিতে সম্মত না হয়' । রসুলুল্লাহ্‌ স. শিশু, নারী, সহায়-সম্বলহীন, দুনিয়াত্যাগী আলেম, অচলব্যক্তি এবং অন্ধকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তারা অশান্তি ও ধবংসাত্মক কার্যকলাপ করতে পারে না।

'সত্যপথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে' — রসুলে পাক স. এর মোজেজাসমূহ এবং সুস্থ বিবেক সাক্ষী দেয় যে, ইমানই সরল সঠিক পথ। যা স্থায়ী এবং পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছায়। আর কুফরের পথ বঙ্কিম। যার গতি অন্যায়ের দিকে। এখন আর ওজর আপত্তি চলবে না। বলপ্রয়োগের আর প্রয়োজন নেই।

বায়যাবী এই আয়াতের ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন যে, বলপ্রয়োগের অর্থ কাউকে দিয়ে এমন কাজ করানো যাতে তার কল্যাণ রয়েছে। দ্বীন কেবলই কল্যাণ। এবং কল্যাণ ভ্রষ্টতা থেকে অবশ্যই পৃথক। জ্ঞানীদের সামনে হেদায়েত প্রকাশ করা হয়েছে। এখন মুক্তিকামী ও সৎকর্মান্বেষণকারী হেদায়েত কবুল করার দিকে অগ্রসর হবে। এটাই স্বাভাবিকতা। কাজেই বল প্রয়োগের প্রয়োজন অবান্তর।

বায়যাবীর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, প্রকৃত জ্ঞানী দ্বীনের মধ্যে কল্যাণ দেখতে পায়। আর বিকৃত জ্ঞানধারীরা তাদের বক্রদৃষ্টির কারণে ইমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

'যে তাগুতকে অস্বীকার করিবে ও আল্লাহে বিশ্বাস করিবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরিবে যাহা কখনও ভাংগিবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়' — তাগুত অর্থ হচ্ছে অন্যান্য উপাস্যসমূহ অথবা ওই সমস্ত উপাস্য যাদের উপাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহিলাকৃতির শয়তান হোক অথবা মানুষ। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহকে এমনভাবে মেনে নেয় যেভাবে মানতে বলেছেন রসুল পাক স., তারাই দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে মজবুত হাতল অথবা মজবুত রশি। স্মর্তব্য যে, রসুলে পাক স. কে মান্য করা ব্যতীত অথবা তাঁর নির্দেশনা থেকে সরে এসে আল্লাহকে বিশুদ্ধভাবে মানা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

হজরত আবু দারদা রা. বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন,-আমার পরে আবু বকর এবং ওমরকে অনুসরণ করাই মজবুত রশিকে ধারণ করা। যে রশি ছিঁড়বে না।

'আল্লাহ সর্ব শ্রোতা, প্রজ্ঞাময়' — যারা তোমরা সত্যের প্রতি আহবান জানাচ্ছো এবং যাদের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে, সকলের কথাই আল্লাহ পাক

শোনেন এবং সকলকেই জানেন। অর্থাৎ তোমরা কতটুকু আগ্রহের সঙ্গে ইমান গ্রহণ করেছো সে সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এই আয়াতের দ্বারা আমল ও ইচ্ছাকে বিশুদ্ধ করতে এবং অবিশ্বাস ও অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৭

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۬ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

❒ যাহারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাহাদের অভিভাবক তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকে লইয়া যান। আর যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাগুত তাহাদের অভিভাবক, ইহারা তাহাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়। উহারাই অগ্নি অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

ইমানদারদের বন্ধু ও পরিচালক আল্লাহ্। তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন। প্রবৃত্তির অন্ধকার, কুমন্ত্রণা এবং কুফরী থেকে বের করে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। যে পথে রয়েছে ইমান। ওয়াকেদি লিখেছেন, কোরআনের বিভিন্নস্থানে উল্লেখিত অন্ধকার ও আলোর অর্থ হচ্ছে কুফর ও ইমান। কেবল সুরা আনআমে উল্লেখিত অন্ধকার ও আলোর অর্থ হচ্ছে রাত এবং দিন। এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় ইমান অর্জন করা যায় না। এ নিছক আল্লাহর দান। ইমান অস্বীকারকারীদের বন্ধু শয়তান। এই শয়তান জ্বিন ও মানুষ উভয়ই হতে পারে। মানুষরূপী শয়তানদের মধ্যে কাব ইবনে আশরাফ এবং হুয়াই ইবনে আখতাব ইহুদীদ্বয়ও ছিলো। তাগুত অর্থ সকল ভ্রষ্টতা। প্রবৃত্তির প্ররোচনা হোক অথবা শয়তানি কুমন্ত্রণা। কাফেররা মনে করে এসব তাদের বন্ধু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো তাদের দুশমন। কাফেরদের তথাকথিত বন্ধুরা তাদেরকে নূর থেকে বহিষ্কৃত করে। সন্দেহে পতিত করায়। প্রবৃত্তিপূজায় লিপ্ত করে এবং অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।

হজরত আবু হোরায়রা বলেন, রসুলে পাক স. বলেছেন, মানব সন্তান ইসলামী স্বভাবের উপর জন্ম নেয়। তারপর তাদের পিতামাতা তাদেরকে ইহুদী, খৃষ্টান এবং অগ্নি উপাসক বানায়। বোখারী, মুসলিম।

ইবনে জারীর, হজরত উবাদা বিন আবী লুবাবা রা. থেকে বর্ণনা করেন, এখানে কাফের অর্থ ওই সমস্ত খ্রিস্টান যারা হজরত ঈসা আ. কে মেনে নিয়েছিলো, কিন্তু রসুল স. কে মানেনি।

তাগুতই মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এই বের করার সম্পর্ক আল্লাহর কুদরত এবং ইচ্ছার সঙ্গে নেই। জানা দরকার যে, আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছা ছাড়া সৎ অসৎ কোনো কাজই সংঘটিত হতে পারে না। কিন্তু অসৎ কাজ সংঘটনের কারণ হচ্ছে শয়তান। তাগুত শব্দের দ্বারা স্ত্রী, পুরুষ, এক বচন, বহুবচন সবই বোঝায়।

ইবনে জারীর মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন, কিছু লোক হজরত ঈসা আ. এর উপর ইমান এনেছে কিন্তু রসুল স. এর উপর আনেনি। আবার কিছু লোক হজরত ঈসা আ. এর নবুয়তকে অস্বীকার করেছে, কিন্তু মেনে নিয়েছে রসুলে পাক স. এর নবুয়তকে। এই দুই দল সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

তাফসীরে কবীরে তিবরানী এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেন, এই আয়াত ওই সকল লোকের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হজরত ঈসা আ. এর উপর ইমান আনলেও রসুলে পাক স. এর উপর ইমান আনেনি।

'উহারাই অগ্নি অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে' — এই কথায় কাফেরদেরকে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে, কিন্তু মুমিনদের সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। ইমানদারদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ তাই ইতোপূর্বে আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক, একথা বলে দেয়া হয়েছে। নতুন করে আর সাহায্য ও প্রতিদান প্রদানের কথা আসে না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৮

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

❑ তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখ নাই, যে ইব্রাহীমের সহিত তাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলিল, 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান,

সে বলিল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহিম বলিল, 'আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হইতে উদয় করান, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদয় করাও।' অতঃপর যে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সে হতবুদ্ধি হইয়া গেলো। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

এই আয়াতটি কাফের বাদশাহ্ নমরুদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। নমরুদই প্রথম ব্যক্তি যে রাজাসনে বসে খোদাই দাবী করেছে। আল্লাহ তাকে বিশাল রাজত্ব দান করেছিলেন। তার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ এটাই। আরবীয় প্রবাদে রয়েছে, 'তুমি আমার শত্রুতা করছো কারণ আমি তোমার উপকার করেছি।'

মোতাজিলা সম্প্রদায় বলে, আল্লাহ কাফেরদেরকে রাজ ক্ষমতা দেন না। এই আয়াত তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ। বাগবী লিখেছেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন চারজন। এর মধ্যে দু'জন ইমানদার এবং দু'জন কাফের। মুমিন বাদশাহ্ ছিলেন নবী সোলায়মান আ. এবং জুলকারনাইন। আর কাফের সম্রাট দু'জন হচ্ছে নমরুদ ও বখতে নসর। যখন ইব্রাহিম আ. মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলেছিলেন তখন নমরুদ তাঁকে বন্দী করেছিলো। পরে বন্দিশালা থেকে তাঁকে বের করে সে জিজ্ঞেস করলো, তোমার প্রতিপালক কে? হজরত ইব্রাহিম আ. বললেন, আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, যখন তাঁকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হলো, তখন আল্লাহ্তায়ালাই তাঁকে হেফাজত করলেন। এদিকে নমরুদের রাজত্বে দেখা দিলো দুর্ভিক্ষ। মানুষেরা খাদ্যের জন্য নমরুদের কাছে ভীড় জমালো। নমরুদ প্রশ্ন করতে লাগলো, তোমার প্রতিপালক কে? উত্তর হ্যাঁ বাচক হলে নমরুদ তার সাথে কেনাবেচা করতো। এ সময় হজরত ইব্রাহিম আ. তার নিকট গেলেন। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, আমার আল্লাহ্ জীবন দান করেন ও মৃত্যু নিশ্চিত করেন। নমরুদ প্রত্যুত্তোর করতে পারলো না। ফেরার পথে তিনি একটি বালুময় টিলার নিকটে গেলেন এবং ঘরের লোকদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কিছু বালু থলিতে ভরে নিলেন। এরপর ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী থলি খুলে দেখলেন, তার মধ্যে রয়েছে উত্তম আটা। সেই আটা দিয়ে তিনি আহার্য প্রস্তুত করে হজরত ইব্রাহিম আ. এর সামনে হাজির করলেন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আহারের আয়োজন হলো কেমন করে? স্ত্রী বললেন, আপনিই তো আটা এনেছেন। হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ্তায়ালাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। নমরুদের ধারণা ছিলো, সমস্ত কিছু আপনা হতেই হয় এবং বিলয়ও হয় আপনাআপনি। নমরুদের আরো ধারণা ছিলো, জ্ঞানীরা তাদের আপন কাজের স্রষ্টা। যেমন এই উম্মতের মোতাজিলা ও রাফেজীদের ধারণা। সে দু'জন লোককে ডেকে এনে একজনকে হত্যা করলো, আরেকজনকে ছেড়ে দিলো এবং বললো, দেখো আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু

ঘটাই। হজরত ইব্রাহিম বুঝলেন, নমরুদ তো দেখি নির্বোধশ্রেষ্ঠ। তিনি তখন বললেন, আমার আল্লাহ সূর্য পূর্ব দিক থেকে ওঠান। তুমি যদি তাঁকে অস্বীকার করো তবে সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে ওঠাও। নমরুদ নির্বাক হয়ে গেলো। সে তখন বুঝলো, ইব্রাহিম দোয়া করলে তাঁর প্রতিপালক সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করবেন। কারণ, ইতোপূর্বে সে দেখেছে অগ্নিকুন্ডকে তিনি শীতল ও শান্তিদায়ক করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা সীমালংঘনকারীদেরকে সরল পথ দেখান না। যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিতে পতিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের জ্ঞানোদয় হয় না।

সুর বাকারা ঃ আয়াত ২৫৯

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

❐ অথবা তুমি সেই ব্যক্তিকে কি দেখ নাই যে এমন এক নগরে উপনীত হইয়াছিল যাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সে বলিল, 'মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ ইহাকে জীবিত করিবেন?' তৎপর আল্লাহ্ তাহাকে একশত বৎসর মৃত রাখিলেন। পরে তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। আল্লাহ্ বলিলেন, 'তুমি কতকাল অবস্থান করিলে?' সে বলিল, 'একদিন অথবা একদিনেরও কিছু কম অবস্থান করিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'না না, বরং তুমি একশত বৎসর অবস্থান করিয়াছ। তোমার খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, উহা অবিকৃত রহিয়াছে এবং

তোমার গর্দভটির প্রতি লক্ষ্য কর; কারণ তোমাকে মানব জাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করিব। আর অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, কিভাবে সেগুলিকে সংযোজিত করি এবং মাংস দ্বারা ঢাকিয়া দেই।' যখন ইহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল তখন সে বলিয়া উঠিল, 'আমি জানি যে আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।'

ধ্বংসস্তূপে পরিণত নগরটি ছিলো বায়তুল মুকাদ্দাস। অথবা বস্তি হারকিল। এ ঘটনা আগে বর্ণনা করা হয়েছে। নগরে উপনীত ব্যক্তি ছিলেন আরমিয়া। হজরত ইবনে ইসহাক বলেন, আরমিয়া হলেন খিজির আ. কিন্তু হাকেম, হজরত আলী ক. এবং ইসহাক বিন বশির, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তিনি আরমিয়া ছিলেন না। ছিলেন উযায়ের আ.। মুজাহিদ এই ঘটনাকে নমরুদের ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তাতে মনে হয় ওই ব্যক্তি কোনো কাফের ছিলো। কিন্তু মুজাহিদের ব্যাখ্যাটি ভুল। কেননা কাফের এ রকম সম্মান পাওয়ার উপযোগী নয়। যদি এ রকম বলা হয়, সে কাফেরই ছিলো কিন্তু কুদরতের নিদর্শন দেখার পর মুমিন হয়েছে তবে আমি বলবো, ওই ব্যক্তি গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তাই সে এ মতন সম্মান পেতে পারে না। এখানে দু'টি ঘটনা একত্রিত হয়েছে। যে ব্যক্তি প্রতি পদে প্রতি মুহূর্তে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে, তার কাছে দ্বিতীয় বার জীবিত হওয়া আশ্চর্যজনক তো মনে হবেই। বীর্য হতে মানুষ এবং বীজ হতে বৃক্ষ — এ রকম তো অহরহই হচ্ছে। তবু কি তা বিস্ময়কর নয়! সেই ব্যক্তিটি নগরটিকে প্রাণচঞ্চল দেখতে চাইলো এবং দোয়া করলো। তার দোয়া কবুলও হলো।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক, হজরত ওহাব বিন মুনাব্বাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহতায়ালা হজরত আরমিয়া আ. কে বনি ইসরাইলের বাদশাহ নাশিয়া বিন আম ওয়াসের সাহায্যার্থে প্রেরণ করলেন। নাশিয়া ছিলেন পুণ্যবান। হজরত আরমিয়া তাঁর নিকট আল্লাহর পয়গাম নিয়ে গেলেন। যখন বনি ইসরাইলদের অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গেলো, তখন আল্লাহ্ হজরত আরমিয়া আ. কে ওহির মাধ্যমে জানালেন, বনি ইসরাইলদেরকে বিপদগ্রস্ত করা হবে। এক জালেমকে তাদের জন্য নির্ধারণ করা হবে। যে তাদের অনেক লোককে ধ্বংস করবে। এ কথা শুনে হজরত আরমিয়া ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁকে জানানো হলো, যতক্ষণ তুমি নির্দেশ না করবে ততক্ষণ আমি তাদেরকে ধ্বংস করবো না। আরমিয়া খুশী হলেন। তিন বৎসর অতিবাহিত হলো। বনি ইসরাইলদের অবাধ্যতা বেড়েই চললো। ওহিও আসতে লাগলো কম। বাদশাহ তাদেরকে কয়েকবার তওবা করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তারা মানলো না। তখন বাবেলের বাদশাহ বখত নসর তার সেনাবাহিনী নিয়ে বনি ইসরাইলের দিকে

রওয়ানা হলো। বাদশাহ ভয় পেলেন। হজরত আরমিয়া বললেন, আল্লাহর প্রতিশ্রুতির উপর রয়েছে আমার পূর্ণ নির্ভরতা। এরই মধ্যে আল্লাহর আদেশে একজন ফেরেশতা বনি ইসরাইলদের মতো পোশাক পরে আরমিয়ার নিকটে এলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি আমার গৃহবাসীদের সম্বন্ধে আপনাকে জানাতে চাই। আমি তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করি। তবুও তারা আমার উপর নারাজ। হজরত আরমিয়া বললেন, তুমি ভালো আচরণ করতে থাকো। সম্পর্কচ্ছেদ কোরো না এবং সুসংবাদ গ্রহণ কোরো। ফেরেশতা চলে গেলেন। কিছুদিন পর ওই ফেরেশতা মানুষের পরিচ্ছদাবৃত হয়ে ফিরে এলেন। পুনর্বার তিনি একই অভিযোগ তুললেন এবং জবাবও পেলেন প্রথমবারের মতোই। কয়েক বছর পর বখত নসর বায়তুল মুকাদ্দাসকে ঘিরে ফেললো। হজরত আরমিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দেয়ালের উপর বসে ছিলেন। বনি ইসরাইলের বাদশাহ তাঁকে বললেন, আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুতির কী হলো? হঠাৎ ওই ফেরেশতাটি এলেন এবং তাঁর গৃহবাসীদের অপ্রশংসা করলেন। হজরত আরমিয়া বললেন, এখন পর্যন্ত তারা মন্দ আচরণ থেকে ফিরলো না। ফেরেশতা বললেন, আমি তো এতোদিন ধৈর্য ধারণ করেই এসেছি। কিন্তু এখন তাদের অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে অনেক বেশী। এ জন্য আল্লাহর প্রতি আমি অভিমানী হয়ে পড়ছি। আপনার প্রতি নিবেদন, আপনি তাদের জন্য বদদোয়া করুন। হজরত আরমিয়া প্রার্থনা জানালেন, 'হে আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ! তারা যদি তোমার অসন্তোষভাজন হয়ে থাকে তবে তুমি তাদেরকে ধ্বংস করে দাও।' হঠাৎ জ্বলে উঠলো ভয়ংকর বিদ্যুৎ। আর জমিন খুলে দিলো সাতটি দরোজা। হজরত আরমিয়া আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার প্রতিশ্রুতির কী হলো? আওয়াজ এলো, তাদের উপর আযাব এসে পড়েছে। এই আযাব এসেছে তোমার প্রার্থনার কারণেই। হজরত আরমিয়া তখন বুঝতে পারলেন আগন্তুক ব্যক্তিটি মানুষ নয়। ফেরেশতা। তিনি অরণ্যে চলে গেলেন।

বখত নসর এসে বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে দিলো। তারপর শামদেশে চলে গেলো। সেখান থেকে সে বাবেলে চলে গেলে আরমিয়া তাঁর গাধায় চড়ে জঙ্গল থেকে ফিরে এলেন। ঐ সময় তাঁর থলের মধ্যে ছিলো কিছু ইরাকী আঙ্গুর ও ডুমুর। ধ্বংস স্তূপ দেখে তিনি মনে মনে বললেন, মৃত্যুর পর আল্লাহ কেমন করে আবার জীবন দান করবেন। তিনি তাঁর গাধাটিকে রশি দিয়ে বাঁধলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঢলে পড়লেন গভীর নিদ্রায়। তাঁর নিদ্রা ছিলো মৃত্যুর মতো। সাঈদ ইবনে মনসুর, হাসান বসরী থেকে এবং ইবনে হাতেম, হজরত কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর নিদ্রা শুরু হয়েছিলো চাশতের সময় থেকে। একশ' বছর পর্যন্ত তিনি মৃতবৎ পড়ে রইলেন। তাঁর গাধা, আঙ্গুর এবং ডুমুর তাঁর পাশেই পড়ে

থাকলো। সত্তর বছর পর আল্লাহ্ এক ফেরেশতাকে পারস্যের বাদশাহ নোশেকের নিকট পাঠালেন। ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ তোমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস ও তাঁর পার্শ্ববর্তী শহর নতুন করে আবাদ করতে আদেশ দিচ্ছেন। নোশেক হুকুম পালনে তৎপর হলেন। ওদিকে একটি মশা বখত নসরের মস্তিষ্কে প্রবেশ করলো এবং তাঁর জীবনাবসান ঘটালো। বাবেলের ইহুদীরা মুক্তি লাভ করলো। তারা ফিরে গেলো বায়তুল মুকাদ্দাস ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। নগরনির্মাণের কাজ চললো তিরিশ বছর ধরে। এ সময় হজরত আরমিয়া পুনর্জীবিত হলেন। সূর্য তখন অস্তমিত প্রায়। আল্লাহ তাঁর নিকটে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। তিনি বললেন, আপনি কতোক্ষণ ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন? অস্তাচলের দিকে চেয়ে হজরত আরমিয়া বললেন, একদিন। বরং পুরো একদিনও নয়। ফেরেশতা বললেন, আপনি ঘুমিয়েছেন একশ' বছর ধরে। দেখুন, এই হচ্ছে আপনার আঙ্গুর আর এই হচ্ছে ডুমুর। আপনার গাধাটির দিকে তাকান। আরমিয়া তাকালেন। তার গলায় যেমন নতুন রশি বাঁধা ছিলো তেমনি আছে। কেউ কেউ বললেন, গাধাটি মরেই গিয়েছিলো। অস্থি চর্ম সব মিশে গিয়েছিলো মাটিতে। আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা ছিলো হজরত আরমিয়ার দৃষ্টির সামনে গাধাটি জীবিত হোক। তাই হুকুম হয়েছে, তাকাও।

আমি বলি, আঙ্গুর ও ডুমুর ছিলো অক্ষত। গাধাটি নয়। তাই 'তাকাও' নির্দেশটি কেবল গাধার জন্য এসেছে। আল্লাহ্তায়ালা এই ঘটনাটিকে তাঁর নিদর্শন হিসাবে পেশ করেছেন। এখানে আরেকটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, গাধাটি মরে মাটিতে মিশে গিয়েছিলো। কিন্তু হজরত আরমিয়ার শরীর ছিলো অক্ষত। নবীদের শরীর অক্ষতই থাকে। হাদিস শরীফে এসেছে, নবীদের শরীর গ্রাস করা জমিনের জন্য হারাম।

হজরত কাতাদা হজরত কাব থেকে এবং জুহাক ইবনে আসাকির হজরত ইবনে আব্বাস থেকে, সুদ্দী এবং মুজাহিদ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেছেন, যখন আল্লাহ একশ' বছর মৃতবৎ থাকার পর উযায়ের আ. কে জীবিত করলেন। তখন তিনি গাধায় আরোহণ করে নিজ গ্রামে এলেন কিন্তু কাউকে চিনতে পারলেন না। নিজের ঘরও চিনতে পারলেন না। লোকেরাও তাঁকে চিনতে পারলো না। হঠাৎ তাঁর দেখা হলো অন্ধ অচল এক বৃদ্ধার সাথে। তাঁর বয়স ছিলো একশ' বিশ বছর। এ বৃদ্ধা ছিলো উযায়ের আ. এর বাঁদী। একশ' বছর আগে বাঁদীর বয়স ছিলো বিশ। হজরত উযায়ের বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাস করলেন, এই গৃহটি কি উযায়েরের? বুড়ি বললো, হ্যাঁ। একশ' বছর পর তার নাম শুনলাম। তুমি কে? হজরত বললেন, আমি উযায়ের। সে বললো, উযায়ের ছিলেন আল্লাহ্র খাঁটি বান্দা। তুমি যদি উযায়ের হয়ে থাকো, তবে দোয়া করো যাতে আল্লাহ পাক আমার চোখ ভালো করে দেন। হজরত দোয়া করলেন এবং তার চোখে হাত

বুলিয়ে দিলেন। বুড়ির চোখ ভালো হয়ে গেলো। হজরত তার হাত ধরে বললেন, আল্লাহর হুকুমে ওঠে দাঁড়াও। বুড়ি দাঁড়ালো এবং তাঁকে চিনতে পেরে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনিই উযায়ের। এরপর দেখা হলো তাঁর ছেলের সঙ্গে। যার বয়স হয়েছিলো একশ' বছর। তাঁর নাতি পুতিগুলোও হয়ে গিয়েছিলো বৃদ্ধ। কিন্তু হজরতের চুল দাড়ি তখনও কালো। বাঁদী তাঁকে নিয়ে বনি ইসরাইলদের মজলিশে উপস্থিত হয়ে বললো, ইনি উযায়ের। তারা বিশ্বাস করলো না। বাঁদী বললো, আমি তাঁর বাঁদী। তাঁর দোয়াতেই আমি চক্ষু ফিরে পেয়েছি এবং সচল হয়েছি। আল্লাহতায়ালা তাঁকে একশ' বছর মৃত অবস্থায় রেখেছিলেন, এখন জীবিত করে দিয়েছেন। হজরতের ছেলে বললো, আমার পিতার বুকে চন্দ্রাকৃতির একটি কালো দাগ আছে। হজরত জামা খুলে দেখালেন। সবাই দেখলো তাঁর বুকে চন্দ্রাকৃতির কালো দাগ। সুদ্দী এবং কালাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত উযায়ের যখন আপন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলেন, তখন তওরাত কিতাব ছিলো না। এই মহাগ্রন্থটিকে বখত নসর পুড়িয়ে দিয়েছিলো। তিনি কেঁদে ফেললেন। এমন সময় এক ফেরেশতা এসে তাঁকে এক পেয়ালা পানি পান করালেন। সঙ্গে সঙ্গে তওরাতের পূর্ণচিত্র তাঁর হৃদয়ে ভেসে উঠলো। লোকেরা যখন তাঁকে উযায়ের বলে মানতে চাইছিলো না, তখন তিনি তওরাত মুখস্ত বলতে শুরু করলেন। এভাবে পূর্ণ তওরাত লিপিবদ্ধ করা হলো। লোকেরা বিশ্বাস করলো না। বলতে লাগলো, তওরাত তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬০

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ
تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ
أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ
جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

❒ যখন ইব্রাহিম বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো আমাকে দেখাও।' তিনি বলিলেন, 'তবে কি তুমি বিশ্বাস কর নাই?' সে বলিল, 'কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত-প্রশান্তির জন্য!' তিনি বলিলেন, 'তবে চারিটি পাখি লও এবং উহাদিগকে তোমার বশীভূত করিয়া লও।

তৎপর তাহাদের এক এক অংশ পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর উহাদিগকে ডাক দাও, উহারা দ্রুত গতিতে তোমার নিকট আসিবে। জানিয়া রাখ যে আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

হাসান, কাতাদা, আতা খোরাসানী এবং ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, হজরত ইব্রাহিম আ. একটি গাধার লাশ সমুদ্রতীরে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। জোয়ারের সময় সমুদ্রের হিংস্র প্রাণীরা তার গোশত খেয়ে যেতো। জোয়ার সরে গেলে জঙ্গলের হিংস্র প্রাণী ও পাখিরা তার গোশত খেতো। হজরত ইব্রাহিম আ. বিস্মিত হলেন এবং আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি জানি তুমি এই মৃত গাধাটির বিভিন্ন অংশ সমুদ্র ও জঙ্গল থেকে এনে একত্রিত করে জীবিত করতে পারো। তবে আমাকে দেখিয়ে দাও, কিভাবে তুমি জীবিত করো। অন্য বর্ণনায় আছে, নমরুদ দুই ব্যক্তিকে ডেকে এনে একজনকে হত্যা করলো এবং অন্যজনকে ছেড়ে দিলো এবং বললো, আমি জীবন দেই এবং মৃত্যু ঘটাই। তুমি কি তোমার আল্লাহকে এমন করতে দেখেছো? এ সময় হজরত ইব্রাহিম এ রকম প্রশ্ন করেছিলেন।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেন, হজরত ইব্রাহিম খলিল পদমর্যাদায় ভূষিত হলেন। তাঁকে এই সুসংবাদ দিলেন মৃত্যুর ফেরেশতা। হজরত ইব্রাহিম বললেন, এই সুসংবাদের নির্দশন কী? ফেরেশতা বললেন, আপনি প্রার্থনা জানালে আল্লাহ তায়ালা মৃতকে জীবিত করে দেখাবেন। হজরত ইব্রাহিম আ. এর প্রশ্নটি ছিলো ওই সময়ের।

যখন আল্লাহ বললেন, 'তবে কি তুমি বিশ্বাস কর নাই?' তিনি বললেন, 'কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত-প্রশান্তির জন্য !' — মানব প্রকৃতি এই যে, প্রত্যক্ষ-গোচর না হওয়া পর্যন্ত অন্তর প্রশান্ত হয় না। এখানে সন্দেহের প্রশ্ন আসে না। এখানে সন্দেহ আল্লাহ তায়ালার শক্তিমত্তা সম্পর্কে নয়। বরং সন্দেহ ছিলো আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন কিনা তাই দেখা। রসুলে পাক স. এরশাদ করেন, দেখার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, শোনার মাধ্যমে তা হয় না।

গোবৎস পূজার সংবাদ শুনেও হজরত মুসা আ. এর রোষ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনেই ছিলো। তখনও তিনি ধরে রেখেছিলেন তওরাতকে। কিন্তু যখন তিনি নিজ চোখে তাদেরকে পূজা করতে দেখলেন, তখন তওরাত খন্ডগুলো ফেলে দিলেন এবং তা ভেঙে গেলো।

এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর বিভিন্ন লোক বললেন, হজরত ইব্রাহিম সন্দেহ পোষণ করেছেন, কিন্তু আমাদের রসুল স. সন্দেহ করেননি। আমি বলি, এ রকম উক্তি দুর্বল। কেননা হজরত ইব্রাহিমের সন্দেহবাদী না হওয়াটা এই আয়াত

দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। 'চিত্ত প্রশান্তির জন্য' — এ রকম কথা বলার পর তাঁর প্রতি সন্দেহ শব্দটি প্রয়োগ করা যায় কি? ধারণা সঠিক রাখা প্রয়োজন।

আত্মিক ভ্রমণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে বিষয়টি ভালো বুঝা যাবে। আল্লাহতায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্তির পথে বিভিন্ন মাকামের (স্তরের) অবস্থা, বিস্তৃতি এবং পর্যবেক্ষণকে আত্মিক ভ্রমণ বা সুলুক বলে। সুলুকের দু'টি অবস্থা। উরুজ (উর্ধারোহণ) এবং নুজুল (অবরোহণ)। উরুজের সময় মানবীয় স্বভাবের পরিচ্ছদ খ'সে যায়। ফেরেশতা স্বভাব বলবত হয়। রসুল পাক স. কখনো কখনো একাধারে রোজা রাখতেন। কিন্তু সাহাবাগণকে এ রকম করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবাগণ আরজ করলেন, আপনি একাধারে রোজা রাখেন, অথচ আমাদেরকে নিষেধ করেন। রসুল স. বললেন, আমি তোমাদের মতো নই। আমার প্রতিপালক আমাকে আহার করান। এই হাদিসটি উরুজের প্রমাণ। আল্লাহওয়ালাগণ এই অবস্থাকে বলেন, সায়ের ফিল্লাহ বা আল্লাহর মধ্যে ভ্রমণ। নুজুল হচ্ছে, এর বিপরীত অবস্থা। অবরোহণের এই অবস্থা মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। এই সাদৃশ্যের কারণে মানুষ নবী, রসুল এবং আল্লাহওয়ালাগণের নিকটতর হয় এবং উপকার লাভ করে। আহবানকার্য এই মাকামের উপযোগী। হজরত ইব্রাহিমের প্রশ্নটি ছিলো এই মাকামের।

জ্ঞাতব্য ঃ উরুজের সময় আরেফের (আল্লাহর পরিচয় লাভকারী) দৃষ্টি কেবল আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ থাকে। এ সময় আল্লাহর পরিচিতি লাভ হয়। সূর্যকিরণ যেমন দর্পণকে পূর্ণ আলোকোজ্জ্বল করে দেয়, উরুজাবদ্ধ আরেফের অবস্থা হয় তেমনি। সে সময় পানাহারের ইচ্ছা, সুখ দুঃখের অনুভূতি তাঁর মধ্যে আর থাকে না। নুজুলের অবস্থায় তাঁর মানবীয় প্রকৃতিসমূহ উরুজের রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে যায়। তখন ক্ষুধা, পিপাসা, বিভিন্ন প্রকার মানবীয় প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর হলেও অবিকল তা সাধারণ মানুষের মতো নয়। তখন তিনি উরুজাবস্থায় দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়গুলো অন্যদের বলতে পারেন। অন্যরাও তখন তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ-পরিচিতি প্রাপ্ত হয়। যারা তাদের সঙ্গে যতবেশী ঘনিষ্ঠ হন তারা ততবেশী কামালিয়াত (পূর্ণতা) লাভ করেন। উরুজ নবী, ওলী সকলেরই হয়। কিন্তু এর স্তরগত পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের নুজুলের মধ্যেও রয়েছে বিরাট পার্থক্য। এ জন্যই তাঁদের কারো মাধ্যমে অল্প সংখ্যক এবং কারো মাধ্যমে অধিক সংখ্যক লোক ফয়েজ প্রাপ্ত হন। এই ফয়েজ আদান প্রদানের জন্য সাদৃশ্য থাকা জরুরী। এ জন্যই মানুষের হেদায়েতের জন্য মানুষের মধ্য থেকেই নবী বানানো হয়েছে। নবীদের মাধ্যম ব্যতীত সাধারণ মানুষ আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে না। আল্লাহ হচ্ছেন নূর। আর সাধারণ মানুষ অপবিত্রতা ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সুতরাং মাধ্যমের প্রয়োজন। যিনি

আলো অন্ধকার দু'দিকেই সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম। ফেরেশতাগণও নূর। তাই তাদের মধ্য থেকে নবী বানানো হয়নি।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বসবাস করতো, তবে আমি তাদের হেদায়েতের জন্য আকাশের ফেরেশতাকে রসুল করে পাঠাতাম।' অন্যত্র বলেন, 'আমি যদি ফেরেশতাদেরকে নবী করে পাঠাতাম তবে তাদেরকে দিতাম পুরুষের রূপ এবং পরিধান করাতাম মানবীয় পোশাক।' যাঁর নুজুলের অবস্থা পূর্ণ, তাঁর প্রচারও সফলতাপূর্ণ। উচ্চ স্থানে অবস্থানকারী শিকারীর তীর অধিকাংশই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।। শায়েখে আকবর মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী কু. বলেন, হজরত নূহ আ. এর উরুজ ছিলো অত্যধিক। তাই অল্প সংখ্যক লোক তাঁর দাওয়াত কবুল করেছিলেন। আর রসুল স. এর উরুজ ও নুজুল উভয়ই পূর্ণ ছিলো বলে বিশাল জনগোষ্ঠী তাঁর অনুসারী হয়েছিলো।

আরেফে কামেল (আল্লাহ্র পরিচয় লাভকারী ব্যক্তি) উরুজ শেষে যখন নুজুলে প্রত্যাবর্তন করেন তখন সাধারণ মানুষের প্রকাশ্য বিষয়াবলীর সঙ্গে সাযুজ্য অনুভব করেন। রসুলে পাক স. যুদ্ধকালে তাঁর শরীর মোবারক হেফাজতের জন্য লোহার বর্ম পরিধান করতেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় তিনি পরিখা খনন করিয়েছিলেন। এটা ছিলো নুজুলের অবস্থা। এই মাকামে আরেফ চিত্তপ্রশান্তির জন্য অকাট্য প্রমাণ অন্বেষণ করেন। হজরত ইব্রাহিমের চিত্ত প্রশান্তির অভিলাষ এই মাকামেরই অবস্থাজ্ঞাপক। 'তিনি এক শক্তিশালী সাহায্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাচ্ছেন' — হজরত লুত আ. এর এই অবস্থাও ছিলো অনুরূপ। রসুলে পাক স. এর নুজুল হজরত ইব্রাহিম আ. এর নুজুলাপেক্ষা অধিকতর পূর্ণ ছিলো তাই তিনি বলেছিলেন, 'সন্দেহের অধিকার ইব্রাহিম আ. এর চেয়ে আমারই বেশি।' এই বাক্যটির অর্থ, চিত্তপ্রশান্তির প্রয়োজন আমারই অধিক। কারণ, আমার নুজুল তাঁর চেয়ে অধিক। বিশ্ববাসীর হেদায়েতের জন্য তাই তাঁকেই প্রেরণ করা হয়েছে। হজরত লুত আ. এর নুজুল এবং হজরত ইউসুফ আ. এর উরুজ অধিক পূর্ণ ছিলো। আর রসুল স. এর উরুজ নুজুল উভয়ই ছিলো পরিপূর্ণ।

'তবে চারিটি পাখী লও' — মুজাহিদ, আতা বিন বিরা এবং জারীর বর্ণনা করেন, ওই চারটি পাখি ছিলো, ময়ুর, মোরগ, কবুতর ও কাক।

আতা খোরাসানী বলেন, পাখিগুলো ছিলো হাঁস, কালো কাক, শাদা কবুতর এবং লাল মোরগ।

আমি বলি, মানুষ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণী চারটি জিনিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলো হলো—রক্ত, কফ, ক্রোধ ও পিত্ত। এগুলো সৃষ্ট হয়েছে ভূত চতুষ্টয় থেকে। ভূত চতুষ্টয় হচ্ছে, আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস। লাল মোরগ রক্তের সঙ্গে, সাদা কবুতর কফের সঙ্গে, কালো কাক ক্রোধের সঙ্গে এবং হাঁস

পিত্তের সঙ্গে সম্পর্কিত। আখেরাতে মানুষের পুনর্জীবন এদেরই পুনর্জীবনের মতো।

বায়যাবী লিখেছেন, পুনর্জীবন (চিরস্থায়ী জীবন) সংঘটিত হয় বিলয়ের পর। রূপসজ্জা, কামনা ও প্রেম ময়ূরের স্বভাবজাত। ভয়, জ্ঞান ও প্রতিবাদী স্বভাব হচ্ছে মোরগের। মন্দ স্বভাব, উচ্চাশা কাকের বৈশিষ্ট্য। দূরান্বেষণ যেমন বায়ু প্রবাহ— এটা হচ্ছে কবুতরের স্বভাব।

আল্লাহ্তায়ালা এখানে ইব্রাহিম আ. কে শিখিয়েছেন হেদায়েতের পদ্ধতি। শিখিয়েছেন ফানা ও বাকা। ফানা ওই অবস্থা যে অবস্থায় সৃষ্টবস্তুর জ্ঞান পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। এই অবস্থায় আল্লাহ্পাকের নাম, গুণাবলী ও মহত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহের রঙে সাধক রঞ্জিত হয়। তারপর সে যখন পুনঃঅস্তিত্ব লাভ করে তখন তা হয় স্থায়ী, যাকে বাকাবিল্লাহ্ বলা হয়। প্রাণীগুলোর অস্তিত্বহীনতা ফানা। 'অতপর উহাদিগকে ডাক দাও' — এই অবস্থা হচ্ছে জজবা (আল্লাহ্তায়ালার প্রেমাকর্ষণ)। আর তাদের পুনর্জীবন লাভ হচ্ছে বাকা। আমাদের এই ব্যাখ্যা কাশ্ফ (আত্মিকবিজ্ঞপ্তি) জাত। আত্মিক অবস্থার উপলব্ধি। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইবনে আবি হাতেম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্তায়ালার হুকুমে হজরত ইব্রাহিম পাখিগুলোকে যবেহ্ করে তাদের টুকরোগুলোকে একত্রিত করলেন এবং সেগুলো সাত ভাগে ভাগ করে সাতটি পাহাড়ে রেখে দিলেন। মাথাগুলো রাখলেন নিজের কাছে। ইবনে জারীর ও সুদ্দী এরকমই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনে জারীর, ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে এবং হজরত কাতাদা, হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে বলেছেন, ইব্রাহিম আ. ভাগ করেছিলেন চারটি এবং চারটি পাহাড়ে সেগুলো রেখে দিয়েছিলেন। ইব্রাহিম আ. যখন বললেন, আল্লাহ্র হুকুমে এসে যাও, তখন পাখিদের রক্তকণিকাগুলো, পালকগুলো এবং হাড়গুলো একত্রিত হতে লাগলো। সবশেষে সংযোজিত হলো মস্তকসমূহ।

'জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' — অর্থাৎ তাঁর পরাক্রমশীলতার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। কোনোকিছুই এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি হাকিম, কৌশলী। মৃতকে জীবিত করা তাঁর অপার হিকমত এবং অসীম প্রজ্ঞার নিদর্শন। হজরত ইব্রাহিম, হজরত উযায়ের অথবা হজরত আরমিয়ার বিবরণ তাঁর নিদর্শনসমূহকে উপস্থাপিত করেছে।

জ্ঞাতব্য ঃ মৃতকে জীবিত করা অসাধারণ ঘটনা। যারা আল্লাহ্তায়ালার এই ক্ষমতার কথা শুনে বিশ্বাস করে, তারা দেখতেও চায়। জেনে বিশ্বাস করার নাম, এলমুল একিন। দেখে বিশ্বাস করার নাম আইনুল একিন। হজরত ইব্রাহিম এবং হজরত উযায়েরের দেখতে চাওয়ার ইচ্ছা ছিলো বিস্ময়। অবিশ্বাস নয়। তাঁরা আইনুল একিনের ইচ্ছাই প্রকাশ করেছিলেন।

বায়যাবী লিখেছেন, পুনর্জীবনের ঘটনা হজরত উযায়ের দেখেছিলেন একশ বছর পর। আর হজরত ইব্রাহিম দেখেছিলেন প্রার্থনা করার সাথে সাথে। এতে প্রমাণিত হয়, হজরত উযায়ের অপেক্ষা হজরত ইব্রাহিম আ. এর মর্যাদা অধিক। হজরত উযায়েরের কথায় ছিলো শুধুই বিস্ময়। হজরত ইব্রাহিমের বিস্ময়ে ছিলো চিত্তপ্রশান্তির জন্য বিনয়াবনত আর্তি।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬১

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

❐ যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহের পথে ব্যয় করে তাহাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যাহা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যকণা। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

এখানে আল্লাহর পথে ব্যয় করার অর্থ, জেহাদে অথবা সকল কল্যাণকর্মে ব্যয় করা। এই ব্যয়ের উপমা এসেছে শস্যবীজের সঙ্গে। শস্যবীজ এবং শস্য সৃষ্টি করেন আল্লাহ্। কিন্তু এখানে সে কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। কেবল কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। কারণের স্রষ্টার উল্লেখ রয়েছে প্রচ্ছন্ন।

বাগবী, কালাবী থেকে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ চার হাজার দিরহাম নিয়ে রসুল স. এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমার কাছে আট হাজার দিরহাম আছে। চার হাজার সন্তান-সন্তুতিদের জন্য রেখে দিয়েছি। আর চার হাজার আল্লাহকে কর্জ দিতে এসেছি। রসুল স. বললেন, যা তুমি নিজের কাছে রেখেছো এবং যা তুমি আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছো সবগুলিতে আল্লাহ্ বরকত দান করুন।

হজরত ওসমান রা. তাবুক যুদ্ধের সময় এক হাজার উট আসনসহ দান করেছিলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

কালাবী, হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. থেকে বর্ণনা করেন, হজরত ওসমান সেনাবাহিনীর সাহায্যার্থে রসুলে পাক স. এর সকাশে এক হাজার দিনার পেশ করলেন। রসুল স. তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে সেগুলো নাড়াচাড়া করে বললেন, আজকের পর কোনোকিছুই ওসমানের জন্য ক্ষতিকারক হবে না। এরপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ইমাম আহমদও হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথা সেখানে উল্লেখিত হয়নি।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬২

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

❒ যাহারা আল্লাহের পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে এবং যাহা ব্যয় করে তাহার কথা বলিয়া বেড়ায় না ও ক্লেশও দেয় না তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

সাধারণতঃ দানশীলেরা নিজেকে উত্তম ধারণা করে। জাগতিক বিনিময় চায়। কিন্তু এ রকম দান আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে গৃহীত হয় না।

বাগবী বলেন, আবদুর রহমান বিন জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, আমার পিতা বলতেন, তুমি কাউকে কিছু দিলে যদি দেখো, দানের কারণে তোমাকে সে সালাম দিচ্ছে তখন তুমি তাকে সালাম কোর না। বিনিময়াকাঙ্খী তো হওয়া উচিত আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটেই।

দানকারীরা সাধারণ যাঞ্ছাকারীকে কষ্ট দেয়। যেমন বলে, আমাকে আর কতো বিরক্ত করবে? কতোবার চাইবে? এ জন্য আল্লাহতায়ালা 'ক্লেশও দেয় না' শর্তটির উল্লেখ করেছেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৩

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ○

❒ যে দানের পর ক্লেশ দেওয়া হয় তাহা অপেক্ষা ভাল কথা ও ক্ষমা শ্রেয়। আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

কালাবী বলেছেন, ভালো কথার অর্থ নেক দোয়া যা কোনো মুসলমান তার অন্য মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে করে থাকেন। জুহাক বলেছেন, পারস্পরিক শত্রুতা দূর করার জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর মতে ভালো কথার উদ্দেশ্য সেই কথা, যা পারস্পরিক বিবাদ দূর করার জন্য বলা হয়।

যে বার বার চেয়ে বিব্রত করে তাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কর্কশ ব্যবহার করা যাবে না।

বাগবী লিখেছেন, 'ক্ষমা করা' অর্থ যাঞ্চাকারীর গোপনীয়তা বজায় রাখা, তার অক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বিভিন্ন আলেম বলেন, নম্র কথার মাধ্যমে যাঞ্চাকারীকে ফিরিয়ে দেয়া। তবেই আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমা পাওয়া যাবে। কালাবী ও জুহাকের মতে বিব্রতকারীকে সুন্দরভাবে এড়িয়ে যাওয়া। নম্র বাক্য ব্যবহার ও ক্ষমা প্রদর্শন ক্লেশদায়ক দান অপেক্ষা উত্তম। খোঁটা দানকারী দাতাকে আল্লাহ্তায়ালা পছন্দ করেন না কিন্তু তাঁকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না এই কারণে যে, তিনি পরম সহনশীল।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৪

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

❒ হে বিশ্বাসীগণ! দানের কথা প্রচার করিয়া এবং ক্লেশ দিয়া তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করিওনা যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করিয়া থাকে, এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করেনা। তাহার উপমা একটি শক্ত পাথর যাহার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তাহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাহাকে মসৃণ করিয়া রাখিয়া দেয় যাহা তাহারা উপার্জন করিয়াছে তাহার কিছুই তাহারা তাহাদের কাজে লাগাইতে পারিবে না। আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

হজরত ইবনে আব্বাসের নিকট অনুগ্রহের অর্থ আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ স্মরণে রাখা এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণের নিকট এর অর্থ দানগ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ রাখা।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস রা. বর্ণনা করেন, রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, খোঁটাদানকারী দাতা এবং মাতা পিতার অবাধ্য সন্তান বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্রহীতা দাতাকে এবং মাতা পিতা সন্তানকে ক্ষমা করে। নাসাঈ, দারেমী।

লোক দেখানো সৎকাজ নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হয়, দাতা মুমিন হলেও। এরকম করা মুমিনের মর্যাদার অনুকূল নয়। বরং এটা মুনাফিকদের স্বভাব। অহংকার (রিয়া) কাফেরদের স্বভাব। অহংকারীরা অকৃতজ্ঞ। সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আল্লাহ্ তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, 'আমি শিরিককে পরওয়া করি না। যে তার আমলের সাথে অন্যকে শরীক করে (কেবল আমার সন্তুষ্টির জন্য আমল না করে) আমি তাকে শিরিককারীর সাথে রেখে দেই।' অন্য বর্ণনায় আছে, 'আমি তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হই। এবং তার আমল তারই সঙ্গে (প্রবৃত্তির সঙ্গে)।' মুসলিম।

হজরত জুনদুব রা. বর্ণনা করেন, রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, দম্ভ প্রকাশ এবং যশলাভের জন্য যে ব্যক্তি আমল করে আল্লাহ্তায়ালা তার আমলকে রেখে দেন সেই ব্যক্তিরই দম্ভ এবং যশের সঙ্গে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ বিন ফোজালা রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি ডেকে বলবেন, যে ব্যক্তি তার আমলে আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক বানিয়েছে সে যেনো তার সওয়াব সেই শরীকের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। আল্লাহ্ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। আহমদ।

হজরত মোহাম্মদ বিন লবীদ রা. বর্ণনা করেন, রসুলে পাক স. আমাকে বলেছেন, ভয়ংকর শিরিক হচ্ছে শিরিকে আসগর (ছোট শিরিক)। সাহাবা গণ আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! শিরিকে আসগর কী? তিনি বললেন, রিয়া। আহমদ, বায়হাকী।

হজরত সাদ্দাদ বিন আউস রা. বর্ণনা করেন, আমি রসুলে পাক স. কে বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মতের শিরিক ও নফসের গোপন ইচ্ছা সম্পর্কে আমি শংকিত।' আমি আরজ করলাম, সে কী রকম! রসুল স. বললেন, না। তারা সূর্য, চন্দ্র, পাথর বা মূর্তি পূজা করবে না। বরং আত্মপ্রদর্শনের জন্য আমল করবে। তারা রোজা রাখবে কিন্তু কামনা চরিতার্থ করার সুযোগ এলে রোজা ভেঙে ফেলবে। আহমদ, বায়হাকী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, কিয়ামতের সময় সর্বপ্রথম একজন শহীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আল্লাহ্তায়ালা তাকে দেয়া অনুগ্রহরাজির উল্লেখ করলে সে তা মেনে নিবে। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছো কীভাবে? সে বলবে, আমি তোমার পথে জেহাদ করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। বীর নামে খ্যাত হওয়াই তোমার কামনা ছিলো। তুমি তা পেয়েছো। এরপর আল্লাহর হুকুমে তাকে নিম্নমুখী করে দোজখে ফেলে দেয়া হবে।

এরপর বিচারের সম্মুখীন হবে একজন আলেম, যে দ্বীনি এলেম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। কোরআনও অধ্যয়ন করেছে। তাকে প্রদত্ত অনুগ্রহসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ্তায়ালা প্রশ্ন করবেন, অনুগ্রহসম্ভারের কৃতজ্ঞতা তুমি কীভাবে পালন করেছো? সে বলবে, আমি দ্বীনের এলেম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি; তোমার সন্তোষভাজন হওয়ার জন্য কোরআন অধ্যয়ন করেছি। আল্লাহ বলবেন, তোমার কথা অসত্য। আলেম এবং ক্বারী নামে খ্যাত হওয়াই ছিলো তোমার ইচ্ছা। তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ হয়েছে। অতঃপর ফেরেশ্তাদেরকে আদেশ দেয়া হবে, তাঁরা তাকে উপুড় করে দোজখে নিক্ষেপ করবে। এরপর বিচার হবে একজন সম্পদশালী ব্যক্তির। আল্লাহ্ পাক তাকে দেয়া অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে স্বীকার করবে। জিজ্ঞেস করা হবে, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তুমি কী করেছো? সে বলবে, যে সব ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা তোমার পছন্দ তার একটিও আমি বাকি রাখিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য সকল ক্ষেত্রেই আমি দান করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। দানবীর নামে খ্যাত হওয়াই ছিলো তোমার ইচ্ছা। তোমার অভিলাষ তো পূর্ণই হয়েছে। অতঃপর আল্লাহতায়ালার নির্দেশে ফেরেশ্তারা তাকে উপুড় করে টেনে হিচঁড়ে দোজখে ফেলে দেবে। মুসলিম।

বাগবী এই হাদিসের শেষে আরো বর্ণনা করেছেন, অতঃপর রসুল স. আমার উরুতে করাঘাত করে বললেন, আবু হোরায়রা, এই তিন প্রকার লোক দোজখে প্রবেশ করবে প্রথমে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৫

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

❒ যাহারা আল্লাহের সন্তুষ্টিলাভার্থে ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে তাহাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান,

যাহাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তাহার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

ওই সম্পদই আপন সম্পদ যা আখেরাতে কাজে আসে। এছাড়া অন্য সম্পদ তো ধ্বংসশীল।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুলে পাক স. বলেছেন, কোন সম্পদ তোমাদের বেশী প্রিয়? আপন সম্পদ না উত্তরাধিকারীদের সম্পদ। সাহাবাগণ আরজ করলেন, আপন সম্পদ। রসুল স. বললেন, তোমাদের আপন সম্পদ ওগুলোই, যেগুলো তোমরা আখেরাতের জন্য জমা করেছো। আর যা পেছনে ফেলে যাবে তা তো উত্তরাধিকারীদের। বোখারী।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বর্ণনা করেন, লোকেরা একটি বকরি জবেহ করলো। রসুল স. বললেন কতোটুকু (দেয়ার ও খাওয়ার পর) বাকি রইলো। সাহাবীগণ, আরজ করলেন, কেবল সীনা। অন্য কিছু নেই। হুজুর স. বললেন, বরং বলো, সীনা বাদে সবই বাকি রয়েছে। অর্থাৎ, সীনার সওয়াবই কেবল জমা হয়নি, বাকি গোশতের সওয়াব জমা হয়ে গিয়েছে। তিরমিজি বলেছেন, এই হাদিসটি সহীহ্।

সম্পদ জীবনের পাথেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ লাভের জন্য সম্পদ ব্যয় করে, তাঁর ইমান আত্মিকশক্তি সম্পন্ন হয়। আর যে, জীবন ও সম্পদ দু'টিই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে সে তার অস্তিত্বের সমস্ত শক্তি ইমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করে।

বায়যাবী লিখেছেন, এই আয়াতে এই নির্দেশনা রয়েছে যে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়, কৃপণতা ও সম্পদপ্রীতি থেকে নফস্কে পবিত্র করে। আমি বলি, ইমাম আবু হানিফা র. বলেছেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সম্পদের উপর জাকাত ওয়াজিব নয়। অভিভাবকগণ তাদের পক্ষ থেকে জাকাত আদায় করবে। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার মাধ্যমে সম্পদশালীর পরীক্ষা নেয়া হয়। পরীক্ষা নেয়া হয় — অন্তরে আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশপালনপ্রীতি না বৈভবপ্রীতি, কোনটা প্রবল। শিশুদের পক্ষে অভিভাবকগণের ব্যয় করা এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে।

'উচ্চ ভূমি' অর্থ উঁচু সমতল স্থান, যেখানে নহর প্রবাহিত হয়। যার দুই তীর নহর থেকে উঁচুও নয় নিচুও নয়। জমি উঁচু কিন্তু পানি নিচু নয় এমন বাগান সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এমন বাগানে বৃষ্টি না হলে যতোটুকু ফল জন্মে, বৃষ্টি হলে জন্মে তার দ্বিগুণ। বৃষ্টিপাত কম বেশী হলেও এ রকম বাগানে ফসলের ফলন ব্যহত হয় না। আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়কারীর অবস্থা এ রকম বাগানের মত। অল্প বৃষ্টিতেও ফসল জন্মে, আর বেশী বৃষ্টিতে জন্মে আরো বেশী। ইমানদারগণের আমলও তদ্রূপ। আমলের বিনিময় তো থাকবেই। কখনো কখনো আল্লাহর ইচ্ছায় দ্বিগুণও হয়ে যাবে।

আল্লাহতায়ালা 'সম্যক দ্রষ্টা', তিনি দু'দলের অবস্থাই দেখেন। দেখেন, ওই দলকে যারা লোক দেখানো ব্যয় করে। ওই দলকেও যাদের দানের মূলে থাকে আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনের ঐকান্তিকতা।

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

❐ তোমাদের কেহ কি চায় যে তাহার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকুক যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাহাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে, আর সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয়, যখন তাহার সন্তান-সন্তুতি দুর্বল, অতঃপর উহাকে এক অগ্নিখরা ঘূর্ণিঝড় আক্রমণ করে ও উহা জ্বলিয়া যায়? এইভাবে আল্লাহ তাঁহার নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

খেজুর ও আঙ্গুর বেশী উপকারী। তাই খেজুর ও আঙ্গুরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে অন্যান্য ফলের গাছ সম্পর্কে। এ রকম সর্ববিধ ফলের গাছবিশিষ্ট বাগানের মালিকের বার্ধক্যাবস্থায় যদি বিপর্যয় নেমে আসে, যদি অগ্নিখরায় ও ঘূর্ণিবাত্যায় সবকিছু দগ্ধীভূত কিংবা বিনষ্ট হয়, তবে তার আক্ষেপ কোন পর্যায়ের হতে পারে, অনুধাবনীয়। একে তো রোজগারে অক্ষম বৃদ্ধ বয়স, তার উপর এই বিপদ। এ অবস্থা কাম্য হতে পারে কার? কিয়ামতের দিন যখন একমাত্র প্রয়োজন হবে পূণ্য, তখন সমস্ত আমল বাতিল হলে তার উপমা তো দগ্ধীভূত বাগানের মতোই হবে।

উবায়েদ বিন উমায়ের বলেন, হজরত ওমর রা. সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, এই আয়াত সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কী? এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত কী? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ই ভালো জানেন। হজরত ওমর রেগে গেলেন, এ কেমন কথা। আল্লাহ্তো সবই জানেন। তোমরা কী জানো তাই বলো? হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, জ্বী। আমি কিছু জানি। হজরত ওমর বললেন, ভাতিজা বলে ফেলো? তোমার কম বয়সের কারণে সংকোচ কোর না। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, এই আয়াতে আমলের উপমা দেয়া হয়েছে। হজরত ওমর বললেন, হ্যাঁ। এই আয়াত ওই ব্যক্তির উপমা, যে আল্লাহ্তায়ালার

সন্তোষজনক আমল করতে চায়। অতঃপর আল্লাহ্ তার উপর শয়তানকে প্রবল করে দেন। তখন সে পাপমুখী হয়ে আপন আমলকে নষ্ট করে ফেলে।

এমনিভাবেই আল্লাহতায়ালা মানুষের জন্য নিদর্শনসমূহ উপস্থাপন করেন। যাতে মানুষ বুঝতে পারে এবং উপদেশ গ্রহণ করে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৭

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যাহা উপার্জন কর এবং আমি যাহা ভূমি হইতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়া দেই তন্মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা ব্যয় কর; এবং উহার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করিও না; যেহেতু তোমরা উহা গ্রহণ করনা, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাক। এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

'উপার্জন' অর্থ বৈধ উপার্জন। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, হারাম উপায়ে উপার্জিত সম্পদ দান করলে কবুল করা হবে না।

হারাম সম্পদ ব্যয় করাতে বরকত নেই। এ রকম ব্যয় দোজখের শাস্তিকে দূর করতে পারবে না। ভালো মন্দকে মিটিয়ে দেয়। কিন্তু অপবিত্রতা দ্বারা অপবিত্রতা দূর হয় না। আলেমরা এখানে একমত। এই আয়াত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের স্থিরনিশ্চিত দলিল। দাউদ জাহেরী কিন্তু এ বর্ণনা থেকে সরে এসে বলেন, পণ্যসামগ্রী ব্যতীত সোনা রূপা এবং অন্য বস্তুতে জাকাত নেই। অধিকাংশ আলেমের মত, আসবাবপত্র, টাকা, বাড়িঘর জায়গা ব্যবসা সংক্রান্ত হলে জাকাত ওয়াজিব। ব্যবসার শর্ত এ জন্যে জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, বাণিজ্য ব্যতীত সম্পদ বৃদ্ধি ঘটে না।

হজরত ইবনে ওমর বলেন, ব্যবসার জন্য না হলে আসবাবপত্রের জাকাত ওয়াজিব নয়। দারা কুতনী।

হজরত সামুরা বিন জুনদুব বর্ণনা করেন, ব্যবসা সামগ্রীর জাকাত আদায় করার জন্য রসুলুল্লাহ স. আমাকে হুকুম দিয়েছেন। দারাকুতনী, আবু দাউদ, বায্যার। বায্যার সুলায়মান বিন সামুরার বর্ণনা সামুরা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু তার এই বর্ণনার সনদে রয়েছে কিছু অপরিচিত বর্ণনাকারী।

আসবাবপত্রে জাকাত ওয়াজিব হয়েছে হজরত হাম্মাস বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারা। তিনি বলেছেন, আমি একবার কিছু কাঁচা চামড়া মাথায় নিয়ে হজরত ওমরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তুমি কি জাকাত আদায় করনি? আমি বললাম, এগুলো ছাড়া আমার আর কোনো সম্পদ নেই। তিনি বললেন, এগুলোই তো সম্পদ। নিচে নামাও। নিচে নামালে তিনি চামড়াগুলো গুণলেন এবং বললেন, এগুলোর জাকাত ওয়াজিব। তিনি চামড়াগুলোর জাকাত নিয়ে নিলেন। শাফেয়ী, আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে আবী শাইবা, সাঈদ বিন মানসুর, দারা কুতনী।

আবু জর বর্ণনা করেন, রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, উট, গাভী, মহিষ এবং কাপড়ের জাকাত ওয়াজিব। দারা কুতনী এই হাদিসকে তিনটি দুর্বল পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। দু'টি পদ্ধতি এসেছে মুসা বিন উবায়দা জায়েদী থেকে। যার সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেন, তার বর্ণনা গ্রহণ করা বৈধ নয়। তৃতীয় পদ্ধতিটি এসেছে আব্দুল্লাহ বিন মুয়াবিয়া বিন আসেম থেকে, নাসাঈ যাকে যয়ীফ (দুর্বল) বলেন এবং বোখারী যাকে মুনকার (পরিত্যক্ত) মনে করেন।

এই বর্ণনার একজন রাবী (বর্ণনাকারী) ছিলেন ইবনে জারীহ্। তিনি ইমরান বিন আনিস থেকে শুনে এই হাদিসটি লিখেছেন। কিন্তু বোখারী বলেন, ইবনে জারীহ্ ইমরান বিন আনিস থেকে হাদিস শুনেননি। চতুর্থ এক পদ্ধতিতে দারা কুতনী এবং হাকেম এই হাদিসকে এইভাবে উল্লেখ করেছেন যে—উট, বকরী, গরু, মহিষ এবং পোশাক পরিচ্ছদের জাকাত ওয়াজিব। যে ব্যক্তি দিরহাম এবং দিনার (স্বর্ণ ও রৌপ মুদ্রা) জমা করে রাখে, কর্জ দেয় না, আল্লাহর রাস্তায় খরচও করে না, তার সম্পদ খনিজ সম্পদ বলে গণ্য হবে। কিয়ামতের দিন এগুলো দিয়ে তাকে দাগ দেয়া হবে। এই বর্ণনাটির সনদে কোনো দোষ নেই।

যদি কোনো ব্যবসায়ী কয়েক বৎসর পর্যন্ত তার পণ্যসামগ্রী বেচা-কেনা না করে তবে এক্ষেত্রে মত রয়েছে বিভিন্ন রকমের। ইমাম মালেকের মতে জাকাত ওয়াজিব নয়, কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেলেও। পরে বেচাকেনা শুরু করলে কেবল এক বৎসরের জাকাত আদায় করতে হবে। অন্য তিন ইমামের মত হচ্ছে, প্রতি বছরের জাকাত ওয়াজিব, বেচাকেনা না করলেও। কেননা রসুলে পাক স. বলেছেন, পণ্য সামগ্রীর জাকাত দাও।

'আমি যাহা ভূমি হইতে উৎপাদন করিয়া দেই' — কোনো কোনো আলেম মনে করেন, এখানে নফল (ঐচ্ছিক) সদকার কথা বলা হয়েছে। হজরত আনাস বিন মালেক বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, মানুষ, পাখি অথবা চতুষ্পদ জন্তু বৃক্ষের ফল অথবা খেতের ফসল খেয়ে ফেললে তার ভূস্বামীর পক্ষে দান হিসাবে বিবেচিত হবে অর্থাৎ দানের সওয়াব দেয়া হবে। আহমদ, শায়খাইন

ও তিরমিজি। আমি বলি, এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, চাষাবাদ করা মোস্তাহাব (পছন্দনীয়)। কিন্তু হজরত আবু উমামা বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, ক্ষেতের ফসল জাকাতবিহীন অবস্থায় যে সম্প্রদায়ের গৃহে প্রবেশ করে সে সম্প্রদায় লাঞ্ছনার উপযুক্ত। বোখারী। এরকম চাষাবাদ অবশ্যই বদনসীবীর প্রমাণ। ওয়াল্লাহু আলাম।'

বিশুদ্ধ মত এই যে, এই আয়াতে জাকাতের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে হুকুমের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সামগ্রীর প্রকার সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন নেই।

মাসআলা ঃ খেজুর, আঙ্গুর এবং প্রতিটি আহার্য দ্রব্য যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তার দশভাগের এক ভাগ জাকাত আদায় করা ওয়াজিব। যদি বৃষ্টির পানি, নদীর জোয়ারের পানি ইত্যাদি জমিতে দিতে পরিশ্রম করতে না হয়। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। কিন্তু ফসল ফলাতে যেয়ে যদি সেচের প্রয়োজন পড়ে, তবে বিশ ভাগের একভাগ দিতে হবে। ঘাস এবং জ্বালানী কাঠের উপর জাকাত ওয়াজিব নয়। উপরোল্লিখিত ফসলগুলো ছাড়া অন্যান্য ফসলের জাকাত দেয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, প্রত্যেক প্রকার জমির ফল এবং শাকসজির জাকাত ওয়াজিব। কারণ, এই আয়াতের হুকুম সাধারণ। রসুল স. বলেছেন, আপনাআপনি বৃষ্টি এবং নদীর পানি পাওয়া গেলে দশ ভাগের একভাগ দিতে হবে। আর পানিসিঞ্চনের প্রয়োজন পড়লে বিশ ভাগের একভাগ দেয়া জরুরী। বোখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, ইবনে জারুদ। মুসলিম, হজরত জাবের থেকে এবং তিরমিজি ও ইবনে মাজা হজরত আবু হোরায়রা থেকে, নাসাঈ ও ইবনে মাজা হজরত মুআজ থেকে এবং আবু দাউদ হজরত আলী থেকে এই হাদিস উদ্ধৃত করেছেন।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওই সমস্ত ফসলের জাকাত দিতে হবে যা আহার্যরূপে গণ্য করা হয়। যেমন — খেজুর, আঙ্গুর, বুট, যব, গম, চাল ইত্যাদি। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে ওই সমস্ত ফসল যা অনুমান করে অথবা ওজন করে জমা রাখা হয় এবং জমা রাখলে নষ্ট হয় না। যেমন তিল, বাদাম, ফুন্দুক (এক প্রকার ফল) জাফরান, জিরা ইত্যাদি।

ক্ষিরা, কাকরোল, খরবুজা, তরমুজ, আনার এবং শাকসজির জাকাত রসুল স. অব্যাহতি দিয়েছেন। দারা কুতনী, হাকেম, বায়হাকী।

হজরত মুআজ রসুলে পাক স. কে লিখিতভাবে বলেছিলেন, সব্জি ও তরকারীর হুকুম কী? রসুল স. বলেছিলেন, এসবের জাকাত নেই। তিরমিজি

লিখেছেন, এই হাদিসটি সহীহ্ নয়। তবে মুসা বিন তালহা রসুল স. থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দারা কুতনী একে দূষণীয় বলেছেন। বলেছেন, হাদিসটি মুরসাল হওয়াই বিশুদ্ধ। বায়হাকী মুসা বিন তালহা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আমাদের নিকট মুআজের চিঠি আছে। হাকেম লিখেছেন, মুসা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন তাবেয়ী ছিলেন। হজরত মুআযের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিলো। কিন্তু ইবনে আবদুল বার বলেছেন, দেখা হয়নি। দারা কুতনী মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে, সজির জাকাত নেই।

দারা কুতনী হজরত আয়েশা থেকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে, সজির জাকাত নেই।

হাকেম এবং বায়হাকী হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু মুসা এবং মুআজ কে দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার জন্য ইয়ামেনে প্রেরণ করার সময় রসুলে পাক স. বলেছিলেন, গম, কিসমিস, যব ও খেজুর ব্যতীত অন্য কোনোকিছুর উপর জাকাত আদায় কোর না।

তিবরানী মুসা বিন তালহার মাধ্যমে হজরত ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এই চারটি বস্তুর মধ্যেই জাকাতের নিয়ম জারি করেছেন।

হজরত শা'বী থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেন, রসুলে পাক স. ইয়ামেনবাসীদেরকে লিখেছিলেন, চারটি ফলের উপর জাকাত ওয়াজিব। খেজুর, খোরমা, যব ও কিসমিস। পঞ্চম আরেকটি বস্তু আছে — ভুট্টা। ভুট্টারও জাকাত ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা এসেছে। কিন্তু বর্ণনাটি দুর্বল। আমি বলি, আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, জাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ ওই চারটি বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যদিও হাদিস শরীফে ওগুলোর উল্লেখ আছে। সীমাবদ্ধতার হুকুমটি রহিত হয়ে গিয়েছে।

ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী বলেন, খাদ্যরূপে ব্যবহারোপযোগী বস্তুর জাকাত ওয়াজিব। তবে খাদ্যদ্রব্যগুলো যেনো পচনশীল না হয়। যেমন, শাক পাতা, সজি, তরকারী ইত্যাদি।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং পাগলের উপরও জাকাত ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, জাকাত হচ্ছে ইবাদত। আর ইবাদতের জন্য নিয়ত জরুরী। আর বিশুদ্ধ নিয়ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং পাগল করতে পারে না। তাই তাদের উপর জাকাত ওয়াজিব নয়। যেমন তাদের উপর নামাজ ওয়াজিব নয়।

ইবাদত করার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। তাই কাফেরের উপরে জাকাত (ওশর) ওয়াজিব নয়। তাদের জন্য রয়েছে খেরাজ (খাজনা)। ওশরী জমি কোনো কাফের কিনে নিলেও তাকে খেরাজই দিতে হবে, ওশর নয়। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ বলেন, ওশরী জমির মালিককে ওশরই দিতে হবে। মালিক মুসলমান কিংবা অমুসলমান যেই হোক।

ইমাম আজমের মতে ওশরের কোনো নেসাব নেই। কম বেশী সকল অবস্থাতেই উৎপন্ন দ্রব্যের ওশর দিতে হবে। কেননা এ সম্পর্কিত হাদিসগুলোর নির্দেশনা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। ওমর বিন আবদুল আজিজ, মুজাহিদ এবং ইব্রাহিম নখয়ী এ রকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদের মতে, ওশরের জন্য নেসাব থাকতে হবে। এর পরমিাণ হচ্ছে পাঁচ ওসাক। তাঁদের দলিল হলো এই যে, রসুল স. পাঁচ ওসাকের কম হলে জাকাত ওয়াজিব নয় বলেছেন। হজরত আবু সাঈদ থেকে বোখারী ও মুসলিম এরকমই বর্ণনা করেছেন।

মাসআলা ঃ জমিতে উৎপন্ন সকল প্রকার শস্যের উপর ওশর ওয়াজিব। কোনো মুসলমান খেরাজের জমিনের মালিক হলে, তাকে ওশর দিতে হবে, খেরাজ নয়। যদি খেরাজ ও ওশর দু'টিই দিতে হয় তবে জমির জন্য খেরাজ এবং ফসলের জন্য ওশর দিতে হবে। এ মতটি অধিকাংশ আলেমদের। কারণ, খেরাজ হচ্ছে জমির খাজনা। উৎপন্ন ফসলের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। ওশর উৎপন্ন ফসলের জাকাত, জমির নয়। এ রকম অবস্থায় নেসাব শর্ত। ইমাম আবু হানিফা বলেন, খেরাজী ভূমি খেরাজী থাকে। ওশর ও খেরাজ এক সাথে মিলে না। কিন্তু এক সাথে যে মিলবে না এ রকম দলিল শরিয়তে নেই। তাই খেরাজী জমির মুসলমান মালিককে ওশর ও খেরাজ দু'টিই দিতে হবে। এ রকমই মত ব্যক্ত করেছেন জমহুর ওলামা।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কোনো মুসলমানের উপর ওশর ও খেরাজ একত্রিত হয় না। কিন্তু আবু হাতেম বলেন, এই কথা রসুল স. এর নয়। এ কথা বলেছে এই হাদিসটির বর্ণনাকারী ইয়াহহিয়া বিন আমবাসা। এটা তার কথা। সে-ই ইমাম আবু হানিফা এবং তার পূর্বসূরীদেরকে অযথা অপবাদ দিয়েছে। সে উদ্ধৃতি দিয়েছে ইব্রাহিম আল কামারের। কিন্তু ইব্রাহিম বর্ণনাকারী হওয়ার উপযুক্ত নয়। তার কথা দলিল নয়। ওদিকে হেদায়া প্রণেতা এই মাসআলায় এজমার (ঐকমত্যের) দাবী করেছেন। লিখেছেন, ফাসেক (অসৎ) অথবা আদেল (ন্যায়পরায়ণ) বাদশাহ ওশর ও খেরাজকে একত্রিত করার হুকুম দেয়নি। কিন্তু হেদায়া প্রণেতার এ দাবী মানা যায় না। কেননা ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন যে, ওমর বিন আবদুল আজিজ র. খেরাজ ও ওশরকে একত্রিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন হজরত ওমর রা. এর অনুসারী। মাসআলাটি যদি সর্বসম্মত হতো তবে ওমর বিন আবদুল আজিজ একে গোপন করতেন না।

'আমি যাহা ভূমি হইতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়া দেই' — এই কথার মধ্যে খনিজ সোনা ও রূপার কথাও আছে। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীর মত এই যে, খনিজাত সোনা ও রূপা নেসাব পরিমাণ হলে জাকাতের নিয়মে

চল্লিশ ভাগের একভাগ দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন, এগুলো খরচ করার খাত জাকাতের খাতের মতো। কিন্তু ইমাম মালেকের নিকট ওই সমস্ত খাতে খরচ করতে হবে, যে সমস্ত খাতে খরচ করতে হয় কাফেরদের সম্পদ (যুদ্ধ ছাড়া যা হাতে আসে)। ইমাম আহমদের মতও এ রকম। কিন্তু ইমাম মালেকের মত গণিমতের মালের মতো। যার একপঞ্চমাংশ দিতে হয়। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আর এ কথাও জেনে রাখবে যে, গনিমত হিসাবে যা কিছু লব্ধ হয় তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র জন্য।' আমাদের নিকট (হানাফী আলেমদের নিকট) এই আয়াতে খনিজ বস্তু অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে 'এখরাজ' এর অর্থ উৎপন্ন করা। এটাই প্রকৃত অর্থ। ইমাম শাফেয়ী একই সঙ্গে প্রকৃত এবং পারিভাষিক দুই অর্থই নিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা নেননি। ইমাম আহমদ বলেন, খনিজ বস্তুর এক পঞ্চমাংশ দান করা ওয়াজিব। চুনাপাথর, সোনা, রূপা, লোহা, তেল — সকল বস্তুর নিয়ম একই। এগুলোকে গণিমতের মালের মতো মনে করতে হবে। জাকাতও দিতে হবে গণিমতের মালের নিয়মে — একপঞ্চমাংশ। হাদিস শরীফে এরকম উল্লেখ আছে।

ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সোনা ও রূপার জন্যই জাকাত। লোহা বা অন্যান্য স্বল্পমূল্যের খনিজ বস্তুর উপরে জাকাত ওয়াজিব নয়। আমি বলি, ভূমি থেকে উৎপন্ন সকল বস্তুরই মূল্য আছে এবং এগুলো বর্ধনশীলও। বর্ধনশীল জিনিসের উপরে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের ঐকমত্য আছে। এ জন্যই জমিতে উৎপন্ন ফসল, গেল্লা (জমিতে উৎপন্ন এক প্রকার ফসল) ফল ইত্যাদির জাকাতের জন্য এক বৎসর ধরে সংরক্ষণ করা শর্ত নয়। তাই খনিজ বস্তুর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক বৎসর ধরে থাকা অথবা তার মূল্যের তারতম্য বিচার করার প্রয়োজন নেই।

এক পঞ্চমাংশ নয় — খনিজ বস্তুর চল্লিশভাগের একভাগ জাকাত দিতে হবে, ইমাম শাফেয়ীর এই মতের দলিল ওই হাদিসটি যা ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় লিখেছেন। রবীয়া বিন আবদুর রহমান বর্ণনাকারীর নাম জানা নাই এমন একজনের বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেন, রসুলুল্লাহ স. বেলাল বিন হারেস মাজানিকে কোনো এক গোত্রের খনির অভিভাবক করে জায়গীর দান করেছিলেন। খনিগুলো ছিলো খুব চাকচিক্যময়। ওই খনিগুলো থেকে জাকাত ব্যতীত অন্য কিছুই নেয়া হতো না। ইবনে আবদুল বার বলেন, এই হাদিসটি মুনকাতেহ (ধারাবাহিকতাহীন)। ইবনে জাওজী বলেন, রবীয়া সাহাবীগণকে পেয়েছিলেন, তবু বর্ণনাকারীর নাম মনে রাখতে পারেননি — এটা তাঁর দুর্বলতা।

আবু উবায়েদ কিতাবুল আমওয়ালে লিখেছেন, হাদিসটি মুনকাতেহ হওয়ার কারণেই রসুল স. যে জাকাতের হুকুম দিয়েছিলেন, এরকম স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেন, হাদিস সংকলনকারীগণ এই হাদিসকে গ্রহণ করেননি।

কারণ, জায়গীর দানের উল্লেখ থাকলেও এতে রসুল স. কর্তৃক জাকাত দানের হুকুম নেই।

ইমাম হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে রবীয়া হারেস বিন বেলাল বিন হারেস মাজানি থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর সম্প্রদায়ের খনির জাকাত তাঁর পিতা থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ইবনে জাওজীও এ রকম উদ্ধৃতি দিয়েছেন দারওয়ার্দীর বর্ণনা থেকে। ইমাম আজম আবু হানিফা দলিল পেশ করেছেন হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিস থেকে, যা সিহাসিত্তায় সংকলিত আছে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, 'খনির মধ্যে এক পঞ্চমাংশ।' আরবী রিকাজ শব্দটির অর্থ খনিজাত বস্তু এবং মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পূর্বে মাটিতে প্রোথিত সম্পদ — দু'টোই হয়। আমি বলি, দু'টোকে আলাদা রাখাই উচিত। প্রোথিত সম্পদ কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ হলে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা ওয়াজিব (ইমাম বোখারী কিন্তু বলেন, রিকাজ শব্দটি মুসতারেক খনিজ বস্তু ও প্রোথিত সম্পদ দুই-ই)। আমি বলি ঘটনা এরকম নয়। রিকাজের অর্থ একটিই-খনিজ বস্তু। বস্তুত 'এক পঞ্চমাংশ' মতটিই অধিক বিশুদ্ধ এবং শক্তিশালী। ওয়াল্লাহু আলাম।

'নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করিও না' — হাকেম, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হজরত বারাহ থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে আমাদের আনসারদের সম্পর্কে। আমরা খেজুর বাগানের মালিক ছিলাম। আমাদের মধ্যে কিছু লোক দানের ব্যাপারে আন্তরিক ছিলো না। তারা খোসা উঠে যাওয়া খেজুর দান করতো। আবু দাউদ, নাসাঈ এবং হাকেম, হজরত সাহল বিন হানীফের বর্ণনা থেকে লিখেছেন, কিছু লোক ওশর হিসাবে খারাপ ফল দিতো, তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। হাকেম, হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এক সা অর্থাৎ সাড়ে তিন সের খেজুর, খোরমা সদকায়ে ফেতের হিসাবে দিতে বলেছিলেন। আমি খারাপ খেজুর, খোরমা নিয়ে এসেছিলাম তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে লিখেছেন, কেউ কেউ খারাপ শস্য কিনে সদকা দিতো, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

'যেহেতু তোমরা উহা গ্রহণ কর না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাক' — অর্থাৎ তোমরা নিজের বেলায় তো এ রকম মাল গ্রহণ করো না। তবে আল্লাহর রাস্তায় এ রকম করো কেনো। চক্ষু বন্ধ করা অর্থ অসম্মত হওয়া। অথবা মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, কোনো পাওনাদারই খারাপ মাল গ্রহণ করে না। হাসান বসরী ও হজরত কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ — তোমরা বাজারে খারাপ সামগ্রী বিক্রি করতে দেখলে কিনতে না। অন্য এক বর্ণনায় হজরত বারাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি বলতেন, খারাপ সামগ্রী হাদিয়া দিলেও তুমি গ্রহণ করতে না। না গ্রহণ করলে দান পেশকারী লজ্জা পাবে ভাবলে যদি গ্রহণও করতে, তবুও অপ্রসন্নভাবে করতে।

আল্লাহর রাস্তায় খারাপ মাল দান করা নিষেধ, যদি ভালো মাল থাকে। কিন্তু সব মাল খারাপ হলে ওশর হিসাবে খারাপ মাল দেয়া নিষিদ্ধ নয়। আর যদি কিছু ভালো এবং কিছু খারাপ হয় তবে কিছু কিছু করে উভয় প্রকারের মাল হতে দিতে পারবে।

'এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত' — অর্থাৎ মনে রেখো, আল্লাহ্ তোমাদের সদকার মুখাপেক্ষী নন। বরং তোমরাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি অভাবমুক্ত। তোমরাই অভাবী। সদকার সওয়াব তোমাদের দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। আরো মনে রেখো, আল্লাহর সমস্ত কাজ প্রশংসনীয়।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৮

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

❐ শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'

'ফক্বর্' অর্থ দারিদ্র — সম্পদের স্বল্পতা। শয়তান এই বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, যদি দান করো তবে গরীব হয়ে যাবে। এখানে 'ফাহশা' শব্দটির অর্থ নেয়া হয়েছে কৃপণতা অর্থাৎ জাকাত না দেয়া। আসলে ফাহশা বলতে সকল প্রকার গোনাহকেই বোঝায়। কালাবী বলেন, এই আয়াত ব্যতীত কোরআনের অন্য যে সমস্ত স্থানে ফাহশা শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, সে সমস্ত স্থানে ফাহশা শব্দের অর্থ হবে ব্যভিচার (জেনা)। অপরপক্ষে আল্লাহতায়ালা ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন যে, তিনি তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বিনিময় দান করবেন। তিনি প্রকৃত প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞও।

হজরত আবু হোরায়রার এক বর্ণনায় আছে, সকাল বেলা দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। একজন বলেন,'হে আল্লাহ্! উত্তম দানকারীকে উত্তম বিনিময় দাও।' দ্বিতীয়জন বলে, 'হে আল্লাহ্! কৃপণকে ধ্বংস করো।' বোখারী, মুসলিম। হজরত আসমা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আমাকে বলেছেন, বিনা হিসাবে ব্যয় করো। আল্লাহ্ও তোমাকে বিনা হিসাবে দান করবেন। জমা করে রেখোনা। তাহলে আল্লাহ্ও জমা করে রাখবেন। তোমাকে দিবেন না। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত আবু জর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. কাবার প্রভুর কসম খেয়ে বলেছেন, ওই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি বললাম, কে? রসুল স. বললেন, যে অতিসম্পদশালী। কিন্তু ওই অতিসম্পদশালী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত নয়, যে অগ্র-পশ্চাৎ

বাম-দক্ষিণ না ভেবে দান করে। এ ধরনের লোক অত্যন্ত কম। বোখারী ও মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ, জান্নাত ও মানুষের নিকটবর্তী এবং দোজখ থেকে দূরবর্তী। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ, জান্নাত ও মানুষ থেকে দূরে, আর দোজখের নিকটে। মূর্খ দাতা কৃপণ আবেদ অপেক্ষা উত্তম। তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা অন্যস্থানে বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, দানের বিনিময়ে জান্নাতে একটি বৃক্ষ উৎপন্ন হবে, যার ডালপালাগুলো জান্নাতের বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়বে। সেই বৃক্ষের কোনো একটি ডাল ধরলে সেটি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কৃপণতা দোজখের একটি বৃক্ষ। যার ডালগুলো থাকবে দোজখের বাইরে। সে ডাল ধরলে ডালটি তাকে নিয়ে যাবে দোজখে। বায়হাকী।

হজরত আলী বলেছেন, দান করো দ্রুততার সঙ্গে। কেননা বিপদ দানকে অতিক্রম করে তোমাদের কাছে আসতে পারবে না। রজীন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৯

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

❒ তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন এবং যাহাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাহাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়; এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে।'

হিকমত অর্থ বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানানুযায়ী আমল যা আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জনের কারণ হয়। এমন জ্ঞান ওহি ছাড়া হাসেল হয় না এবং ওহি (প্রত্যাদেশ) আসে নবীগণের কাছে। তাই হিকমত নবী, রসুল এবং পরে তাদের মাধ্যমে অন্যেরা লাভ করেন।

ইবনে মারদুবিয়া, জুআইবিরের পদ্ধতিতে জুহাকের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মারফু হাদিস উদ্ধৃত করে বলেন, হিকমত অর্থ কোরআন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, কোরআন অর্থ কোরআনের তাফসীর (ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ)। যাকে হিকমত দান করা হয়েছে, তাকে দেয়া হয়েছে অতি বৃহৎ কল্যাণ। হজরত মুয়াবিয়া বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে ধর্মের বিধি বিধানের জ্ঞান দান করেন। আর আমি ধর্মের বিধি বিধান বন্টনকারী (বর্ণনাকারী)। দাতা হচ্ছেন আল্লাহ্। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, মৃত্যুর পর সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, বাকি থাকে কেবল তিন প্রকারের আমল - ১. সদকায়ে জারিয়া (যেমন নির্মিত কূপ, রাস্তা, মাদ্রাসা, সড়ক, মুসাফিরখানা ইত্যাদি) ২. এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় (যেমন রচিত

গ্রন্থাদি, সৎকর্মপরায়ণ আলেমের যোগ্য ছাত্র) ৩. সৎ ও সাধু সন্তান যারা পিতা মাতার জন্য দোয়া করে। মুসলিম। হজরত আবু মাসউদ আনসারী রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কল্যাণের পথপ্রদর্শকদেরকেও কল্যাণকর্মে ব্যপৃতদের সমান সওয়াব দান করা হবে। মুসলিম।

হজরত আবু দারদা থেকে বর্ণিত হয়েছে রসুল স. এরশাদ করেছেন, মূর্খ আবেদের উপর দ্বীনি আলেমের মর্যাদা এ রকম — যেমন তারকারাজির মধ্যে চতুর্দশীর চাঁদ।

আম্বিয়া আ. গণ দিরহাম ও দিনার (পার্থিব সম্পদ) রেখে যাননি। রেখে গিয়েছেন এলেম (জ্ঞান)। যে এই জ্ঞানকে গ্রহণ করে সেই সৌভাগ্যশালী। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী।

হজরত আবু উমামা বাহেলী রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আবেদের উপরে আলেমের মর্যাদা এ রকম যেমন আমার মর্যাদা সাধারণ মানুষের উপর। একথা নিশ্চিত যে আল্লাহ্, ফেরেশতা এবং পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত অধিবাসী এমন কি গহবরের পিপীলিকা এবং পানির মাছ সকলেই ওই ব্যক্তির উপরে রহমত প্রেরণ করেন যিনি মানুষকে সৎকর্ম শিক্ষা দেন। অর্থাৎ রহমত অবতীর্ণ করেন আল্লাহ্ আর তাঁর সমস্ত সৃষ্টি করে রহমতপ্রাপ্তির প্রার্থনা। তিরমিজি।

বোধশক্তিসম্পন্ন বা জ্ঞানবান যাঁরা তারাই আল্লাহ্র আয়াত থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। তাঁরা এমন জ্ঞানী যাঁদের চিন্তাস্রোত শয়তানী ধারণা থেকে পবিত্র। আমি বলি, এমন চিন্তা ওই সময়ে অর্জিত হতে পারে, যখন নফস পূর্ণরূপে ফানা হয়ে যায় (ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান তিরোহিত হওয়ার পর অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্ পাকের জাতের জ্ঞান লাভ হওয়ার অবস্থাকে ফানা বলে)।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭০

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

❒ যাহা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যাহা কিছু তোমরা মানত কর আল্লাহ্ তাহা জানেন। সীমালংঘনকারীগণের কোন সাহায্যকারী নাই।

মানুষ যা কিছু ব্যয় করে, আল্লাহ্তায়ালা তার সবই জানেন, প্রকাশ্যে হোক অথবা গোপনে। সঠিক পথে হোক বা অন্যায় পথে। যা ওয়াজিব এবং মানতের মাধ্যমে নিজের উপরে ওয়াজিব করে নেয়া হয় যেমন, আল্লাহ্ আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করলে দশদিন রোজা রাখবো অথবা দশজন মিসকিনকে খাওয়াবো — এসবকিছুই আল্লাহ্তায়ালা জানেন এবং এর জন্য তিনি বিনিময়ও দিবেন। লোক

দেখানো দান অথবা অন্যায় পথে ব্যয়কারীদেরকে আল্লাহ্তায়ালার অসন্তোষ থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তারা সীমানালংঘনকারী। আর সীমানালংঘনকারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭১

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

❐ তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে উহা ভাল; আর যদি তাহা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তবে তাহা তোমাদের জন্য আরও ভাল; এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করেন; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা অবহিত।'

প্রকাশ্য গোপন উভয় প্রকার দানই আল্লাহ্তায়ালার পছন্দ। দানে পাপমোচন হয়।

হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, গোপন দান আল্লাহ্তায়ালার শাস্তির আগুনকে নিভিয়ে দেয়। আর অভাবগ্রস্তদের সাথে উত্তম আচরণ হায়াত বৃদ্ধি করে। তিবরানী।

হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন, যেদিন আল্লাহ্র ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন সাত প্রকারের মানুষ আল্লাহ্র ছায়া লাভ করবেন ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক ২. যে যুবক তার যৌবনের প্রারম্ভেই আল্লাহ্র ইবাদতে নিমগ্ন হয়েছেন ৩. ওই ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পরও পুনঃ প্রবেশ পর্যন্ত যার অন্তর মসজিদ সংলগ্ন থাকে ৪. ওই সমস্ত ব্যক্তি যাঁরা আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে — একত্রিত হয় আল্লাহ্র জন্য, বিচ্ছিন্নও হয় আল্লাহ্র জন্য ৫. ওই ব্যক্তি যে নীরবে নিভৃতে আল্লাহ্র স্মরণমগ্ন থাকে এবং কাঁদে ৬. ওই ব্যক্তি যে সুন্দরী রমনীর ব্যভিচারের আহবানকে এই কথা বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, আমি আল্লাহ্কে ভয় করি ৭. ওই ব্যক্তি যার দান এতো গোপন যে, ডান হাত করলে বাম হাত জানে না। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদ রা. মারফু হাদিসে বর্ণনা করেছেন, তিন ধরনের মানুষ আল্লাহ্র অতি প্রিয় — ১. ওই ব্যক্তি যে রাতে উঠে কোরআন তেলাওয়াত করে ২.

ওই ব্যক্তি যে ডান হাতে দান করে অথচ বাম হাত তার সংবাদ রাখে না ৩. ওই ব্যক্তি, জেহাদের ময়দানে সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও যে শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের মানুষ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রিয় এবং তিন ধরনের মানুষ তাঁর অপ্রিয় - ১. অনাত্মীয় যাঞ্চাকারীকে যখন কেউ কিছু দেয় না তখন যে ব্যক্তি তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে কিছু দান করে ২. যুদ্ধরত কোনো দল প্রায় সারা রাত অভিযান শেষে যখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তখন যে ব্যক্তি দোয়া ও কোরআন পাঠে রত হয় ৩. যুদ্ধকালে সাথীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও শহীদ বা গাজী হওয়া পর্যন্ত যে শত্রুর মোকাবেলা করে।

আল্লাহ্‌তায়ালার অপ্রিয় ব্যক্তিরা হচ্ছে — ১. বৃদ্ধ ব্যভিচারী ২. দাম্ভিক ফকির ৩. জালেম ধনী। তিরমিজি, নাসাঈ।

'তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করেন' — একথার মাধ্যমে সগীরা গোনাহ্ মাফ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। রসুল স. বলেছেন, গোপন দানে পাপমোচন হয়। তিবরানী।

'তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা অবহিত' — এ কথায় গোপন দানকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। গোপন দান বিফল হয় না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭২

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

❒ তাহাদের সৎপথ গ্রহণের দায় তোমার নহে; বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন; যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহা তোমাদের নিজেদের জন্য; এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করিয়া থাক। যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহার পুরস্কার তোমাদিগকে পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হইবে, তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না।

নাসাঈ, তিবরানী, বায্যার এবং হাকেম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রথম দিকে সাহাবীগণ তাঁদের কাফের আত্মীয় স্বজনকে দান করতে

অনীহা প্রকাশ করতেন। রসুল স. এ রকম করতে নিষেধ করলেন তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইবনে আবী শাইবা হজরত মোহাম্মদ বিন হানাফীয়ার মুরসাল বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, ইবনে আবী হাতেম ও হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. কেবল মুসলমানদেরকে দান করতে বলেছিলেন, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি সকল সম্প্রদায়কে দান করার অনুমতি দিয়ে দেন। বাগবী, সাঈদ ইবনে জুবায়ের রা. থেকেও এ রকম উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

ইবনে আবী শাইবা, হজরত সাঈদ বিন জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, আপন ধর্মানুসারী ছাড়া অন্যকে দান কোর না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। আল্লাহ্র কথার মর্ম এই যে, হে রসুল! ধর্মের সুমতি দানে আপনি দায়বদ্ধ নন।

কালাবী বলেছেন, মুসলমানদের কিছু ইহুদী আত্মীয় ছিলো। মুসলমানদের সাহায্য ছাড়া তারা ছিলো নিরুপায়। মুসলমানরা এই উদ্দেশ্যে দান থেকে বিরত হলো যে, তারা যেনো মুসলমান হয়ে যায়।

'আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন' — এতে বোঝা যায় সৎপথ প্রাপ্তি আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ও অনুগ্রহেই হয়ে থাকে।

দানের বিনিময় দাতার দিকেই ফিরে আসে, সওয়াব দ্বারা তারাই উপকৃত হয়। আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি সাধনই দান করার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাই অবৈধ সম্পদ দান, গ্রহীতাকে খোঁটা দেয়া — এসব থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহতায়ালার সন্তোষবিহীন দান অপব্যয়ের নামান্তর। আর অপব্যয় নিষিদ্ধ।

যে দাতা গ্রহীতার কাছে সম্মান কিংবা অন্য কোনো বিনিময় প্রত্যাশী হয়, আল্লাহ্তায়ালার কাছে তার কোনো বিনিময় নেই। পণ্য বিনিময়কারী ক্রেতা বিক্রেতা যেমন, অন্যের কাছে তাদের কোনো পাওনা থাকে না।

ফরজ দান - জাকাত, ওশর কেবল মুসলমানদেরকে দিতে হবে। এছাড়া অন্য সকল দান মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই দেয়া বৈধ। সদকায়ে ফেতের, কাফফারা এবং মানতের ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমামে আজম বলেছেন, এ সব দান অমুসলমানকেও দেয়া যাবে। কোরআন মজীদের হুকুম অবশ্য সাধারণভাবে সকলের জন্য প্রযোজ্য।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হজরত মুআজ কে ইয়ামেনে জাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণকালে রসুল স. বলেছিলেন, ধনীদের কাছ থেকে ফরজ জাকাত আদায় করে গরীবদেরকে দিও। বোখারী, মুসলিম। এ হাদিসটি কোরআনের হুকুমের অনুকূল। কিন্তু কোরআনের পরবর্তী হুকুম দ্বারা

অমুসলমানদেরকে জাকাত প্রদান অবৈধ করে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে এর অনুসরণে হাদিসও বর্ণিত হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭৩

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ
خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

❒ ইহা অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য; যাহারা আল্লাহের পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে জীবিকার সন্ধানে ঘুরাফিরা করিতে পারে না; যাঞ্চা না করার জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে অভাবমুক্ত বলিয়া মনে করে; তুমি তাহাদের লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে। তাহারা মানুষের নিকট নাছোড় হইয়া যাঞ্চা করে না। যে ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ তাহা সবিশেষ অবহিত।

দান অভাবগ্রস্তদেরই প্রাপ্য। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযোগী যারা তাদের কথা বিশেষভাবে এই আয়াতে বলা হয়েছে। তারা আল্লাহর পথে এমনভাবে নিমগ্ন যে, উপার্জনের অবসর তাদের নেই। তারা মানুষের কাছে চায় না। তাই অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবীও মনে করে না। আল্লাহ্তায়ালা বিভিন্ন নিদর্শন দেখে তাদেরকে চিনে নিতে নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা দ্বীনের জ্ঞানার্জন অথবা জেহাদে নিয়োজিত। তারা অল্পে তুষ্ট। তাই যাঞ্চাবিমুখ। মানুষকে বিব্রত করা তাদের স্বভাব নয়। চেহারার মলিনতা ও পোশাক পরিচ্ছদের দীনতা দেখে তাদেরকে চিনে নিতে হবে।

কারো কাছে যাঞ্চা না করাই আল্লাহতায়ালার পথে নিমগ্ন ব্যক্তিদের প্রধান নিদর্শন। ইমাম আহমদ, ইবনে আবী মালিকার বর্ণনা থেকে লিখেছেন, একবার উষ্ট্রারোহী অবস্থায় হজরত আবু বকররে হাত থেকে উটের রশি পড়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ তিনি নেমে রশিটি তুলে নিলেন। লোকেরা বললো, আমাদেরকে বললেই তো পারতেন। তিনি বললেন, আমার বন্ধু মোহাম্মদ স. আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেনো কারো কাছে কিছু না চাই।

তাফসীরে মাযহারী/৬৪

আল্লাহ পাকের পথে নিমগ্ন ব্যক্তি বলতে এখানে প্রধানত আসহাবে সুফফাগণকে বোঝানো হয়েছে। তাদের সংখ্যা ছিলো চার'শ। থাকতেন মসজিদের বারান্দায়। অসহায় মোহাজের ছিলেন তাঁরা। সারাক্ষণ ইবাদত ও জ্ঞানচর্চাই ছিলো তাঁদের কাজ। রসুল স. কখনো কখনো তাঁদেরকে জেহাদে পাঠাতেন। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহায়ালা তাঁদেরকেই সাহায্য করতে আহবান করেছেন। অকুণ্ঠচিত্তে এই আহবানে সাড়া দিয়েছেন সাহাবীগণ। তাঁরা তাঁদের অতিরিক্ত আহার্য আসহাবে সুফফাগণকে পৌঁছে দিতেন।

হজরত জুবাইর বিন আওয়াম রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি উত্তম, যে মানুষের কাছে প্রার্থী না হয়ে শ্রমস্বীকার করে জঙ্গলের কাঠ কেটে পিঠে করে নিয়ে বাজারে বিক্রি করে। এভাবে আল্লাহতায়ালা তার ইজ্জত রক্ষা করেন। বোখারী।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, একবার রসুল স. তাঁর মিম্বরে উঠে যাঞ্চা করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন। বললেন, উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও যাঞ্চা করবে, কিয়ামতের দিন তার মুখ হয়ে পড়বে চর্ম ও গোশ্‌তবিহীন। আরজ করা হলো, হে রসুল ! সম্পদশালী কে? রসুল স. বললেন, পঞ্চাশ দিরহাম অথবা এর সমপরিমাণ স্বর্ণের অধিকারী। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী।

হজরত সাহল বিন হানযালা রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ধনী যাঞ্চাকারী নিজের জন্য আগুন জমা করে। তিনি আরো বলেন, ধনী কে এ সম্পর্কে আমি রসুল স. কে প্রশ্ন করেছি। রসুল স. বলেছেন, যার সকাল সন্ধ্যার আহার আছে। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, একদিন ও এক রাতের পূর্ণ খোরাক যার আছে। আবু দাউদ। আমি বলি, উল্লিখিত হাদিসগুলো বাহ্যত সামঞ্জস্যহীন। হাদিসগুলোর বর্ণনা এক রকম নয়। কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাঞ্চা করা হারাম হবে তার বিধান একরকম দেয়া হয়নি। অবশ্য মানুষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এ রকম বলা হয়েছে বোঝা যায়। যার আজকের আহারের আয়োজন আছে তার কালকের জন্য যাঞ্চা করা বৈধ নয়। প্রয়োজনীয় আহারের ব্যবস্থা থাকলেও যার পরিবারের মহিলাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র নেই, সে প্রয়োজনানুপাতে যাঞ্চা করতে পারবে। কিন্তু চল্লিশ দিরহামের মালিক অন্ন, বস্ত্র, কোনকিছুই চাইতে পারবে না।

—৫

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

❐ যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাহাদের পুন্যফল তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। সুতরাং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

ইবনে মুনজির, হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়েবের বাণী উল্লেখ করে বলেন, হজরত ওমর এবং আবদুর রহমান বিন আউফ সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা তবুক যুদ্ধের সেনাদলের জন্য অর্থ ব্যয় করেছিলেন।

ইবনে জারীর, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে আবী হাতেম এবং তিবরানী দুর্বল সূত্রের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের বাণী উল্লেখ করে বলেন, হজরত আলীর শানে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর নিকট চারটি রৌপ্য মুদ্রা ছিলো। তিনি রাতে দিনে প্রকাশ্যে গোপনে একটি করে রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করেছিলেন।

বাগবী, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হলে হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ আসহাবে সুফ্ফাদেরকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন। হজরত আলী রা.ও রাতে এক ওসাক খেজুর পাঠিয়েছিলেন। প্রকাশ্যে অর্থদান এবং গোপনে খেজুর দানের দিকেই ছিলো এই আয়াতের ইঙ্গিত।

বাগবী, হজরত আবু উমামা, হজরত আবু দারদা, মাকহুল এবং আওজায়ীর উক্তি উল্লেখ করে বলেন, এই আয়াতটি ওই সকল লোকের শানে নাজিল হয়েছে যারা জেহাদের জন্য ঘোড়া পালতেন এবং দিনে, রাতে, প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে সেগুলোর পরিচর্যা করতেন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলে মানে, সে যদি জেহাদের জন্য ঘোড়া প্রতিপালন করে তবে ঘোড়ার আহার বিহার বর্জ্য পদার্থ কিয়ামতের দিন মিজানের পাল্লায় রাখা হবে। সেগুলো পূণ্যের পাল্লাকে ভারী করবে।

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۚ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۚ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

❐ যাহারা সুদ খায় তাহারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াইবে যাহাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। ইহা এই জন্য যে তাহারা বলে, 'বেচাকেনা তো সুদের মতো।' অথচ আল্লাহ্ বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করিয়াছেন। যাহার নিকট তাহার প্রতিপালকের উপদেশ আসিয়াছে এবং যে বিরত হইয়াছে অতীতে যাহা হইয়াছে তাহা তাহারই; এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। আর যাহারা পুনরায় আরম্ভ করিবে তাহারাই অগ্নি-অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

এখানে শয়তান অর্থ জ্বিন। জ্বিনে ধরা মানুষ অপ্রকৃতিস্থ হয়। জ্বিন স্পর্শ করলে রোগব্যাধিরও সৃষ্টি হয় — একথা কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কোরআনে হজরত আইয়ুব আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনি নিজ প্রতিপালককে ডেকে বললেন, শয়তান আমাকে দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে।' এস্তেহাজা (মেয়েলী রোগ) সম্পর্কে হাদিসে এসেছে এ হচ্ছে এক প্রকার হালকা জখম যা শয়তানের স্পর্শের কারণে হয়।

কেউ কেউ বলেন, আরববাসীরা মনে করতো জ্বিন মানুষকে পাগল বানিয়ে দেয়। এই আয়াতে তাদের ধারণানুযায়ী উপমা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ সুদখোরদের পেট বড় করে দিবেন। সাপ দিয়ে তার পেট ভরে দেয়া হবে। তাই সে ঠিকমতো দাঁড়াতে পারবে না।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসুল স. শবেমেরাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এরশাদ করেন, জিব্‌রাইল আমাকে এমন কতগুলো মানুষের কাছে নিয়ে গেলেন যাদের পেট ছিলো বড় ঢোলের মতো। ফেরআউনের সাথীদের পথে পড়ে থাকবে তারা। সকাল বিকাল ফেরআউনের অহংকারী অনুসারীদেরকে দোজখে

নিক্ষেপ করা হবে। তারা লেলিহান মশাল হয়ে পশমধারী উটের মতো উন্মত্ত অবস্থায় পাথর গাছ সবকিছুকে পিষে পথ চলতে থাকবে। তারা কিছু শুনবেও না। বুঝবেও না। তাদের পদশব্দ পেয়ে সুদখোরেরা রাস্তা থেকে সরে যাবার জন্য দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা তাদের বিশাল পেট নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবেনা। যতোবার উঠে দাঁড়াতে চাইবে ততোবার চিৎ হয়ে পড়ে যাবে। ফেরআউনের অহংকারী অনুসারীরা তাদেরকে পায়ে পিষে যেতে আসতে থাকবে। তাদের এ শাস্তি হবে আলমে বরযখে।

রসুল স. ফরমান, অহংকারীগণ বলতে থাকবে, হে আল্লাহ্ ! কিয়ামত কখনো যেনো না আসে। আল্লাহ্ বলেন, 'কিয়ামতের দিন ফেরআউনের অনুসারীকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।' আমি জিব্রাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিব্রাইল বললেন, সুদখোর। তারা উঠে দাঁড়াতে পারবে না। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে তাদেরকে মনে হবে যেনো জ্বিনে ধরা রোগী। বাগবী। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, শবে মেরাজে রসুল স. এমন লোকদের কাছে পৌঁছলেন, যাদের বড় ঢোলের মতো পেট সাপে পরিপূর্ণ। বাইরে থেকেও সেগুলোকে দেখা যায়। রসুল স. প্রশ্ন করলেন, এরা কারা? হজরত জিব্রাইল বললেন, সুদখোর। আহমদ, ইবনে মাজা।

আবু ইয়ালী, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, কিয়ামতের দিন সুদখোরদের আলামত হবে এই যে, তারা দাঁড়াতে পারবে না। দাঁড়াতে চাইলে জ্বিনে ধরা রোগীদের মতো তারা কেঁপে কেঁপে উঠবে।

ইবনে আবী হাতেম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বিশুদ্ধ সনদে উল্লেখ করেন, কিয়ামতের দিন সুদখোরেরা পাগল হয়ে উঠবে। তিবরানী, হজরত আউফ বিন মালেক থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন। এখানেও পাগলামীর কথা আছে। এর অর্থ এভাবেও করা যায় যে, সুদের আয় ভক্ষণ করার সাথে সাথে সুদখোরের অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন সে সত্য মিথ্যা, হালাল হারামের পার্থক্য বুঝতে পারে না। যেমন পাগল, যাদের ভালোমন্দের জ্ঞান থাকে না।

রসুল স. সুদখোরদেরকে অভিসম্পাত দিয়েছেন। বলেছেন, সুদ খাওয়া ব্যভিচার অপেক্ষা ঘৃণ্য। মুসলিম ,হজরত জাবের এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এবং বোখারী, হজরত আবু হোযায়ফা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সুদ গ্রহীতা এবং দাতা উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন। আবু দাউদ এবং তিরমিজি হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় এবং মুসলিম হজরত জাবেরের বর্ণনায় আরো সংযোজন করেছেন যে, রসুল স. সুদের দলিল লিখক এবং সুদের স্বাক্ষীদেরকেও অভিশাপ দিয়েছেন। বলেছেন, তারা সকলেই সমান। নাসায়ী, হজরত আলী থেকে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় সুদের সাক্ষীর পরিবর্তে জাকাত

অস্বীকারকারীর কথা বলেছেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন হানযালা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জেনে বুঝে এক দিরহাম সুদ খাওয়া ছত্রিশবার ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য। আহমদ, দারা কুতনী।

ইবনে আবীদ্দুনিয়ার বর্ণনাও এ রকম। তিনি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে। আর বায়হাকী যে হাদিসটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন তাতে রয়েছে অতিরিক্ত এই কথাটি, হারাম খেয়ে যার শরীর পরিপুষ্ট হয়েছে, আগুনই তার জন্য উপযুক্ত। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সুদের মধ্যে রয়েছে, সত্তুরটি গোনাহ্। তার মধ্যে নিম্নতম গোনাহটি হচ্ছে, মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মতো। ইবনে মাজা, বায়হাকী।

'তাহারা বলে, 'বেচাকেনা তো সুদের মত।' — এ রকম কথা আল্লাহ্তায়ালার শাস্তিকে অবধারিত করে। এ রকম কথা যারা বলে, তারা হারামকে মনে করে হালাল। এ রকম ধারণা কুফরী। তাই এই আয়াতের শেষে তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সুদখোর মুমিনের অবস্থা এ রকম নয়। যেহেতু তারা গোনাহ্ করলেও গোনাহ্কে গোনাহ্ বলে স্বীকার করে। হারামে নিপতিত হলেও হারামকে হারামই জানে, হালাল মনে করে না। তাই তাদের শাস্তি হলেও তা হবে সাময়িক। স্থায়ী নয়। তাদের এই অব্যাহতি লাভ হবে নবীর শাফায়াত, আল্লাহর দয়া এবং তৌহিদ ও রোসালতের স্বীকৃতির কারণে। কাফেরদের উক্তি, 'বেচাকেনা তো সুদের মতো' — এখানে সুদকে মূল অবস্থানে রেখে বেচাকেনাকে তার সমতূল্য করা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস এ রকম যে, সুদতো হালালই সেই সঙ্গে বেচাকেনাও সুদের মতো হওয়ার কারণে হালাল। এ রকম ধারণা নির্ভেজাল কাফেরদের পক্ষেই করা সম্ভব। যদি এ রকম বলা হতো, সুদতো বেচাকেনার মতো তবে তা নিরেট কুফরীর মতো হতো না। এক্ষেত্রে বেচাকেনাকে মূল অবস্থানে রেখে সুদকে করা হতো তার অনুগামী। তবুও তো নিরেট কুফরী থেকে তাদের কথা হতো কিঞ্চিত পরোক্ষ। কিছুটা দূরবর্তী।

'অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করিয়াছেন।' — ফখরুল ইসলাম 'বাজদুবী' অভিধানে লিখেছেন, পণ্য বিনিময়কে বেচাকেনা বলা হয়। শরিয়তের সিদ্ধান্ত এরকম। তবে এর সঙ্গে আরো একটি শর্ত রয়েছে যে, এতে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের সন্তুষ্টি থাকতে হবে। সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে পণ্য বিনিময় ছিনিয়ে নেয়ার মতো। সন্তুষ্টিও বুদ্ধিনির্ভর হতে হবে। এ জন্যে পাগল ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বেচাকেনা বৈধ নয়। কেননা তাদের বুদ্ধি বিকৃত অথবা অপরিণত। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেউ বুদ্ধিমান হলে — এ সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন মত রয়েছে।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে তাদের বেচাকেনাও অবৈধ। ইমামে আজম ও ইমাম আহমদের মতে বৈধ, যদি এতে তাদের অভিভাবকের সায় থাকে।

অপরিণত জ্ঞান, পরিণত জ্ঞানের সমর্থন পেলে, ক্ষতির সম্ভাবনা আর থাকে না। এর সপক্ষে কোরআন মজীদে সমর্থন রয়েছে এ রকম — ১. 'অতঃপর তার অভিভাবক ইনসাফের সাথে মুসাবিদা করে দিবে।' ২. 'আর এতীমদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছা পর্যন্ত, বুদ্ধি বিবেচনার উন্মেষ অনুভব করতে পারলে তাদের সম্পদ তাদেরকে অর্পণ করতে পারবে।'

বেচাকেনা হচ্ছে পণ্য বিনিময়ের চুক্তি (ইজাব ও কবুল)। বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে, এই পণ্য এতো মূল্যে নিতে পারো। ক্রেতা বলবে, এতো মূল্যে দাও। বিক্রেতা বলবে, বেচলাম। ক্রেতা বলবে, কিনলাম। এ রকম বিনিময় ক্রেতা বিক্রেতা বিনা বাক্য ব্যয়ে মৌনতার মাধ্যমেও সম্পন্ন করতে পারে। এ কথা বলেছেন ইমাম আজম এবং ইমাম মালেক। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফেয়ীও এরকম মত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর মত এই যে, শাব্দিক ইজাব ও কবুল ছাড়া শুধু আদান প্রদানের মাধ্যমে বেচাকেনা হয় না। আমরা বলি, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পারস্পরিক সন্তুষ্টি। বেচাকেনা হবে অর্থ ও পণ্যের মালিকদের মধ্যে অথবা তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে।

অতিরিক্ত বেচাকেনা (ক্রেতা বিক্রেতার সম্মতি ব্যতিরেকে অন্য কারো মাধ্যমে যে বেচাকেনা হয়) সম্পর্কে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আজম এবং ইমাম মালেক বলেন, এ রকম করা বৈধ, যদি বিক্রয়কারী পরে তার ক্রয় বিক্রয়কে সমর্থন করে। এ রকম অবস্থা আগে অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মতো। এতে প্রমাণিত হবে যেনো তার প্রথম থেকেই ক্রয়বিক্রয়ের ইচ্ছা ছিলো।

ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফের নিকট ক্রেতার অনুমতির পর বেচাকেনা বৈধ হবে। তবে শর্ত এই যে, অতিরিক্ত বেচাকেনার সময় বলতে হবে, আমি ওমুক ব্যক্তির জন্য ক্রয় করছি। তুমিও ওমুক ব্যক্তির জন্য বিক্রয় করো। এ রকম কথা না বললে বৈধ হবে না।

ইমাম শাফেয়ীর নিশ্চিত উক্তি এই যে, অতিরিক্ত বেচাকেনা বৈধ নয়। ইমাম আহমদ উল্লিখিত দু'টি উক্তিই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম শাফেয়ীর দলিল এই যে, রসুল স. হাকেম বিন হাজামকে বললেন, তোমার কাছে যা নেই তা বেচাকেনা কোর না।

ইবনে জাওজী সনদসহ ওমর বিন শোয়াইব থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে বস্তু তোমার কাছে নেই তা বিক্রি করা বৈধ নয়। ঐ বস্তুও বিক্রি করা বৈধ নয়, যা তোমার অধিকারবহির্ভূত।

অধিকারবহির্ভূত বিক্রয় এ রকম — মাল মওজুদ না থাকা সত্বেও বিক্রয় সম্পন্ন করার পর বিক্রয়কারী অন্য স্থান থেকে মাল ক্রয় করে এনে ক্রেতাকে দেয়। হজরত হাকেম বিন হাজামের ঘটনা আমাদেরকে এ বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করে।

হজরত হাকেম আরজ করলেন, মানুষেরা আমার কাছে এমন সামগ্রী কিনতে আসে যা আমার কাছে থাকে না। তবু আমি বিক্রয় করি। পরে বাজার থেকে ওই সামগ্রী কিনে এনে তাকে দিই। রসুল স. বললেন, তোমার কাছে যা নেই তা বিক্রয় কোর না।

এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইউসুফ বিন মালেক। ইমাম আহমদ এবং আসহাবে সুনানেও এর উদ্ধৃতি আছে। ইবনে হাব্বানও এ রকম বর্ণনা করেছেন। ইউসুফ বলেছেন, এই হাদিসটি আমাকে বলেছেন হাকেম। অন্যান্য সনদে ইউসুফ এবং হাকেম ছাড়াও আবদুল্লাহ বিন আসেমার নাম এসেছে। কিন্তু শায়েখ আবদুল হক আবদুল্লাহকে দুর্বল এবং ইবনে হাজম অখ্যাত বলেছেন। কিন্তু ইবনে হাজার এই দলিলকে গ্রহণ করেননি।

আসহাবে সালাসা হজরত আবদুল্লাহর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন এবং নাসাঈ এই বর্ণনাকে দলিল হিসাবে পেশ করেছেন। আর তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি হাসান সহীহ্ (যে হাদিসের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি দুর্বল প্রমাণিত হয় তাকে হাসান বলে আর সহীহ্ বলে ওই হাদিসকে যার ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্ন, সনদের প্রতিটি স্তরে বর্ণনাকারীর নামোল্লেখ আছে এবং বর্ণনাকারীগণও নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, প্রখর স্মরণশক্তিসম্পন্ন)।

আমরা এখানে প্রমাণ হিসাবে আরেকটি হাদিস পেশ করছি। রসুল স. হাকেমকে এক দিনার দিয়ে একটি ছাগল কিনতে পাঠালেন। তিনি এক দিনার দিয়ে কিনলেন দু'টি ছাগল। একটি বিক্রি করলেন এক দিনার মূল্যে। তারপর অন্য ছাগলটি ও একটি দিনার নিয়ে রসুল স. এর কাছে হাজির হলেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ তোমার ক্রয় বিক্রয়ে বরকত দান করুন। এরপর এমন অবস্থা হলো যে, হজরত হাকেম মাটি কিনে বিক্রি করলেও লাভ হতো। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিজি, দারা কুতনী।

মুসলিম এই হাদিসটিকে সঠিক ধারাবাহিকতার সাথে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই ধারাবাহিকতায় আবু লবীদ লিমাজাহ বিন জিয়াদাহ উল্লেখিত হয়েছেন যাকে বাদ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু ইবনে সা'দ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম আহমদও তাঁর সুখ্যাতি করেছেন এবং মুনজেরী ও নববী লিখেছেন, তার সনদগুলো হাসান সহীহ্। ইমাম শাফেয়ী এবং কারখী এই হাদিসটিকে অন্য এক পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন যার সনদ এ রকম — ইবনে ওয়ায়ীনা, শাবীব বিন এরফেদা থেকে, শাবীব তার সম্প্রদায়ের নিকট থেকে এবং তার সম্প্রদায় ওরওয়া বারেকি থেকে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এই হাদিসটি সহীহ্ হলে আমি তার অনুরাগী হতাম। বায়হাকী লিখেছেন, শাবীবের সম্প্রদায় খ্যাতিমান নয়। এ জন্যই শাফেয়ী একে দুর্বল মনে করেছেন। সন্দেহ নেই যে, হাদিসটি মুরসাল (যে হাদিসের শেষের দিকের বর্ণনাকারীর নাম নেই, হাদিস শেষ হয়েছে কোনো

তাবেয়ী পর্যন্ত — এ রকম সনদের হাদিসকে মুরসাল বলে)। ইমাম শাফেয়ী মুরসাল হাদিসকে দলিলের উপযুক্ত মনে করেন না। খাত্তাবীও অনুরূপ মত পোষণ করেন। এই হাদিসটি কারখী একই সনদের সঙ্গে পেশ করেছেন। কিন্তু এই সনদে শাবীব ও ওরওয়ার মধ্যে হাসানের নাম এসেছে। এ জন্যে হাদিসের ধারাবাহিকতা ঠিক আছে। অতএব বর্ণনাটি আর মুরসাল রইলো না। মুরসাল আমাদের নিকট দলিল। তাছাড়া এর অনুকূলে এসেছে মুসনাদ বর্ণনা (যে মারফু হাদিসের সনদ সম্পূর্ণ মুত্তাসিল তাকে মুসনাদ বলে)।

তিরমিজি, হাবিব বিন সাবেতের মাধ্যমে হজরত হাকেম বিন হাজামের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, রসুল স. আমাকে কোরবানীর জানোয়ার কেনার জন্য এক দিনার দিলেন। আমি একটি বকরী কিনলাম। বকরীটি দুই দিনার মূল্যে বিক্রি করে আরেকটি বকরী কিনলাম এক দিনার দিয়ে। তারপর বকরী ও দিনার নিয়ে রসুল স. এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ তোমার ক্রয় বিক্রয়ে বরকত দান করুন। তিনি স. বকরীটি কোরবানী করলেন। দিনারটিও দান করে দিলেন।

তিরমিজি লিখেছেন, হাদিসটি প্রসিদ্ধ নয়। আমি বলি, এই বর্ণনা হাবীব হজরত হাকেম থেকে শোনেননি। আবু দাউদ লিখেছেন, মদীনার কোনো এক বৃদ্ধার মাধ্যমে হজরত হাকেম এই বর্ণনাটি দিয়েছেন। বায়হাকী লিখেছেন, সেই বৃদ্ধা অপ্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে এই হাদিসটি দুর্বল। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

বেচাকেনা মালের বিনিময়ে মাল এবং মালের বিনিময়ে অর্থ দুই প্রকারেরই হয়ে থাকে — ১. ওই মাল যা হুবহু উদ্দেশ্য হয়, যা মানুষ কামনা করে। প্রকৃত মাল বলতে এটাই বোঝায় ২. ওই মাল যা হুবহু উদ্দেশ্য হয় না — এমন মাল যা অন্য বস্তুর বিনিময়ে হস্তগত করা যায়, একেই বলে মূল্য; যা নির্ধারিত হয় সোনা ও রূপার নিরীখে। এ রকম বেচাকেনা চার প্রকার — ১. সোনা রূপার মাধ্যমে বেচাকেনা। সাধারণ বেচাকেনা এই প্রকারের। এ রকম বেচাকেনার সময় মাল সামনে মওজুদ থাকতে হবে এবং তা বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। হজরত হাকেমের হাদিস দ্বারা বেচাকেনার সময় মাল মওজুদ থাকা শর্ত বোঝা যায়।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. পাত্রের মাপের পরিবর্তে পাত্রের মাপে বিক্রয় নিষেধ করেছেন — ওই বস্তু হুবহু অথবা অবিকল ওই প্রকারের অন্য বস্তু দেয়া ক্রেতার উপর ওয়াজিব হয়। যেমন, কোনো বস্তুর মূল্য দশ টাকা-এ রকম স্থানে অবিকল একটি দশ টাকার নোট দেয়া জরুরী নয়। এক টাকার দশটি অথবা পাঁচ টাকার দুটি - যেভাবে হোক মোট দশ টাকা দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু যদি বিক্রয়কারীর পণ্য মওজুদ না থাকে তবে বস্তুর গুণগতমান নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। ব্যাপারটি তখন হবে অনুমাননির্ভর। তাই হাদিস শরীফে এ রকম বেচাকেনা

অবৈধ বলা হয়েছে। হজরত ইবনে ওমরের হাদিস উদ্ধৃত করেছেন ইমাম দারা কুতনী। এতে বোঝা যায়, ক্রেতার কাছে মালের মূল্য থাকা জরুরী নয় বরং পরিশোধ করা জরুরী। তাৎক্ষণিকভাবে মূল্য পরিশোধ না করলে চারটি শর্ত থাকা জরুরী হবে — ১. পরিশোধের সময় নির্ধারণ ২. পণ্যের প্রকৃত মূল্য ৩. আনুমানিক মূল্য ৪. গুণগত বিবেচনা। বিবাদ বিসংবাদ এড়ানোর জন্যই এই শর্তগুলো আরোপ করা হয়েছে। বিবাদ বেচাকেনাকে অবৈধ করে দেয়। হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. এক ইহুদীর কাছ থেকে কিছু তরকারী বা খাদ্য ক্রয় করলেন এবং তাঁর লৌহবর্মটি বন্ধক রাখলেন। সাথে সাথে তরকারীর মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারণ করে নিলেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আয়েশার দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, ইন্তেকালের সময় রসুল স. তাঁর জেরা (যুদ্ধের পোশাক) তিরিশ সা যবের বিনিময়ে এক ইহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। বোখারী।

এই হাদিসটি-ই ইমাম আহমদ এবং তিরমিজি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি এটিকে সহীহ্ বলেছেন।

ওলামাগণ ঐকমত্যের সঙ্গে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, বেচাকেনার ক্ষেত্রে চারটি শর্ত নির্ধারণ থাকা জরুরী।

১. বিক্রয়যোগ্য বস্তু নির্দিষ্ট করতে হবে। বস্তুর মূল্যমানও নির্ধারণ করতে হবে। বস্তু সামনে হাজির থাকা অথবা ক্রেতার আয়ত্তাধীনে থাকা জরুরী নয়।

এ ধরনের ক্রয় বিক্রয়ের নাম বায়ে সালয়া।

২. বস্তু বিনিময়। এক প্রকার বস্তুকে দ্বিতীয় প্রকার বস্তুর সঙ্গে বিনিময়। এ ধরনের বেচাকেনায় দু'দিকেই কেনা অথবা দুদিকেই বিক্রয় বোঝা যায়। তবে শর্ত হলো দু'দিকের সামগ্রী এক রকম হওয়া চলবে না। একদিকে মূল্যধারী বস্তু এবং অপরদিকে মূল্যধারী বস্তুর অনুরূপ বস্তু। মূল্যধারী বস্তুর মূল্যকে মূল্য এবং অনুরূপ বস্তুকে বিক্রয়যোগ্য বস্তু মনে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বস্তু উপস্থিত থাকা জরুরী নয়। ক্রেতাকে তাই মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তবে বস্তুর প্রকার ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে তার জানা থাকতে হবে। মূল্যধারী বস্তুর মূল্য যেমন নির্ধারণ করতে হবে, বিক্রয়যোগ্য বস্তু পরিশোধের সময়ও তেমনি নির্ধারণ করতে হবে। দুটি বস্তুই যদি মূল্যধারী ধরা যায় তবে হানাফী আলেমগণের মতে, বিক্রিত বস্তু আগে দিয়ে দিতে হবে এবং অপর বস্তুর মূল্যমান স্বীকার করতে হবে।

আমাদের মতে, দুই দিকের বস্তুই উপস্থিত থাকতে হবে এবং সেগুলোর মূল্যও নির্ধারণ করতে হবে। কেননা দুদিকের বস্তুকেই মূল্যধারী অথবা বিক্রয়যোগ্য বস্তু ধরে নিয়ে যে বিনিময় হয় তাকেই বলে হুবহু বেচাকেনা অর্থাৎ বায়ে মুকাইয়েজা। রসুল স. এরশাদ করেছেন, বিক্রয়যোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য থাকলে যেভাবে ইচ্ছা বেচাকেনা করতে পারবে।

তবে বেচাকেনা হতে হবে সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতে। অন্য এক বর্ণনায় 'হাতে হাতে' এর স্থলে এসেছে হুবহু।

৩. তৃতীয় প্রকার বেচাকেনার মধ্যে দু'দিকেই মূল্য নির্ধারণ হওয়া জরুরী। এ রকম বেচাকেনা সোনা রূপা অর্থাৎ নগদ বস্তু ছাড়া হতে পারে না। এখানে অনুমান করে বস্তুর বিক্রয় ও মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। এ রকম অবস্থায় দু'দিককেই বিক্রয়ের দিক বলা যেতে পারে। কারণ দু'দিকেই নগদ মূল্য নির্ধারণ থাকে। তাই কেনাবেচার স্থানে দু'দিকেরই দখল বা আয়ত্ত থাকা ওয়াজিব। এধরনের বেচাকেনাকে বায়ে সরফ বলে।

৪. চতুর্থ প্রকার বেচাকেনার নাম সলম। এ ক্ষেত্রে পণ্য গ্রহণের পূর্বেই মূল্য দিয়ে দেয়া হয়। এ অবস্থাটি সাধারণ বেচাকেনার বিপরীত। সাধারণ বেচাকেনায় পণ্য মওজুদ থাকে এবং ক্রেতার উপর তার মূল্য পরিশোধ করাও ওয়াজিব হয়। বায়-ইস্-সলম এ কর্মস্থলে পণ্য মওজুদ থাকে না কিন্তু মূল্য মওজুদ থাকে। এক্ষেত্রে ক্রেতা তাৎক্ষণিকভাবে মূল্য পরিশোধ করবে এবং বিক্রেতাও তা অধিকার করে নিবে। যখন একথা প্রমাণ হয়ে গেলো যে, বেচাকেনার জন্য মূল্যধারী পণ্য হওয়া প্রয়োজন তখন মৃতদেহ, রক্ত, শরাব অথবা শুকর এসবের বেচাকেনা বৈধ নয়। কারণ শরিয়তের দৃষ্টিতে এ সমস্ত পণ্য, পণ্য হিসাবে গণ্য নয়। এ সমস্তের বেচাকেনাকে শরিয়ত বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। এসবের মূল্য নির্ধারণ করে যদি নগদ মুদ্রা বিনিময়ের বদলে কাপড় জুতা বা অন্য কোনো হালাল বস্তুকে বিনিময় করা হয় তবুও তা শরিয়তের দৃষ্টিতে বাতিল।

রিবা (সুদ) এর আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। জমহুর আলেমদের মত এই যে, এই আয়াতে সংক্ষেপে কেবল সুদ হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর বিপরীতে বেচাকেনা যে হালাল সে কথাটি উহ্য রয়েছে। অন্য আয়াতে বেচাকেনার উল্লেখ রয়েছে এরকম, আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহে ব্যবসায় লাভ অন্বেষণ করায় কোনো গোনাহ্ নেই। সুতরাং বুঝা যায়, ব্যবসায় লাভ অতিরিক্ত হলেও হারাম নয়। একথা অবশ্য স্পষ্ট করে এ আয়াতে বলা হয়নি।

হজরত উবাদা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর এবং লবনের বদলে লবন সমান সমান হাতে হাতে লেনদেন করো এবং যখন এ সমস্তের প্রকার ভিন্ন হবে তখন যেমন কম ও বেশীর সঙ্গে চাও লেনদেন করো। কিন্তু লেনদেন হাতে হাতে হতে হবে। মুসলিম।

দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, লেনদেন করো সোনাকে সোনার বদলে, রূপাকে রূপার বদলে, গমকে গমের বদলে, যবকে যবের বদলে, খেজুরকে খেজুরের বদলে, লবনকে লবনের বদলে — কিন্তু সমান সমান, নগদা নগদি, হাতে হাতে। হ্যাঁ,

সোনা রূপার বদলে, রূপা সোনার বদলে, গম যবের বদলে, যব গমের বদলে, খেজুর লবনের বদলে, লবন খেজুরের বদলে বেচাকেনা করো। হাতে হাতে যেভাবে চাও। কম অথবা বেশী। এক ধরনের পণ্য লেনদেনে বেশী অথবা কম দিলে তা হবে সুদ। শাফেয়ী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত ওবায়দা থেকে মুসলিম এরকমই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনা শেষে যে কথাগুলো অতিরিক্ত আছে তা হলো এই — যে বেশী দিলো সে সুদ দিলো এবং যে বেশী নিলো সে সুদ নিলো। এখানে দাতা ও গ্রহীতা সমান দোষী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর সনদের দ্বিতীয় সিলসিলায় বর্ণিত হয়েছে, সোনাকে সোনার বদলে বিক্রয় কোর না। রূপাকে রূপার পরিবর্তে বিক্রয় কোর না। অনুপস্থিত পণ্যকে নগদের পরিবর্তে বিক্রয় কোর না। বোখারী, মুসলিম। এক বর্ণনায় এসেছে, সোনাকে সোনার পরিবর্তে এবং রূপাকে রূপার পরিবর্তে বেচাকেনা কোর না। কিন্তু সমান সমান হলে করতে পারবে।

নিম্নলিখিত হাদিস সমূহে ছয়টি বস্তুর ক্ষেত্রে সুদ হারাম হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। সিহাহ্ সিত্তায় হজরত ওমর থেকে, মুসতাদরাকে হাকেমে হজরত আলী থেকে, মুসলিম শরীফে হজরত আবু হোরায়রা থেকে, দা'রাকুতনীর হাদিসে হজরত আনাস থেকে, বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত আবুবকর থেকে, বায্যারে হজরত বেলাল রা. থেকে এবং বায়হাকীতে হজরত ওমর থেকে।

সংখ্যাগত দিক থেকে দাউদ জাহেরী এবং তার অনুসারীগণ এবং আকীল হাম্বলীর উক্তি এরকম যে, মাত্র ছয়টি বস্তুর ক্ষেত্রে সুদ হারাম। এই হাদিসের সম্পর্ক রয়েছে হজরত কাতাদা এবং তাউসের দিক থেকে। জমহুরের নিকট উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর ক্ষেত্রে সুদ হারাম হওয়া নিশ্চিত। নির্দেশনা হয় কারণের ভিত্তিতে। হারাম হওয়ার কারণ পাওয়া গেলে হারাম তো হবেই।একদলের নিকট মালই হলো মূল কারণ। একথা মেনে নিলে, সকল মালের ক্ষেত্রে সুদ হওয়া প্রমাণিত হবে। অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, সকল ক্ষেত্রে কারণ একরকম হয় না। সোনা, রূপা এবং অন্যান্য বস্তুর কারণ বিভিন্ন। কেননা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক সোনা ও রূপায় বস্তুগত নয় মূল্যগত কারণকে গ্রহণ করেছেন। এরকম অবস্থায় সোনা রূপা ছাড়াও যে সমস্ত বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা যায়, সে সমস্ত বস্তু কমবেশীর সঙ্গে বিনিময় হারাম। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ বস্তুর ওজনকে কারণ বলেছেন। সুতরাং যে সমস্ত বস্তুর বেচাকেনা ওজনের মাধ্যমে হয় যেমন — লোহা, রাংতা এসমস্ত বস্তুতেও সুদ হারাম। সোনা রূপা ছাড়া অন্য চারটি বস্তু এক রকম হলে যন্ত্র বা পাল্লার সাহায্যে মেপে যদি বেচাকেনা করা হয় তবে সুদ হারাম হওয়ার কারণ হবে। চাই তা খাদ্যবস্তু হোক অথবা নাই হোক।

ইমাম মালেকের নিকট বস্তু এক রকম হওয়া এবং আহার্য বস্তু হওয়াই কারণ। ইমাম শাফেয়ীর মতে খাদ্যবস্তু (আনুমানিক অথবা ওজনযুক্ত) হওয়াই কারণ। কেননা ওজনযুক্ত খাদ্যবস্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সুদের হুকুম প্রযোজ্য হয়। কিন্তু অনুমানে অথবা যন্ত্রের মাধ্যমে যা নির্ণয় করা যায়না তার মধ্যে সুদ প্রযোজ্য নয়। যেমন ডিম। ইমাম শাফেয়ীর শেষ বর্ণনা এই যে, একজাতীয় আহার্য বস্তু হওয়াই হারাম হওয়ার কারণ। ফল, তরিতরকারী, ঔষধ, মিষ্টান্ন এক জাতীয় হলে সুদ হবে। ইমাম শাফেয়ী বস্তুর মূল্যধারী হওয়া এবং সেগুলো আহারোপযোগী হওয়াকে কারণ বলেছেন। আর ইমাম মালেক কারণ বলেছেন কেবল আহারোপযোগী হওয়াকে। তাঁদের উক্তির দলিল হাদিস শরীফে 'সমান সমান এবং হাতে হাতে' এরকম ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এ দু'টি শর্তে বুঝা যায় যে, বেচাকেনা মর্যাদার ভিত্তিতে এবং সময়ানুযায়ী হতে হবে। যেমন বিবাহ। বিবাহের জন্য সাক্ষী থাকা শর্ত। আর স্ত্রী দ্বারা উপকার লাভ করা সময়ের ব্যাপার। বিষয়টির কারণ সময়নির্ভর মর্যাদায় অভিষিক্ত। যেমন, স্থায়ী থাকা, উভয়ে জীবিত থাকা এবং দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। ধার্যকৃত মোহরানার মূল্যমান জানা থাকা প্রয়োজন। কেননা, বস্তু লাভ হয় মূল্যের মাধ্যমে।

হুকুমের গুরুত্ব শর্তের উপরে হয়ে থাকে। শর্ত না পাওয়া গেলে হুকুম কার্যকরী হতে পারে না। যেমন ব্যাভিচারের শাস্তি সঙ্গেসার করা (ব্যভিচারীকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুতে উপর্যুপরি পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা)। কিন্তু এর শর্ত হলো ব্যভিচারীকে বিবাহিত হতে হবে। বিবাহিত না হলে সঙ্গেসার করা যাবে না।

হজরত মুয়াম্মার বিন আবদুল্লাহ্‌র মারফু হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, খাদ্যবস্তু হওয়াই কারণ। রসুল স. বলেছেন, খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য সমান সমান বেচাকেনা করো। মুসলিম।

কথা হচ্ছে, কারণ এবং হুকুম একই প্রকৃতির হওয়া বাঞ্ছনীয়। যা জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তার জন্য সাধারণ অনুমতি থাকা প্রয়োজন। এতে কোনো শর্তের কারণে যেনো ন্যূনাধিক্য না হয়। যেমন, পানি ঘাস ইত্যাদি সাধারণভাবে হালাল। ইমাম আবু হানিফার উক্তিতে একজাতীয় হওয়া এবং ওজন নির্ধারণ করাই হুরমতে ইল্লত (হারামের কারণ)। সুদকে হারাম করার উদ্দেশ্য সম্পদকে অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করা। আর হেফাজতের জন্য মাপ ও ওজনের প্রয়োজন। আল্লাহ্‌তায়ালাও মাপ ও ওজনে ইনসাফ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, 'তোমরা ইনসাফের সাথে ওজন করো।' 'অন্যত্র বলেছেন, 'যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। তারা নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং দেয়ার সময় ওজনে কম দেয়।'

রসুল স. অতিরিক্ত দেয়া নেয়াকে হারাম করে দিয়েছেন এবং সমান সমান লেনদেনকে করেছেন ওয়াজিব। সমান সমান নির্ধারিত হয় মাপের মাধ্যমেই। এজন্য পরিমাণ ও পরিমাপই কারণ। রসুলে পাক স. নিজে এরকম আমল করেছেন এবং বলেছেন, এক জাতীয় জিনিস সমান সমান হলে বিনিময় কোর। আর যদি প্রকার ভিন্ন হয় তবে কমবেশী করাতে গোনাহ্ নেই। এই হাদিসটি হজরত আবু ওবায়দা এবং হজরত আনাস থেকে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু সাঈদ এবং হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জাওয়াদ বিন ওরওয়াকে খয়বরের আমীর করে পাঠালেন। জাওয়াদ সেখানকার উৎকৃষ্ট খেজুর রসুল স. এর খেদমতে পেশ করলেন। তিনি স. বললেন, ওখানকার সমস্ত খেজুর কি এরকমই ? জাওয়াদ বললেন, জী না। আমরা সেনাশিবিরে মিলিত হওয়ার সময় দুই সা দিয়ে এক সা এবং তিন সা দিয়ে দুই সা কিনেছি। রসুল স. বললেন, এরকম কোর না। মূল্য নির্ধারণ করে বিক্রি কোর। তারপর ওই মূল্য দিয়ে কিনে নিও। ওজনসাপেক্ষ বস্তুর হুকুম এরকমই। দারা কুতনী।

আমি বলি, সুদের পরিসর সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাপক। সীমাবদ্ধ বা সংক্ষিপ্ত বিষয় সহজে বোঝা যায়না। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণের বর্ণনা থেকে একথা পরিস্কার বোঝা যায়। রিবা (সুদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ স্পষ্ট। অর্থাৎ বেশী হওয়া। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'যতোটুকু সে তোমার জন্য করেছে তুমিও ততোটুকু করো।' অতিরিক্ত করার সুযোগ এখানে নেই। বেচাকেনা এবং ঋনের বেলায় এরকম করাই ওয়াজিব। যে পরিমাণ নিবে সে পরিমাণই দিবে। কিন্তু ওজনসাপেক্ষ বস্তুর ক্ষেত্রে এরকম বাধ্যবাধকতা নেই। এক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমেই বিনিময় বৈধ। ক্রয় বিক্রয় সাধারণত এই নিয়মেই হয়। এক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতাকে পরস্পরের সিদ্ধান্ত জেনে নিতে হবে। বিনিময় হতে হবে হাতে হাতে। হাতে হাতে না হলে বস্তুর পরিমাণে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। একদিকে সাথে সাথে গ্রহণ আর অন্যদিকে একযুগ পরে গ্রহণ সুদের মতো। এ ক্ষেত্রে সমতা অটুট থাকেনা। দেরীতে গ্রহণের কারণে মূল্যমান বাড়িয়ে দেয়া হয়। যেমন, দশ দেরহাম নিয়ে এগারো দেরহাম দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হারাম। এভাবে ভালোর বদলে মন্দ বস্তু বেশী দেয়া এবং ভালো বস্তু দেয়ার কথা থাকলেও মন্দ বস্তু বেশী দিয়ে পুষিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা বৈধ নয়। কম ওজনের ভালো বস্তু ভালো হলেও ওজনে কিন্তু কমই। আবার মন্দ বস্তু ওজনে বেশী হলেও ভালো হয়ে যায়না। তাই পরিমাপ ও পরিমাণে দু'টি বস্তু সমান সমান হলে ভালো বস্তুটি ভালো হওয়ার কারণে সুদ হয়ে যায়। কিন্তু জমহুরের উক্তি এই যে, ভালোমন্দ বিবেচ্য বিষয় নয়। পরিমাপ ও পরিমাণ ঠিক থাকতে হবে। গুণগত পার্থক্যের কারণে সুদ হবেনা।

হেদায়া প্রণেতা এই মতের সমর্থনে রসুল স. এর এরশাদ উল্লেখ করেছেন এইভাবে, ভালো ও মন্দ এক বরাবর। এই হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ হলে আর কোনো

দলিল আবশ্যক করেনা। আমাদের কথা এই যে, বস্তুর গুণগত উৎকর্ষ নির্ধারণ করা শক্ত। ইবনে হাম্মাস লিখেছেন, গুণগত পার্থক্যের কারণে সুদ নির্ণীত হলে বেচাকেনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। আমি বলি, বন্ধ হবেনা। কেননা মন্দ বস্তু বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ভালো বস্তু ক্রয় করা যায়। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'যদি তোমাদের কারো নিকট কোন কর্জ (পাওনা) থাকে তবে সে যেনো ভালো বস্তুর পরিবর্তে মন্দ বস্তু না লয়। কিন্তু লজ্জাবশত মন্দ বস্তু নিলে উত্তম।' এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় কর্জ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে বস্তুর ভালোমন্দ বিচার করা জরুরী নয়। ভালোর বিনিময়ে মন্দ নেয়া যেতে পারে। কিন্তু পাওনাদার যদি মন্দ নিতে অস্বীকার করে তবে এটা তার অধিকার। তাকে ভালোর বদলে ভালোই দিতে হবে।

মাসআলা ঃ খোরমার পরিবর্তে খেজুর এবং আঙ্গুরের পরিবর্তে কিস্‌মিস্ বেচাকেনা করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। সমান হলেও নয়, কম বেশী হলেও নয়। জমহুরের উক্তি এরকম। ভেজা ও শুকনো গমের বিনিময় অথবা শুকনো এবং পাকা বা ভুনা গমের বিনিময়ও বৈধ নয়। কিস্‌মিস্ ও আঙ্গুরের বিনিময় সম্বন্ধে ইমাম আবু হানিফার দুই রকম মত জানা যায়। একটি হ্যাঁ বাচক অন্যটি না বাচক। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি খোরমা ও খেজুরের বিনিময়কে বৈধ বলেছেন।

জমহুরের উক্তির দলিল হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের হাদিসটি। তিনি বলেছেন, রসুল স. এর নিকট খেজুর ও খোরমার বিনিময় প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তিনি এরশাদ করেছেন, খেজুর শুকিয়ে গেলে ওজনে কম হয়ে যায় না কি? আরজ করা হলো, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, একারণেই বৈধ নয়। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এরকম করতে নিষেধ করেছেন। শাফেয়ী, আহমদ, ইবনে খাজিমা, ইবনে হাব্বান। হাকেম, দারা কুতনী, আলবায্যার বায়হাকী, আসহাবে সুনান, জায়েদ আবুল আয়াশ এর হাদিস থেকে। হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন আলেমগণ এই হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন। আমি বলি, বর্ণনাগুলোতে জয়ীফ (দুর্বল) হওয়ার অকাট্য কোনো প্রমাণ নেই। ইবনে জাওজী লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা বলেন, জায়েদ আবুল আয়াশ অখ্যাত।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফার নিকট তিনি অখ্যাত হলেও অন্যান্য আলেমগণের নিকট অখ্যাত নন। ইবনে হাজার বলেন, তিরমিজি জায়েদের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি একে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম মুসলিমও এর উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন তিনি (জায়েদ) হজরত সা'দ এবং আব্দুল্লাহ্ বিন এজিদের বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনী তাকে (জায়েদকে) নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আসলে এই হাদিসটি সহীহ্। খেজুরের জলীয় অংশ আসলে খেজুর নয়। আর জলীয় অংশের

পরিমাণ নির্ধারণযোগ্য নয়। তাই খোরমা ও খেজুরের বিনিময় সমান সমান অথবা কমবেশী কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। হানাফীগণ বলেন, খেজুর খোরমার সমগোত্রীয় হলে সম ওজনে বেচাকেনা বৈধ। কারণ রসুল স. বলেছেন, একই প্রকৃতির বস্তু সমানে সমানে বেচাকেনা করো। বস্তু সমগোত্রীয় না হলেও বেচাকেনা করা যাবে। কেননা রসুল স. বলেছেন, পৃথক প্রকৃতির বস্তু যেভাবে চাও বেচাকেনা করো। গণনা ও পরিমাণের পার্থক্য যেখানে কম, সেখানে গণনা দ্বারা বিনিময় বৈধ হওয়া উচিত নয়। প্রকাশ্য নির্দেশ এরকমই। যেমন আখরোট এবং একজাতীয় প্রাণীর ডিম। এসব ক্ষেত্রে পরিমাপ ও গণনা ঠিক থাকলেও পরিমাণে পার্থক্য হওয়া সম্ভব। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ওজনের মাধ্যমে বিনিময় বৈধ। এ কারণেই সমতা ঠিক রাখার জন্যে শরিয়তে ওজন নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ভিন্ন জাতীয় প্রাণীর ডিম গণনার মাধ্যমে বিনিময় হতে পারে।

মাসআলা ঃ যব ও গমের কমবেশী বিনিময় বৈধ হতে পারে যদি ক্রেতা বিক্রেতা তা মেনে নেয় এবং দেয়া নেয়ার কাজ তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করে। বিনিময় সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন না হলে মূল্যমানে সমতা ঠিক থাকতে পারেনা। এ ক্ষেত্রে কমবেশী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। আর কমবেশী করাটাই সুদ।

মাসআলা ঃ লোহা ইত্যাদির সঙ্গে গম কমবেশী হলেও বিনিময় বৈধ। কিন্তু বিনিময়ের কাজ সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদন করতে হবে। কেননা রসুল স. ভিন্ন প্রকৃতির পণ্য বিনিময় হাতে হাতে যেভাবে ইচ্ছা করতে বলেছেন। এই হুকুমটি সাধারণ।

মাসআলা ঃ পশু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। মূল্য সাথে সাথে পরিশোধ করা জরুরী নয়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতি থাকলেই চলবে। অবশ্য কিয়াস (চিন্তাভাবনা) এই সিদ্ধান্তের অনুকূল নয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কোরআন, হাদিস ও এজমার অনুকূল। তাই কিয়াস এখানে বর্জনীয়।

মাসআলা ঃ ভিন্ন প্রকৃতির পশু বিনিময় বৈধ। কিন্তু বিনিময় সঙ্গে সঙ্গে হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে না হলে বৈধাবৈধ সম্পর্কে আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে না হলে বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন বৈধ। ইমাম মালেক বলেছেন, একই প্রকৃতির বস্তুর বিনিময় সঙ্গে সঙ্গে না হলেও বৈধ হবে যদি কমবেশী করা না হয়। আর পৃথক প্রকৃতির বস্তুর বিনিময় সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। নতুবা তা বৈধ হবে না। দলিল হিসাবে তিনি হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আসের বর্ণনা পেশ করেছেন। বর্ণনাটি এই, রসুল স. যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করতে বললেন। আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস নিবেদন করলেন, আমার কোনো বাহন নেই। রসুল স. বললেন, জাকাত আদায়কারী ফিরে এলে মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাহন কিনে নাও। তিনি

দুইটি উট দেয়ার অঙ্গীকার করে একটি উট কিনলেন। ইমাম আবু হানিফার অভিমতের ভিত্তি দুটি। একটি যুক্তিসম্মত, আর একটি প্রমাণসম্মত। যুক্তি বলে, পশু-প্রাণী নগদ মূল্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। ক্রেতার পক্ষে মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব। এই ওয়াজিব নগদ মূল্যের মাধ্যমেই পালন করা সম্ভব। পশু-প্রাণীর মাধ্যমে সম্ভব নয়। কারণ পশু-প্রাণীর ক্ষেত্রে মূল্যমান নির্ধারণ করা সহজ নয়। পশুর আকার প্রকার ও গুণাগুণের সুনির্দিষ্ট মূল্যমান থাকেনা। সলম (গ্রহণ করার আগেই মূল্য পরিশোধ করা) প্রকৃতির বেচাকেনা পশু বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, দেখার আগে পশুর প্রকৃতি ও গুণাগুণ নির্ধারণ করা যায় না। ইমাম আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, দারেমী, ইবনে মাজা এবং আবু দাউদ, হজরত সামুরা বিন জুনদুব থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. পশুর বিলম্বিত বিনিময় নিষিদ্ধ করেছেন। বিলম্ব এক দিক থেকে হোক বা উভয় দিক থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দারাকুতনীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি এবং ইমাম আহমদ বাসিল, হেজাজ বিন আরতাত, আল জুবাইর ও হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পশু বেচাকেনার পরে বিলম্বে হস্তগত করা দুরস্ত নয়।

বেচাকেনা হাতে হাতে হতে হবে। তিরমিজি এই হাদিসকে হাসান বলেছেন। তিবরানী হজরত ইবনে ওমর থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। ইবনে জাওজী হজরত সামুরা, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত জাবের থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদিসের সনদ দোষমুক্ত। এ প্রসঙ্গেঁর হাদিসগুলোর মধ্যে প্রকাশ্যতঃ দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এখানে উল্লেখিত হাদিসকে ইতোপূর্বে উল্লেখিত এক উটের বিনিময়ে দুই উটের হাদিস অপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কারণ, সতর্কতামূলক হাদিস সাধারণভাবে বৈধতা বর্ণনাকারী হাদিস অপেক্ষা অগ্রগামী। কিয়াস সমর্থিত বলে এই হাদিসটি আমাদেরকে বারবার উল্লেখ করতে হচ্ছে।

মাসআলা ঃ বেচাকেনার সময় অতিরিক্ত কোনো শর্ত সংযোজন করা হলে বৈধ হবেনা। এতে যদি ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই উপকার হয় তবুও নয়। অতিরিক্ত শর্ত সুদতুল্য। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী এরকমই বলেছেন। ইবনে আবী লায়লা, নাখয়ী এবং হাসান বলেছেন, বেচাকেনা বৈধ হবে কিন্তু অতিরিক্ত শর্তকে বাতিল করতে হবে। ইবনে শুবরাম এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, বেচাকেনা ও শর্ত উভয়ই বৈধ। ইমাম মালেক বলেছেন, যতোটুকু শর্ত বেচাকেনার অনুকূল ততটুকু বৈধ। এর অতিরিক্ত বৈধ নয়।

ইমাম আবু হানিফা পণ্য বিনিময়ে বিলম্বিত করা অথবা বিনিময়কে ঠেকিয়ে রাখাকে বৈধ বলেননি। একজাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে পরিমাণ সমান হতে হবে।

একজাতীয় না হলে মূল্য ও পণ্য সাথে সাথে অধিকারে আনতে হবে। পণ্য বিনিময়ে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে কেউ অতিরিক্ত লাভবান হলে তা হবে বিলম্বে বিনিময়ের মতো। বিনিময়ের সিদ্ধান্তবিরোধী শর্ত তাই বৈধ নয়। এ ধরনের শর্ত বাতিল। এবং সিদ্ধান্তও বাতিল। যেমন, কেউ যদি বাঁদী ও গোলাম কেনার সময় এই শর্ত সংযোজন করে যে, কেনার পর সে বাঁদী ও গোলামকে আজাদ করে দেবে, অথবা বাঁদীকে সন্তানবতী করে দেবে তবে তা বৈধ হবেনা। এ ধরনের শর্ত বেচাকেনার মূল নিয়মের অতিরিক্ত। ইবনে হাজাম, তিবরানী, হাকেম।

ইবনে সাঈদ বলেন, আমি মক্কায় পৌছে আলাদাভাবে আবু হানিফা, ইবনে আবী লায়লা এবং ইবনে শুবরামার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করলাম, বেচাকেনার সঙ্গে অতিরিক্ত শর্ত সংযোজনের হুকুম কী? ইমাম আবু হানিফা বললেন, বেচাকেনা ও শর্ত দুই-ই বাতিল। আবী লায়লা বললেন, বেচাকেনা বৈধ। কিন্তু শর্ত বাতিল। ইবনে শুবরাম বললেন, বেচাকেনা ও শর্ত উভয়ই বৈধ। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এতো মতবিরোধ! ইবনে আবী লায়লা এবং ইবনে শুবরামের মত যখন ইমাম আবু হানিফাকে জানালাম, তখন তিনি বললেন, আমি জানিনা তাঁরা এমন বললেন কেনো। আমর বিন শোয়াইব তাঁর পিতা এবং পিতামহের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. অতিরিক্ত (ফাসেদ) শর্তযুক্ত বেচাকেনাকে নিষিদ্ধ করেছেন। এমতাবস্থায় বেচাকেনা ও শর্ত উভয়ই বাতিল।

এরপর আমি গেলাম ইবনে আবী লায়লার কাছে। অন্য দু'জনের মত তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, বুঝতে পারছিনা তাঁরা এমন বললেন কেনো। হিশাম বিন ওরওয়া তাঁর পিতার মাধ্যমে হজরত আয়েশার উক্তি বর্ণনা করেছেন। হজরত আয়েশা বলেছেন, রসুল স. আমাকে বলেছেন, বোরায়রাকে (আজাদ করার কথা বলে) কিনে নাও এবং তাকে আজাদ করে দাও (এমতাবস্থায় গোলামের মূল্য পাবে তার মালিক)। অতঃপর কেনাবেচা জায়েয, শর্ত বাতিল।

শেষে গেলাম ইবনে শুবরামার কাছে। সব শুনে তিনি বললেন, আমি জানিনা তাঁরা এরকম বলছেন কেনো। আমার কাছে তো মুসয়ার, মোহাবের বিন দিসার হজরত জাবেরের উক্তি বর্ণনা করেছেন। হজরত জাবের বলেছেন, আমি রসুল স. এর মাধ্যমে এই শর্তে একটি উটনী কিনলাম যে, আমি তাতে চড়ে মদীনায় যাবো। এতেই বোঝা যায়, বেচাকেনা ও শর্ত উভয়ই বৈধ।

প্রশ্ন ঃ ইমাম আবু হানিফা বর্ণিত হাদিসটিকে অধিকাংশ আলেম মুরসাল বলেছেন। অন্য দু'জনের হাদিস দু'টি মুসনাদ। আর মুসনাদ মুরসালের চেয়ে উত্তম ও শক্তিশালী।

উত্তর ঃ মুরসাল বলে ওই হাদিসকে যাতে সনদ অস্পষ্ট থাকে। কিন্তু আবু দাউদ, তিরমিজি এবং নাসাঈর উদ্ধৃতিতে 'তাঁর দাদা হতে' আবদুল্লাহ বিন আমর

বিন আস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এই সনদে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ক্রয় বিক্রয়ের সঙ্গে কর্জ এবং শর্ত বৈধ নয়। কোনো পণ্য অধিকারবহির্ভূত রেখে বেচাকেনা কোর না। তিরমিজি বলেছেন, এই হাদিসটি হাসান সহীহ্। এর সমর্থনে আরেকটি হাদিস রয়েছে ইমাম মালেকের মুয়াত্তায়। বর্ণনা করেছেন, হজরত হাকেম বিন হিশাম। তিবরানী, মোহাম্মদ বিন শিরিনের মাধ্যমে হজরত হাকেমের যে বর্ণনাটির উল্লেখ করেছেন, সেটি হচ্ছে এই, রসুল স. ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চারটি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন — ১. কর্জ ২. অতিরিক্ত শর্ত সংযোজন ৩. আয়ত্তবহির্ভূত বেচাকেনা ৪. এবং আওসের ক্রয় বিক্রয় (আওস হচ্ছে এক প্রকার হিংস্র জন্তু)। কর্জ অর্থ, ক্রেতা বিক্রেতাকে কিছু টাকা কর্জ দিবে — একথা বলা। এক্ষেত্রে ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে যে কোনো একজনের অতিরিক্ত লাভের সুযোগ রয়েছে।

ইবনে আবী লায়লা বর্ণিত হাদিসটি রয়েছে বোখারী ও মুসলিমে। হজরত আয়েশা বলেছেন, বোরায়রা বললেন, নয় উকিয়া পরিশোধের শর্তে আমার মালিকের সঙ্গে আমার একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বৎসরে এক উকিয়া দিতে হবে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমি বললাম, তোমার মালিক সম্মত হলে আমি একবারে পরিশোধ করে দেবো এবং তোমাকে মুক্ত করে দেবো। কিন্তু ত্যাজ্য সম্পদের সত্ত্ব থাকবে আমার। রসুল স. আমাকে বললেন, তুমি বোরায়রাকে (তাঁর মালিকের শর্তের উপর) আজাদ করে দাও। এরপর তিনি স. মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্ তায়ালার স্তব ও স্তুতি প্রকাশের পর বললেন, মানুষ কেনো এরকম শর্ত করে, যার উল্লেখ আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে করেননি। এরকম শর্ত বাতিল, একশতবার করা হলেও। আল্লাহ্তায়ালাই সত্য। তাঁর হুকুম শর্তাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী।

দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, হজরত আয়েশা রসুল স. কে বললেন, বোরায়রার মালিক শর্ত ছাড়া তাকে বিক্রয় করবেনা। ত্যাজ্য সম্পদের অধিকার তারই থাকবে। রসুল স. বললেন, অধিকারের শর্ত মেনে নিয়ে তুমি তাকে কিনে নাও। অধিকার থাকবে তার, যে আজাদ করবে। বোখারী, মুসলিম।

রাফেয়ী বলেন, কেবল হিশামের বর্ণনাতেই শর্ত মেনে নেয়ার কথা আছে। অন্য কোনো বর্ণনাকারী এর উল্লেখ করেননি। ইবনে হাজার বলেছেন, বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে শর্ত মেনে নেয়ার কথা এসেছে। যেমন, আবদুর রহমান বিন আইমানের বর্ণনাটি। তাঁর বর্ণনায় জুহুরী ও ওরওয়া রয়েছেন। হজরত জাবের বর্ণিত একটি হাদিস বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হজরত জাবের বলেছেন, এক যুদ্ধের সময়ের ঘটনা — আমার উটটি ছিলো দুর্বল, আরোহী বহনে অক্ষম। রসুল স. আমার কাছে এসে বললেন, তোমার উটের কী হয়েছে? আমি

বললাম, উটটি দুর্বল। রসুল স. উটটিকে ধমক দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। ফল হলো এই যে, আমার উটটি সকল উটের আগে চলতে লাগলো। রসুল স. বললেন, এখন কী অবস্থা? আমি বললাম, অনেক ভালো। এতো আপনার দোয়ারই বরকত। তিনি স. বললেন, উটটি এক উকিয়া মূল্যে বিক্রয় করতে সম্মত আছো কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু এতে চড়ে মদীনা পর্যন্ত আমাকে যেতে দিতে হবে। মদীনায় গিয়ে সেই উটটির পিঠে চড়েই আমি রসুল স. এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি স. আমাকে উটের মূল্যতো দিলেনই, উটটিও দিয়ে দিলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আমাকে বললেন, এক উকিয়ার বিনিময়ে উটটি আমার কাছে বিক্রয় করো। আমি বিক্রয় করলাম। শর্তারোপ করলাম এই যে, গৃহগমন পর্যন্ত এটিই হবে আমার বাহন। বোখারী, মুসলিম।

বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. হজরত বেলালকে বললেন, মূল্য পরিশোধ করে দাও। তারপর কিছু বেশীও দিও। হজরত বেলাল রা. এক কিরাত বেশী দিয়ে দিলেন। ইবনে জাওজী এই হাদিস দ্বারা শর্তযুক্ত ক্রয় বিক্রয় বৈধ হওয়ার দলিল দিয়েছেন। ইবনে জাওজী আরেকটি দলিল দিয়েছেন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণিত হাদিস দ্বারা যাতে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মুসলমান আপন অধিকারের অনুকূল শর্ত মেনে চলবে। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, মুসলমান আপন শর্ত অনুসরণ করবে, যা হবে সত্যের অনুকূল। উল্লেখিত হাদিস সমূহের দৃশ্যতঃ দ্বন্দ্বের নিরসন হওয়া প্রয়োজন। প্রথম হাদিসে বলা হয়েছে, শর্ত আল্লাহর কিতাবের অনুকূল না হলে বাতিল। একশ'বার করা হলেও। দ্বিতীয় হাদিসে বলা হয়েছে, মুসলমানগণ আপন শর্তের অনুসরণ করবে, যদি তা সত্যের অনুকূল হয়। আসলে এই হাদিস দু'টিতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। দু'টি হাদিস থেকেই একথা পরিস্কার বোঝা যায়, ক্রয় বিক্রয়ে শর্তসংযোজন বাতিল। কিন্তু বৈধতার অনুকূল হলে বাতিল নয়। একথায় আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে। হজরত সামুরা বর্ণিত যে হাদিসটিতে শর্তের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণ ক্ষেত্রে নয়। শর্তের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে যেয়ে এমন কিছু কিছু শর্ত এসেছে যাতে শর্ত আপনাআপনি অবৈধ হয়ে পড়ে। এতে বেচাকেনা বাতিল হয়না — তবে শর্ত বাতিল হয়। হজরত বোরায়রার ঘটনাটি ছিলো এরকমের। কিন্তু কোনো কোনো শর্ত এমন, যাতে মূল ক্রয় বিক্রয়ই অবৈধ হয়ে যায়। হজরত সামুরা বর্ণিত হাদিসে এ রকম শর্তেরই উল্লেখ আছে। আবার কিছু শর্ত আছে এমন, যা সঠিক বলে মেনে নিতে হয়। হজরত আনাস এবং হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত শর্ত এই প্রকারের। অযথা সংযোজিত শর্তের কারণে বেচাকেনা বাতিল হয়না। এর একটি প্রকার এই যে, যার জন্য শর্ত করা হয় তার পক্ষে শর্ত মানা অসম্ভব। যেমন, বিক্রেতা এই শর্ত আরোপ করলো,

ক্রয়ের পর ক্রেতা গোলাম আজাদ করে দিলেও আজাদ হবে না। অথবা ত্যাজ্য সম্পদের অধিকার বিক্রেতার থাকবে। এরকম একশত শর্ত করা হলেও তা অগ্রাহ্য হবে। এ ধরনের শর্তের কারণে ক্রয় বিক্রয় বাতিল হয়না। হজরত বোরায়রার ঘটনা এর সাক্ষী।

শায়েখ ইবনে হাজার লিখেছেন, এই ঘটনায় আজাদের কথাটি মুখ্য নয় বরং বিক্রেতার অধিকার বলবত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এ ধরনের শর্ত স্বীকারোক্তিবিরুদ্ধ। এতে ক্রেতা বিক্রেতার কোনো বিশেষ লাভও নিহিত নেই যে সুদের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। এ ধরনের শর্ত অর্থহীন। তাই এ কারণে বেচাকেনা বাতিল হয়না। যেমন, কোনো কাপড় বিক্রেতা যদি বলে, ক্রেতাকে এই কাপড় ঈদের সময় পরতে হবে। অথবা কোনো ঘোড়া বিক্রেতা এই শর্তে ঘোড়া বিক্রি করে যে, ক্রেতা ঘোড়াটিকে উত্তমরূপে পানাহার করাবে — এ ধরনের শর্ত অনর্থক। ক্রয় বিক্রয়ের উপরে এর কোনোই প্রভাব নেই। দ্বিতীয় হাদিসে বর্ণিত শর্ত কিন্তু অনর্থক নয়। বরং এক্ষেত্রে শর্ত পূর্ণ করা জরুরী। যেমন, বিক্রেতা বললো, মূল্য হাতে না পাওয়া পর্যন্ত পণ্য থাকবে আমার অধিকারে। এ ধরনের শর্তে দোষ নেই। কারণ এতে রয়েছে কেবল পরিশোধের তাগিদ। শরিয়তসম্মত শর্ত বর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন, সাধারণ ক্রয় বিক্রয়। এতে মূল্য আদায়ের সময় নির্ধারণ করতে হয়। অথবা সলম প্রকৃতির ক্রয় বিক্রয় — যেখানে কেনার পূর্বে মূল্য পরিশোধ করতে হয়, বিক্রেতাকে পণ্য হস্তান্তরের সময় বলে দিতে হয়। এ ধরনের শর্ত কিয়াস বহির্ভূত হলেও হাদিস সম্মত। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হাদিসের দলিল সহ সাহাবীদের সময়ের বাস্তব ঘটনার উল্লেখ থাকতে হবে। ব্যাপারটি এ রকম যেমন, জুতা ক্রয়কারী বিক্রেতাকে বললো, জুতায় চামড়ার টুকরা লাগিয়ে দিতে হবে।

অতিরিক্ত শর্তবহির্ভূত ক্রয়বিক্রয়ের আরেকটি প্রকার এই যে, বিক্রেতা ক্রেতার নিকট জিম্মাদার চাইবে অথবা কোনো বস্তু জিম্মা রাখার কথা বলবে। এরকম অবস্থাও ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার বিরুদ্ধে যায়না। বরং ক্রয়বিক্রয়কে মজবুত করে। তাই এ রকম ক্রয়বিক্রয় বৈধ। জিম্মা হিসাবে কোনো মানুষ অথবা কোনো সামগ্রী বিক্রেতার অধিকারে এলে তখন ক্রয়বিক্রয়, জিম্মাদার, জিম্মাকৃত বস্তু সবকিছুই বিশুদ্ধ হবে। এরকম অবস্থায় ক্রেতা শর্ত পূরণ করে দিলে তো ভালোই। যদি না দেয় তবে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের হুকুম দেয়া হবে। ক্রেতা মূল্য পরিশোধে অক্ষম হলে বিক্রেতা ক্রয়বিক্রয় বাতিল করতে পারবে।

ক্রয়বিক্রয়কে বাতিল করার শর্ত সমূহ এর বিপরীত। যেমন, গম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এরকম শর্ত যে, বিক্রেতাই গম পিষে দিবে অথবা তার ঘরে একদিন, একমাস অথবা এক বৎসর রাখবে। কাপড় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ রকম শর্ত যে,

বিক্রেতা কাপড় সেলাই করে দিবে। উট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ রকম শর্ত, বিক্রেতা তার উপর আরোহন করে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত যাবে অথবা ক্রেতা ক্রয় করে নির্ধারিত ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে দিবে। এ ধরনের শর্ত দ্বারা ক্রয় বিক্রয় ফাসেদ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধাটুকুই সুদ।

এ ব্যাখ্যার পর হাদিসের মধ্যে দ্বন্দ্ব আর অবশিষ্ট থাকেনা। সুদের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ হয়ে যায়। হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটি (যাতে মদীনা পর্যন্ত পৌঁছার শর্ত আরোপিত ছিলো) সম্পর্কে আলেমগণ বলেন, মদীনা পর্যন্ত যাওয়ার শর্ত এখানে মূল ক্রয়বিক্রয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলোনা। ইবনে হাম্মাস ও ইমাম শাফেয়ী এরকম বলেছেন।

আমি বলি, বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসের শব্দগুলি এর প্রতিকূল। হাদিসের বর্ণনায় একথা পরিস্কার যে, নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত গমন ক্রয়বিক্রয়ের সঙ্গে করা হয়েছে। ইমাম মালেক বলেন, সামান্য উপকারের ব্যাপারে ক্রেতাবিক্রেতা উভয়েই যদি সম্মত হয় তবে তাতে ক্ষতি নেই। আমি বলি, এই হাদিস সুদের আয়াতের সমকক্ষ নয়। তাই সুদের আয়াত দ্বারা এই হাদিসটি মনসুখ (রহিত) হয়ে গিয়েছে বলে ধরে নেয়াই উত্তম। কেননা সুদের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ পর্যায়ে। শাবী, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিতে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. এর উপর সবশেষে অবতীর্ণ আয়াত সমূহের অন্যতম ওই আয়াতে হারামের হুকুমই বলবৎ হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনই শ্রেয়। তাই এমন হাদিস বার বার সামনে আনা উচিত নয়। সুদের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সাবধান!

আল্লাহ তায়ালা সুদের শাস্তির কথা পাঁচ রকমভাবে বর্ণনা করেছেন।

১. 'তাহারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াইবে যাহাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে।'

২. 'আর যাহারা পুনরায় (সুদ) আরম্ভ করিবে তাহারাই অগ্নি-অধিবাসী।'

৩. 'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন।'

৪. 'সুদের যাহা বকেয়া আছে তাহা ছাড়িয়া দাও যদি তোমারা বিশ্বাসী হও।'

৫. 'যদি তোমরা না ছাড় তবে জানিয়া রাখ যে, ইহা আল্লাহ্ ও রসুলের সহিত যুদ্ধ।'

হজরত ওমর বলেছেন, সুদের আয়াত নাজিল হয়েছে সকলের শেষে। তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত রসুল স. বলেছেন, সুদ ছেড়ে দাও, সুদের সন্দেহকেও ছেড়ে দাও। অতএব, সুদ হারাম — একথা নিশ্চিত। হারাম হওয়ার আগে যে সুদ গ্রহণ করা হয়েছে তা মাফ করে দেয়ার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। বিষয়টি সম্পূর্ণতই

আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাধীন। ক্ষমা অথবা শাস্তি যে কোনোটির সিদ্ধান্ত গ্রহণে আল্লাহ্‌তায়ালা পূর্ণ ক্ষমতাবান। আলেমগণ বলেন, সুদ থেকে বিরতি যদি খাঁটি নিয়তে হয় তবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে উত্তম বিনিময় দিবেন। কেউ কেউ বলেছেন, নিষেধাজ্ঞার পর বিরত ব্যক্তির ব্যাপারটি আল্লাহ্‌তায়ালার উপরে নির্ভরশীল। তিনি তাকে রক্ষা করবেন যদি চান। যদি না চান তবে সে হবে সাহায্যহীন। পুনরায় সে সুদের দিকেই ফিরে যাবে। অবশ্যই তারা দোজখবাসী। দোজখই তাদের চিরকালের আবাস। তবে হ্যাঁ, যদি সে সুদ গ্রহণ করা সত্ত্বেও হারামকে হারাম বলে জানে তবে চিরস্থায়ী আবাস না হলেও তার দোজখবাস হবে দীর্ঘস্থায়ী।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭৬

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝

❒ আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ্ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, রসুল স. বলেছেন, সুদের মাধ্যমে সম্পদবৃদ্ধি ঘটলেও শেষ পর্যন্ত তা ঘাটতির দিকেই যাবে। ইবনে মাজা। হাকেম বলেছেন হাদিসটি বিশুদ্ধ। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, সুদের মাধ্যমে সম্পদ বেড়ে গেলেও পরিণামে তা কমের দিকেই যাবে।

আল্লাহ্ পাক দানকে বর্ধিত করেন। দানকারীর সম্পদে বরকত দান করেন এবং অনেক সওয়াবও দান করেন। হজরত আবু হোরায়রা রা. বলেন, রসুল স. বলেছেন, দানের কারণে সম্পদ কমে না। এবং ঋণগ্রস্তকে ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ্‌তায়ালা তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যে বিনম্র হয়, আল্লাহ্‌তায়ালা তার মর্যাদা সমুন্নত করেন। মুসলিম, তিরমিজি।

ইতোপূর্বে এক হাদিসে আমরা উল্লেখ করেছি, প্রতিদিন দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। একজন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ্! দাতাকে বিনিময় দান করুন। দানকারীকে আল্লাহ্‌তায়ালা ভালোবাসেন। রসুল স. বলেছেন, সমস্ত প্রাণী আল্লাহ্‌তায়ালার পরিবারের সদস্য। সে-ই আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে সর্বাধিক প্রিয় যে তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়। বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে এই বর্ণনাটির উল্লেখ করেছেন।

অকৃতজ্ঞ পাপীকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন না। অকৃতজ্ঞ পাপী ওই কাফের যে হালাল ফেলে হারামকে গ্রহণ করে এবং সতত ধাবমান থাকে গোনাহের দিকে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭৭

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

❐ যাহারা বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয়, তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে ; তাহাদের কোনো ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

ইমানের পরে নামাজ এবং তার পরে জাকাতের বিশেষ গুরুত্ব এই আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। দৈহিক ইবাদতে নামাজ এবং আর্থিক ইবাদতে জাকাতই শ্রেষ্ঠ। নামাজ এবং জাকাত আদায়কারী ইমানদারগণকে এই আয়াতে পুরস্কার প্রাপ্তির সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁদের কোনো শংকা নেই। তাঁরা চিন্তিতও হবেন না। বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল মানুষের জন্য অতীতের আক্ষেপ এবং ভবিষ্যতের বিপদ থাকতেই পারে না।

ইবনে মানদাহ্ এবং আবুল ইয়ালী মুসনাদে এবং কালাবীর উদ্ধৃতিতে আবু সালেহ্ হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এইভাবে, আমাদের কাছে এই কথাটি পৌঁছেছে যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় আমর বিন আউফ সাকাফির গোত্র মুগীরা বিন আবদুল্লাহ্ বিন উমাইর বিন মাখজুমের গোত্রকে সুদী কর্জ দিতো। মক্কাবিজয়ের পর রসুল স. সমস্ত সুদকে বাতিল করে দেন। বনী মুগীরা বললেন, আল্লাহ্তায়ালা সকল সুদ বাতিল করেছেন। আমরা এমন হতভাগ্য নই যে, এর পরেও সুদকে কায়েম রাখবো। বনি আমর বললো, আমাদের সাথে তো এই শর্তেই সন্ধি ছিলো যে, আমাদের সুদ ঠিক থাকবে। এই দুই সম্প্রদায় হজরত ইতাব রা. এর কাছে তাদের মন্তব্য পেশ করলে, তিনি রসুল স. নিকট লিখিতভাবে এই সমস্যাটি উত্থাপন করলেন। তখন নিম্নের আয়াত দু'টি অবতীর্ণ হয়।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

❐ হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সুদের যাহা বকেয়া আছে তাহা ছাড়িয়া দাও যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

ইবনে জারীর, হজরত ইকরামার উক্তি উল্লেখ করেছেন এভাবে — সাকীফ গোত্রের চার ভাই সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের নাম মাসউদ, আবদে ইয়ালিল, হাবীব এবং রবীয়া। তাদের পিতার নাম ছিলো আমর বিন উমাইর। মুকাতিলও এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাগবী, সুদ্দীর মাধ্যমে লিখেছেন যে, হজরত আব্বাস এবং হজরত খালেদ বিন ওলীদের শাণে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা মুর্খতার যুগে সাকীফ গোত্রের বনি আমর বিন উমাইর সুদী কর্য দিতেন। ইসলাম গ্রহণের পর যখন সুদ হারাম করা হলো, তখন তাঁদের সুদের অনেক টাকা মানুষের কাছে পাওনা ছিলো। এই আয়াতে বকেয়া বলতে সেই বকেয়ার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

বিদায় হজের সময় আরাফাতের ময়দানে রসুল স. ঘোষণা করলেন, উপস্থিত জনমন্ডলী! মনোযোগের সঙ্গে শোনো। মূর্খতার সময়ের প্রত্যেক বিষয় আমার পদতলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ওই সময়ের সকল হত্যা বাতিল। এখন তার কেসাস (হত্যার বদলে হত্যা) নেয়া চলবেনা। আপন গোত্রের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম রবীয়া বিন হারেসের হত্যাকে বাতিল করলাম। (রবীয়া বনু হারেস গোত্রের কোনো এক মহিলার দুধ পান করেছিলো। বনু হুজাইল তাকে হত্যা করে)। মূর্খতার সময়ের সমস্ত সুদ বাতিল। সর্বপ্রথম আমি আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদকে বাতিল করলাম। আব্বাসের সমস্ত সুদ ছেড়ে দেয়া হলো। মুসলিমও হজরত জাবেরের মাধ্যমে রসুল স. এর বিদায় হজের ভাষণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাতে শানে নজুলের উল্লেখ নেই।

বাগবী, ইকরামা ও আতার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব এবং হজরত ওসমান বিন আফ্ফান কিছু খেজুর সলম হিসাবে কিনেছিলেন। ফসল কাটার সময় খেজুরওয়ালা তাঁদেরকে বললো, আপনারা যদি এ সময় সমুদয় পাওনা নিয়ে নেন তবে আমার ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন মিটবে না। আপনারা বরং অর্ধেক নিন এবং বাকি পাওনার জন্যে একটি সময় নির্ধারণ করে দিন। আমি তখন দ্বিগুণ দেবো। তাঁরা রাজী হয়ে গেলেন। নির্ধারিত সময়ে তাঁরা পাওনা আদায়ের উদ্যোগ নিলে এই সংবাদটি রসুল স. এর নিকট পৌঁছলো। তিনি স. উভয়কে নিষেধ করলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। তখন তাঁরা কেবল আসল পাওনাটুকু নিয়ে সুদ ছেড়ে দিলেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭৯

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ○

❑ যদি তোমরা না ছাড় তবে জানিয়া রাখ যে, ইহা আল্লাহ্ ও রসুলের সহিত যুদ্ধ; কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। ইহাতে তোমরা অত্যাচার করিবেনা অথবা অত্যাচারিতও হইবে না।

সাঈদ বিন জোবায়ের রা. হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, কিয়ামতের দিন সুদখোরকে যুদ্ধের জন্য আহবান করে বলা হবে, নিজ হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত হও।

হজরত ইবনে আব্বাসের এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে খোরমা ক্রয় করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, যখন কোনো জনপদে সুদ সহজলভ্য হয়ে যায়, তখন সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের প্রতি আল্লাহ্র আযাবকে নামিয়ে নেয়। বর্ণনাটিকে হাকেম শুদ্ধ বলেছেন।

হজরত আমর বিন আস রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেন, যে জাতির মধ্যে সুদের অধিক প্রচলন হয়, তাদেরকে শাস্তিদান গজবরূপে প্রতিভাত হয়। ব্যাপক হারে সুদ গ্রহণকারীরা শত্রুর ভয়ে সদা শংকিত থাকে। আহমদ।

আলেমগণ বলেন, আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধ অর্থ দোজখ এবং রসুলের সাথে যুদ্ধ হলো তরবারী। এই সূত্র ধরে বায়যাবী বলেন, সুদখোরের কাছ থেকে রাষ্ট্রদ্রোহীর মতো তওবা তলব করতে হবে। সে যদি আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করে তো ভালো। নচেৎ তার সাথে যুদ্ধ করা যাবে।

আমি বলি, যদি সুদখোর হীনবল হয়, যুদ্ধের সামর্থ যদি তার না থাকে তবে তওবা না করা পর্যন্ত তাকে বন্দী রাখা ওয়াজিব। আর যদি সুদখোর বিরুদ্ধাচরণে প্রবল হয়, তখন তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ঘোষণা করতে হবে এবং যতক্ষণ না সে তওবা করে ততোক্ষণ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। এই হুকুম প্রত্যেক ফরজ অমান্যকারীর প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন, নামাজ, জাকাত তরককারী এবং কবীরা গোনাহকারী। প্রকাশ্য গোনাহে লিপ্ত থাকাবস্থায়ও ওই একই হুকুম।

রজীন, মুনাকেবে আবী বকরের মধ্যে হজরত ওমর বিন খাত্তাব রা. এর এই বর্ণনাটি উদ্বৃত করেছেন, রসুল স. এর তিরোধানের পর কোনো কোনো সম্প্রদায় ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলতে থাকে, আমরা জাকাত দিবোনা। আমীরুল মুমিনীন হজরত আবুবকর রা. ঘোষণা করেন, এসমস্ত লোক জাকাতের হিসেবে উটের পায়ের রশি দিতে অস্বীকার করলেও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। আমি আরজ করলাম, হে রসুলের খলিফা। মানুষকে একত্রিত রাখুন এবং নম্রতা প্রদর্শন করুন। তিনি বললেন, তুমি তো মূর্খতার যুগে খুবই শক্তিশালী ছিলে, ইসলাম কি তোমার শক্তি হরণ করেছে? ওহি স্থগিত। দ্বীন পরিপূর্ণ। এখন আমরা বেঁচে থাকতে কি দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবুবকর ঘোষণা দিলেন আল্লাহ্র কসম! আমি ওই ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করবো, যে নামাজ এবং জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। সম্পদের জন্য জাকাত ফরজ। তারা রসুল স. কে যেমন দিতো তেমনিভাবে বকরীর বাচ্চা দিতে অস্বীকার করলেও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। হজরত ওমর বলেছেন, হজরত আবু বকরের সিদ্ধান্তই সঠিক।

কর্জ গ্রহণকারীর নিকট থেকে কর্জের অতিরিক্ত গ্রহণ করা জুলুম। কর্জ গ্রহীতাও আসল অপেক্ষা কম দিতে পারবেনা।

হজরত আবু হোরায়রা বলেন, রসুল স. বলেছেন, আসল ঋণ পরিশোধের বেলায় টালবাহানা করলে জুলুম হবে। বায়যাবী লিখেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে এ কথাও বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি সুদকে হালাল মনে করে এবং তওবা না করে, আসল মালও সে পাবেনা। এ ক্ষেত্রে সুদ দাতা মুরতাদ বলে গণ্য হবে। কারণ সে হারামকে হালাল বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তার দূষিত সম্পদ গণিমতের মতো। বায়যাবীর এই বর্ণনা ইমাম শাফেয়ীর মতের অনুকূল। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মুরতাদের সম্পদ মূল্যবিবর্জিত, গণিমতের মতো।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মুরতাদ যদি ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায় অথবা শাস্তি স্বরূপ তাকে হত্যা করা হয় তবে তার ইসলামে থাকাকালীন সম্পদ তার মুসলমান উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। আর মুরতাদ অবস্থার সম্পদ গণিমতের অন্তর্ভূত হবে। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হলে বনি আমর ও অন্যান্য সুদখোরেরা বললো, আমরা তওবা করছি। কারণ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। সবাই তখন তাদের আসল মাল নিতে রাজী হলো। আবু ইয়ালীর হাদিসেও এরকম কথা বলা হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, বনী মুগীরা অভাব অনটনের কথা উল্লেখ করে ফসল কাটা পর্যন্ত সময় প্রার্থনা করলো। কিন্তু ঋণ দাতারা রাজি হলো না। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮০

وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۚ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

❐ যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দেওয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছাড়িয়া দাও তবে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানিতে।

এই আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা অক্ষম ও অসচ্ছল খাতকের প্রতি অনুগ্রহশীল হতে নির্দেশ দিয়েছেন। সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিতে বলেছেন এবং তাদের কর্জ ক্ষমা করে দিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দিবে আল্লাহতায়ালা তাকে ইহকাল ও পরকালে অবকাশ দিবেন। মুসলিম।

হজরত ইমরান বিন হোসাইনের একটি মারফু হাদিস এই যে, কর্জ আদায়ের সময়ে কর্জগ্রহীতাকে অবকাশ দিলে প্রত্যেক দিনের বদলে একটি সদকার সওয়াব পাওয়া যাবে। ইমাম আহমদ বলেন, উদ্দেশ্য এই যে, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়া অতি উত্তম।

হজরত আবু হোরায়রা বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তি প্রথম আল্লাহ্‌র ছায়া পাবে, যে কর্জ আদায়কালে খাতককে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছে। অথবা তার পাওনা মাফ করে দিয়েছে। বলেছে, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আমার অধিকার ছেড়ে দিলাম। তারপর কর্জের চুক্তিপত্র সে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তিবরানী।

বাগবী শরহে সুন্নায় বর্ণনা করেন, যে ঋণগ্রহণকারীর ঋণ মাফ করে দেয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র আরশের ছায়ায় থাকবে। হজরত ওসমান বিন আফফানও এ রকম বর্ণনা করেছেন। বাগবী, হজরত আবুল ইয়াসেরের এরকম আরো একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

হজরত কাতাদা রা. বর্ণনা করেন, আমি একজন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর আমার পাওনা তলব করলাম। সে আত্মগোপন করলো। আমি দেখে ফেললাম। বললাম, এমন করলে কেনো? লোকটি বললো, অভাবের কারণে। এ ব্যাপারে কসম করতে বললে লোকটি তাই করলো। আমি তাকে ঋণের চুক্তিনামাটি দিয়ে দিলাম এবং বললাম, আমি রসুল স. এর নিকট শুনেছি, যে অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দিবে অথবা তার কর্জকে ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের কঠিন মুসিবত থেকে হেফাজতে রাখবেন। মুসলিমও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত আবু বকর বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চায় তার দোয়া কবুল হোক এবং তার দুনিয়া ও আখেরাত বিপদমুক্ত হোক, সে যেনো অভাবগ্রস্তকে কর্জ আদায়কালে অবকাশ দেয় এবং তাগাদা না দেয়। আর যে ব্যক্তি চায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচিয়ে তাঁর আপন ছায়ায় আশ্রয় দেন, সে যেনো মুমিনদের প্রতি কঠোর না হয় এবং বিনম্র আচরণ করে।

হজরত ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, অতীতকালের এক ব্যক্তির জান কবজ করার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কোনো নেক কাজ করেছে কি? সে বললো, না। ফেরেশতা বললেন, ভেবে দেখো। সে বললো, তেমন তো কিছু নেই, তবে হ্যাঁ। আমি মানুষকে কর্জ দিতাম এবং আমার কর্মচারীকে বলে দিতাম কর্জগ্রহীতা অসচ্ছল হলে অবকাশ দিও এবং অক্ষম হলে মাফ করে দিও। আল্লাহ্ ফেরেশতাগণকে বললেন, তোমরা এই ব্যক্তিকে অব্যাহতি দাও। মুসলিম।

'যদি তোমরা জানিতে' — এ কথার দ্বারা বলা হয়েছে এই আমল তোমাদের জন্য মোটেও কঠিন নয়, যদি এর মর্যাদা তোমরা উপলব্ধি করতে পারো। বিনিময়ের প্রসঙ্গ অবশ্য এখানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮১

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

❒ তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহের দিকে প্রত্যানীত হইবে। অতঃপর প্রত্যেককে তাহার কর্মের ফল পুরাপুরি প্রদান করা হইবে। আর তাহাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হইবে না।

এরশাদ হচ্ছে, মানুষ প্রস্তুত হও। একদিন তো আল্লাহতায়ালার সামনে আপন কর্মফলের জবাবদিহি করতে দাঁড়াতেই হবে। ভালো ও মন্দের উপযুক্ত বিনিময় পাওয়া যাবে সেই দিনই। কারো পুণ্য কমানো হবে না। অপরাধের তুলনায় অধিক শাস্তিও দেয়া হবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, রসুল স. এর প্রতি অবতীর্ণ এই আয়াতটি সুরা বাকারার শেষ আয়াত। হজরত জিব্‌রাইল আ. তখন বলেছিলেন, একে সুরা বাকারার দুইশত আশি আয়াতের পাশে রাখুন। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। সায়লাবী সায়দী, সগীরের মাধ্যমে কালাবীর বর্ণনা এবং আবু সালেহ, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এভাবে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. পৃথিবীর জীবন পেয়েছিলেন মাত্র একুশ দিন। ফারইয়ানীও হজরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিটি বর্ণনা করেছেন। তিনি অবশ্য বলেছেন, এরপর রসুল স. মাত্র সাত দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে আবী হাতেম, হজরত সাঈদ বিন জোবায়েরের উক্তিতে উল্লেখ করেছেন, তাঁর স. ওফাতের দিন ছিলো সোমবার। তারিখ রবিউল আউয়ালের তিন। সময় সূর্য ঢলে পড়ার পর। হিজরী এগারো।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ
يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ
اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا
اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَ
اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ
اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا
مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ
اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ
وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

❐ হে বিশ্বাসীগণ তোমরা যখন একে-অন্যের সহিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন উহা লিখিয়া রাখিও; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন

ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয়; লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না। যেহেতু আল্লাহ্ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং সে যেন লিখে; এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লিখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর উহার কিছু যেন না কমায়; কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লিখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে না পারে তবে যেন তাহার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লিখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাহাদের উপর তোমরা রাজী তাহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখিবে, যদি পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রী লোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে তাহাদের অপরজন স্মরণ করাইয়া দিবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হইবে তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে। ইহা ছোট হউক অথবা বড় হউক মিয়াদসহ লিখিতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হইও না। আল্লাহের নিকট ইহা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর; কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-প্রদান কর তাহা তোমরা না লিখিলে কোন দোষ নাই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগস্ত কর তবে ইহা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। এবং তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ই সবিশেষ অবহিত।

রসুল স. অনুমাণ করে বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন। হজরত ইবনে ওমর এই হাদিসের বর্ণনাকারী এবং দারাকুতনী এর উদ্ধৃতি-দাতা। এই আয়াতের হুকুম বায় সলম (পণ্য গ্রহণের পূর্বে মূল্য পরিশোধ করা), ভাড়া, ঋণ, বিবাহ, খোলা, সন্ধি সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (খোলার আভিধানিক অর্থ বন্ধনমুক্ত করা — শরিয়তের পরিভাষায় স্ত্রীর প্রস্তাবানুসারে তার নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দেয়া)। তাৎক্ষণিকভাবে বেচাকেনার ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তির প্রয়োজন নেই। আয়াতে উল্লিখিত 'মুসাম্মা' শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট করা। অর্থাৎ দিন মাস বৎসর নির্ধারণ করা। মাল গ্রহণের পূর্বে মূল্য পরিশোধ করে দেয়া অথবা মূল্য পরিশোধের পর মাল গ্রহণের অপেক্ষায় থাকা—এই দুই অবস্থাতেই সময়ের নির্ধারণ থাকতে হবে। না হলে বেচাকেনা শুদ্ধ হবে না। কারণ এতে ঝগড়া সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। তবে কর্জ আদায়ের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ করা জরুরী নয়। নির্ধারণ করে দিলেও তা নির্ধারণ বলে গণ্য হবে না। কর্জদাতা যে কোনো সময় চাইতে পারবে। শরিয়তে কর্জ ধার দেয়ার মতো। ধার ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার দাতার জন্য সর্বক্ষণই বিদ্যমান।

সলম প্রকৃতির বেচাকেনা বৈধ। একথা আগেই বলা হয়েছে। এর ভিত্তি আল্লাহতায়ালার কালামের উপর যেমন আল্লাহাতয়ালা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ যখন

তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদানপ্রদান করো তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও।' ওদিকে কিয়াস (বুদ্ধিবৃত্তিক অনুমান) চায় সলম যেনো জায়েয না হয়, বেচাকেনার পূর্ণ ধরণ এতে পাওয়া যায় না। বেচাকেনার জন্য ক্রয়ের মূল্য এবং বিক্রয়ের বস্তু একই স্থানে উপস্থিত থাকতে হয়। এ জন্যে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, বেচাকেনা হতে হবে হাতে হাতে, নগদে নগদে। কিন্তু বায় সলম এর ব্যতিক্রম। কারণ এর বৈধতা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এর উপরে এজমা (ঐকমত্য)ও হয়েছে। এক্ষেত্রে কিয়াসকে বাদ দিতেই হবে। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুল স. মদীনায় এসে দেখলেন, মানুষেরা এক বৎসর দুই বৎসরের প্রতিশ্রুতিতে বায় সলম করছে। অন্যান্য বর্ণনায় তিন বৎসরেরও উল্লেখ আছে। রসুল স. বলেছেন, ফলের বায় সলম করলে পরিমাপ, পরিমাণ এবং সময় নির্ধারণ করে নাও। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ বিন আবী আউফা বর্ণনা করেন, আমরা রসুল স. এর যুগে এবং পরবর্তীতে হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের যুগে গমকে খোরমা এবং কিসমিসের পরিবর্তে বায় সলম করতাম। বোখারী।

ইবনে জাওজী, ইমাম আহমদের বর্ণনাও এভাবেই উদ্ধৃত করেছেন। আমি ইবনে আবী আউফাকে জিজ্ঞেস করলাম, রসুল স. এর যুগে আপনারা কি গম, যব এবং জয়তুন বায় সলম করতেন? ইবনে আবী আউফা বললেন, হ্যাঁ। আমরা তখন গণিমতের মাল পেতাম, তাই দিয়ে খোরমা, জয়তুন, যব ইত্যাদি কিনতাম। আমি বললাম, কার কাছ থেকে কিনতেন? তিনি বললেন, যে চাষাবাদ করে এবং যে করে না সকলের কাছ থেকে (আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম না যে, তোমরা কৃষি কাজ করো কি না)। এরপরে বর্ণনাকারী ইবনে আবী আবজীর কাছে গিয়ে একই কথা জিজ্ঞেস করলে তিনিও একই উত্তর দিলেন।

বিক্রয়ের বস্তু বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতার হাতে তুলে দিতে হয় না — এ অবস্থার নামই সলম। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন, সাথে সাথে তুলে দিলে বায় সলম বিশুদ্ধ হবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হবে। কেননা দেরীতে দিলেও যদি দুরস্ত হয় তবে সাথে সাথে দিলেও হবে।

আমরা বলি, দরিদ্র মানুষের উপকারার্থেই সলম বৈধ করা হয়েছে। বিক্রয়মূল্য আগে পেলে তার অভাব মোচন হবে। পণ্য পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময়ের অবকাশও সে পাবে। হাতে হাতে নগদে নগদে বেচাকেনার ক্ষেত্রে এ রকম সুযোগ নেই। দরিদ্র ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে অসহায়।

মাসআলা ঃ বায় সলম জায়েযের ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য এই যে, বিক্রিত বস্তুর প্রকার, অবস্থা, পরিমাণ, আদায়ের স্থান, আদায়ের সময় সব কিছুর স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে বাদানুবাদের অবকাশ না থাকে। মূল্যের উল্লেখও জরুরী।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বায় সলম বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত সাতটি। পণ্যপ্রদানের স্থান উল্লেখ থাকতে হবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মূল্য প্রদানের স্থানই পণ্য প্রদানের স্থান। ইমাম আজমের নিকট অষ্টম শর্তটি এই যে, মূল্য গ্রহণের সময় থেকে আদায়ের সময় পর্যন্ত বিক্রয়ের বস্তু বাজারে অথবা শহরে মওজুদ থাকতে হবে। জমহুরের নিকট এই শর্ত জরুরী নয়। আদায়ের সময় বিক্রয়ের বস্তু (বাজারে অথবা শহরে) সহজে পেয়ে যাওয়াই যথেষ্ট হবে (বিক্রয়কারীর কাছে আপন জমির ফসল না থাকলে অন্য স্থান থেকে কিনে এনে দিতে হবে)। কেননা আপন জমির ফসল দেয়ার শর্ত শরিয়ত নির্ধারণ করে দেয়নি।

ইমাম আবু হানিফার দলিল ওই হাদিসটি যা আবু দাউদ এবং ইবনে মাজা ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এক নাজরানী ব্যক্তি এর বর্ণনাকারী। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, গাছে খেজুরের কলি আসার আগেই আমি খোরমার বায় সলম করি। তিনি বললেন, এ রকম কোর না। আমি বললাম, কেনো? তিনি বললেন, রসুল স. এর যুগে এক ব্যক্তি এরকম করেছিলো। কিন্তু ওই বৎসর খেজুরের গাছগুলোতে কোনো কলি আসেনি। তখন ক্রেতা বললো, আগামী বৎসর অথবা তার পরের বৎসর ফল এলে আমি আমার পাওনা উসুল করে নিবো। বিক্রেতা বললো, ঠিক আছে। কিন্তু ফল না এলে তোমার পাওনা বাতিল হয়ে যাবে। বচসা শুরু হলো। দুজনই তখন উপস্থিত হলেন রসুল স. এর দরবারে।তিনি স. বিক্রেতাকে বললেন, সে কি তোমার গাছ থেকে তার পাওনা নিয়ে নিয়েছে? বিক্রেতা বললেন, না। তিনি স. বললেন, তবে তুমি তার মালকে হালাল মনে করছো কেনো? মূল্য ফিরিয়ে দাও। এরপর গাছে ফল না আসা পর্যন্ত আর কখনো বায় সলম কোর না।

বোখারী, হজরত আবুল বোখতরী থেকে লিখেছেন, আমি হজরত ইবনে ওমরকে বায় সলম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, খেজুরের ফুল বের হওয়ার সময় বেচাকেনা কোর না। ফল পরিণত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এরপর আমি হজরত ইবনে আব্বাসের নিকট এই ব্যাপারটি জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, রসুল স. খেজুর বৃক্ষের ফুল প্রকাশের প্রাক্কালে বেচাকেনা নিষেধ করেছেন। খাওয়ার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন।

আমি বলি, হাদিসটি দুর্বল। কারণ নাজরানী ব্যক্তিটি অখ্যাত। এবং ইবনে ইসহাকের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারেও অনৈক্য আছে। এ ধরনের বর্ণনাকে দলিল হিসাবে পেশ করা যায় না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার উক্তিটি ছিলো সম্ভাবনা নির্ভর। কেননা এখানে সলমের স্বীকারোক্তিটি জায়েয কিয়াসের অনুকূল হয়নি। এক্ষেত্রে সম্ভাবনা আরো বেশী শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন ছিলো।

মাসআলা ঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, যন্ত্রের সাহায্যে অথবা গজ দিয়ে মেপে কিংবা ওজন করে যদি বায় সলম করা হয় তবে দুরস্ত হবে। কাপড় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ প্রস্থের উল্লেখ থাকতে হবে। যে সমস্ত বস্তু গণনা করে বিক্রয় করা হয়, তাদের প্রকারে কোনো পার্থক্য না থাকলে (অথবা পার্থক্য ধর্তব্য না হলে) বায় সলম দুরস্ত হবে। যেমন, আখরোট, ডিম ইত্যাদি। ইমাম আহমদের এক দুর্বল বর্ণনায় জায়েযের যোগসূত্র পাওয়া যায়। পার্থক্যপ্রবণ বস্তু যেমন, খরবুজা, তরমুজ, আনার ইত্যাদির সলম ইমাম আজমের মতে দুরস্ত নয়। গণনা, পরিমাণ ও ওজন—কোনোপ্রকারেই দুরস্ত নয়। এই হুকুম ওই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে এ সমস্তের বিক্রয় গণনার মাধ্যমে করা হয়। এ সমস্তের বিক্রয় ওজনের মাধ্যমে হলে বায় সলম দুরস্ত হবে। ইমাম মালেকের মতে পরিমাণ, গণনা এবং ওজনের পার্থক্য থাকলেও বায় সলম জায়েয। ইমাম শাফেয়ীর মতে কেবল ওজনের মাধ্যমেই জায়েয। ইমাম আহমদের বর্ণনাও এ রকম।

মাসআলা ঃ ইমাম আজমের মতে প্রাণীর বায় সলম দুরস্ত নেই। অন্যান্য তিন ইমামের মতে দুরস্ত আছে। হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুল স. হজরত আবদুল্লাহকে সৈন্য প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু উটের সংখ্যা ছিলো খুবই কম (সৈন্যদের জন্য যথেষ্ট নয়)। রসুল স. বললেন, জাকাতের উট আমদানী হওয়ার সময়ে পরিশোধের শর্তে উট সংগ্রহ করো। হজরত আবদুল্লাহ এক উটের পরিবর্তে দুইটি উট দেয়ার শর্তে উট সংগ্রহ শুরু করলেন। এই হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ। সনদ এ রকম — মোহাম্মদ বিন ইসহাক,ইয়াজিদ বিন আবী হাবীব, মুসলিম বিন জুবাইর, আবু সুফিয়ান, আমর বিন হারেস, আবদুল্লাহ বিন আমর। হাকেমও এই হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। মুসলিম একে সহীহ্ বলেছেন। ইবনে কাত্তান বলেছেন, এই হাদিসের সনদ এলোমেলো। আগের বর্ণনাকারীকে পরে এবং পরের বর্ণনাকারীকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের হাদিসকে মুজতাবের বলা হয়।

হাম্মাদ বিন সালমাও উল্লিখিত সনদের সাথে রয়েছেন। কিন্তু জারীর বিন হাজেমের বর্ণনায় ইয়াজিদ বিন আবী হাবীবের উল্লেখ নেই। আবার আবু সুফিয়ানের আগে মুসলিম বিন জুবাইরের উল্লেখ করা হয়েছে। আমি বলি, ইবনে জাওজীও গুরুত্ব সহকারে এরকম বর্ণনা করেছেন। আফফান তার বর্ণনায় হাম্মাদ বিন সালমাকে এই সনদের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন — ইবনে ইসহাক, ইয়াজিদ, আবু হাবীব, মুসলিম, আবু সুফিয়ান, আমর বিন হারেস। ইয়াজিদ থেকে আবু হাবীব এবং আবু হাবীব থেকে মুসলিম। আবু বকর বিন আবী শাইবা আবদুল আলার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এই বর্ণনায় ইয়াজীদ বিন আবী হাবীবের উল্লেখ

নেই। আবু সুফিয়ানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে মুসলিমের আগে। মুসলিমের পিতা জুবাইর নন। আর আমর বিন হারিশ অখ্যাত এবং মুসলিম বিন জুবাইরের উল্লেখ আমি কোথাও পাইনি। আবু সুফিয়ানের অবস্থাও সন্দেহাতীত নয়। শায়েখ ইবনে হাজার, ইবনে ইসহাকের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলেছেন। বায়হাকী এই হাদিসকে সনদসহ আমর বিন শোয়াইব থেকে এবং শোয়াইব তার দাদা থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। আমি বলি, ইবনে জাওজীও এই সিলসিলাকে উপস্থাপন করেছেন। এই হাদিস পূর্ববর্তী হাদিসের বিপরীত। হজরত সামুরা, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. জানোয়ারকে জানোয়ারের পরিবর্তে বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন। তাই নিয়মানুযায়ী হারাম ঘোষণাকারী হাদিসকে হালালকারী হাদিসের উপরে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জানোয়ারের বায় সলম অবৈধ। হাকেম এবং দারা কুতনী বর্ণনা করেন, ইসহাক বিন ইব্রাহিম বিন হুতাহ, আবদুল মালেক জিমারী, সুফিয়ান সওরী, মুয়াম্মার ইয়াহিয়া বিন আবী কাসীর,ইকরামা বিন আব্বাস সূত্রে এসেছে, রসুল স. জানোয়ারের বায় সলম নিষেধ করেছেন। হাকেম এই সনদকে সহীহ্ বলেছেন। অন্যদিকে ইবনে জাওজী, আবু জারআর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, আবদুল মালেক জামারী বর্ণনাকারী হিসাবে অত্যধিক দূর্বল। রাজী বলেছেন, এর সনদ শক্তিশালী নয়। কিন্তু হাল্লাস বলেছেন শক্তিশালী। আমি বলি, সম্ভবত হাকেম ইসহাক সম্বন্ধে জানতেন। এজন্য তিনি তার বর্ণনাকে সহীহ্ বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই হাদিসটি হাসান। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, ইয়াহিয়া বিন মুঈন, ইবনে হুতাকে সন্দেহবশতঃ দূর্বল বলেছেন। নতুবা তার বর্ণিত সহীহ্ এবং হাসান হাদিসসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে সত্য বলে গণ্য হয়েছে। একই হাদিস পৃথক পৃথক সূত্রে বর্ণিত হলে তা দলিল হিসাবে গৃহীত হয়। ইমাম আবু হানিফা তার মতের সমর্থনে হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদিসকে গ্রহণ করেছেন যাতে বলা হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ, জায়েদ বিন খোয়াইলাকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন। জায়েদ আরীস বিন এরকুব শাইবানী থেকে কিছু উটনী সলম রূপে খরিদ করেছিলেন। উটনী হস্তান্তরের সময় এলে জায়েদ কিছু উটনী গ্রহণ করলেন আর কিছু বাকী রয়ে গেলো। আরিস ছিলেন অপারগ। এদিকে সংবাদ পাওয়া গেলো যে, আসল মাল হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের। তখন তিনি হাজির হলেন রসুলর স. এর খেদমতে। ব্যাপারটা তাঁকে জানালেন। তিনি স. বললেন, কে এমন করেছে? জায়েদ? আরিস বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. জায়েদকে ডেকে বললেন, আসল মাল নিয়ে অতিরিক্তগুলো ফেরত দিয়ে দাও। কখনো জানোয়ারকে সলম ক্রয় কোর না।

সাহেবুত্ তানকীহ্ লিখেছেন, এই হাদিসের সনদে ধারাবাহিকতা নেই। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, এতে কোনো দোষ নেই। আমি বলি, হাদিসটি সহীহ্। কারণ জানোয়ারের বায়ে সলম রসুলে পাক স. নিষেধ করেছেন। ইমাম আবু হানিফাও বলেছেন, জানোয়ারকে কর্জ দেয়া দুরস্ত নয়। অন্যদিকে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন দুরস্ত আছে। তাঁরা দলিল হিসাবে এই হাদিসটি পেশ করেছেন, রসুল স. এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক উট কর্জ নিয়েছিলেন। পরে তার কাছে উট এসে গেলে বললেন, একটি উট ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। সাহাবীগণ আরজ করলেন, আমাদের কাছে তো মাত্র চার বৎসর বয়স্ক ভালো উট আছে (কিন্তু তার কাছ থেকে কর্জ নেয়া হয়েছিলো একটি পূর্ণবয়স্ক উট)। রসুল স. বললেন, তাই দিয়ে দাও। উত্তম ওই ব্যক্তি যে উত্তমরূপে কর্জ পরিশোধ করে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তির নিকট রসুলে পাক স. এর কিছু কর্জ ছিলো। সে রসুল স. এর সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার শুরু করলে সাহাবীগণ উত্তেজিত হলেন। রসুল স. বললেন, পাওনাদারকে কিছু বলা ঠিক নয়। তাকে এক বৎসরের একটি উট কিনে নিয়ে দিয়ে দাও। সাহাবীগণ আরজ করলেন, আমাদের কাছেতো তার উট থেকেও ভালো উট আছে। তিনি স. বললেন, তাই দাও। ওই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমরূপে কর্জ পরিশোধকারী। বোখারী।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, জানোয়ারের গুণগত বিবরণ নির্দিষ্ট না হওয়ায় এধরনের কর্জ দুরস্ত নেই। কিন্তু উল্লেখিত দুইটি সহীহ্ হাদিসের মোকাবেলায় ইমাম আজমের মতটি নিছক অনুমান (কিয়াস) যা অগ্রহণীয় — যতোক্ষণ পর্যন্ত জানোয়ারের সলম বেচাকেনার হাদিস সহীহ্ বলে প্রমাণিত না হয়। সহীহ্ প্রমাণিত হলে সলম করা এবং কর্জ দেয়া দুটোই না জায়েয হয়ে যাবে। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে সলম ও কর্জ দুটোই সামিল আছে। জানোয়ারের কর্জ বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে উপরে যে হাদিসটি বলা হয়েছে তাতে কেবল উট কর্জ নেয়ার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু উট বাদে অন্যান্য জানোয়ারের কথা এতে বলা হয়নি। সুতরাং অন্যান্য জানোয়ারের প্রসঙ্গ অবৈধই থেকে যাবে।

দিয়তের প্রসঙ্গটি আবার অন্যরকম (হত্যার বিনিময়কে দিয়ত বলে)। এক্ষেত্রে বায় সলম জায়েয। কারণ, উট দ্বারা দিয়ত প্রদান করাই শরিয়তের নির্দেশ। আমরা বলি, মালের বিনিময়ে মালের ক্ষেত্রে মালের গুণগত পার্থক্য নির্দেশ বলবৎ থাকতে হবে। যেমন, কেনাবেচা এবং ইজারা — এরা একে অপরের সাথে সন্ধি করেছে। কিন্তু যেখানে মালের বিনিময়ে মাল না হয় যেমন, বিবাহ, খোলা, রক্তপনের বিনিময়ে সন্ধি — এ সমস্ত অবস্থায় মালের গুণগত পরিমাণ নির্ধারণ করা জরুরী নয়।

আলেমদের ঐকমত্য এই যে, স্বাধীনা গর্ভবতী নারী গর্ভপাত ঘটালে তার দিয়ত হচ্ছে একটি গোলাম অথবা একটি বাঁদী। গর্ভবতী ক্রীতদাসী গর্ভপাত ঘটালে তার দিয়ত কিন্তু গোলাম বা বাঁদী নয় — নগদ অর্থ। ইমাম আবু হানিফার মতে গর্ভপাতকৃত শিশু ছেলে হলে দশ ভাগের একভাগ এবং মেয়ে হলে বিশ ভাগের একভাগ দিয়ত নির্ধারিত হবে। অন্যান্য আলেমদের মতে দিয়ত নির্ধারিত হবে গর্ভপাতকারিণী কৃতদাসীর মূল্যের দশভাগের একভাগ। আর জানোয়ারের বাচ্চার গর্ভপাত ঘটালে তার দিয়ত হবে, গর্ভপাতের কারণে ওই জানোয়ারের মূল্য যতটুকু কমে গিয়েছে ততটুকু।

মালের বিনিময়ে মালের ক্ষেত্রে বিবাদ-বিসংবাদ, পরিশোধে বাহানা ইত্যাদির সুযোগ বেশী। এক্ষেত্রে মাল নয় বরং পরিশোধের ব্যাপারটিই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। উটের কর্জ এবং বায় সলম জায়েয হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, উটের মূল্যমানের পার্থক্য নিতান্তই কম, যা ধর্তব্য বলে গণ্য হয় না।

কর্জের ব্যাপারটি এ রকম — এক পক্ষ থেকে নগদ টাকা দেয়া হবে, অন্য পক্ষ নির্ধারিত সময়ের পর ওই পরিমাণ টাকা ফিরিয়ে দিবে। অথবা কোনো বস্তু দিলে কিছুকাল পরে ঐ প্রকারের বস্তু ফিরিয়ে নিবে। এ রকম অবস্থায় সুদের আশংকা বিদ্যমান। কারণ, টাকা ও বস্তুর মূল্যমানে হ্রাসবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে এ ধরনের লেনদেনকে শরিয়ত বৈধ করে দিয়েছে। এই বৈধতার উপর এজমাও হয়েছে। আলেমগণ কর্জের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ রকম — ঋণ গ্রহণকারী টাকা পয়সা এবং আহার্য বস্তু ঋণ নিয়ে ব্যবহার করলে অথবা খরচ করে ফেললে অবিকল ওই বস্তু ফিরিয়ে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। পরিশোধের সময় সমমূল্যের এবং সমপরিমাণের অন্য টাকা ও আহার্য বস্তু দিলেও কোনো ক্ষতি নেই। শরিয়ত এ রকম অনুমতি দিয়েছে। যে ক্ষেত্রে ধার নেয়া বস্তু অবিকল ফিরিয়ে দেয়া জরুরী হয়, সেক্ষেত্রে কর্জ দেয়া জায়েয নয়। যেমন, বাঁদী, গোলাম, কাপড়, আসবাবপত্র, জানোয়ার ইত্যাদি। ইমামে আজম এরকমই বলেছেন। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কাউকে আপন বাঁদী কর্জ দেয়া নাজায়েয।

মাসআলা ঃ পূর্ব সম্পর্ক ছাড়াই যদি ঋণগ্রহণকারী ঋণদাতাকে কিছু উপঢৌকন দেয়, বাহন ব্যবহার করতে দেয়, বাড়িতে থাকতে দেয়, গৃহীত কর্জ অপেক্ষা অতিরিক্ত প্রদান করে অথবা যা নেয় তার চেয়ে উত্তম বস্তু দিয়ে দেয় তবে তা গ্রহণ করা ঋণগ্রহীতার জন্য বৈধ হবে কিনা — এ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ বলেন, জায়েয নয়।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, বিনা শর্তে দিলে জায়েয।

আইম্মায়ে সালাসা (ইমামত্রয়-ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল) হজরত আনাসের হাদিস থেকে এই দলিলটি উপস্থাপন করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কর্জগ্রহীতা কর্জদাতাকে হাদিয়া দিলে সে যেনো গ্রহণ না করে তার সওয়ারীতে ভ্রমণ করাতে চাইলে সে যেনো ভ্রমণ না করে। তবে পূর্বসম্পর্ক থাকলে এ রকম করাতে দোষ নেই। ইবনে মাজা।

সালেম বিন আবী জু'দ রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হজরত ইবনে আব্বাস কে বললো, আমি একজনকে বিশ দেরহাম মূল্যের গালিচা কর্জ দিয়েছিলাম। এরপর সে আমাকে হাদিয়া হিসাবে একটি মাছ দিলো, যার মূল্য তের দেরহাম। হজরত আব্বাস বললেন, তুমি তার নিকট থেকে সাত দেরহাম নিও। ইবনে জাওজী।

হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম বলেন, তোমাদের নিকট কর্জ গ্রহণকারী তোমাদেরকে পোশাক, আঞ্জির, যব ইত্যাদি দিতে চাইলে নিও না। কারণ তা সুদ। বোখারী।

হজরত আলী বর্ণনা করেন, রসুল স. ওই ধরনের কর্জ দিতে নিষেধ করেছেন যাতে স্বার্থ রয়েছে।

বায়হাকী আল মারেফা'র মধ্যে ফোজালা বিন উবাইদের বর্ণনা থেকে এই হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন, কর্জের সাথে অতিরিক্ত লাভ গ্রহণ করা একপ্রকার সুদ।

ইমাম শাফেয়ী হজরত আবু রাফে এবং হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিসকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সাহাবীগণ আরজ করলেন, পরিশোধের জন্য আমাদের এই উটনী কর্জ হিসাবে গ্রহণ করা উটনী থেকে উত্তম। রসুল স. বললেন, তাই দাও। তোমাদের মধ্যে উত্তম ওই ব্যক্তি যে ঋণ পরিশোধ করে উত্তমরূপে। জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. কে বললাম, কিছু খামীর অথবা রুটি প্রতিবেশীরা পরস্পরকে কর্জ দেয় এবং গ্রহণ করার বেলায় কমবেশী গ্রহণ করে। রসুল স. এরশাদ করলেন, এতে কোনো দোষ নেই। উত্তম আচরণ ব্যতীত এতে অন্য কিছু নেই।

হজরত মুআজ বিন জাবালের কাছে খামীর এবং রুটি কর্জ দেয়া নেয়ার নিয়ম জানতে চাইলে তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! এটা তো অতি উত্তম আচরণ। কম নিয়ে বেশী দেয়া এবং বেশী নিয়ে কম দেয়ায় ক্ষতি নেই। তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম যে পরিশোধের বেলায় উত্তম। আমি রসুল স. এর কাছে এ রকমই শুনেছি। ইবনে জাওজী।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, কর্জ লেনদেন ওজনের মাধ্যমে হওয়া উচিত। কেউ কেউ বলেন গণনার মাধ্যমে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ঋণ লেনদেনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার হুকুমটি ঐচ্ছিক। ওয়াজিব নয়। এই হুকুমটি ওই আয়াতে উল্লেখিত হুকুমের মতো যেখানে বলা হয়েছে, যখন নামাজ শেষ হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো।

কোনো কোনো আলেম বলেন, লিপিবদ্ধ করার হুকুমটি ওয়াজিব। শা'বী বলেন, ঋণ লেনদেনের বিষয় সাক্ষীদের সাক্ষ্যসহ লিখে রাখা ফরজ। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে এ রকম বলা হয়েছে, 'তোমরা একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেনো আমানত প্রত্যর্পণ করে।' — এতে বোঝা যায় লিপিবদ্ধ করার আবশ্যকতা রহিত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ওয়াজিব মনসুখ হয়ে গিয়েছে। আমি বলি, পরে অবতীর্ণ আয়াত দ্বারা পূর্বে অবতীর্ণ আয়াত মনসুখ হয়। কিন্তু এখানে তা হয়নি। দু'টি আয়াতই অবতীর্ণ হয়েছে এক সাথে। এতে বোঝা যায় লিপিবদ্ধ করার হুকুমটি ঐচ্ছিক।

লেখককে হতে হবে ন্যায়পরায়ণ। দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে তাকে। তাই নিয়ম হচ্ছে, লেখার কাজে নিয়োগ করতে হবে ধর্মভীরু এবং ন্যায়বান লেখককে। আর লেখকের উচিত যেনো লিখতে অস্বীকৃত না হয়। আল্লাহতায়ালা যেমন তাকে অনুগ্রহ করে লিখতে শিখিয়েছেন, তাই সে আল্লাহতায়ালার বান্দাদের প্রতিও অনুগ্রহশীল হবে। এটাই কাম্য। অন্যত্র আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'আল্লাহ যেমন তোমাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন, তোমরাও মানুষের সাথে তেমনই করো।'

লেখকের উপর লেখা এবং সাক্ষীদের উপর সাক্ষ্য দেয়া ওয়াজিব কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। মুজাহিদ বলেন, ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো, লেখক ও সাক্ষীকে ডাকতে হবে। হাসান বসরীও ওয়াজিব বলেন। তবে প্রয়োজন মতো। অর্থাৎ নির্বাচিত হওয়ার পর লেখকের উপর ওয়াজিব। জুহাক বলেন, লেখার জন্য লেখককে এবং সাক্ষ্য দেয়ার জন্য সাক্ষীকে নির্ধারণ করার পর তাদের উপর লেখা ও সাক্ষ্যদান করা ওয়াজিব। কিন্তু বলা হয়েছে, 'লেখক এবং সাক্ষী যেনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।' সুতরাং ব্যাপারটির ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

লেখককে বলা হয়েছে সে যেনো আল্লাহ্‌কে ভয় করে। এবং প্রকৃত বিষয় অবিকৃতভাবে লিপিবদ্ধ করে। আর লিপিবদ্ধ করাবে ওই ব্যক্তি যে দাবীদার। তার দাবী হবে কর্জগ্রহণকারীর সম্মতিসাপেক্ষ। দাবীদার অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বৃদ্ধ অথবা উন্মাদ হলে তার পক্ষে তার অভিভাবক লিপিবদ্ধ করাবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আয়াতে 'দুর্বল' বলতে স্বল্পস্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। কর্জ দাতা বোবা, বন্দী, ব্যাধিগ্রস্ত হলে তাঁর পক্ষে অভিভাবক কিংবা উকিল নিযুক্ত করতে হবে। পর্দানশীন মহিলার প্রতিও একই হুকুম। মানুষের স্মৃতিশক্তি সব সময়

নির্ভরশীল অবস্থায় থাকে না। লিপিবদ্ধ করাতে তাই দাতা গ্রহীতা উভয়েই ভুল ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারে। মূল্য, বিবরণ, পরিমাণ, আদান প্রদানের সময়, বায় সলম — সবকিছুই যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, যাতে স্মৃতি প্রতারক হয়ে না দাঁড়াতে পারে।

সাক্ষ্যদাতা স্বাধীন, মুসলমান, পুরুষ, জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া প্রয়োজন। অপ্রাপ্তবয়স্কদের জ্ঞান অপরিণত। পাগল জ্ঞানহীন। তাই ঐকমত্য এই যে, এদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কৃতদাসের সাক্ষ্যও অগ্রহণীয়। ইমাম আহমদ বলেছেন, গ্রহণীয়। হজরত আনাস বিন মালেক এ রকমই মত প্রকাশ করেছেন। ইসাহাক এবং দাউদ জাহেরীও এরকম বলেছেন। বোখারী।

হজরত আনাস বলেছেন, গোলামের সাক্ষ্য জায়েয। তবে শর্ত হলো, সে যেনো ফাসেক না হয়। এছাড়া জায়েযের পক্ষে আরো রয়েছেন শোরাইহ এবং জুরারাহ্। ইবনে শিরিন বলেছেন, গোলামের সাক্ষ্য জায়েয। কিন্তু মনিবের পক্ষে হলে জায়েয নয়। হাসান ও ইব্রাহিম মনিবের পক্ষে হলেও জায়েয বলেছেন। শোরাইহ্ বলেছেন, তোমরা তো সবাই গোলাম ও বাঁদীর সন্তান। বোখারী।

কাফেরের সাক্ষ্য জায়েয নয়। কাফেরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেও। ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এই মত ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'কাফেরেরা সবাই জালেম।'

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কাফেরের বিরুদ্ধে কাফেরের সাক্ষ্য জায়েয। যদিও তাদের ধর্মমত পৃথক হয়। কেননা জিম্মি কাফের অভিভাবক হওয়ার যোগ্য (ইসলামী রাষ্ট্রে জিজিয়া কর দিয়ে যে কাফের স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাকে বলে জিম্মি)। জিম্মিকে তাদের সম্প্রদায়ের অপ্রাপ্ত বয়স্কদের অভিভাবক হিসাবে মানা যায়। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'তারা একে অপরের বন্ধু।' এজন্য এক ধর্মের কাফেরের সাক্ষ্য অন্য ধর্মের কাফেরের বিরুদ্ধে দুরস্ত আছে। তারা তাদের আপন সম্পদের মালিক। প্রকৃতপক্ষে কাফেররা কাফেরই। ফাসেকরা ফাসেক। কিন্তু তারা আল্লাহাতায়ালার হুকুমের বাইরে। আল্লাহ এবং তাঁর হুকুমে তাদের আস্থা নেই, কিন্তু তাদের ধারণায় কুফরই ধর্ম। মিথ্যা বলা তাদের ধর্মেও হারাম।

ইবনে আবী লায়লা এবং আবু ওবায়দা বলেন, এক ধর্মের কাফেরের সাক্ষ্য অন্য ধর্মে কাফেরের বিরুদ্ধে গ্রহণীয় নয়। যেমন ইহুদীর সাক্ষ্য খৃষ্টানের বিরুদ্ধে। বায়যাবী লিখেছেন, 'মিররিজালিকুম' শব্দটি ইসলামের শর্তকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমি বলি, এই আয়াত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে। তাই সাক্ষীদের মুসলমান হওয়া জরুরী। আর যার উপর দাবী করা হয় সেও যেনো মুসলমান হয়। ইবনে জাওজী বলেন, মুসলমান ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীর সাক্ষ্য অন্য কোনো

ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ নয়। ইবনে জাওজীর দলিল হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিসটি। তিনি বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, এক ধর্মের উত্তরাধিকার অন্য ধর্মে বলবৎ হয় না। এবং আমার উম্মত ছাড়া অন্য কেউ অন্য কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে বৈধ নয়। তবে আমার উম্মতের সাক্ষ্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বৈধ। দারা কুতনী, ইবনে আদী। এই হাদিস ইবনে আবী লায়লারও পক্ষে। কিন্তু ইমাম আহমদের বিপক্ষে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, সমস্ত কাফেরই প্রকৃতপক্ষে একধর্মভূত। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'অতঃপর তাদের মধ্যে যারা ইমানদার এবং তাদের মধ্যে যারা কাফের' — বোঝা যাচ্ছে, দল মোটে দু'টি। মুমিনদের দল এবং কাফেরদের দল। এই ধারণার প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফার মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখিত হাদিসের সনদভুক্ত এক রাবীর নাম ওমর বিন রাশেদ, দারাকুতনী যাকে জয়ীফ বলেছেন। অপরদিকে ইমাম আবু হ্যানিফা আশ্রয় করেছেন হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটিকে, যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. আহলে কিতাবদের এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়াকে বৈধ করে দিয়েছেন। ইবনে মাজা।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় এসেছে — এক ইহুদী পুরুষ ও একজন ইহুদী নারীকে রসুল স. এর দরবারে হাজির করা হলো। এ দু'জন ছিলো ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী। রসুল স. ইহুদীদেরকে বললেন, এদু'জন আমাদের ধর্মের হলে শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি দেয়া হতো। কিন্তু আমরা অপারগ। তোমরা বরং তোমাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠ দু'জন আলেমকে নিয়ে এসো। ইহুদীরা সুরিয়ার দুই ছেলেকে নিয়ে এলো। তিনি স. বললেন, তোমরা কি তোমাদের সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় আলেম? তারা বললো, লোকেরা এরকমই বলে। রসুল স. বললেন, আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি যিনি মুসা আ. এর উপর তওরাত অবতীর্ণ করেছেন। তোমরা বলো, তওরাতে কী শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে? তারা বললো, চারজন লোক যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা কোনো পুরুষকে স্ত্রীলোকের ভিতর এভাবে প্রবেশ করতে দেখে যেমন সুরমাদানীর মধ্যে সুরমাদন্ড প্রবেশ করানো হয়, তবে তাদেরকে সঙ্গেসার করতে হবে (কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতে হবে)। রসুল স. এরশাদ করলেন, সাক্ষী উপস্থিত করো। চারজন সাক্ষ্য দিলো। রসুল স. সঙ্গেসারের আদেশ দিলেন। আবু দাউদ, ইসহাক বিন রহ্ওয়াইহ্, আবুল ইয়ালী আল মুসলী, আল বায্যার, দারা কুতনী। তাহাবীর বর্ণনায় শব্দগুলো রয়েছে এরকম, তোমাদের মধ্য থেকে চারজনকে আমার কাছে নিয়ে এসো, যারা সাক্ষ্য দেবে। এই হাদিস দু'টি সনদের দিক দিয়ে অবশ্য দুর্বল। দু'টি হাদিসেরই বর্ণনাকারী হিসেবে রয়েছে মুজালিদ বিন সাঈদ। যার সম্পর্কে

ইমাম আহমদ বলেছেন, সে কিছুই ছিলো না। ইয়াহিয়া র. বলেছেন, তার বর্ণিত হাদিস দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না।

সাক্ষী হতে হবে দু'জন। দু'জনই পুরুষ। পুরুষ দু'জন না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। অর্থাৎ একজন পুরুষের সাক্ষ্য দু'জন মহিলার সাক্ষ্যের সমান। তবে মহিলাদের সাক্ষ্য না নেয়াই উত্তম। বরং ঐকমত্য এই যে, মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। রসুল স. এর পরে প্রথম দু'জন খলিফার আমল এরকমই ছিলো। অর্থাৎ হুদুদ ও কেসাসে মহিলাদের সাক্ষ্য জায়েয ছিলো না (সঙ্গেসারকে হদ এবং খুনের বদলে খুনকে কেসাস বলে)। জুহুরী এই হাদিসটি ইবনে আবী শাইবা, হাফস্ ইজাজ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি মুরসাল। আর মুরসাল হাদিস আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের কথা এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাদের সময়ে শরিয়তের বেশীর ভাগ নিয়ম কানুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাহাবীদের এজমাও হয়েছে। পরবর্তীতে হয়েছে অনেক কম। রসুল স. এরশাদ করেন, তোমরা এই দু'জনের অনুসরণ করো, কারণ তারা আমার পরে খলিফা হবে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত হুজায়ফা। তিরমিজি।

ইবনে হাজার লিখেছেন, ইবনে আবী শাইবার বর্ণনাসূত্রে ইমাম মালেক, হজরত আকীল জুহুরীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এই বর্ণনায় এই কথা কয়টি অতিরিক্ত আছে, হুদুদ ও কেসাসে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয নয়। বিবাহ এবং তালাকেও জায়েয নয়। কিন্তু ইমাম মালেকের এই হাদিস সহীহ্র পর্যায়ে পৌঁছেনি। ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেকের অনুসরণে বলেন, কেবল পণ্যবিনিময়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয। যেমন ইজারা, খিয়ার (যে বেচাকেনায় শর্ত থাকে তাকে খিয়ার বলে)। শোফা (অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট বাড়ি বা জমি বিক্রয়ের পর বিক্রেতার অংশীদার অথবা প্রতিবেশী যথামূল্য পরিশোধ করে মালিক হওয়ার যে অধিকার পায় তাকে শোফা বলে)। ভুলক্রমে হত্যা, ওই প্রকারের অপরাধ যাতে জরিমানা দিতে হয় — এ সমস্ত কাজে মেয়েদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। বিবাহ, তালাক, উকিল, ওসিয়ত, গোলাম আজাদ করা, তালাক থেকে ফিরে আসা, বংশনির্ণয় — এসব কাজেও গ্রহণীয় নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, কেসাস ও হুদুদ ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে রমণীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক বলেছেন, দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দুজন রমণীর সাক্ষ্য একটি সম্মিলিত সংবাদ — এতে ভুলের সম্ভাবনা আছে। এর দ্বারা দাবীদারের দাবী নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নাও হতে পারে। সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে দাবীদার তা মানতে বাধ্য নয়। কিন্তু যেহেতু কোরআন দ্বারা এবং কোরআনের সমর্থনে সাক্ষী নির্ধারিত হয়, তাই তাদেরকে মেনে নিতে হয়। এজন্য নারীর সাক্ষ্য ওই সমস্ত ক্ষেত্রে জায়েয, যে সমস্তের উল্লেখ কোরআনে রয়েছে (অর্থাৎ পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে)। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন,

'এবং সাক্ষ্য দিবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।' রসুল স. বলেছেন, অভিভাবক এবং ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ সম্পন্ন হতে পারেনা।

জ্ঞাতব্য ঃ বিবাহের প্রচার করা জরুরী। আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে এব্যাপারে। তারা বলেন, দু'জন পুরুষ সাক্ষ্যদাতার মাধ্যমেই একাজ সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু ইমাম মালেক একথা মেনে নেননি। তাঁর মতে প্রচার শর্ত নয়। কারণ আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'তোমরা যাকে পছন্দ করো, বিবাহ করো।' অন্যত্র বলেছেন, 'আর ওই নারী ব্যতীত অন্যান্য নারীগণ তোমাদের জন্য হালাল।' প্রচারের শর্ত এগুলোতে নেই।

ইমাম আহমদ বলেন, বিবাহের সাক্ষী জরুরী — একথা কোনো বর্ণনায় নেই। ইবনে মুনজিরও একথা বলেন।

আমি বলি, সহীহ্ হাদিসে রয়েছে, তোমরা বিবাহের প্রচার করো। ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান, তিবরাণী।

মুস্তাদরেকে হাকেম এবং হুলিয়ায় আবু নাঈম হজরত ইবনে জুবায়ের থেকে এবং তিরমিজি জননী আয়েশার মাধ্যমে এরকম হাদিস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাদিসে প্রচারের সীমারেখা বেঁধে দেয়া হয়নি। ক'জনের নিকট প্রচার — দু'দশ জন কিংবা হাজার লক্ষ অথবা সমস্ত পৃথিবীবাসীর নিকট প্রচার, এরকম সীমানির্ধারিত নেই বলে ইমাম আবু হানিফা কমপক্ষে দু'জন সাক্ষ্যদাতা জানলেই তাকে প্রচার বলে ধরে নিতে বলেছেন। দু'জন জানার পর বিষয়টি আর গোপন থাকে না। কারখী বলেন, কিছু মানুষের মজলিশে বিবাহ হলে সাক্ষ্যদানের বিষয়টি আর জরুরী থাকে না। কারণ, প্রচারের কাজটি এতেই সমাধা হয়ে যায়। ইমাম মালেক বলেন, দফ বাজালেও প্রচারের কাজ হয়ে যাবে। দু'জন মানুষকে সাক্ষী বানানোর পর যদি তাদেরকে একথা বলে দেয়া হয় যে, সংবাদটি গোপন রেখো, তবে প্রচার বাতিল হয়ে যায়।

আমি বলি, প্রচারের শর্তের ব্যাপারে ঐকমত্য নেই। তাই বিবাহের পরে গোপন করায় অথবা অস্বীকার করায় বিবাহ বাতিল হবে না। দফ বাজানো কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। এজন্যই আমরা ইজাব ও কবুলের সময় দু'জন সাক্ষীর উপস্থিত থাকা এবং তাদের নিজ কানে ইজাব ও কবুলের স্বীকারোক্তি শোনা জরুরী করে দিয়েছি, যেনো প্রচারের কাজটি সুসম্পন্ন হয়। অর্থাৎ গোপনে না হয়ে সাক্ষীদের সামনে হয়।

এই হাদিস জননী আয়েশা, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে দারা কুতনী লিখেছেন (বর্ণিত হাদিসের নির্দেশানুযায়ী মহিলাদের সাক্ষ্যকে মুহাদ্দিসগণ গ্রহণীয় বলেছেন)।

ইমাম আজমের মতে, সকল ক্ষেত্রে সাক্ষী মেনে নেয়া যৌক্তিকতাবিরোধী। কিন্তু এই আয়াতে মহিলাদের সাক্ষ্য মেনে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর অনুসরণে

তাদের সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা অন্যান্য ক্ষেত্রেও মেনে নেয়া উত্তম। হুকুমটি সাধারণ। তাই সম্পদবিষয়ক এবং মানসম্মানবিষয়ক সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত না হওয়ার কোনো কারণ নেই। রসুল স. এরশাদ করেন, মালের হেফাজত করা জীবন ও মানসম্মান রক্ষা করার মতো।

বিদায় হজের সময় রসুল স. তার ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছেন, তোমাদের রক্ত, সম্পদ এবং মান সম্মান হানি করা তোমাদের কারো পক্ষে বৈধ নয়। অন্যায়ভাবে হত্যা করা, রক্ত প্রবাহিত করা অথবা সম্পদ আত্মসাৎ করা অবৈধ। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম আহমদ ও ইবনে হাব্বান হজরত সাঈদ বিন জায়েদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, আপন সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে যে নিহত হয়, সে শহীদ। জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যে মারা যায়, সেও শহীদ। আর ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেতো শহীদই। পরিবার পরিজনের হেফাজত করতে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিও শহীদ।

আসল কথা হলো, হুদুদ ও কেসাসে নারীর সাক্ষ্য মেনে নেয়া যায় না। এটা ঐকমত্য। কারণ এই যে, হুদুদ ও কেসাস নিঃসন্দেহ হওয়া বাঞ্ছণীয়। বিবাহের অবস্থা এরকম নয়।

হজরত আয়েশার মাধ্যমে উপরে বর্ণিত হাদিসটির একজন বর্ণনাকারীর নাম, মোহাম্মদ বিন ইয়াজিদ বিন সানাম। ইমাম আহমদ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহিয়া বলেছেন, সে ন্যায়পরায়ন ছিলো না। নাসাঈ বলেছেন, সে মাতরুকুল হাদিস (যে বর্ণনাকারী সাধারণভাবে মিথ্যাবাদী বলে পরিচিত)। দারাকুতনী তাকে এবং তার পিতাকে দুর্বল প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয় সনদের নাফে বিন ইয়াসিরুল আবুল খতীব অখ্যাত। হজরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত হাদিসের একজন বর্ণনাকারী ছিলো নাহ্হাশ। তাকে ইয়াহিয়া বলেছেন দুর্বল। ইবনে আদী বলেছেন, অযোগ্য। হজরত ইবনে মাসউদ রা. বর্ণিত হাদিসের রাবী (বর্ণনাকারী) বকর বিন বিকার সম্পর্কে ইয়াহিয়া বলেছেন, সে কিছুই ছিলো না। এই সনদের অন্য রাবী আবদুল্লাহ বিন মাহরাজ দারাকুতনীর দৃষ্টিতে মাতরুকুল হাদিস। হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিসের সাবেত বিন জুবায়ের মুনকিরুল হাদিস বলে গণ্য। তার মধ্যে ন্যায়পরায়নতা পূর্ণরূপে ছিলোনা। আবুল হাতেম, ইবনে আদ্দী এবং ইবনে হাব্বানও এরকম বলেছেন।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, সম্পদবিষয়ক নয়, এরকম ক্ষেত্রে একজন সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্য গ্রহণ করে দাবীদারের পক্ষে রায় দেয়া যাবে না। সম্পদ সংক্রান্ত ব্যাপারেও একই নিয়ম। এক্ষেত্রে দাবীদার যদি কসম করে তবুও না। জমহুরের নিকট সম্পদ সংক্রান্ত নয়, এমন ক্ষেত্রে একজন সাক্ষ্যদাতার

সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তবে শর্ত হলো, দাবীদারের নিকট থেকে হক ইনসাফ ও সততার কসম নিতে হবে। কেননা রসুল স. একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং দাবীদারের কসমের উপর ভিত্তি করে রায় দিয়েছিলেন। এই হাদিস ইবনে জাওজী হজরত জাবের এবং হজরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন। হজরত ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু হোরায়রা, হজরত ইবনে ওমর, হজরত জায়েদ বিন সাবেত, হজরত আবু সাঈদ খুদরী, হজরত সাঈদ বিন ওবাদা, হজরত আমের বিন রবীয়া, হজরত সহল বিন সাঈদ, হজরত আম্মার বিন হাজম, হজরত আমর বিন হাজম, হজরত মুগীরা বিন শোবা, হজরত বেলাল বিন হারেস, হজরত সালমা বিন কায়েস, হজরত আনাস বিন মালেক, হজরত তামীমে দারী, হজরত জয়নব বিনতে সায়লাবা এবং হজরত বিরক (রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন) থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে।

আমি বলি, হজরত জাবের থেকে এই হাদিসটি ইমাম আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা এবং তাহাবী সূত্রপরম্পরায় আবদুল ওহাব বিন আবদুল মজীদ সাকাফীর মাধ্যমে জাফর বিন মোহাম্মদ তাঁর পিতা থেকে উল্লেখ করেছেন। তিরমিজি বলেছেন, এই হাদিস ইমাম সওরী ও অন্যান্যরাও বর্ণনা করেছেন। সওরী এটিকে মালেক, জাফর ও মোহাম্মদের বর্ণনা থেকে মুরসাল হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। এই সনদই সবচেয়ে বিশুদ্ধ। দারাকুতনী হজরত আলী থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একজন সাক্ষী এবং একজন হকদারের কসমের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। এই সনদে অবশ্য ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। দারাকুতনী বলেন, হাদিসটি মুআল্লাল (গোপন দুর্বলতাদুষ্ট যা বিশুদ্ধ হওয়ার অন্তরায়)। আরো বলেছেন, হজরত জাফর একে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবার কখনো করেছেন মাউসুল হিসেবে (মিলিতভাবে)। ইমাম শাফেয়ী এবং বায়হাকী বলেছেন, আবদুল ওহাব বর্ণনা করেছেন মাউসুল হিসেবে। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য।

আমি বলি, জাহাবী লিখেছেন, আবদুল ওহাব ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং বিশৃঙ্খল বোধসম্পন্ন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দাবীদারের কসমের সঙ্গে একজনের সাক্ষীর উপর রসুল স. রায় দিয়েছেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও তাহাবী। তিরমিজি একে হাসান বলেছেন। তাহাবী বলেছেন মুনকার। এই হাদিসের রাবী কায়েস বিন সা'দ এবং আমর বিন দিনার সম্পর্কে তাহাবী বলেছেন, আমি জানতে পারিনি কায়েস আমর বিন দিনার থেকে আদৌ কোনো হাদিস বর্ণনা করেছেন কিনা।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এক সাক্ষী ও এক কসমের উপর রায় দিয়েছিলেন। বর্ণনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী, আসহাবে সুনান ও ইবনে

হাব্বান। ইবনে আবি হাতেম একে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী ও তাহাবী একে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসটিকেই বায়হাকী মুগীরা বিন আবদুর রহমান, আবু জিয়াদ আ'রাজ, আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেছেন, এই হাদিসের সিলসিলা সর্বাধিক সহীহ্। ইমাম আজম বলেন, সহীহ্ হলেও এই হাদিসটি খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ভূক্ত (এককভাবে বর্ণিত)। তাই কিতাবুল্লাহ্র বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা এর নেই। অধিক শক্তিশালী হাদিসের বিরুদ্ধেও একে গ্রহণীয় ভাবা যায়না।

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনা, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, মানুষের দাবী সহজে মেনে নিলে কিছু লোক মানুষের রক্ত ও সম্পদের দাবী করে বসবে। তখন দ্বিতীয় পক্ষও কসম করতে উদ্যত হবে। বায়হাকীর বর্ণনাতেও এরকম রয়েছে। সাক্ষ্য উপস্থাপন করা দাবীদারের দায়িত্ব। সাক্ষী পেশ করতে না পারলে তার কসম স্বীকৃত হবেনা। আমর বিন শোয়াইবের বর্ণনা, সাক্ষী পেশ করা দাবী উত্থাপকের দায়িত্বভুক্ত এবং কসম দ্বিতীয় পক্ষের দায়িত্বে। দারা কুতনী, তিরমিজি। হজরত ওয়ায়েল বিন হাজার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এক দাবীদারকে বললেন, সাক্ষী আনো। সে বললো, আমার কোনো সাক্ষী নেই। রসুল স. বললেন, কসম করো। সে বললো, ইতোমধ্যে সে তো তার জমি নিয়ে যাবে। তিনি স. বললেন, উপায় নেই।

উল্লেখিত হাদিস দু'টির সমাধান তাহাবী এভাবে করেছেন, রসুল স. কসমের দায়িত্ব দিলেন দ্বিতীয় পক্ষকে। দাবীদারের পাওনা ফিরে পাওয়ার আর কোনো উপায়ই রইলোনা। দু'জনকে দু'রকম দায়িত্ব দেয়া হলো। একজনকে সাক্ষী অন্যজনকে কসম। অতঃপর কসম ও সাক্ষী একত্রিত থাকবে কীভাবে? কাজেই পার্থক্য হয়ে গেল। তাহাবী, শাফেয়ী কর্তৃক উপস্থাপিত হাদিসের জবাব এভাবে দিয়েছেন, সাক্ষ্য ও কসমের উদ্দেশ্য — দাবীদারের কসম, যে সাক্ষী উপস্থাপন করতে অসমর্থ। এরকম ক্ষেত্রে রসুল স. সাক্ষীর পরওয়া না করে দ্বিতীয় পক্ষের কসম নিয়েছেন, যেনো কসমে কসমে ফয়সালা হয়ে যায়। পরিণাম দাঁড়ালো এই যে, শুধু দাবী করার মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষ কসমের অধিকার লাভ করে। এমন নয় যে, দাবীদার প্রথমে তার দাবী প্রমাণ করে ও সাক্ষী হাজির করে। পূর্ব সম্পর্কের কারণে উভয়ের লেনদেনে রদবদল হয়ে যেতে পারে, ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে শেষে দাবীর ব্যাপারটি প্রবল হয়।

রসুল স. হজরত খাজিমার সাক্ষ্যের উপর ফয়সালা দিয়েছিলেন। তিনি স. তাকে দু'জন সাক্ষীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। এরকম বিশেষত্ব কেবল তাঁকে দেয়া হয়েছিলো। এ কথা অবশ্য হাদিসে প্রকাশ্যভাবে বলা হয়নি, তাই এর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসমীচীন। সাক্ষী পেশ করার উদ্দেশ্য, বিবাদ বিসংবাদ দূর করা। সাক্ষীর সংখ্যা দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন

নারী। কসমের প্রশ্ন উঠতে পারে তখনই যখন সাক্ষী অনুপস্থিত থাকবে। রসুল স. ফয়সালা দিয়েছেন সাক্ষ্য ও কসমের ভিত্তিতে। সাক্ষ্য ও কসম সত্য হলেও মিথ্যা হলেও।

মূল কথা এই যে, এই মাসআলাটি মতানৈক্যমন্ডিত। একজন রাবীর বর্ণনা (খবরে আহাদ) কিতাবুল্লাহ্‌র মোকাবেলায় গ্রহণ করাকে অন্যান্য ইমামগণ জায়েয বলেছেন। ইমাম আজম বলেননি। উল্লেখিত হাদিসে একজন সাক্ষীর সাথে দাবীদারের কসমকে যথেষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোরআনে নির্দেশ রয়েছে, দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ দু'জন নারী।

মাসআলা ঃ যে সমস্ত বিষয় সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, সে সমস্ত বিষয়ে রমণীদের সাক্ষ্য গ্রহণীয়। যেমন শিশুর জন্ম সংবাদ, রমণীদের অভ্যন্তরীণ ব্যাধি ইত্যাদি। এটা ঐকমত্য। ইমাম আজম বলেন, এ সমস্ত বিষয়ে একজন মুসলমান স্বাধীনা পুণ্যবতী রমণীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। দু'জন হলে উত্তম। ইমাম মালেক বলেছেন, দু'জন হওয়া জরুরী, একজন যথেষ্ট নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, চারজন হওয়া জরুরী। কেননা শরিয়তে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য চারজন নারীর সমান। রসুল স. বলেছেন, মেয়েদের সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক।

ইমাম মালেক বলেন, সাক্ষীর জন্য দু'টি ব্যাপার জরুরী। সংখ্যা ও পুরুষ সাক্ষী। প্রয়োজনবশতঃ পুরুষ হওয়ার শর্ত রহিত করা গেলেও সংখ্যার শর্ত এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। অপরদিকে হানাফীদের দলিল এই, ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান, ইমাম আবু ইউসুফ, গালিব বিন আবদুল্লাহের মাধ্যমে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, সাঈদ বিন মুসাইয়েব, আতা বিন আবী রেবাহ্‌ এবং তাউস বলেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে সমস্ত বিষয় পুরুষদের গোচরীভূত হয়না সে সমস্ত বিষয়ে নারীদের সাক্ষ্য জায়েয। হাদিসটি মুরসাল। এতে কোনো সাহাবীর উল্লেখ নেই। আয়াতে উল্লেখিত 'আন্‌ নিসা' শব্দটিতে সংখ্যার নির্ধারণ নেই। কাজেই এক সাক্ষী যথেষ্ট — বেশী হলে উত্তম।

আবদুর রাজ্জাক ইবনে জারীর জুহুরীর বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন, যা ইবনে আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন, এ পদ্ধতি রসুল স. এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রচলিত ছিলো। পুরুষদের অবগতিবহির্ভূত বিষয়ে (প্রসব সংবাদ, বিশেষ বিশেষ মেয়েলী রোগ) মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয। অন্যান্য ক্ষেত্রে জায়েয নয়।

আয়াতে সাক্ষীর যোগ্যতা নির্ণয় করা হয়েছে এরকম — সাক্ষী যেনো ফাসেক ও প্রবৃত্তিপূজক না হয়। যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হবে তার সঙ্গে পার্থিব শত্রুতা যেনো না থাকে। দাবীদারের সঙ্গে তার আঁতাত থাকাও চলবে না। ফাসেকের সাক্ষ্য অগ্রহণীয়—এটা ওলামাদের ঐকমত্য। সাক্ষীকে হতে হবে প্রথম শ্রেণীর

ন্যায়পরায়ণ। কারণ, সত্য সিদ্ধান্ত নির্ভর করে তার সাক্ষ্যের উপরেই। ন্যয়পরায়নতার অর্থ এই, ওয়াজিব সমূহ যথা নিয়মে আদায় করা। সকল সময় কবীরা গোনাহ্ পরিহার এবং সগীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা। তাফসীরে কবীরে এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তায়ালার সমকক্ষ মনে করা, যাদু, হত্যা, সুদ, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন, সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া — এগুলো কবীরা গোনাহ্। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা শপথ করা। বোখারী, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। বোখারী, মুসলিম হজরত আনাস ও হজরত আবু বকর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবোনা কোন্ গোনাহ্ সবচেয়ে বড় — আল্লাহ্র সাথে শিরিক করা, পিতা মাতার অবাধ্যতা। এ সময় রসুল স. বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন, আরো শোনো — মিথ্যা বলা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। একথা বারবার বলতে বলতে তিনি স. একসময় নীরব হয়ে গেলেন।

রসুল স. আরো বলেছেন, ইমান থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করতে পারেনা। চুরি, মদ্যপান, সম্পদলুণ্ঠন, গণিমতের মাল আত্মসাৎ — এগুলোও কবীরা গোনাহ্। বোখারী।

হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে, সে খাঁটি মুনাফিক। একটি থাকলে সে প্রকৃত মুনাফিক না হলেও মুনাফিকের স্বভাববিশিষ্ট বলে গণ্য হবে। ওই চারটি স্বভাব হচ্ছে, আমানত খেয়ানত করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ছিন্ন করা, বাদানুবাদের সময় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা। এ হাদিসটি এসেছে হজরত আবদুল্লাহ বিন আমরের সুত্রে। লিপিবদ্ধ করেছেন বোখারী ও মুসলিম। তাঁরা আরো লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে এসেছে, মুনাফিকীর নিদর্শন তিনটি — অঙ্গীকার ভঙ্গ, আমানত খেয়ানত ও মিথ্যাচার।

কোনো কোনো আলেম বলেন, যে সমস্ত ব্যাপারে শরিয়ত শাস্তি নির্ধারণ করেছে, ওগুলোই কবীরা গোনাহ্। কেউ কেউ বলেন, যে সমস্ত গোনাহ্র কথা কোরআনে উল্লেখ রয়েছে, কবীরা গোনাহ্ সেগুলোই। যেমন, সমকাম। আমর বিন শায়েব তাঁর পিতার মাধ্যমে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমরের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, খেয়ানতকারী নারী পুরুষের সাক্ষ্য বৈধ নয়। যে ব্যক্তি তার ভাই অথবা তার পরিবার পরিজনের উপার্জননির্ভর, তার সাক্ষ্য তার ভাই ও তার পরিবার পরিজনের বিরুদ্ধে গ্রহণীয় নয়। অন্যদের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে দাকিকুলঈদ, বায়হাকী।

ইবনে জাওজী লিখেছেন, এই হাদিসের এক রাবী মোহাম্মদ বিন রাশেদ দুর্বল।কিন্তু তানকি নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইমাম আহমদ তাঁকে নির্ভরযোগ্য মেনেছেন।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, খেয়ানতকারী নারী ও পুরুষের সাক্ষ্য বৈধ নয়। ওই ব্যক্তিও বৈধ নয় যাকে শাস্তিস্বরূপ দোররা মারা হয়েছে। ওই ব্যক্তি যে আপন ভাইয়ের শত্রু, সেও সাক্ষী হিসেবে বৈধ নয়। রোজগার নির্ভর পরিজনের বিরুদ্ধে — খরচবহনকারী ব্যক্তির এবং ওই ব্যক্তির যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান, তাদের সাক্ষ্যও অগ্রহণীয়। পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের, পুত্রের বিরুদ্ধে পিতার সাক্ষ্যও গ্রহণীয় নয়। নিকটতম এক আত্মীয়ের বিরুদ্ধে আরেক আত্মীয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়াজিদ বিন দামেসকী থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, দারাকুতনী এবং বায়হাকী।

ইয়াজিদ বিন জিয়াদ কিন্তু রাবী হিসেবে দুর্বল।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, পিতামাতা সন্তানের বিরুদ্ধে, স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে, স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে, গোলাম মনিবের বিরুদ্ধে, মনিব গোলামের বিরুদ্ধে এবং এক শরীক অন্য শরীকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে তা বৈধ বলে গণ্য হবে না। কারণ এরা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। তবে অপরের বিরুদ্ধে এদের সাক্ষ্য জায়েয। শ্রমিকের সাক্ষ্যও তার নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে গ্রহণীয় নয়। বর্ণনা করেছেন খস্সাফ।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, বিচারক সাক্ষীর কেবল প্রকাশ্য দিকই দেখবে । তবে দ্বিতীয় পক্ষ সাক্ষী সম্পর্কে আপত্তি তুললে বিচারক তার বিস্তারিত অবস্থা জেনে নিবে। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, সাক্ষীর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় অবস্থা জেনে নেয়া বিচারকের জন্য জরুরী — দ্বিতীয় পক্ষ আপত্তি না তুললেও। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ এই মতই পোষণ করেন। ইমাম মালেক বলেছেন, যার ন্যায়পরায়ণতা প্রসিদ্ধ তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করা ঠিক নয়। আর যার ফাসেক হওয়া প্রসিদ্ধ তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা ঠিক নয়। যার কোনো দিকেই প্রসিদ্ধি নেই, তার সম্পর্কে জেনে নিতে হবে।

ইমাম আবু হানিফার দলিল এই যে, রসুল স. বলেছেন, ব্যভিচারের কারণে যাকে শাস্তিযোগ্য বলে নির্ধারণ করা হয়েছে, সে ছাড়া অন্য সকল মুসলমানকে ন্যায়পরায়ণ ধরতে হবে। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারবে। ইবনে আবী শাইবা।

হজরত ওমর বিন খাত্তাবের খেলাফতের সময় তিনি হজরত আবু মুসা আশআরীর নিকট একটি চিঠি লিখেছিলেন, যাতে এই কথাগুলো ছিলো — সকল মুসলমান আদেল (ন্যায়পরায়ণ)। সবার সাক্ষ্য সবার জন্য গ্রহণ করা যাবে, ওই ব্যক্তি ব্যতীত যে ব্যভিচারের অপরাধে শাস্তি পেয়েছে। ওই ব্যক্তিও, যে মিথ্যা

সাক্ষ্য দেয়ার কারণে শাস্তি পেয়েছে। ওই সমস্ত ব্যক্তিও যারা প্রভু, ভৃত্য এবং আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। এই বর্ণনার এক রাবী আবদুল্লাহ্ আবু হামিদের বিরুদ্ধে দুর্বলতার অভিযোগ রয়েছে। অন্য সূত্রে দারাকুতনী একে হাসান বলেছেন। অন্য আরেক সূত্রে বায়হাকী এই হাদিসের উল্লেখ করেছেন। হানাফী আলেমদের উক্তি এই যে, ফতওয়া হয়েছে সাহেবাঈনের মতের উপর। তারা আরো বলেছেন, ইমাম সাহেব ও সাহেবাঈনের মতানৈক্য দলিলের উপর ভিত্তি করে হয়নি। যুগের পার্থক্যের কারনে হয়েছে। ইমাম সাহেবের যুগে সাধারণ মানুষ ছিলো পুণ্যবান, ফাসেকের সংখ্যা ছিলো অনেক কম। সাহেবাঈনের যুগের অবস্থা ছিলো বিপরীত। আমি বলি, আমাদের যুগে ইমাম সাহেবের মতের উপরেই ফতওয়া হওয়া বাঞ্ছনীয়।কেননা এই জামানায় কিতাবের শর্তানুসারে পুণ্যবান মানুষের দেখা পাওয়া ভার। প্রায় সকলেই কোনো না কোনোভাবে ফাসেক। এখন যদি আমরা সাক্ষ্যদাতাদের পরিসর কমিয়ে দেই, তবে হুকুম কার্যকর হবে কীভাবে। এতে যে ফয়সালার সমস্ত পথই বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের সময়ে ফাসেকের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা দরকার। তবে শর্ত হলো, পৃথিবীবাসীর দৃষ্টিতে তাকে সম্মানিত বলে বিবেচিত হতে হবে। ধারণা করতে হবে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না। পূর্ববর্তী যুগে সাক্ষীদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা জিজ্ঞেস করা হতো না। কসম নেয়া হতো এবং কসমকেই যথেষ্ট মনে করা হতো।

একটি আপত্তি ঃ এটা তো কোরআনের অকাট্য প্রমাণের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত ধারণা মাত্র, যা গ্রহণ করা যায়না।

উত্তর ঃ না, ব্যাপারটা এরকম নয়। কোরআনের উদ্দেশ্য এরকম, 'আর তোমাদের পছন্দ মতো দু'জন পুরুষকে সাক্ষী করে নাও।'

প্রত্যেক যুগেই উত্তম মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বর্ণিত যোগ্য সাক্ষ্যদাতা এ যুগে কোথায় ?

একদা রসুল স. সাহাবীগণকে বললেন, যে কাজ করতে তোমরা নির্দেশপ্রাপ্ত তার দশভাগের একভাগ ছেড়ে দিলেও তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর এমন এক যুগ আসবে, যে যুগের মানুষেরা দশভাগের একভাগ পালন করলেও মুক্তি পেয়ে যাবে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, হজরত আবু হোরায়রা থেকে। হাদিসটির উদ্দেশ্য এই যে, পরের জামানার মানুষেরা আল্লাহ্‌তায়ালা ও আখেরাত আকাঙ্খী হওয়া সত্ত্বেও গোনাহ্ করবে অনেক বেশী। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে মাফ করে দেবেন। কিন্তু পূর্বের লোকদের এমন গোনাহ্ মাফ করা হবে না। প্রথম যুগের মানুষের গোনাহ্ পরের যুগের মানুষের জন্য মোবাহ্ হবে। এর উপমা এরকম — যোদ্ধাদের অগ্রগামী দল সর্বক্ষণ যুদ্ধরত। পশ্চাৎবর্তী দল সেরকম নয়। কিন্তু পুরস্কারের সময় পশ্চাৎবর্তী ও পূর্ববর্তী দল একসঙ্গে সামগ্রিক সেনাবাহিনী হিসেবে গণ্য হয়। বরং কখনো কখনো পশ্চাৎবর্তী দলকেই অধিক পুরস্কৃত করা হয়। ফজল তো আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাধীন — তিনি যাকে ইচ্ছা দান

করেন। যাকে চান তার কবীরা গোনাহ্ও ক্ষমা করে দেন। আবার যাকে চান তার সগীরা গোনার জন্যও শাস্তি নির্ধারণ করেন।

আয়াতে মিনাশ্ শোহাদা (সাক্ষীদের মধ্যে অর্থ, বিভিন্ন সাক্ষী)। এর দ্বারা বোঝা যায়, ফাসেকের সাক্ষ্য দেয়ার সুযোগ আছে। যদি হাকিম (বিচারক) সাক্ষ্য গ্রহণ করেন তবে জায়েয। কিন্তু গোনাহ্গার হলেও তার কাছ থেকে কাজ আদায় করা যাবেনা কেনো?

'দু'জন স্ত্রী লোক; স্ত্রী লোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে অপরজন স্মরণ করাইয়া দিবে।' — একথায় বোঝা যায়, মেয়েদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল। রসুল স. বলেছেন, বুদ্ধি ও ধর্মের ব্যপারে অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও একজন পুরুষের জ্ঞান তোমাদের চেয়ে বেশী। মেয়েরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের বুদ্ধি ও ধর্মের অপূর্ণতা কীরকম? রসুল স.বললেন, নারীর সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, এটাই বুদ্ধির অপূর্ণতার প্রমাণ। তিনি স. পুনরায় বললেন, ঋতুবতী হলে নামাজ ও রোজা তোমাদের জন্য নিষেধ — তাই নয় কি? তাঁরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, তোমাদের দ্বীনের অপূর্ণতা এটাই ।

'সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হইবে তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে।' — আলেমগণ বলেন, ডাকা মানে সাক্ষী হয়ে যাওয়া। কেউ কেউ বলেন, এই হুকুমটি ওয়াজিব। আবার কেউ কেউ বলেন, অন্যকোনো সাক্ষী না পাওয়া গেলে ওয়াজিব। অন্য সকলের জন্য ওয়াজিব নয়, ইচ্ছাধীন। হাসান বসরী বলেছেন, কোনো কোনো আলেম ডাকা শব্দের অর্থ করেছেন সাক্ষ্যদান করা। মুজাহিদ, ইকরামা ও সাঈদ বিন জুবাইর এর তাফসীর করেছেন, সাক্ষ্যদান করা ওয়াজিব। কেননা অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা সাক্ষ্য গোপন কোরনা।'

হজরত আবু মুসা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, কাউকে সাক্ষ্য দিতে বলা হলে সে যদি সাক্ষ্যকে গোপন করে, তবে তার অবস্থা হবে মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারীর মতো। তিবরানী।

এই সনদের এক রাবীর নাম আবদুল্লাহ্ বিন সালেহ্। তিনি ছিলেন লাইস বিন সাআদের কাতেব (লেখক)। ইমাম বোখারী তার নির্ভরযোগ্যতা মেনে নিয়েছেন।

<u>মাসআলা</u> ঃ যদি সাক্ষীকে হাকিমের এজলাসে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা হয় তখন সে ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো হাকিমের এজলাস কাছে হতে হবে। দূরে হলে যাওয়া ওয়াজিব নয়। কেননা আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।' নাসের বলেছেন, দিনে দিনে আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে ঘরে ফিরে আসা সম্ভব হলে ওয়াজিব।

<u>মাসআলা</u> ঃ বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে দাবীদার যদি সাক্ষীকে তার নিজ বাহনে করে নিয়ে যায় তবে ক্ষতি নেই। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। সোলায়মান বলেন,

কোনো ব্যক্তি তার সাক্ষীকে ভাড়া করা বাহনে করে নিয়ে গেলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আন নাওয়াজেল গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা রয়েছে এরকম, যে বৃদ্ধ সাক্ষী পায়ে হেঁটে পথ চলতে পারেনা, সওয়ারীর ভাড়াও দিতে পারেনা, তার ভাড়া দাবীদার দিয়ে দিলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। ইমাম ইবনে হুম্মাম বলেন, এই ফতওয়া সাক্ষীকে সম্মানিত করার জন্য হয়েছে। পায়ে হেঁটে পথ চলা অসম্মান।

মাসআলা ঃ নিজেদের জন্য আহার প্রস্তুত করার পর, সাক্ষীকে খাওয়ালে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সাক্ষীদের জন্য আলাদা আহারের আয়োজন করলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আজম এরকম বলেছেন। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, দুই অবস্থার কোনো অবস্থাতেই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, উভয় অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য। ইমাম ইবনে হুম্মাম বলেন, সবচেয়ে উত্তম যদি কোনো সম্মানিত ব্যক্তি কারো ঘরে গেলে গৃহকর্তা তাকে আহার করান। সে সাক্ষী হলেও। না হলেও। খাওয়ার শর্ত না থাকলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, শর্ত থাকলে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তা ঘুষ হবে, যা গ্রহণ করা হারাম। সাক্ষী অন্বেষণকারী ও সাক্ষ্যদাতার জন্য কোনোকিছু দেয়া ও গ্রহণ করা জায়েয নয়। অন্য কোনো সাক্ষী না থাকলে এবং বিনিময় নির্ধারিত থাকলে জায়েয। ইমাম শাফেয়ী বলেন, নির্ধারিত সাক্ষী ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষী না থাকলে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। সাক্ষী নির্ধারিত না থাকলেও বিনিময় জায়েয। কারণ এ অবস্থায় সাক্ষ্য দেয়া ফরজ নয়। আমরা বলি, অন্য সাক্ষী না থাকলে সাক্ষ্য দেয়া ফরজে আইন। অন্যথায় ফরজে কেফায়া। ফরজ স্বীকার না করলে সকল অবস্থায় মোস্তাহাব হবে। অর্থাৎ নফল ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। ইবাদতের বিনিময় নেয়া আমাদের মতে জায়েয নয়। রসুল স. এরশাদ করেছেন, ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই দোজখী। তিবরানী।

'ছোট হউক অথবা বড় হউক, মিয়াদসহ লিখিতে তোমরা কোনোরূপ বিরক্ত হইওনা।' — লিখিত বিষয়ে সন্দেহের সম্ভাবনা নাই। স্মৃতিদৌর্বল্যের কারণে ভুলত্রুটি হলেও লিখিত বিষয় ভুলসংশোধন করতে সহায়ক। এতে কোনো পক্ষই অসৎ উদ্দেশ্য লালনের সুযোগ পায়না। এজন্যই ছোটবড় সব লেনদেনই লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়েছে। সাক্ষীর নাম, কর্জের বিষয়বস্তু, প্রদান ও পরিশোধের সময়, সকল বিষয়ই লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। এতে ন্যায়প্রতিষ্ঠার কাজ সহজ হয়। এই সহজ শিক্ষাই আল্লাহপাক এখানে দিয়েছেন।

মাসআলা ঃ সাক্ষীকে স্মৃতি থেকে বলতে হবে। স্বাক্ষরকৃত লেখা দেখে সাক্ষ্য দেয়া জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেন। কিন্তু সাহেবাইন স্বাক্ষর দেখে সাক্ষ্য দেয়াকে জায়েয বলেছেন। কোনো কোনো ফকিহ্ স্বাক্ষর দেখে সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। লিখিত বিষয়বস্তু মনে না থাকলে লেখা দেখে সাক্ষ্য দিলে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই — সাহেবাইন এই যুক্তি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু

ইমামে আজম এ যুক্তি মানেননি। তিনি বলেছেন, সাক্ষ্যের ভিত্তি প্রত্যক্ষগোচরতার উপর। রসুল স. এরশাদ করেছেন, তোমরা যখন কোনো বিষয় সূর্যের মতো পরিষ্কার দেখবে, তখন সাক্ষ্য দিবে। সুতরাং লিখিত বিষয়বস্তু মুখস্থ করা যেতে পারে; কিন্তু সাক্ষ্য দিতে হবে লিখিত সাক্ষ্য না দেখে।

নগদ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে লেখালেখির প্রয়োজন নেই।

'তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর' — এই আয়াতাংশে সাক্ষী রাখার কথা বলা হচ্ছে। জুহাক এবং আবু দাউদ এ কথার প্রকাশ্য অর্থ নিয়েছেন। তাই তাদের মতে নগদ অথবা ধারে, সব রকমের বেচাকেনাতেই সাক্ষী নির্ধারণ করা ওয়াজিব। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, প্রথমে ওয়াজিবই ছিলো। কিন্তু 'আর যদি একে অপরকে বিশ্বাস করে'— এই আয়াতাংশ দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার ধারণা রহিত হয়ে গিয়েছে। জমহুরের নিকট হুকুমটি ইচ্ছাধীন। তবে সাক্ষী নির্ধারণ করা উত্তম।

ইমাম আহমদ, আম্মার বিন খাজিমা, তাঁর চাচা যিনি ছিলেন সাহাবা— তাঁর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এক বেদুইনের কাছ থেকে একটি ঘোড়া কিনলেন। ঘোড়ার মূল্য পরিশোধের জন্য রসুল স. ওই স্থান ত্যাগ করলে অন্য লোকেরা এসে ঘোড়ার দরদাম করতে লাগলো— রসুল স. যে ঘোড়াটি কিনেছেন, এ তথ্য তাদের জানা ছিলোনা। তারা মূল্য বেশী বলতে লাগলো। বেদুইনটি রসুল স. কে ডেকে এনে বললো, কিনলে কিনে নাও; না হলে আমি বিক্রি করে দেবো। রসুল স. বললেন, আমি কি কিনিনি? বেদুইন বললো, না। আল্লাহর কসম আমি বিক্রি করিনি। রসুল স. বললেন, নিশ্চয়ই আমি কিনেছি। বেদুইন বললো, সাক্ষী হাজির করো। উপস্থিত লোকেরা বলতে লাগলো, আরে বেদুইন, আল্লাহর রসুল মিথ্যা বলেন না। এমন সময় হজরত খাজিমা এলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার ও রসুল স. এর মধ্যে ক্রয়বিক্রয় হয়েছে। রসুল স. তাকে বললেন, তুমি কীভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ, তখনতো তুমি উপস্থিত ছিলেনা। খাজিমা বললেন, সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনার সততার উপর ভিত্তি করে। কারণ, আপনি কখনো মিথ্যা বলেন না। রসুল স. খাজিমার সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন।

না দেখে সাক্ষ্য দেয়া বৈধ নয়। কিন্তু রসুলে পাক স. এখানে না দেখা সাক্ষ্যকে গ্রহণ করেছেন। আমরা বলি যে, এখানে ব্যাপারটি অন্যরকম। বেদুইনের মিথ্যাবাদিতা সম্পর্কে রসুলে পাক স. জানতেন। তাই এরকম করেছেন। হজরত খাজিমার সাক্ষ্যের উপর তিনি স. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। লক্ষ্যণীয়, তাঁর সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্য হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছেন। এতে করে খাজিমার ইমান ও জ্ঞানের দৃঢ়তা প্রমাণিত হয়েছে। এই হাদিস থেকে এই মাসআলা স্পষ্ট হয়েছে যে, পূর্বে জানা থাকলে হাকিম তাঁর জ্ঞান মোতাবেক সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন। দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা ধারণা লাভ করা যায় বটে, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করা যায়না। পূর্বে জানা থাকলে দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণা দুই-ই লাভ করা যায়। এ কারণেই রসুল

স. এর ইন্তেকালের পর হজরত ফাতেমা রা. যে বাগানের দাবী করেছিলেন, হজরত আবুবকর রা. তা নাকচ করে দিয়েছিলেন। কারণ, হজরত আবু বকরের সরাসরি জানা ছিলো, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি নবী, আমার সম্পদে কারো উত্তরাধিকার নেই। এই হাদিস দ্বারা আরো একটি মাসআলা বের হয়েছে। বাদশাহ অথবা হাকিম তাদের আপন অধিকার বলবৎ করতে পারবে। সাক্ষী না থাকলেও। তবে, হ্যাঁ। ব্যাপারটি যদি অন্য কোনো হাকিমের এজলাসে যায়, তবে ওই হাকিম সাক্ষ্য তলব করতে পারবে।

'লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।' — এর অর্থ, তাউস, হাসান এবং কাতাদা এরকম করেছেন যে, যেখানে লেখক ও সাক্ষী নির্ধারিত থাকে সেখানে তাদেরকে অস্বীকার করে ক্রেতা বিক্রেতাকে কষ্ট দেয়া যাবেনা। এটা তাদের জন্য ক্ষতি। অন্য অর্থ এও হতে পারে যে, আচরণগত দিক থেকে তাদেরকে কষ্ট দেয়া যাবে না। লেখকের বিনিময় না দেয়া, সাক্ষীর ব্যস্ততার সময় তাকে তলব করা অথবা ঘটনাস্থলে অন্য কোনো সাক্ষী উপস্থিত থাকলেও রোগী অথবা দুর্বল ব্যক্তিকে সাক্ষ্যদানের জন্য পীড়াপিড়ি করা— তাদেরকে কষ্ট দেয়ার শামিল। এরকম করা পাপ। তাই সবশেষে আল্লাহ্ তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করেছেন। 'তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন' — এ কথা বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আল্লাহ্র শিক্ষার মধ্যেই দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সকলের শেষে বলেছেন, 'আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' এ কথায় প্রকাশিত হয়েছে আল্লাহ্ তায়ালার পরাক্রম ও মাহাত্ম ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮৩

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۖ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ
رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝ ع

❐ যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোনো লেখক না পাও তবে বন্ধক রাখা বৈধ। তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করিলে, যাহাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে। এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে। তোমারা সাক্ষ্য গোপন করিও না, যে কেহ উহা গোপন করে তাহার অন্তর অপরাধী। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত।

বন্ধককৃত বস্তু ফেরত পাওয়া যাবে তখনই, যখন তার পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হবে। যৎসামান্য মূল্য বাকি থাকলেও ফেরত পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। কোনো শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস কালে লেখক না পাওয়া গেলে, বন্ধক রাখা যাবে। পাওয়া গেলেও রাখা যাবে।

মুজাহিদ ও দাউদ বর্ণনা করেছেন, এই নিয়মটি শুধু সফরের সময়ে প্রযোজ্য। অন্য সময়ে নয়। অন্য সময়ে লেখক না থাকলে বন্ধক বৈধ। অন্যথায় নয়। এখানে সমস্ত সহীহ্ হাদিস গ্রন্থে উল্লেখিত হজরত আয়েশা রা.এর বর্ণনা এবং বোখারীতে উল্লেখিত হজরত আনাস রা.এর বর্ণনাকে আমরা দলিল হিসেবে পেশ করছি। রসুল স. তাঁর যেরা (বর্ম) বিশ সা যবের বিনিময়ে এক ইহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। তাঁর তিরোধান পর্যন্ত যেরাটি ইহুদীর কাছেই ছিলো।

বিনিময় ছাড়া বন্ধক রাখা যাবে না। ইমাম আজম, ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফেয়ী এই মত পোষণ করেন। ইমাম মালেক বলেছেন, বিনিময় দিতে স্বীকৃত হলেও বন্ধক রাখা যাবে। কিন্তু বন্ধকদাতার নিকট থেকে বন্ধক গ্রহণ করার অধিকার বাধ্যতামূলক। আমরা বলি, অধিকৃত বন্ধকের দ্বারাই বন্ধক্ জায়েয হওয়া প্রমাণিত হয়েছে।

ইমাম আজম বলেছেন, বন্ধকের জন্য অধিকার শর্ত। তাঁর মতে, বন্ধকের বস্তুর উপর বন্ধক দাতার একক মালিকানা থাকতে হবে। যে বস্তুর মালিক একাধিক সেই বস্তু বন্ধক দেয়া যায় না। সে বস্তুটি ভাগ করার উপযোগী হোক বা না হোক। সম্মিলিত মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি দাঁড়াবে এরকম — এক মালিক বন্ধক দিলো অন্য মালিক অথবা মালিকেরা দিলোনা। বন্ধকদাতা যদি বলে, একদিনের জন্য বন্ধক দিলাম। পরের দিন বন্ধক থাকবে না। কারণ, আমি ছাড়াও এ বস্তুর অন্য মালিক আছে যে বন্ধক দেয়নি। এভাবে তৃতীয় দিন থাকবে, চতুর্থ দিন থাকবে না — এ পদ্ধতিটি ভুল। কারণ (রেহেন) বন্ধক অর্থ আবদ্ধ করে রাখা (কর্জ আদায় পর্যন্ত)। বন্ধক গ্রহণকারীর সার্বক্ষণিক অধিকার থাকা চাই। যা কেবল একজনের মালিকানাধীন বস্তুর ক্ষেত্রেই সম্ভব। বন্ধক কিন্তু হেবার (দানছত্রের) মতো নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যে সমস্ত বস্তু ভাগ করা সম্ভব, সে সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত হেবা শুদ্ধ হয় না। ভাগ করে দেয়া হেবাকারীর দায়িত্ব। পক্ষান্তরে যে সমস্ত বস্তু ভাগ করা যায় না যেমন, রাজ্য, জায়গীর ইত্যাদি — এ সমস্ত ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলেও বৈধ।

মাসআলা ঃ সকল অবস্থায় বন্ধকের বস্তুর উপর বন্ধক দাতার মালিকানাই বলবৎ থাকে। বন্ধক দেয়ার পর বন্ধক গ্রহণকারীর কেবল সাময়িক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তার অধিকারে থাকা পর্যন্ত বন্ধক দাতা বন্ধককৃত বস্তু থেকে

কোনো প্রকার উপকার গ্রহণ করতে পারবে না। আরোহনের জন্তু, পোশাক পরিচ্ছদ, বাড়ি — যে কোনো জিনিসই বন্ধক দেয়া হোক না কেনো, বন্ধকাবস্থায় বন্ধক গ্রহীতা তার কোনোকিছুই ব্যবহার করতে পারবে না। বন্ধক দাতা অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা — এটা ইমাম আজমের অভিমত।

হজরত ইমাম শাফেয়ী বলেন, রেহেন দেয়া মালের দ্বারা উপকার গ্রহণ করা রেহেন দাতার জন্য জায়েয। কেননা রসুল স. বলেছেন, রেহেনের জন্তুর উপর আরোহন করা যায় এবং দুধ দোহন করা যায়। এই হাদিস দারাকুতনী এবং হাকেম, আমাস থেকে, তিনি আবু সালেহ্ ও আবু হোরায়রা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, হাদিসটি মুআল্লাল (দুর্বল সনদযুক্ত)। বলেছেন, আমার পিতা অবশ্যই এই হাদিসকে একবার মারফু হিসেবে বলেছেন। পরে বর্ণনা করেছেন মওকুফ হিসাবে (সূত্র পরম্পরা রসুল পাক স. পর্যন্ত পৌঁছলে মারফু এবং সাহাবী পর্যন্ত পৌছলে মওকুফ বলা হয়)। দারাকুতনী ও বায়হাকী মওকুফের পরিবর্তে মারফুকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

আমরা বলি, হাদিসটি সংক্ষিপ্ত। এখানে বন্ধক দেয়া জন্তুর উপরে আরোহন করা রেহেন দাতার জন্য হতে পারে, আবার রেহেনগ্রহীতার জন্যও হতে পারে। এখানে বরং রেহেনদাতার জন্য নাজায়েয হওয়াটাই প্রমাণিত হয়েছে।

মাসআলা ঃ রেহেনকৃত মালের উপর রেহেনদাতার অধিকার না থাকাই শরিয়তসম্মত। অধিকারের প্রমাণ পাওয়া গেলে, বুঝতে হবে — এক্ষেত্রে রেহেন গ্রহণকারীর আদেশ অথবা অনুমতি আছে। এরকম অধিকার বাতিল। কিন্তু বেচাকেনা এবং হেবার ক্ষেত্রে অধিকার বাতিল হয়না। যেমন, গোলাম আযাদ করা — এ ক্ষেত্রে বাতিলের সুযোগ নেই। মালিকানা রেহেন দাতার, তাই অধিকার রেহেনগ্রহীতার হওয়াই যুক্তিযুক্ত। রেহেন দাতা সম্পদশালী হলে আজাদ করা গোলামের সমমূল্যের মাল রেহেন গ্রহীতাকে দিবে। দরিদ্র হলে দিবে গোলামের শ্রমের সমমূল্য — বলেছেন ইমাম আজম ও ইমাম আহ্মদ। ইমাম মালেক বলেন, বেচাকেনার মতো রেহেনগ্রহণকারীর হুকুম অথবা রেহেন ছেড়ে দেয়ার উপর নির্ভরশীল থাকবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন, রেহেনদাতা সম্পদশালী হলে সকল অবস্থাতেই তার অধিকার বলবৎ থাকবে। তাকে রেহেনকৃত মালের পরিবর্তে অন্য মাল রেহেন গ্রহণকারীর নিকট জমা রাখতে হবে। দরিদ্র রেহেন দাতার কোনো অধিকার থাকবে না।

মাসআলা ঃ রেহেন দাতা যেহেতু রেহেনকৃত বস্তুর মালিক, তাই রেহেনকৃত বস্তুর সম্পূর্ণ খরচ তাকেই বহন করতে হবে। রেহেনকৃত বস্তু থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়— যেমন, বাচ্চা, দুধ, ফল ইত্যাদি রেহেন দাতাই পাবে। রসুল স.

এরশাদ করেছেন, যা কিছু লাভ হবে, তা রেহেন দাতার এবং যা কিছু ক্ষতি হবে, তাও তারই।

বিভিন্ন বর্ণনায় বলা হয়েছে, ইমাম আহমদের মতে, রেহেনকৃত বস্তু থেকে উৎপন্ন বস্তুর মালিকানা রেহেন গ্রহণকারীর। কিন্তু অনুসন্ধান করে ইবনে জাওজী লিখেছেন, রেহেনকৃত বস্তুজাত বস্তুর মালিক রেহেন দাতাই। এটাই আসলে ইমাম আহমদের মত। তিনি আরো লিখেছেন, রেহেনগ্রহীতা রেহেনকৃত বস্তুর জন্য যদি কিছু খরচ করে, তবে তা রেহেনকৃত বস্তুর দুধ, ফসল ইত্যাদি থেকে উসুল করতে পারবে।

মাসআলা ঃ রেহেনকৃত বস্তুর মতোই রেহেনকৃত বস্তুজাত সবকিছুর অধিকার রেহেন গ্রহণকারীর থাকবে। মালিকানা থাকবে রেহেন দাতার। এজন্য রেহেনগ্রহীতা রেহেনকৃত বস্তুর জন্য কোনো খরচও করতে পারবে না, তা থেকে কোনো উপকারও গ্রহণ করতে পারবে না। করলে সুদ হবে।

মাসআলা ঃ রেহেন গ্রহণকারী যদি রেহেন দাতার হুকুমে রেহেনকৃত মালের জন্য কিছু খরচ করে, তবে তা হবে তার পাওনা। হুকুম ব্যতীত খরচ করলে, সে এক প্রকার উপকার করলো। পাওনা দাবী করতে পারবে না। ইমাম আহমদ বলেছেন, হুকুম বেহুকুম সকল অবস্থাতেই রেহেন গ্রহীতা পাওনাদার হবে। সে রেহেনকৃত বস্তুজাত জিনিস হতে তার পাওনা নিয়ে নিতে পারবে। ইবনে জাওজী এ মতের সমর্থনে — 'আরোহন করতে পারবে, দুধ দোহন করতে পারবে' — ওই হাদিসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে শা'বীর মাধ্যমে বোখারী বর্ণিত হাদিসটিকে তিনি দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। হাদিসটি এই, রসুল স. এরশাদ করেছেন, রেহেনগ্রহণকারী রেহেনকৃত বস্তুর জন্য কিছু খরচ করলে, সে তার দুধ ও সওয়ারী থেকে উপকার গ্রহণ করতে পারবে — ওই পরিমাণ, যে পরিমাণ সে খরচ করেছে।

আবু দাউদের বর্ণনায় দুধ পান করার স্থলে দুধ দোহন করার কথা রয়েছে। তাহাবী বলেছেন, আরোহী হতে ও দুধ দোহন করে পান করতে পারবে। ইবনে জাওজী আরো বলেছেন, রেহেনকৃত বস্তুজাত জিনিসের জন্য খরচ করলে সে আরোহণ করার এবং দুগ্ধবতী পশুর দুধপান করার অধিকার রাখবে। খরচের দায়িত্বও তার।

আমরা বলি, এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, রেহেনকৃত বস্তুর খরচের দায়িত্ব রেহেনগ্রহীতার। কিন্তু ঐকমত্য এই যে, খরচের দায়িত্ব রেহেন দাতার। সুতরাং বুঝতে হবে, এই হুকুম সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে ছিলো।

এই হাদিসের উদ্দেশ্য এই যে, কর্জের বিনিময়ে রেহেন রাখলে রেহেনের মাল কর্জের জিম্মাদার হিসেবে থাকে। কর্জ রেহেনকৃত মালের সমমূল্যেরও হতে পারে।

কম কিংবা বেশীও হতে পারে। রেহেনকৃত মাল বিনষ্ট হয়ে গেলে কর্জ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ওই আমানতটুকু বাকী থাকবে, যতটুকু হবে কর্জমূল্য অপেক্ষা বেশী।

মাসআলা ঃ বন্ধক দাতার মৃত্যু হলে বন্ধককৃত মাল বিক্রয় করে বন্ধক গ্রহণকারীর ঋণ পরিশোধ করা হবে। বন্ধককৃত বস্তুর উপর বন্ধক গ্রহণকারীর অধিকার থাকে বলে তার মালিকানাই এখানে অগ্রগণ্য। বন্ধকের শর্ত এরকম যে, বন্ধক দাতা কর্জ পরিশোধ করতে না পারলে বন্ধক গ্রহণকারী বন্ধককৃত বস্তু থেকে তার কর্জ উসুল করে নিবে।

মাসআলা ঃ বন্ধক থাকাবস্থায় বন্ধক গ্রহণকারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধকের মাল নষ্ট হয়ে গেলে বন্ধক গ্রহণকারীকে জরিমানা দিতে হবে — বলেছেন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক। জরিমানা অর্থ পুরাপুরি পরিশোধ হয়ে যাওয়া। এরপর বন্ধক দাতার নিকট কর্জ দাবী করলে তা হবে সুদ। ইমাম মালেকের মতে, বন্ধককৃত বস্তুর প্রচলিত বাজার মূল্য দিতে হবে বন্ধক দাতাকে। ইমাম আজমের মতে, বন্ধক গ্রহণকারীর জরিমানার পরিমাণ হবে ততটুকু, বন্ধককৃত মালের যতটুকু মূল্য হবে কর্জের তুলনায় বেশী। বাকি অংশ আমানত হিসেবে থাকবে। তাহাবী এবং হজরত ওমর রা.এর সিদ্ধান্ত এরকম। কাজী শোরাইহ্ হাসান বসরী এবং শা'বা বলেছেন, বন্ধককৃত বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে তার মূল্য কম হোক বা বেশী হোক ব্যাপারটার এখানেই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। কারো উপরে কারো দাবী অবশিষ্ট থাকবে না।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, রেহেনের মাল আমানত। গ্রহণকারীর ভুলে নষ্ট হলে তাকে জরিমানা দিতে হবে। অন্যথায় দিতে হবে না। রসুল স. এরশাদ করেছেন, বন্ধক দাতা বন্ধকের মাল নিজের কাছে রাখতে পারে না। মাল বন্ধক গ্রহণকারীর কাছে থাকলেও মালিকানা বন্ধক দাতারই। মাল থেকে প্রাপ্ত উপকার ও ক্ষতি দু'টোই তার। ইবনে হাব্বান বলেছেন, হাদিসটি সহীহ্। দারাকুতনি এবং হাকেম জিয়াদ বিন সাআদ জুহুরী থেকে, তিনি সাঈদ বিন মুসাইয়েব থেকে, তিনি হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু হিসেবে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনি লিখেছেন, জিয়াদ বিন সাআদ হাফেজ ও সিকাহ্ ছিলেন (যে হাদিসের মধ্যে আদালত ও জব্‌ত পূর্ণ মাত্রায় থাকে তাকে সিকাহ্ বলে)। জিয়াদ আরো বলেছেন, হাদিসটি হাসান ও মোত্তাসিলুস্ সনদ (দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাবীর সনদকে হাসান বলে। আর পূর্ণ ধারাবাহিকতাসম্পন্ন হাদিসকে বলে মুত্তাসিল)। ইবনে মাজা ইসহাক বিন রাশেদ থেকে জুহুরীর মাধ্যমে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাকেম বর্ণনা করেছেন মারফু হিসেবে বিভিন্ন নিয়মে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আওজায়ী, ইউনুস এবং ইবনে আবী জি-ব জুহুরীর বর্ণনা থেকে, তিনি সাঈদ বিন মুসাইয়েব থেকে মুরসাল হিসেবে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

ইমাম শাফেয়ী, ইবনে আবী ফদিক ও ইবনে আবী শা'বা থেকে, তিনি ওয়াকিহ্ থেকে তিনি আবী জি-ব থেকে এবং আব্দুর রাজ্জাক, সওরীর বর্ণনা থেকে, তিনি আবী জি-ব থেকে বর্ণনা করেছেন।আবু দাউদ, বায্যার এবং দারা কুতনি বলেছেন, হাদিসটি মুরসাল। দারাকুতনি এবং বায়হাকী একে অন্য সনদ থেকেও উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ওই সমস্ত সনদ দুর্বল। ইবনে হাজাম এবং দারা কুতনি শাবাবা — ওয়ারাকা — ইবনে আবী জি-ব-জুহুরী — সাঈদ বিন মুসাইয়েব ও আবু সালমা বিন আবদুর রহমান থেকে, তিনি আবু হোরায়রা থেকে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, রেহেনকে বন্ধ করে রাখা যায় না। রেহেন, রেহেন দাতার। রেহেনের লাভও তার ক্ষতিও তার। হাদিসটিকে ইবনে হাজম হাসান, ইবনে আবদুল বার সহীহ্ এবং আবদুল হক মুত্তাসিল বলেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এই সনদের এক রাবীর নাম আব্দ বিন নসর। তার বর্ণিত হাদিসগুলো মুনকার (অত্যধিক দুর্বল রাবীর হাদিসকে মুনকার বলে)। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এই হাদিস দৃষ্টে বোঝা যায়, বন্ধক দাতাই বন্ধককৃত মালের আসল মালিক। বন্ধক গ্রহণকারীর শুধু আবদ্ধ করে রাখার অধিকার আছে। আমরা বলি, আসল অর্থ প্রকাশিত হয়েছে ইবনে জাওজী বর্ণিত হাদিসে। তিনি ইব্রাহিম নাখয়ীর মাধ্যমে লিখেছেন, মানুষ যার নিকট বন্ধক রাখে তাকে বলে, আমি অমুক যদি কর্জ আদায় করি তবে তো ভালোই। নয়তো মাল তোমার হয়ে যাবে। অতঃপর রসুল স. বলেছেন, নির্ধারিত সময়ে বন্ধকের মূল্য পরিশোধ করা না হলেও ওই মালের উপর গ্রহণকারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাহাবীও নিজ সূত্রে ইব্রাহিম নাখয়ীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। মালেক বিন আনাস এবং সুফিয়ান বিন সাঈদও এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। মাল ভালো থাকলেও বন্ধক দাতার, নষ্ট হয়ে গেলেও বন্ধক দাতার। বন্ধককৃত মাল থেকে প্রাপ্ত সুবিধা, যেমন বাচ্চা, দুধ — এগুলোও বন্ধক দাতার। বন্ধককৃত মালের খরচ যেমন, পশুদের খানাপিনা — ইত্যাদিও বন্ধক দাতার।

আমরা জরিমানা ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছি। দলিল ওই হাদিস যা তাহাবী ধারাবাহিকভাবে মোহাম্মদ বিন খুজাইমা থেকে, তিনি ওবায়দুল্লা বিন মোহাম্মদ তাইমি থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক থেকে, তিনি মাসআব বিন সাবেত থেকে, তিনি আতা বিন আবী রাবাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, একজন এক ঘোড়া বন্ধক নিলো এবং বন্ধক থাকাবস্থায় সেটা মরে গেলো। রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, তার হক চলে গেলো। এই হাদিসটি মুরসাল। এক্ষেত্রে মুরসাল আমাদের নিকট দলিল হিসেবে গণ্য। অর্থ এই যে, বন্ধককৃত মালের মূল্যের অতিরিক্ত অংশ কর্জ হিসেবে গণ্য হবে এবং আমানত হিসেবে থাকবে।

বন্ধক দাতা ও বন্ধক গ্রহীতা পরস্পর বিশ্বাসভাজন হলে লেখার প্রয়োজন পড়েনা। বলা হয়েছে, তারা যেনো আমানত পরস্পরকে প্রত্যর্পণ করে। হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, যার আমানতদারী নেই তার ইমান নেই এবং যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন নেই তার ধর্ম নেই। বায়হাকী।

প্রকৃত ইমানদার আল্লাহ্কে ভয় করে এবং আমানত খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকে। মুনাফিকরা এর বিপরীত। আমানত খেয়ানত করাই তাদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে সাক্ষীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এই বলে, যেনো তারা সাক্ষ্য গোপন না করে। সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। যার বিরুদ্ধেই যাক। যে সাক্ষ্য গোপন করে তার অন্তর অপরাধী। অন্তর হচ্ছে মানুষের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্রাট। রসুল স. এরশাদ করেছেন, মানুষের শরীরে এক টুকরো গোশত আছে। ওই গোশতখন্ডটি শুদ্ধ হলে সমস্ত শরীরই শুদ্ধ হয়ে যায়। নষ্ট হয়ে গেলে সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখো, ওই গোশতখন্ডটিই অন্তর (কল্‌ব)। বোখারী, মুসলিম।

এই আয়াতের শেষ কথা, 'ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালূনা আলীম' — অর্থ তোমরা যা কিছু করো তিনি সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। সাক্ষ্য দেয়া অথবা গোপন করা কোনো কিছুই তাঁর জানার বাইরে নয়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। সাক্ষীকে ডাকা না হলেও নিজ উদ্যোগে সাক্ষ্য দিতে যেতে হবে। যার জন্য সাক্ষ্য প্রয়োজন সে যদি না যায়, তবুও সাক্ষীর দায়িত্ব এই যে — এ সংবাদ তাকে জানাবে। কোনো কোনো আলেম বলেন, না ডাকলে সাক্ষ্য দিতে যাওয়া ভালো নয়। হজরত ইমরান বিন হোসাইন বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ। এরপর সাহাবীদের যুগ। তারপর তাবেয়ীদের যুগ। এরপর এমন যুগ আসবে যে যুগের মানুষেরা বিনা ডাকে সাক্ষ্য দিতে যাবে। তারা আমানতদার হবে না। মান্নত পুরা করবে না। সাধারণত তারা হবে ধোঁকাবাজ। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, প্রয়োজন না পড়লেও তারা কসম খাবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার সাহাবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো। এরা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তার পরের মর্যাদা ওই সমস্ত মানুষের, যারা তাদের ঘনিষ্ঠতম। এর পরের মর্যাদা তাদের নিকটতম জনদের। এরপর মিথ্যার বিস্তৃতি ঘটবে। এমনকি মানুষ অপ্রয়োজনে কসম খাবে এবং বিনা আহ্বানে সাক্ষ্য দেবে। নাসাঈ। এই হাদিসের সনদ সহীহ্। হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরকম বর্ণনা রয়েছে। হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনা এরকম, তাদের সাক্ষ্য কসমের আগে এবং কসম সাক্ষ্যের আগে হবে।

আমরা বলি, মন্দ সাক্ষী অর্থ মিথ্যা সাক্ষী। শেষ দিকের অবস্থা হবে এরকম — আমানতের খেয়ানত, মিথ্যা কসম, মান্নত অমান্য এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ।

অন্যদিকে তাহাবী, মালেকের মাধ্যমে হজরত জায়েদ বিন খালেদ জেহেনীর বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন এভাবে, রসুল স. বলেছেন, শোনো, উত্তম সাক্ষী কে। উত্তম সাক্ষী ওই ব্যক্তি যে প্রয়োজনের আগেই সাক্ষ্য দেয় অথবা সাক্ষ্য তলব করার আগেই নিজের সাক্ষী হওয়ার সংবাদ জানিয়ে দেয়।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮৪

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

❐ আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহেরই। তোমাদের মনে যাহা আছে তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ আল্লাহ্ উহার হিসাব তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে খুশী শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

কোনো কোনো আলেম বলেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকল বস্তুর অবয়ব আছে। কোনো সৃষ্ট বস্তুই অবয়বহীন নয়। নিরাবয়ব কোনো কিছুর মালিকানা দাবী করা দুষ্কর। তাই এই আয়াতের শুরুতেই আকাশ ও পৃথিবীর সকল শরীরবিশিষ্ট সৃষ্টির মালিকানা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই দলিল ভুল। সকল সৃষ্টি শরীরবিশিষ্ট নয়। শরীরহীন সৃষ্টিও রয়েছে অনেক। যেমন, রূহ সমূহ, ফেরেশতা ইত্যাদি। তারা কি জানেন না, রূহ, সের, খফি, আখফা — এ সমস্ত কিছুই আকারবিহীন। আল্লাহ্তায়ালাই জানেন তার সাকার ও নিরাকার সৃষ্টির সংখ্যা কতো। এই আয়াতে কেবল আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে দৃশ্যমান সৃষ্টবস্তু সমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সকলের দৃষ্টি এসবের প্রতি নিবদ্ধ। তাই সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য এই উল্লেখকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। আরশ কুরসীর কথাও এখানে বলা হয়নি। কারণ, এগুলো আকাশ ও পৃথিবীর সীমাভূত নয়। এগুলোর অস্তিত্ব সর্বসাধারণের দৃষ্টিবহির্ভূত। আল্লাহ্তায়ালা অন্তর বাহির সবই জানেন। মানুষের বাইরের দোষ তবু দেখা যায়। অন্তরের দোষ দেখা যায়না। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা সবকিছুই দেখেন। অন্যায় চিন্তা, পৃথিবীপ্রীতি, রোষ, অহংবোধ, কামনাবাসনা, লোভ, নৈরাশ্য, ধৈর্যচ্যুতি, পরশ্রীকাতরতা — এ সমস্ত হচ্ছে অন্তরের ব্যাধি।

হজরত জুবাইর বিন মুতঈম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, ওই ব্যক্তি আমার উম্মত নয়, যে অন্তরে মূর্খতার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে অথবা আক্ষেপ করে। আবু দাউদ।

হজরত হারেসা বিন ওহাব বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জানাবোনা বেহেশতী কে? বেহেশতী ওই ব্যক্তি যে তোমাদের দৃষ্টিতে দুর্বল। সে আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করে কসম করলে, আল্লাহ্‌তায়ালা কসম পূর্ণ করে দেন। তিনি স. আরো বলেছেন, আমি কি তোমাদের বলবোনা, দোজখবাসী কে? দোজখবাসী ওই ব্যক্তি যে দাম্ভিক। বোখারী , মুসলিম।

হাসান বসরী মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, পৃথিবীপ্রেম সমস্ত পাপের অগ্রণী। বায়হাকী।

হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আবুবকর ও ওমরের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করাই ইমান। এবং তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করা মুনাফিকী। ইবনে আদী।

হজরত জাবের মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবুবকর ও হজরত ওমরকে ভালোবাসা ইমানের অঙ্গ। তাদেরকে হিংসা করা কুফরী। আনসারদেরকে মহব্বত করা ইমান এবং তাদের সাথে হিংসা রাখা কুফরী। আরবদের সাথে মহব্বত রাখা ইমানের নিদর্শন এবং তাদের সাথে শত্রুতা করা কুফরী। যে আমার সাহাবাকে গালি দিবে, তার উপর আল্লাহ্‌র লানত। আর যে আমার ভালোবাসার কারণে তাদেরকে ভালোবাসবে, কিয়ামতের দিন আমি তার সাথে উত্তম আচরণ করবো। ইবনে আসাকের।

হজরত রসুল স. এরশাদ করেছেন, আলীকে ভালোবাসা ইবাদত। হজরত আলী বলেছেন, যিনি বীজ থেকে সবুজ ঘাস সৃষ্টি করেন এবং জীবনবিশিষ্ট অস্তিত্বের সৃজন নিশ্চিত করেন, ওই জাতের কসম দিয়ে বলছি, আমাকে রসুল স. জানিয়েছেন, ইমানদার ছাড়া অন্য কেউ তোমাকে ভালোবাসতে পারেনা এবং মুনাফিক ছাড়া অন্য কেউ তোমার শত্রু হতে পারে না। মুসলিম।

হজরত আলী আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তোমার দৃষ্টান্ত হজরত ঈসা নবীর মতো। ইহুদীরা শত্রুতাবশতঃ তাঁর জননীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে। অপর দিকে খৃষ্টানেরা অতি ভালোবাসার কারণে তাঁকে এমন মর্যাদায় পৌঁছিয়েছে, যা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। (অর্থাৎ তারা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলেছে)। এই হাদিস বর্ণনা করার পর হজরত আলী বলেছেন, আমার কারণে দু'ধরনের মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। একদল ধ্বংস হবে সীমাতিরিক্ত ভালবাসার কারণে, আরেক দল ধ্বংস হবে হিংসাজাত শত্রুতার কারণে। আহমদ।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, অহংকার আমার উত্তরীয় এবং মহত্ত্ব আমার পরিধেয় — যে ব্যক্তি এগুলো ছিনিয়ে নিতে চাইবে, আমি তাকে অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করাবো। মুসলিম।

হজরত আতিয়া, সায়দীর মারফু বিবরণে বলেছেন, রাগ শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে। আবু দাউদ।

বাহাস বিন হাকিম তার দাদার মাধ্যমে হাকেমের মারফু বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, রাগ ইমানকে এইভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়, যেমন মুসাব্বার নষ্ট করে মধুকে। বায়হাকী।

আমর বিন শোয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদার মারফু বিবরণ দিয়েছেন এভাবে, এই উম্মতের প্রথম প্রাপ্তি বিশ্বাস এবং দুনিয়াবিমুখতা এবং প্রথম ক্ষতি কার্পণ্য ও কামনা। বায়হাকী।

হজরত সা'দ বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা সৌভাগ্য এবং অসন্তুষ্ট থাকা হতভাগ্যতা। আহমদ, তিরমিজি।

হজরত মুআজ বিন জাবালের মারফু বর্ণনায় আছে, শাবান মাসের পনের তারিখের রাতে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং শিরিক ও পরশ্রীকাতরতা ব্যতীত অন্য সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন। দারা কুতনি।

ভালো ও মন্দের নির্দেশ করে উপরোক্ত হাদিসগুলো বর্ণিত হলো। এই আয়াতের তাফসীর শা'বী ও ইকরামা এভাবে করেছেন, অন্যের দোষ প্রকাশ করার ইচ্ছা তোমাদের অন্তরে উদয় হলে তা স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ কোর না। আল্লাহ্তায়ালাই হিসাব গ্রহণকারী। মুকাতিল তাফসীর করেছেন এভাবে — কাফেরের সঙ্গে বন্ধুত্বের বাসনা অন্তরে জাগ্রত হলে, একে প্রকাশ করো অথবা গোপন করো — আল্লাহ্ তার হিসাব গ্রহণ করবেন। এই আয়াতে এই ইঙ্গিতই রয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, 'মা ফী আনফুসিকুম' এর উদ্দেশ্য, পাপ কাজের নিশ্চিত সংকল্প। আবদুল্লাহ্ বিন মোবারক সুফিয়ান সওরীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অন্তরের ইচ্ছার হিসাবও কি আল্লাহ্তায়ালা গ্রহণ করবেন? তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। যদি ইচ্ছা দৃঢ়সংকল্পের রূপ পরিগ্রহ করে।

আমরা বলি, দৃঢ় সংকল্প, সংকল্পই। এই পাপ অন্তরের পাপ রূপে গণ্য। যদিও ভিতর ও বাহিরের সব পাপের হিসাব গ্রহণ করা উচিত, তবুও সহীহ্ হাদিসে এসেছে রসুল স. এরশাদ করেছেন, পাপধারণা অন্তরে লালন করলেও তা কার্যে রূপ না দেয়া পর্যন্ত লেখা হবে না। লেখা হবে ততটুকুই যতটুকু সে আমল করে।

কিয়ামতের হিসাব সত্য। আল্লাহ্তায়ালা যাকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করবেন, তার হিসাব গ্রহণ করবেন সহজভাবে। আর যাকে শাস্তি দিবেন, তার হিসাব করে

দেবেন কঠিন। কারণ, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর শাস্তি ও ক্ষমার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করবে, এমন সাধ্য কার? ছোট পাপের কারণে শাস্তি এবং বড় পাপের কারণে ক্ষমা নির্ধারণ করতে তিনি পূর্ণ স্বাধীন।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য এই যে, জ্ঞানের দাবী অনুযায়ী বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ছোট ও বড় সকল গোনাহ্র জন্য শাস্তি নির্ধারিত হওয়াই সমীচীন। কিন্তু এরকম করতে আল্লাহ্তায়ালা বাধ্য নন।

মোতাজিলা ও রাফেজী সম্প্রদায় পরকালের হিসাব বিশ্বাস করে না। মোতাজিলারা বলে, পাপের শাস্তি দেয়া বাধ্যতামূলক।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি আরজ করলাম, আল্লাহ্তায়ালা কি বলেননি, 'তবে তার নিকট থেকে সহজ হিসাব নেয়া হবে।' রসুল স. এরশাদ করলেন, তখনতো শুধু উপস্থিতিই হবে। কিন্তু যার হিসাব বারবার হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বিশ্বাসী বান্দাকে অতি নিকটে রাখবেন। আপন হাতে ঢেকে রাখবেন তাকে। বলবেন, তোমার ওই গোনাহ্র কথা কি মনে আছে, ওই পাপের কথা কি স্মরণ আছে? বান্দা আরজ করবে, হে আমার আল্লাহ্! আমার মনে আছে। পাপের স্বীকৃতি দানের পর সে ভাববে আমি তো ধ্বংস হয়ে গেলাম। আল্লাহ্ বলবেন, পৃথিবীতে আমি তোমার পাপ গোপন রেখেছিলাম (তোমাকে লজ্জিত করি নাই) আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। এরপর তার হাতে দেয়া হবে উত্তম আমলনামা। আর কাফের এবং মুনাফিকের হিসাব নিকাশের পর বলা হবে, 'এরা ওই লোক যারা তাদের প্রতিপালকের উপর মিথ্যারোপ করেছিলো। জেনে নাও, এমন জালেমের উপর আল্লাহ্র লানত।' বোখারী, মুসলিম।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, এক বক্তি রসুল স. এর নিকট নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার কতিপয় গোলাম আছে। তারা আমার সাথে মিথ্যা বলে, আমার সম্পদ নষ্ট করে এবং অবাধ্যতা করে। আমি তাদেরকে গাল দেই এবং প্রহার করি। এরকম আচরণ সঙ্গত কি? রসুল স. বললেন, কিয়ামতের দিনে তাদের মিথ্যা, খেয়ানত, নাফরমানী এবং তোমার শাস্তির হিসাব নেয়া হবে। তোমার শাস্তি তাদের ভুলের সমান হলে, ব্যাপারটা মিটে যাবে তখনই। এতে করে তোমার উপকারও হবেনা, ক্ষতিও হবে না। শাস্তি ভুলের চেয়ে কম হলে তোমার উপকার হবে (যে গোনার শাস্তি তুমি দাওনি তার সওয়াব পাবে) আর যদি শাস্তি ভুলের চেয়ে বেশী হয়, তবে বেশীর বিনিময় তোমার কাছ থেকে নিয়ে তাদেরকে দেয়া হবে। তিরমিজি।

কোনো কোনো মানুষ বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার প্রতিপালক আমাকে কথা দিয়েছেন, তিনি আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষকে হিসাব কিতাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাদের প্রত্যেকের সাথে আরো সত্তর হাজার করে মানুষ থাকবে। তারাও জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পাবে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করার পর একজন আহ্বানকারী দাঁড়িয়ে বলবে, ওই লোকেরা কোথায়? যাদের বাহু পোষাক সংলগ্ন নয়। — এই আহ্বান শুনে অল্পসংখ্যক লোক দাঁড়িয়ে যাবে। তাদেরকে হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। অবশিষ্ট মানুষকে হিসাবের জন্য প্রস্তুত করা হবে। বায়হাকী।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের সত্তুর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ওই সমস্ত লোক যারা ঝাড়ফুক করেনি, নজর নেয়াজ নেয়নি, আল্লাহ্ই ছিলেন তাদের নির্ভরতা। বোখারী, মুসলিম।

আমার বক্তব্য এই যে, কোরআন ও হাদিসের বর্ণনায় বোঝা যায়, বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারীরা হবে তাসাউফপন্থী। কারণ তারা আল্লাহ্প্রেমিক। এই আয়াতের নির্দেশনা প্রকাশ্য, গোপন দুই দিকের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। দু'টি দিকই হিসাবের আওতাভূত। বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলের হিসাব নেয়া হবে। সরাসরি নফসের হিসাব নেয়া হবে না। তবুও নফসের প্রতিক্রিয়া হবে ভয়াবহ ও কঠিন। কারণ মূল দোষ তারই। শরীরের বিভিন্ন অংশের গোনাহ তার সিদ্ধান্তেই সাধিত হয়েছে। নফসের পরিশুদ্ধি এবং কলবের পবিত্রতা অর্জিত হওয়ার পর গোনাহ্র আমল হয় খুব কম — এজন্যই বাতেনী গোনাহ্র হিসাবের কথা বলা হয়েছে। কলবের পবিত্রতার উপর শারীরিক পবিত্রতা নির্ভরশীল — এ সম্পর্কীয় হাদিসটি ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

নফস ও কলবের পরিচ্ছন্নতা ও প্রশান্তি অর্জিত হওয়ার পরও কোনো কোনো সময়ে হঠাৎ গোনাহ্ হয়ে যাওয়া সম্ভব। এরকম হলে তাৎক্ষণিক অনুতাপ, লজ্জা ও তওবার মাধ্যমে গোনাহ্র সংশোধন হয়। এমনকি গোনাহ্গুলোকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেয়া হয়। আল্লাহ্ গফূরুর রহীম।

হজরত ইবনে মাসউদ মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন, গোনাহ্ থেকে তওবাকারী গোনাহ্হীনের মতো। ইবনে মাজা, বায়হাকী।

শরহে সুন্নায় হজরত ইবনে মাসউদের মওকুফ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, গোনাহ্র জন্য অনুতপ্ত হওয়াই তওবা।

সুফী বলে ওই সমস্ত মানুষকে, যাদেরকে হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে ফোকারা ও মোমেনীন নামে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমিই প্রথম জান্নাতের দরোজার শিকল নাড়াবো। জান্নাতের দরোজা প্রথম খুলে দেয়া হবে আমার জন্যই। আমি প্রবেশ করবো — ঐ সময় আমার সঙ্গে থাকবে ফকির ও মোমেনীন। আমার এই কথা গৌরববিমুক্ত।

যার কিছুই নেই তাকে বলে ফকির। সুফীদের কিছুই থাকে না। তাঁরা তাঁদের অস্তিত্বকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুকূলে উৎসর্গ করে দেন। উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ্‌প্রাপ্তি। প্রবৃত্তির পীড়া এবং গোপন পাপ তাঁদেরকে ছেড়ে চলে যায়। তাঁরাই পূর্ণ মানুষ। কামালত বা পূর্ণতাকে তাঁরা ভাবেন আল্লাহ্‌র আমানত এবং অনুগ্রহমন্ডিত বৈভব। তাঁরা তাঁদের প্রত্যেক পুণ্য কাজের সম্পর্ক দেখেন আল্লাহ্‌র দিক থেকে। এজন্য পুণ্য লাভ করার পর তাঁরা আত্মগৌরবের শিকার হননা। উল্লেখিত হাদিসে রসুল স. সত্তর হাজার উম্মতের বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করার কথা বলার পর, আরো বলেছেন, ওই লোকদের প্রত্যেকের সঙ্গে আরো সত্তর হাজার লোক থাকবে। অর্থাৎ তাঁরা কামেল এবং অন্যদের কামেল হওয়ার পথ প্রদর্শক। তাঁরা আম্বিয়া, আউলিয়া, মোর্শেদ। তাঁদের প্রত্যেকের সাথে যে সত্তুর হাজার মানুষেরা থাকবে তাঁরা ওলামায়ে রাসেখীন, আউলিয়া, সিদ্দিকীন এবং সালেহীন। প্রথম দল পথ-প্রদর্শক এবং মোর্শেদ। প্রথম দল কামেলদের। এবং দ্বিতীয় দল যাঁদেরকে কামেল বানানো হয়েছে তাঁদের। এরপর তিনদল লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে। একদল হবে আল্লাহর রাস্তায় জীবন দানকারী শহীদদের। দ্বিতীয় দল হবে তাঁরা যাঁরা আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য সমস্ত জীবন সত্যানুসরণের কাজে ব্যয় করছে। তাঁরা এমন মুরিদের দল — যাঁরা সম্পর্ক স্থাপন করেছেন কামেলীন ও মোকাম্মেলীনদের সঙ্গে। তৃতীয় দল তাঁরা, যাঁরা আল্লাহর সন্তোষার্থে তাঁদের সম্পদ ব্যয় করেছেন।এই দল প্রথম ও দ্বিতীয় দলের অনুসারী।

আল্লাহ্‌নির্ভরতা সুফীদের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। তাঁদের গভীর রাতের জিকির ও ইবাদত বাহ্যিক নিদর্শনস্বরূপ।

বোখারী, মুসলিম এবং ইমাম আহমদ হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনা থেকে এবং মুসলিম ও অন্যান্যরা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেছেন যে, 'তোমাদের মনে যাহা আছে তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ আল্লাহ উহার হিসাব তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন।' — এই আয়াত নাজিল হলে সাহাবীগণ খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। ব্যাপারটি তাঁদের কাছে কঠিন মনে হতে লাগলো। তাঁরা নতজানু হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনার নির্দেশিত নামাজ, রোজা, জেহাদ এবং দান খয়রাত পালন করার শক্তি আমাদের আছে। কিন্তু সদ্য অবতীর্ণ এই আয়াত সহ্য করার শক্তি আমাদের নাই। রসুল স.

বললেন, তোমরা যে পূর্বের উম্মতের মতো কথা বলতে শুরু করেছো। তারা বলেছিলো, 'আমরা শুনলাম। কিন্তু আমল করতে পারবোনা।' এমন কথা বোল না। বরং এ রকম বলো, 'তারা সকলে বললো—আমরা শুনলাম এবং সানন্দে আনুগত্য স্বীকার করলাম্, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' এরপর সাহাবীগণ এই আয়াত বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিচের আয়াতটি।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮৫

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

❐ রসুল, তাহার প্রতি তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং বিশ্বাসীগণও। তাহাদের সকলে আল্লাহে, তাঁহার ফেরেশতাগণে, তাঁহার কিতাবসমূহে এবং তাঁহার রসুলগণে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। তাহারা বলে, 'আমরা তাহার রসুলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না' আর তাহারা বলে, 'আমরা শুনিয়াছি এবং পালন করিয়াছি! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।'

আমি বলি, পূর্ববর্তী আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর যখন সাহাবীগণ বুঝলেন, আল্লাহ নফসের ভুলেরও (ওয়াসওয়াসা) হিসাব গ্রহণ করবেন, তখন তাঁরা নফসের কুমন্ত্রণার সঙ্গে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত দেখতে পেয়ে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলেন। রসুল স. তখন তাঁদেরকে তসলীম, রেজা এবং তাওয়াক্কুলের উপায় বলে দিলেন। নফসে মোতমাইন্নার বৈশিষ্ট্য এরকমই। আল্লাহতায়ালা তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিলেন এই বলে যে, তোমাদের ইমান সত্য। নিয়তও বিশুদ্ধ। তোমাদের নফস পবিত্র এবং অন্তরও পরিচ্ছন্ন। অপবিত্র নফস পবিত্র করা ইমানের দাবী। এই আয়াতে সাহাবীগণ যে মুমিন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন আল্লাহ্ পাক। এখানে ইমান অর্থ পূর্ণ (কামেল) ইমান। নফসের দোষত্রুটি ফানা হয়ে যাওয়াই পূর্ণ ইমানের চাহিদা। এই আয়াতে বিশ্বাসীগণ বলতে সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। তখন মুমিন ছিলেন তাঁরাই। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে নবী, আল্লাহ্ই আপনার ও

বিশ্বাসীদের জন্য যথেষ্ট।' এখানেও বিশ্বাসীগণের অর্থ সাহাবায়ে কেরাম। অবশিষ্টরা হচ্ছেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভূত। তাঁদের ইমান সাহাবীদের ইমানের মতো। তাদের আমলও সাহাবীদের আমলের মতো।

রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, বনি ইসরাইলরা ছিলো বাহাত্তর দলে বিভক্ত। আর আমার উম্মতেরা বিভক্ত হবে তিয়াত্তর দলে। একদল ছাড়া অন্য সব দলগুলো হবে জাহান্নামী। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! নাজাতপ্রাপ্ত দল কোনটি! তিনি স. বললেন, যে দল হবে আমার এবং আমার সাহাবীদের অনুসারী।

আয়াতের প্রথমে রসুলের বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। পরে বলা হয়েছে 'এবং বিশ্বাসীগণ'। বোঝা যায় রসুলের ইমান প্রত্যক্ষ। সাহাবা ও অন্যদের ইমান তাঁর মাধ্যমে পরোক্ষ। রসুলের ইমান চাক্ষুস দর্শনভিত্তিক। আর অন্যদের ইমান দলিল — প্রমাণ নির্ভর।

বিশ্বাস্য বিষয় সমূহ হচ্ছে, আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসুলগণ। নবী ও রসুলগণের ব্যাপারে ইমানের বিশেষ ঘোষণা এই যে, 'আমরা তাঁর রসুলগণের মধ্যে তারতম্য করি না।' অর্থাৎ আমরা তাঁদের কারো প্রতি ইমান রাখি কারো প্রতি রাখিনা — এরকম নয়। সকলের প্রতিই আমাদের বিশ্বাস আছে। ইহুদীরা বলতো, আমরা কারো প্রতি ইমান রাখি কারো প্রতি রাখি না। এ রকম কথায় ইমান থাকে না।

আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি — এ রকম কথা পূর্ণ ইমানের নির্দশন। বাগবী হজরত জাবেরের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত জিব্‌রাইল রসুল স. কে বললেন, আল্লাহ আপনার ও আপনার উম্মতের প্রশংসা করেছেন। আপনি আল্লাহর নিকট কিছু যাঞ্চা করুন। আপনার প্রার্থনা গৃহীত হবে। রসুল স. নিবেদন জানালেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই। আর প্রত্যাবর্তন তো তোমার দিকেই। 'প্রত্যাবর্তন' শব্দটিতে হাশরের স্বীকৃতি রয়েছে। সুতরাং আখেরাতের বিশ্বাসও ইমানের অন্তর্ভূত।

সামি'না (আমরা শুনেছি) সাহাবা কেরামের এই কথাটি ছিলো এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে। পরে আল্লাহতায়ালা তাঁর কালামে এই শব্দের উদ্ধৃতি দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করেছেন — এই ব্যাখ্যাই সঠিক।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۟ع

❒ আল্লাহ্ কাহারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যাহা তাহার সাধ্যাতীত। সে ভাল যাহা উপার্জন করে তাহা তাহারই এবং সে মন্দ যাহা উপার্জন করে তাহাও তাহারই। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদিগকে অপরাধী করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করিও না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে জয়যুক্ত কর।

আল্লাহ্ কাউকে আদেশ পালনে বাধ্য করেন না। তাঁর হুকুম প্রতিপালন অবশ্যই মানুষের সাধ্যভূত।

জ্ঞাতব্য ঃ আশায়েরাদের মত এই যে, কোরআন মজীদে করা অসম্ভব এমন কোনো আমলের হুকুম দেয়া হয়নি। বোবাকে কথা বলতে বলা, পঙ্গুকে হাঁটতে বলা, উম্মাদকে চৈতন্যোদয়ের নির্দেশ দেয়া — এ রকম অসম্ভব হুকুম কোরআনে নেই। যেমন, যারা সম্পদশালী নয় তাদেরকে জাকাত দিতে বলা হয়নি। আল্লাহ্র আহকাম প্রয়োজন নির্ভর নয়। তাঁর হুকুম পালন করা না করার প্রয়োজন থেকে পবিত্র (বায়যাবী)। এজন্য মানুষকে অসম্ভব কাজের হুকুম যদি দেয়াও হয়, তবু তাকে জ্ঞানবিরুদ্ধ বলা যাবে না। সাধ্য থাকলে করবে, অন্যথায় করবে না। সকল অবস্থায় হুকুম, হুকুমই থাকবে।

মানুষ তার প্রকৃতিগত স্বভাবের উপরই দাঁড়িয়ে থাকে। আমলের নির্দেশ আসে পরে। প্রকৃতিগত স্বভাব অবস্থান নেয় হুকুমের পক্ষে আবার কখনো বিপক্ষে। হজরত নূহ আ. এর সম্প্রদায়, ফেরাউন, আবু জেহেল এবং আবু লাহাব দাঁড়িয়ে ছিলো আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে। তাদেরকে উল্লেখ করে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাদের অন্তরে ঔদাসীন্যের মোহর এবং চোখে মূর্খতার যবনিকা স্থাপন করেছেন। বলেছেন, তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। কোরআন ওই ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করবে যে প্রকৃত পথান্বেষী। হেদায়েত লাভ করতে যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছু মানুষকে দেয়া হয়েছে। যেমন, দৃষ্টির জন্য চোখ, শ্রুতির জন্য কান, বুঝবার জন্য মস্তিষ্ক। নবী রসুলগণের মাধ্যমে হেদায়েতের আহবান জানানো হয়েছে। তাঁরা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মানুষকে স্থাপন করেছেন তাঁদের আহবানের পরিসরে। এখন, যে চায় সে সোজা পথে চলতে পারে আর যে চায় না, সে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমাদের কোনো ইচ্ছা নেই।' আল্লাহর ইচ্ছা মানুষের আয়ত্তের অতীত। মানুষের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা সহজ নয়। একে তওফিকে এলাহি বলে।

জ্ঞাতব্য ঃ তাফসীরকার লিখেছেন, শক্তি ও ফিতরত আসলে দু'টি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য। এ সবের ভিত্তিতে মানুষ কাজ করে। বান্দার কাজের ক্ষমতা তার স্বভাবজ ব্যাপার। কিন্তু জমহুরের মতে, ক্ষমতা কার্য সম্পাদনের জন্য শর্ত নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বান্দা কোনো কাজের ইচ্ছা করলে তার যোগ্যতার ভিত্তিতে আল্লাহ্তায়ালাই ক্ষমতা দান করেন। ফলে সে ভালো অথবা মন্দ কাজ করে থাকে। এই ক্ষমতাদান অবিলম্বে হওয়াই সমীচীন। না হলে তা হবে জড় পদার্থতুল্য। ক্ষমতাদানের অর্থ দু'রকম। প্রথমত কেবল যোগ্যতা ও সম্ভাবনা — যা দেয়া হয় প্রথমেই। এই ক্ষমতা অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয় প্রকার ক্ষমতাদানকে বলে তওফীক। এই দ্বিতীয়টি প্রথমটির সঙ্গে সংযোজিত হলেই কার্য সুস্পষ্ট হয়।

মোতাজিলারা বলে, যোগ্যতা প্রদর্শনের ক্ষমতা মানুষের মধ্যে থাকে প্রথম থেকেই। কাজের সময় ক্ষমতা সংযোজন হয় না। এ রকম হলে, ক্ষমতা ও কাজ একত্রিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। কেননা শক্তি লাভ হয় যোগ্যতা অনুসারে। আর কাজ প্রকাশ্য ব্যাপার। এই ধারণার ভিত্তিতে মোতাজিলাদের বিশ্বাস জন্মেছে, বান্দারা নিজেরাই তাদের কাজের স্রষ্টা। তাদের ধারণা ভ্রান্ত ও ঐকমত্যবিরোধী।

বিষয়টি জটিল। সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম। এই স্থানে চিন্তাভাবনাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয়া সমীচীন নয়। আল্লাহ্তায়ালার কথা বিশ্বাস করার নামই ইমান। বুঝতে পারার জ্ঞান হচ্ছে অতিরিক্ত সংযোজন। বিশ্বাস রাখতে হবে—বুঝতে পারলেও না পারলেও। সুতরাং নীরবতাই শ্রেয়।

বোখারী ও মুসলিম, হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াত যখন সাহাবীদের কাছে অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হচ্ছিলো, তখন রসুল পাক স. তাঁদেরকে বলতে বলেছিলেন, 'আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি।' এরপর আল্লাহ্তায়ালা, 'কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না' এই আয়াত অবতীর্ণ করে পূর্ববর্তী আয়াতটি রহিত করে দেন।

আমি বলি, হজরত আবু হোরায়রা রহিত বলেছেন রূপক হিসাবে। কেননা রহিতকরণ প্রকৃত পক্ষে হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। রহিতকরণের অর্থ নতুন হুকুমের প্রবর্তনার মাধ্যমে পূর্বের হুকুমকে অকার্যকর ঘোষণা করা। বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত ঘোষণায় সে রকম সুযোগ নেই। আলোচ্য দু'টি আয়াতই বিজ্ঞপ্তি বিষয়ক। প্রথম আয়াতে অন্তরের গোনাহ্র জিজ্ঞাসাবাদের সংবাদ দেয়া হয়েছে। এবং পরের আয়াতে দেয়া হয়েছে, সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ না করার সংবাদ। তাই এখানে রহিতকরণ প্রসঙ্গ আসে না।

বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত হলেও অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এই আয়াতকে হুকুম সংক্রান্ত বলার অবকাশও আছে। কারণ, পরোক্ষভাবে নফসের অপবিত্রতা যে হারাম এ কথা এখানে বোঝা যায়। যেমন অন্যত্র উল্লেখিত, 'তোমাদের উপর সওম বা রোজা ফরজ করা হয়েছে।' — এই আয়াত বিজ্ঞপ্তি হওয়া সত্ত্বেও রোজার হুকুম ফরজ হওয়ার প্রমাণ। অতএব, 'আর যা তোমাদের অন্তরে তা প্রকাশ করো বা গোপন রাখো তার হিসাব আল্লাহতায়ালা তোমাদের কাছ থেকে নিবেন' এই আয়াতটিও বিজ্ঞপ্তি হওয়ার সাথে সাথে নফসের অপবিত্রতা হারামের হুকুমটিকেও প্রমাণ করছে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, অন্তরের কুমন্ত্রণা কথা ও কাজে রূপ না নেয়া পর্যন্ত পাপ বলে গণ্য হবে না। আল্লাহতায়ালা এই উম্মতের জন্য এটা ক্ষমা করে দিয়েছেন। বোখারী, মুসলিম।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, আতা এবং অধিকাংশ তাফসীরকারদের নিকট, 'তোমাদের মনে যা আছে......'এই আয়াতে অন্তরের কুমন্ত্রণার কথাই বলা হয়েছে। আমি বলি, দু'টি আয়াতের হুকুমই সাধারণ। অবশ্য নফসের অপবিত্রতার বিশেষ হুকুমও এতে শামিল আছে। আর এই বিশেষ হুকুমটি রহিত হয়েছে ধরা যায়।

জ্ঞাতব্য ঃ যখন প্রমাণিত হলো, নফসের অপবিত্রতার হিসাব শারীরিক আমলের হিসাবের চেয়ে কঠিন এবং সাধ্যতীত দায়িত্ব মানুষকে অর্পণ করা হবে না, তখন বান্দার তো উচিত হবে, অন্তরের কুমন্ত্রণাসমূহ দূর করার চেষ্টায় রত থাকা এবং কামনা বাসনার অনুসারী না হওয়া। অপবিত্রতা দুর করার জন্য যারা সুফীদের (হক্কানী পীর মোর্শেদের) সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখার চেষ্টায় রত থাকে,

আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তাদের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দিবেন। হিসাব নিবেন না। কেননা, তারা সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। সাধ্যতীত বিষয় তো আল্লাহতায়ালা ধরবেনই না। পক্ষান্তরে যারা উদাসীনতার বশবর্তী হয়ে এ রকম চেষ্টা সাধনা থেকে বিমুখ থাকবে, তারা অবশ্যই দোজখে যাবে।

প্রমাণিত হলো যে, সুফীগণের তরিকায় চলা, ফকির দরবেশদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা ফরজ। যেমন ফরজ আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত এবং তার আহকাম শিক্ষা করা। রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, কিতাবুল্লাহ ও আহলে বাইত (বংশধর)। অতঃপর আল্লাহর কিতাবের হুকুম মেনে চলা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহর কালামকে আশ্রয় করা জরুরী। সাথে সাথে আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভার্থে বিশুদ্ধ অন্তর এবং প্রশান্ত প্রবৃত্তি অর্জনের জন্য রসুল স. এর বংশধরদের (রুহানী ও জিসমানী) সাথে সম্পর্ক রাখাও জরুরী।

আয়াতে ভালো ও মন্দ উভয় প্রকার আমল সম্পর্কে বলা হয়েছে। ভালো মন্দের প্রতিফল আমলকারীই পাবে। 'কাসাব' শব্দের অর্থ অর্জন বা উপার্জন। পূণ্য কাজের দিকে প্রবৃত্তির আকর্ষণ থাকে কম। সেই জন্য ভালো কাজের জন্য কাসাব (অর্জন) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ শ্রমসাধ্য কাজের বিনিময়কেই অর্জন বা উপার্জন বলা যেতে পারে। অপরদিকে মন্দ কাজের ক্ষেত্রে 'আকসাব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আকসাব অর্থ নিজের জন্য কোনো কাজ করা। নিষিদ্ধ কাজের দিকে স্বভাবগতভাবেই মানুষ আকর্ষণ বোধ করে। তাই ভালো কাজ অপেক্ষা মন্দ কাজ সহজসাধ্য। কাসাব ও আকসাব শব্দ দু'টি শ্রমসাধ্য ও সহজসাধ্য কাজের পার্থক্যকে এখানে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

শেষ প্রার্থনায় বলা হয়েছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ভুল করলে, তুমি আমাদেরকে অপরাধী কোর না — অর্থাৎ বিস্মৃতিবশত কোনো অপরিহার্য নির্দেশ যদি লংঘন করি কিংবা উন্নাসিকতার প্রভাবে কোনো কাজ সুষ্ঠু সম্পাদনে যদি ত্রুটি করি তবে তুমি তা উপক্ষা কোর।

গোনাহ্ বিষ তুল্য। ভুল করে পান করলেও যার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। গোনাহ্ শাস্তি ডেকে আনে। অন্তরকে করে কালিমালিপ্ত। হজরত শেখ শহীদ তাঁর শায়েখ নুর মোহাম্মদ বদায়ুনী সম্পর্কে বলেছেন, শায়েখ বদায়ুনীর নিকট আহার্য বস্তু অথবা অন্য কোনো হাদিয়া এলে তিনি সেদিকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। তারপর কখনো কখনো খেয়ে ফেলতেন অথবা ব্যবহার করতেন, না হয় অন্যকে দিয়ে দিতেন। আবার কখনো হাদিয়ার সামগ্রী মাটিতে পুঁতে ফেলতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এমন করেন কেনো? অন্য

কাউকে দিয়ে দিলেই তো পারেন। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! বিষ মিশানো খাদ্য কি খাওয়া যায় না অন্যকে দেয়া যায়।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, মুফতীর ফতোয়া পাওয়ার পরও অন্তরের ফতোয়া তলব করো। অন্তর সায় না দিলে কোর না। দিলে কোর।

হাদিস ও এজমা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই উম্মতের ভুলক্রটি আল্লাহতায়ালা মাফ করে দিবেন। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের ভুল ও অক্ষমতাজনিত ক্রটি হিসাবের আওতাবহির্ভূত করে দেয়া হয়েছে। এই হিসাব আখেরাতের হিসাব। আখেরাতে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত করা হবে না। কিন্তু দুনিয়াতে ভুল হলে, স্মরণ হওয়া মাত্র সংশোধন করে নিতে হবে। যেমন, নামাজ পড়ার কথা ভুলে গেলে, স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নিতে হবে। নামাজের ভিতরে ভুল হলে সোহ সেজদা ওয়াজিব হয়। ভুলবশতঃ করলে কাফফারা ওয়াজিব হয়।

<u>মাসআলা</u> ঃ নামাজে ভুলবশতঃ কথা বললে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়। ইমামে আজম এ কথা বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ভঙ্গ হয় না। কেননা হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. একবার জোহর অথবা আসরের নামাজ দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরালেন। এরপর মসজিদের কিবলার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটি গাছের কান্ডে হেলান দিয়ে উপবেশন করলেন। তখন তিনি ছিলেন রোষতপ্ত। হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কথা বলতে পারছিলেন না। কেউ কেউ তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, নামাজ কসর হয়ে গিয়েছে। জুলিয়াদাইন দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি কি ভুলে গিয়েছেন না নামাজ কসর হয়ে গিয়েছে (স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে বেশী লম্বা হাত বিশিষ্ট জনৈক সাহাবীকে জুলিয়াদাইন বলা হতো)। রসুল স. ডানে বামে দেখে নিয়ে বললেন, জুলিয়াদাইন বলে কী! অন্যান্যরা বললেন, সে ঠিকই বলেছে। আপনি দু'রাকাতই পড়েছেন। তৎক্ষণাৎ রসুলে পাক স. দু'রাকাত পড়ে নিয়ে সালাম ফিরালেন। তকবীর বললেন, সেজদা করলেন আবার তকবীর বলে মাথা ওঠালেন। পুনরায় তকবির বলে সেজদা করলেন আবার তকবীর বলে মাথা ওঠালেন (এভাবে সোহর দুই সেজদা করলেন)। বোখারী, মুসলিম।

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য, 'তোমরা আল্লাহর জন্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে যাও' — এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে উল্লেখিত হাদিসটি মনসুখ (রহিত) হয়ে গিয়েছে।

<u>মাসআলা</u> ঃ জমহুরের নিকট হজ অবস্থায় ভুল করে সহবাস করলে হজ ফাসেদ হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ীর মত এর বিপরীত। আমাদের নিকট ভুলবশতঃ

ও বলপ্রয়োগ উভয় অবস্থায় তালাক সাব্যস্ত হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হয় না। তিনি বলেন, দুনিয়াতেও ভুলের শাস্তি দেয়া যাবে না। আমরা বলি, ভুলের অভিযোগ আখেরাতে আনা হবে না, কিন্তু দুনিয়াতে হবে।

মাসআলা ঃ ভুলে কিছু খেয়ে ফেললে রোজা ভঙ্গ হয় না — বলেছেন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ, এবং ইমামে আজম। জমহুরের মতেও ফাসেদ হয় না। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন রসুল স. এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যদি (ভুলে) খায় অথবা পান করে তবে সে যেনো তার রোজাকে পূর্ণ করে। আল্লাহ্ই তাকে পানাহার করিয়েছেন। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলা ঃ জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে জবেহ হারাম হয়ে যায় একথা বলেছেন ইমাম মালেক। আমাদের নিকট হারাম হয় না। ইনশাল্লাহ এই মাসআলার আলোচনা আমরা সুরা আনআমে করবো।

'হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার অর্পণ করিও না'—এখানে বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী ইহুদীদের উপর যে কঠিন বোঝা চাপানো হয়েছিলো; আমাদের উপর সে রকম বোঝা চাপিও না। ইহুদীদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ ছিলো। জমানো সম্পদের এক চতুর্থাংশ জাকাত ফরজ ছিলো। হুকুম ছিলো, কাপড়ে নাপাকি লেগে গেলে কাপড় কেটে ফেলে দিতে হবে। কেউ গোনাহ করলে সকালে সে দেখতে পেতো তার ঘরের দরোজায় লেখা রয়েছে 'গোনাহগার'। গোবৎসের পূজা করার পর হুকুম দেয়া হলো, 'এখন তোমরা আপন স্রষ্টার সমীপে তওবা করো, তারপর একে অপরকে হত্যা করো।' তাদের ধর্মের নিয়ম ছিলো, কবীরা গোনাহকারীকে হত্যা করতে হবে। যারা বাছুর পূজা করেছিলো তাদেরকে হত্যা করেছিলো তারা যারা পূজা করেনি। আয়াতে 'ইসরান' বলতে ওই গোনাহ্কেই বোঝানো হয়েছে, যার তওবা হয় না। কোনো কোনো আলেম একথা বলেছেন। মোট কথা, প্রার্থনার অর্থ এ রকম — এমন গোনাহ থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখো অথবা আমাদের শরিয়তে এমন গোনাহ্ দিও না, যার তওবা হয় না।

আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানী আমাদের শরিয়তে এমন কোনো কঠিন নির্দেশই নেই যা বহন করতে আমরা অপারগ। অতএব আমাদের প্রার্থনা, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ মোচন করো, দয়া করো। পাপমুক্তি ও পূণ্যার্জন তো তোমার দয়ারই প্রতিফল। তুমি আমাদের অভিভাবক, সংরক্ষক, আমাদেরকে বিজয়ী করো অবিশ্বাসীদের উপর। এখানে অবিশ্বাসী বলতে অবিশ্বাসী জিন, ইনসান, নফসে আম্মারা সবকিছুই হতে পারে। এই দোয়া সকল ধরনের অবাধ্যতার উপরে বিজয়ী হওয়ার দোয়া।

বাগবী লিখেছেন, হজরত মুআজ সুরা বাকারা পাঠ শেষে আমীন বলতেন। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সুরা বাকারার শেষ চারটি বাক্য পাঠ করার সময় প্রতিবাক্যের শেষে আল্লাহতায়ালা বলেন, সাধু, সাধু। যেমন, 'আও আখত্ব'না শেষে, 'মিন ক্বলিনা' শেষে; 'মা লা ত্ব ক্বতালা নাবিহ' শেষে, এবং 'ফাংসুরনা আলাল ক্বওমিল কাফেরীন' শেষে।

মুসলিম ও তিরমিজিতে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় 'সাধু, সাধু' এর পরিবর্তে বলা হয়েছে, 'আমি এমনই করেছি'।

হজরত আব্বাসের দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, 'গোফরানাকা' পড়ার পর আল্লাহ্ বলেন, ক্বদ গফারতু লাকুম (আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি)। আও আখত্ব'না পড়ার পর বলেন, লা উয়াখিযুকুম (আমি তোমাদের হিসাব নিব না)। লা তাহমিল আলাইনা এর পরে বলেন, লা আহমিল আলাইকুম, লা তুহাম্মিলনা এর পরে লা উহাম্মিলকুম এবং ওয়াফু আন্নার পরে বলেন, 'আমি তোমাদের গোনাহ মাফ করে দিয়েছি, ক্ষমা করে দিয়েছি। তোমাদের উপর রহমত দান করেছি এবং কাফেরদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করেছি।'

এই হাদিস প্রমাণ করছে যে, আল্লাহর নিকট থেকে দোয়া কবুল করিয়ে নেয়া হয়েছে। ভুলত্রুটির অভিযোগ তোলা হবে না। এ অবস্থা সমস্ত উম্মতের জন্যে। এটা ঐকমত্য। কারণ, এই কোরআনের কোনো হুকুম, বিজ্ঞপ্তি আর কখনো রহিত হবে না। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিতও হবে না। সুতরাং বিজয়ের সংবাদ সকল উম্মতের জন্য। তবে রসুল স. ও সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে এর সম্পর্ক বিশেষভাবে, অন্যদের সঙ্গে সাধারণভাবে।

আয় আল্লাহ্! উম্মতে মোহাম্মদী স. কে ক্ষমা করে দিন। তাদের উপর রহমত করুন। এবং তাদের আমল সংশোধন করে দিন। আমীন।

সুরা ফাতিহার ফযীলত প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে এসেছে, এক ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে এসে রসুল স. কে বললেন, আপনাকে দু'টি নূরের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে, যা আগের কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। ফাতিহাতুল কিতাব (সুরা ফাতিহা) এবং সুরা বাকারার শেষ আয়াত। আপনি ওই দু'টি থেকে যা পাঠ করবেন তা আপনাকে অবশ্যই দেয়া হবে। যেমন, 'ইহ্দিনাস সিরত্বল মুস্তাক্বীম' (আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন) পড়লে আল্লাহ অবশ্যই সরল পথ দেখাবেন। আবার 'রব্বানা লা তোয়াখিযনা ইন্নাসিনা' থেকে সুরার শেষ পর্যন্ত পড়লে আল্লাহ কবুল করবেন এবং ওতে যা চাওয়া হয়েছে সবই দান করবেন। এ কারণেই আপনার পরে আপনার উম্মত কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মত পথভ্রষ্টতার উপর একত্রিত হবে না।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বর্ণনায় এসেছে, আমার উম্মতের একদল সর্বদা আল্লাহর হুকুমের উপর কায়েম থাকবে। কেউ তাদের সাহায্য না করলেও ক্ষতি নেই। বিরুদ্ধবাদীরা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। এ রকম অবস্থাতেই কিয়ামতের হুকুম এসে যাবে।

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বর্ণনা করেন, মেরাজ রজনীতে তিনি স. সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌছলেন। সিদরাতুল মুনতাহার অবস্থান ষষ্ঠ আকাশে। পৃথিবীবাসীদের আমল ওই স্থান পর্যন্ত পৌছে থেমে যায়। এবং ঊর্ধ্বজগতের হুকুম প্রথমে ওই স্থানে অবতীর্ণ হয়। সিদরাতুল মুনতাহাকে ঘিরে রয়েছে স্বর্ণ পতঙ্গতুল্য ফেরেশতাদের ঝাঁক। তাঁরা রসুল স. এর সন্দর্শন চাইলে আল্লাহ অনুমতি প্রদান করেন। এখানে রসুল স. লাভ করলেন তিনটি নেয়ামত। ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ

২. সুরা বাকারার শেষ আয়াত এবং ৩. তাদের জন্য শাফায়াতের অনুমতি, যারা শিরিকমুক্ত কিন্তু কবীরা গোনাহ্ করেছে।

মুশরিক না হলে কবীরা গোনাহের ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহপাক। এই ক্ষমা প্রদর্শন তওবার কারণে হতে পারে। তওবা ব্যতীত শুধু রহমতের মাধ্যমে হতে পারে। আযাব ব্যতীত অথবা আযাবের পরেও হতে পারে। আসল কথা হলো, কবীরা গোনাহর কারণে কোনো মুমিনের চিরস্থায়ী দোজখ বাস হবে না।

মোতাজিলা ও রাফেজীদের ধারণা সঠিক নয়। মোতাজিলারা কবীরা গোনাহকারীকে ইমানহীন বলে। কিন্তু কাফের বলে না। রাফেজীরা কাফের বলে। আবার দু'দলই বলে কবীরা গোনাকারীর দোজখ বাস চিরস্থায়ী।

হজরত আবু মাসউদ আনসারী বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, সমস্ত রাতের জন্য সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করাই যথেষ্ট। আল আয়েম্মাতুস্ সিত্তাহ্।

হজরত নোমান বিন বশীর বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগেই আল্লাহপাক লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, যে ঘরে এই দুই আয়াত তিন রাত পড়া হবে, সেই ঘরের অধিবাসীর নিকট শয়তান আসতে পারবে না। বাগবী।

হজরত আবু মাসউদ আনসারীর মারফু বর্ণনা এই যে, আল্লাহ জান্নাতের সম্পদসম্ভারের অন্তর্ভূত রেখেছেন এই দুই আয়াতকে। মখলুক সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগে তিনি এই আয়াত দু'টি আপন হাতে লিখে রেখেছিলেন। যে ব্যক্তি এশার নামাজের পরে পড়ে নিবে, রাতের জন্য তা—ই তার পক্ষে যথেষ্ট হবে। আখজা বিন আবী কামেল।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, ওই সুরা যার মধ্যে সুরা বাকারার উল্লেখ আছে, তা হচ্ছে কোরআনের মিজান (তুলাদন্ড)। তোমরা একে শিক্ষা করো। এই শিক্ষায় রয়েছে বরকত। ছেড়ে দিলে আক্ষেপ। বাতিলগণ এ থেকে নূর নিতে পারবে না। আরজ করা হলো, বাতিলিন কে? রসুল স. বললেন, যাদুকর। দায়লামী।

আলহামদুলিল্লাহ্। সুরা বাকারার তাফসীর এখানেই শেষ। আল্লাহতায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তিনিই এই ফকিরকে সুরা বাকারার তাফসীর সমাপ্ত করবার তওফিক দিয়েছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ বায়হাকী শোয়াবুল ইমানে সলসালের বর্ণনা থেকে দুর্বল সনদে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি সুরা বাকারা পড়বে তাকে জান্নাতের তাজ পরানো হবে। দায়লামী মারফু হিসাবে হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, কোরআনের দুইটি আয়াত আছে সুরা বাকারার শেষে। এই আয়াত দু'টি শাফায়াত করবে। দু'টিই আল্লাহর প্রিয়। হজরত আবু ওবাদা বর্ণিত এক হাদিসে রয়েছে, যে ঘরে সুরা বাকারা পড়া হয়, সে ঘর থেকে শয়তান বের হয়ে যায়। এ রকম হাদিস আরো এসেছে হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন মোগাফ্ফাল থেকে। ইমাম আহমদ, হজরত বোরায়রা

থেকে বলেছেন, সুরা বাকারা শেখো। এ শেখায় বরকত আছে। ছেড়ে দিলে আক্ষেপ করতে হবে। যাদুকরেরা এ থেকে নূর গ্রহণ করতে পারে না। সুরা বাকারা ও সুরা আলে ইমরান শেখো। এই দুইটি আনন্দের দুটি ফুল (কিয়ামতের দিন পাঠকারীর উপর ছায়া স্বরূপ হবে)।

ইবনে হাব্বান ও অন্যান্যরা হজরত সহল বিন সাআদ থেকে উল্লেখ করেছেন, সবকিছুর একটি উচ্চ শৃঙ্গ আছে। কোরআনের উচ্চ শৃঙ্গ হচ্ছে সুরা বাকারা। যে ঘরে দিনে পড়া হবে, সে ঘরে তিন দিন পর্যন্ত শয়তান প্রবেশ করতে পারবে না। আর যে ঘরে রাতে পড়া হবে সেখানে সে তিন রাত পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে না। হজরত আবু ওবাদা হজরত ওমর থেকে বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা বাকারা ও আলে ইমরান রাতে তেলাওয়াত করবে সে হবে বিনয়ী।

দারেমী, হজরত মুগীরা বিন শাফীয় থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি শয্যাগ্রহণের সময় সুরা বাকারার দশ আয়াত পড়বে, সে কোরআনকে ভুলবে না। প্রথম দিক থেকে চার আয়াত, আয়াতুল কুরসীর এক আয়াত, এর পরের দুই আয়াত, তার পরে শেষের তিন আয়াত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১,২,৩,৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ○ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ○ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ○ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۥ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۥ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

❒ আলিফ — লাম — মী — ম। 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তিনি চিরঞ্জীব ও অনাদি স্বাধিষ্ঠ, বিশ্বধাতা।

❒ তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহা উহার পূর্বের কিতাবের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাওরাত ও ইনজীল—

❒ পূর্বে তিনি মানব জাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য; এবং তিনি ফুরকানও অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহারা আল্লাহের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক, দাতা।

ইবনে আবী হাতেম, রবী বিন আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন কতিপয় খৃষ্টান রসুল স. এর দরবারে হাজির হয়ে হজরত ঈসা আ. সম্বন্ধে বির্তক শুরু করে দিলো। তখন আল্লাহ্তায়ালা সুরা আলে ইমরানের শুরু থেকে আশি নং আয়াত পর্যন্ত নাজিল করেন। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, চুরাশি আয়াত পর্যন্ত। তার পরের আয়াত শুরু হয়েছে পথভ্রষ্টদের সম্পর্কে। ইবনে ইসাহাক বর্ণনা করেন, আমাকে মোহাম্মদ বিন সহল বিন আবী উমামা বলেছেন, নাজরানের এক খৃষ্টান প্রতিনিধিদল রসুল স. এর সকাশে হাজির হয়ে হজরত ঈসা বিন মরিয়ম আ. সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। তখন সুরা আলে ইমরানের প্রথম আশিটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। বায়হাকী। বাগবী ও কলবী, রবী বিন আনাসের উক্তি উল্লেখ করে লিখেছেন, এই আয়াতসমূহ নাজরানের ষাটজন খৃষ্টান সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা উটে চড়ে এসেছিলো। প্রধান দলপতির নাম ছিলো আকেব। নেতা ছিলো তিনজন। উপনেতা ছিলো চৌদ্দজন। দলপতির পরামর্শ ছাড়া তারা কোনো কাজ করতো না। দলপতি আকেবের আরেক নাম ছিলো আবদুল মসীহ। এক আমিরের নাম ছিলো আইহাম। তাদের সঙ্গে ছিলো মাজহাবী আলেম, পাদরী আবুল হারেসা বিন আলকামাহ। আছরের নামাজের পর এই দলটি মসজিদে প্রবেশ করলো। তাদের পরিচ্ছদ ছিলো ইয়ামেনী নকশা খচিত। দেখতে মনে হচ্ছিলো তারা খুব ভালো মানুষ। সবাই বলাবলি করছিলো, এ ধরনের প্রতিনিধি দল আগে দেখিনি। নামাজের সময় হয়ে গেলো। রসুল স. তাদেরকে অনুমতি দিলেন, তারা পূর্বদিকে মুখ করে নামাজ পড়লো। এরপর শুরু হলো কথাবার্তা। রসুল স. তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন। দলপতি আকেব এবং নেতা আইহাম উত্তরে বললো, আমরা আপনার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি। রসুল স. বললেন, ভুল বলেছো। তোমরা আল্লাহর পুত্র স্বীকার করে থাকো। ক্রুশের পূজা করো এবং শুকরের গোশত খাও। তারা বললো, ঈসার পিতা যদি খোদা না হয় তবে তার পিতা কে? রসুল স. এরশাদ করলেন, তোমরা কি জানো না আমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব। কিন্তু ঈসা আ. এর মৃত্যু হবে। প্রতিনিধি দল বললো, জানি। রসুল স. পুনরায় বললেন, তোমাদের কি এ কথা জানা নেই যে, তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। সবকিছু সংরক্ষণ ও রিজিক দানের দায়িত্ব তাঁরই। তারা উত্তর দিলো, জানি। রসুল স. বললেন, এ রকম গুণ কি ঈসার আছে! তারা উত্তর দিলো, না—নেই। রসুল স. বললেন, তোমরা কি এই জ্ঞান রাখো না যে, আকাশ,পৃথিবীর কোনোকিছুই আল্লাহর আগোচর নয়। তারা বললেন, জানবো না কেনো। রসুল স. বললেন, এ রকম গুণ কি ঈসার আছে? তারা বললো, না। তিনি স. বললেন, আমাদের প্রতিপালক ঈসাকে তাঁর মায়ের উদরে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের আল্লাহ পানাহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তারা বললো , হ্যাঁ। রসুল স.

বললেন, তোমরা কি এটুকুও বোঝনা, তাঁর মা হজরত ঈসাকে অন্যান্য গর্ভধারিনী স্ত্রীলোকদের মতই আপন উদরে ধারন করেছিলেন। প্রসবও করেছিলেন অন্য মহিলাদের মতো। তারপর তিনি আহার দিয়েছিলেন যেমন অন্য শিশুদেরকে দেয়া হয়। তিনি পানাহার করতেন এবং প্রকৃতির প্রয়োজন পুরো করতেন। তারা বললো, একথা আমরা জানি। রসুল স. বললেন, এরপরও তোমরা তাকে আল্লাহর পুত্র মনে করো কিভাবে? খৃষ্টানেরা নির্বাক হয়ে গেলো। তখন আল্লাহ সুরা আলে ইমরানের প্রারম্ভ থেকে আশি আয়াত পর্যন্ত অবতীর্ণ করলেন। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সকল কিছুর সংরক্ষণকারী। ইতোপূর্বে আয়াতুল কুরসীর ব্যাখ্যায় এ বিষয়টি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ইবনে আবী শা'বা, তিবরানী এবং মারদুবিয়া হজরত আবু উমামার মারফু হাদিসে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর ইসমে আজম তিনটি সুরায় রয়েছে। বাকারা,আলে ইমরান ও তোয়া হা'য়। আবু উমামার ছাত্র কাশেম বলেছেন, আমি অনুসন্ধান করে 'হাইউল কাইয়ুম' শব্দটি তিনটি সুরার মধ্যে পেয়েছি। সুরা বাকারায় পেয়েছি আয়াতুল কুরসীর মধ্যে, আলে ইমরানে পেয়েছি এই আয়াতে এবং তোয়াহা'য় উল্লেখ দেখেছি, 'ওয়ানাছিল উজুহু লিল হাইয়্যুল কাইয়ুম' (আর সকল চেহারাই সেই চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহ্র সম্মুখে অবনমিত থাকবে)।

জাজরী তাঁর পুস্তকে হেসনে হাসিনে লিখেছেন যে, আমি বলি ইসমে আজম হলো, 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম।' এই বাক্যটি এই তিনটি সুরায় আছে। আমি আরও বলি, ইসমে আজম হলো, 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়া'। হাদিস শরীফে এরকমই বলা হয়েছে। হজরত আসমা বিন ইয়াজিদ বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, ইসমে আজম রয়েছে এই দুই আয়াতের মধ্যে— 'ওয়া আল হিকমুল্লাহু ওয়াহিদ লা ইলাহা ইল্লা হুয়ার রহমানুর রহীম (আর যিনি তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য তিনি এক। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নাই। তিনি পরম দয়ালু ও করুণাপরবশ) এবং আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম।' তিরমিজি, ইবনে মাজা, আবু দাউদ ও দারেমী।

হজরত সা'দ বিন আবী ওক্কাস বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, হজরত ইউনুস আ. মাছের পেটে থাকাবস্থায় তাঁর আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লা আংতা সুবহানাকা ইন্নি কুংতু মিনাজ্ জ্বলেমিন।' (তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই। তুমি পবিত্রতম। নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভূত)। কেউ যদি এই দোয়ার সাথে আল্লাহ্তায়ালার কাছে কিছু চায়, আল্লাহ্পাক তা কবুল করেন। আহমদ, তিরমিজি।

এই দোয়ার নাম দোয়ায়ে ইউনুস। হাকেম লিখেছেন, দোয়ায়ে ইউনুসই আল্লাহ্‌র ইসমে আজম। এই দোয়ার মাধ্যমে দোয়া করলে আল্লাহ্ কবুল করবেন এবং কিছু চাইলে দান করবেন।

হজরত ইয়াজিদ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি এক ব্যক্তিকে এই বলে দোয়া করতে দেখেছি, আয় আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট চাই, আমি যেনো সাক্ষ্য দেই তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তুমি এক, অমুখাপেক্ষী, তুমি কারো সন্তান নও। তোমারও কোনো সন্তান-সন্ততি নেই। তোমার সমতুল্য কেউ নেই। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্‌র নিকট এমন ইসমে আজম পড়ে দোয়া করে কেউ কিছু চাইলে তিনি দান করেন, দোয়া করলে কবুল করেন। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিজি, হাকেম, ইবনে হাব্বান।

হজরত আনাস বলেছেন, আমি মসজিদে বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি নামাজ পাঠরত অবস্থায় বলতে লাগলো, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমারই নিকট প্রার্থনা করি। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তুমি অতি দয়ালু ও অনুগ্রহ দাতা। আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা। হে প্রতাপশালী ও সম্ভ্রমশালী! হে চিরঞ্জীব হে সংরক্ষণকারী! রসুল স. এরশাদ করলেন, ওই ব্যক্তি এমন ইসমে আজম নিয়ে দোয়া করলো, যে নাম নিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ্ কবুল করেন এবং কিছু চাইলে প্রদান করেন। উল্লেখিত হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় ও তিনটি সুরায় ইসমে আজম রয়েছে।

হজরত জাবেরের একটি মারফু হাদিস এই যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উত্তম জিকির। তিরমিজি।

হজরত মুআজের মারফু হাদিসও এরকম, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' জান্নাতের চাবি। হাদিসটি বহুবিদিত (মুতাওয়াতির)।

জ্ঞাতব্য ঃ লা ইলাহা ইল্লাহু, লা ইলাহা ইল্লা আংতা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ — এগুলোকে হাদিস শরীফে ইসমে আজম বলা হয়েছে, হুয়া (তিনি) এবং আংতা (তুমি) এর উদ্দেশ্য আল্লাহ্ই। এই সর্বনাম দু'টির মাধ্যমে বর্ণিত বাক্যের মর্যাদা অনেক বেশী। এগুলোর উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র জাতের (অস্তিত্বের) প্রতি প্রবর্তিত হয়। আর জাত, সিফাতের (গুণাবলীর) সম্মিলিত অবস্থা। এ জন্যই সকল গুণবাচক নামের তুলনায় জাতী নামের (আল্লাহ্) গুরুত্ব অধিক। আল্লাহ্ শব্দে সমস্ত সিফাত (গুণ) একত্রিত রয়েছে। অন্যান্য নাম ও গুণ সমূহ জাতকে পূর্ণরূপে নির্দেশ করেনা। সুফীগণ সবচেয়ে বেশী ফলদায়ক জিকির হিসেবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কে বেছে নিয়েছেন — উদ্দেশ্য, অন্যান্য নাম এবং গুনসমূহ ব্যতীতই যেনো খালেছ জাত পর্যন্ত সম্পর্কিত হওয়া সম্ভব হয়।

আমি বলি, ইসমে আজম দু'রকম। হ্যাঁ বোধক এবং না বোধক। এর কারণ রয়েছে। হ্যাঁ বোধক ইসমে আজমের মাধ্যমে বোঝা যায়, সমস্ত কামালিয়াত বা পূর্ণতা তাঁর জাতের মধ্যে বিদ্যমান। এবং এর মধ্যে কোনো ক্রটিবিচ্যুতিই নেই। জাত সমস্ত গুণকে একত্রিতকারী। আর ক্রটিবিচ্যুতিমুক্ত না হলে মাবুদ হওয়ার যোগ্যতা থাকেনা। এই অবস্থায় যে কলেমা 'আল্লাহ্ ব্যতীত' ঘোষণার দ্বারা সমস্ত কিছুর উপর আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণ করবে তাকেই ইসমে আজম বলা হবে। এ কারণেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ইসমে আজম হয়েছে।

আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তানযিল এবং আনযালা। তওরাত ও ইঞ্জিল নির্ধারিত সময়ে সম্পূর্ণ কিতাব একত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। আর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় ধরে। এজন্য কোরআনের ক্ষেত্রে তানযিল শব্দটি এসেছে। ইঞ্জিল ও তওরাতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে আনযালা শব্দটি। পূর্ণ কিতাব একই সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে বুঝতে আনযালা শব্দটি অধিক উপযোগী। তওরাত মুসা আ. এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের নাম — শব্দটি ইবরানী। ইঞ্জিল সুরিয়ানি শব্দ। ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে হজরত ঈসা আ. এর উপর। আর কোরআন আরবী শব্দ। নাযিল হয়েছে আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতাবা স. এর উপর। আয়াতে হুদাল্লিন্ নাস বলতে, সমস্ত মানুষের হেদায়েতের জন্য একথা বোঝানো হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আন্ নাস বলে হজরত মুসা আ. ও হজরত ঈসা আ. এর উম্মতগণকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু একথা বলার কোনো কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে 'আন্নাস' অর্থ সমস্ত মানুষ। কারণ, কোরআন সমস্ত আসমানী কিতাব এবং পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রসুলকে মেনে নেয়ার জন্য সকল মানুষকে দাওয়াত দিয়েছে। কোরআন পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সত্যায়নকারী। আর মোহাম্মদ স. এর প্রসঙ্গ পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাব উল্লেখ করেছে।

ভুলের অপনোদন ঃ কোরআন মজীদের হুকুম দ্বারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের হুকুম আহকাম মনসুখ হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় 'সমস্ত মানুষের হেদায়েতের জন্য' একথা বলার অর্থ কী? উত্তর এই যে, পূর্ববর্তী কিতাবের কোনো কোনো হুকুম রহিত হওয়া সত্ত্বেও সকল মানুষের হেদায়েতের নির্দেশাদি কোরআনে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। খোদ কোরআনেরই অনেক আহকাম অন্য আহকাম দ্বারা মনসুখ হয়ে গিয়েছে। একথার অর্থ এই নয় যে, পূর্ববর্তী আহকাম ভুল ছিলো। বরং অর্থ এই — পূর্ববর্তী হুকুম ছিলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। মেয়াদ শেষে তাই নতুন হুকুম জারি করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আগের নবীদের শরিয়ত অনুযায়ী কোনো আমল করা আমাদের জন্য অপরিহার্য নয়। কিন্তু আমাদের জন্য সবকিছু জানা জরুরী এবং মনসুখ হুকুম আহকাম ছাড়া অন্যান্য বিষয় থেকে ধারণা নেয়া জরুরী।

'ওয়া আনযালা ফুরক্বন'—অর্থ হক ও বাতিলের পার্থক্য সূচক আসমানী কিতাবসমূহ। এই শব্দটির মধ্যে শামিল রয়েছে তওরাত, ইঞ্জিল এবং কোরআন ছাড়াও অন্যান্য সকল আসমানী কিতাব অথবা শুধু কোরআন মজীদ। 'ফুরক্বন' শব্দটি প্রশংসা, মহত্ত্ব ও সম্মান প্রকাশার্থে দু'বার কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সকল কিতাবই প্রেরিত কিতাব। কিন্তু কোরআন মোজেজা হওয়ার কারণে স্থায়ী পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। দু'বার আনযালা উল্লেখ করার কারণ দু'টি। ১. দু'বার উল্লেখিত না হলে সন্দেহের অবকাশ ছিলো যে, ফুরক্বন, তওরাত ও ইঞ্জিলের সমার্থক। ('ফুরক্বন' শব্দটির মধ্যে তওরাত, ইঞ্জিল এবং কোরআন ছাড়াও অন্যান্য সকল আসমানী কিতাব রয়েছে)। ২. আনযালা দু'বার উল্লেখের অর্থ, কোরআন মজীদ দু'বার নাজিল হয়েছে। একবার সম্পূর্ণ কোরআন দুনিয়ার আসমানে। দ্বিতীয়বার কিছু কিছু করে পৃথিবীতে।

সুদ্দী বলেছেন, আনযালা শব্দ দু'বার উল্লেখ করার কারণ, আগে এবং পরের বর্ণনার ভিন্নতা। আগে বলা হয়েছে 'মানুষের হেদায়েতের জন্য' এবং পরে বলা হয়েছে 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ আয়াতকে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি'।

ওয়াল্লাহু আজীজ অর্থ, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী। তিনি শাস্তি দিতে চাইলে রদ করার কেউ নেই। 'জুনতিকাম' অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণকারী, দন্ড বিধায়ক, দাতা। আসমানী কিতাব মানবীয় ক্ষমতাভূত নয়। তাই তাকে মেনে নিতে হবে। অস্বীকারকারী নিশ্চিত শাস্তিযোগ্য।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৫, ৬

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ○ هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

❒ আল্লাহ, আসমান ও জমিনে কিছুই তাঁহার নিকট গোপন থাকে না। তিনিই মাতৃ-গর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ্তায়ালা সব কিছুই জানেন। কোনোকিছুই আল্লাহ্তায়ালার দৃষ্টি থেকে গোপন নয়। এই আয়াতে প্রথমে পৃথিবী, তার পরে আকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, বান্দার আমলের স্থান পৃথিবী। পৃথিবীবাসীদের আমল

তাঁর সম্যক জানা আছে বলেই তিনি তাদের পুরস্কার অথবা শাস্তি নির্ধারণ করেন। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তাঁর জ্ঞান ছাড়া কোনো জ্ঞান নেই। তাঁর ক্ষমতা ছাড়া কোনো ক্ষমতাও নেই। সৃষ্টি করেন তিনিই। মাতৃগর্ভে মানব শিশুর আকৃতিদান করেন তিনিই। তিনি পরাক্রমশালী, মহা জ্ঞানী।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, আল্লাহর সত্য নবী মোহাম্মদ স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীজ আকারে, তার পরে চল্লিশ দিন রক্তপিন্ডের আকারে তার পরে চল্লিশ দিন মাংশপিন্ডের আকারে রাখেন। তারপর আল্লাহ্ ফেরেশতাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন। হুকুম অনুযায়ী ফেরেশতা তার রিজিক, হায়াত, আমল এবং শেষ পরিণাম লিপিবদ্ধ করেন।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ কেউ নেক আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যখন জান্নাত ও তার মধ্যে দূরত্ব থাকবে এক গজ। তখন তকদীর প্রবল হবে এবং ওই ব্যক্তি দোজখীদের ন্যায় আমল করতে থাকবে এবং দোজখে চলে যাবে। আবার কেউ কেউ দোজখের উপযোগী আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছবে, যখন দোজখ ও তার মধ্যে দূরত্ব থাকবে মাত্র একগজ। সহসা তকদীর প্রবল হবে এবং সে বেহেশতের অনুকূল আমল শুরু করবে এবং বেহেশতে চলে যাবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত হোজায়ফা বিন উসাইদ মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন, মাতৃ উদরে চল্লিশ অথবা পয়তাল্লিশ দিন থাকার পর মানবশিশুর নিকট এক ফেরেশতা আসবে এবং আরজ করবে, হে আল্লাহ। সে কি বদবখত নাকি নেকবখত? যে নির্দেশ আসবে ফেরেশতা তাই লিখে দিবেন। অতঃপর আরজ করবে, হে প্রভু। নারী না পুরুষ? ফেরেশতা তাই লিখে দিবেন যা তাকে নির্দেশ করা হবে। বাগবী।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৭

هُوَ الَّذِيٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

❒ তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন; এইগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলি রূপক;

যাহাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রহিয়াছে শুধু তাহারাই ফিৎনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যাহা রূপক তাহার অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ ইহার ব্যাখ্যা জানে না। আর যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা বলে, 'আমরা ইহা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত;' এবং বোধ-শক্তি সম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না।

কোরআন শরীফের কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, কিছু আয়াত রূপক। সুস্পষ্ট আয়াতের শব্দসম্ভার, বাক্যাবলী, সবই সুস্পষ্ট। সন্দেহমুক্ত। গভীর অভিনিবেশ ছাড়াই এগুলোর অর্থ বোঝা যায়। যেমন, 'আপনি বলে দিন তোমরা এসো এবং পড়ো যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন, তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক আদেশ করেছেন; তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না; তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই; তিনি সবকিছু শোনেন এবং দেখেন' ইত্যাদি। কিছু আয়াত বুঝতে অবশ্য যৎসামান্য অভিনিবেশ প্রয়োজন। এগুলোও সুস্পষ্ট আয়াতের আওতায় পড়ে। যেমন, চুরি সংক্রান্ত আয়াত। এর মধ্যে যে পকেট কাটাও পড়ে, সামান্য চিন্তাতেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আবার কাফন চুরি এই আয়াতের হুকুমের মধ্যে পড়ে না। কারণ মৃত ব্যক্তি কাফনের মালিক নয়। মৃতের উত্তরাধিকারীরাও কাফনের মালিক নয়। অন্য এক আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'পা ধৌত করো টাখনু পর্যন্ত'। এই আয়াতে ধৌত করার শেষ সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায়, এখানে 'টাখনু পর্যন্ত' অর্থ হবে টাখনুসহ। এই ব্যাপারে তাই ঐকমত্য হয়েছে। এক বর্ণনায় আছে, 'সালাসাতা কুরু' — এর অর্থ ইমাম শাফেয়ীর নিকট ঋতু থেকে পবিত্রাবস্থা। হানাফীদের মতে ঋতু (হায়েজ) অবস্থা। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় এখানে তিন ঋতুই উদ্দেশ্য। তুহুর বা পবিত্র অর্থ হলে তিন সংখ্যা পুরা হয় না। কেননা তালাক তুহুর থেকে শুরু হয়। ইদ্দতের সময় তুহুর থেকে গণনা করলে তিন তুহুর পুরা হয় না। গণনা না করলে তিন তুহুরের বেশী হয়ে যায়। এজন্যই বুঝতে হবে, এখানে তিন হায়েজই অর্থ। অন্য একটি আয়াত 'ঐ কাঁচ রৌপ্য নির্মিত হবে;' একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, কাঁচ বলতে ওই পাত্র বোঝানো হয়েছে যা তৈরী হবে রূপা দিয়ে এবং যার পরিচ্ছন্নতা হবে চকচকে সীসার মতো। এ ধরনের আয়াতকেই আয়াতে মোহকামাত বা সুস্পষ্ট (মোহকাম) আয়াত বলে। হজরত ইবনে আব্বাসের বদৌলতে আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট নয় এ রকম আয়াতও মোহকাম আয়াতের অন্তর্ভূত হয়েছে। এ রকম হয়েছে তাঁর বিজ্ঞজনোচিত তাফসীর (ব্যাখ্যা) এর কারণে। মোহাম্মদ জাফর বিন জোবায়ের বলেছেন, 'মোহকাম'এর অর্থ দ্ব্যর্থহীনতা। বিকল্প অর্থের সম্ভাবনা যাতে নেই। কেউ কেউ বলেছেন, 'মোহকাম' অর্থ প্রসিদ্ধ। এর উপস্থাপনা সম্পূর্ণতই প্রকাশ্য।

বলা হয়েছে, এই মোহকাম আয়াতগুলোই কিতাবের মূল ভিত্তি (উম্মুল কিতাব)। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'উম' শব্দের অর্থ মা। প্রত্যেক বস্তুর আসল উৎসকে বলা হয় উম্মুল কওম। 'উম' এর আরেক অর্থ একত্রকারী। আমি বলি, এখানে কিতাব শব্দের অর্থ হবে মাকতুব। মাকতুব অর্থ ফরজ করা। যেমন বলা হয়েছে, 'কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম' (তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে)' এখানে কুতিবা অর্থ ফরজ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই মোহকাম আয়াতগুলোই কোরআনের ভিত্তিমূল।

দ্বিতীয় প্রকারের আয়াত হচ্ছে আয়াতে মোতাশাবেহাত (রূপক আয়াত)। এ সমস্ত আয়াত বুঝতে গেলে বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারীদের যথাযথ ব্যাখ্যার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। কেবল ভাষা বা সাহিত্য জানলেই এগুলোর অর্থ বোঝা যাবে না। বিভিন্ন সুরার শুরুতে উল্লেখিত হরফে মোকাত্তায়াত (বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি যেমন, আলিফ লাম মীম, ইয়া সীন, ত্বোয়াহা ইত্যাদি) — এগুলোও রূপক। কোরআন মজীদে রূপক আয়াত রয়েছে অনেক। যেমন, 'আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর', 'আল্লাহ আরশের উপরে অধিষ্ঠিত' — এগুলোর সোজাসুজি অর্থ বোঝা দুরূহ। কোনো কোনো আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত ব্যক্তি (আরিফ) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান এবং এলহামের মাধ্যমে এ সমস্ত আয়াতের অর্থ বুঝতে পারেন। যেমন, হজরত আদম আ. কে আল্লাহ সমস্ত কিছুর শিরোনাম সম্ভুত জ্ঞান দান করেছিলেন। এ সমস্ত আয়াতের জ্ঞান লাভ হয় মেশকাতুন নবুয়ত (নবুয়তের তাক) থেকে শরহে ছুদুরের (বক্ষ সম্প্রসারণের) পর। ভাষার মাধ্যমে এই জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। আলোচনা এখানে অচল। অক্ষমতা এই পথের পরিণতি। তাই অতিরিক্ত আলোচনা অসমীচীন।

একটি ধারণা ঃ আলিফ লাম র কিতাবি আহকামাতি — অর্থ এটা এমন কিতাব যার আয়াতগুলো প্রমাণাদি দ্বারা সুদৃঢ়। এ কথায় প্রমাণ হয় যে, সমস্ত আয়াতই মোহকাম। কিতাবি মোতাশাবিহা — এ কথায় বোঝা যায় সম্পূর্ণ কোরআনই মোতাশাবেহ। — এর কারণ কী?

জবাব ঃ মোহকাম হওয়ার অর্থ এই যে, সম্পূর্ণ কোরআন অসঙ্গতি ও বর্ণনার দুর্বলতা হতে সুরক্ষিত। এর কোনো আয়াতের ত্রুটি নির্দেশ করা এবং এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা কারো নেই। অপরদিকে মোতাশাবেহ বলার অর্থ এই যে সম্পূর্ণ কোরআনই সৌন্দর্য ও পূর্ণতার এক রহস্যময় সমন্বয়। এই অর্থে সম্পূর্ণ কোরআনই মোতাশাবেহ। তাই এই আয়াতে দু'টি দিককেই একই সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে বলা হচ্ছে, এর কিছু অংশ মোহকাম এবং কিছু অংশ মোতাশাবেহ, যা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যতীত বোঝা যায় না।

'যাহাদের অন্তরে সত্য—লংঘন প্রবণতা রহিয়াছে' — এই কথায় ইঙ্গিত করা হয়েছে নাজরানের সেই খৃষ্টান প্রতিনিধিদলের প্রতি। তারা রসুল স. কে বলতে লাগলো, আপনি ঈসা আ.কে কলেমাতুল্লাহ ও রুহুল্লাহ বলেন না। তিনি স. বললেন, কেনো বলবো না। তারা বললো, আমাদের জন্য এই যথেষ্ট। তখন এই আয়াত নাজিল হলো।

কালাবী বলেছেন, এই আয়াত এক দল ইহুদীদের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হুয়াই ইবনে আখতাব এবং কাব বিন আশরাফ সহ ইহুদীদের এক দল রসুল স. এর নিকটে এলো। হুয়াই বললো, আমরা জানতে পারলাম আপনার উপর আলিফ লাম মীম অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা আপনাকে কসম দিয়ে বলছি, ঘটনাটি কি সত্যি? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। আবজাদ গণনার মাধ্যমে হুয়াই বললো, এ কথা সত্য হলে আপনার উম্মতের স্থায়ীত্ব হবে একাত্তর বৎসর — গণনাতে তাই আসে। এছাড়া অন্য কিছু কি অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি স. বললেন হ্যাঁ। আলিফ লাম মীম ছুদ নাজিল হয়েছে। হুয়াই বললো, তবে তো সময় বেড়ে গেলো। এবার হলো একশ' একষট্টি বৎসর। আর কিছু—। রসুল স. এরশাদ করলেন, আলিফ লাম, র। সে বললো, তবে তো আরো বেশী হয়ে গেলো—দু'শো একুশ বৎসর। আর কী নাজিল হয়েছে? রসুল স. বললেন, আলিফ লাম মীম র। সে বললো, অনেক সময় হয়ে গেলো যে—দুইশ একাত্তর বৎসর। আপনি যে আমাদের গণনা বিশৃঙ্খল করে দিলেন। আমরা বুঝতে পারছিনা, বেশী সময় নির্ধারণ করবো না কম সময়। আমরা এসব মানি না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনে জারিহ্ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে। হাসান বলেছেন, খারেজীদের উদ্দেশ্যে। ইমাম আহমদ ও অন্যান্যরা হজরত আবু উমামা থেকে বলেছেন, কাতাদা রা. যখন এই আয়াত পড়তেন — তখন বলতেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য হরোরিয়া এবং সাবীয়া দল যদি না হয় তবে আমি জানি না তারা কে। কেউ কেউ বলেছেন, যাদের উদ্দেশ্যে হোক না কেনো তারা সবাই বেদাতী।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. একবার এই আয়াত পাঠ করার পর বললেন, যদি কাউকে দেখো কোরআনের মোতাশাবেহ আয়াত নিয়ে মেতে আছে তখন বুঝবে তারা ওই লোক — যাদের কথা আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াতে উল্লেখ করেছেন। তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকবে। বোখারী। হজরত আবু মালেক আশআরী বর্ণনা করেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, আমি আমার উম্মতের তিনটি বিষয়ে আশংকা করি। একটি এই যে, কোনো কোনো মানুষ কিতাব খুলে মোতাশাবেহ্ আয়াতের ব্যাখ্যা উদ্ধারে গলদঘর্ম হবে।

এসমস্তের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ই জানেন। বিদ্যানগণ বলেন, আমরা এই কোরআনে বিশ্বাস রাখি। এই কোরআন এসেছে আমাদের প্রভূপ্রতিপালক থেকে। এর উপদেশ ইমানদার ও জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যতীত কেউ গ্রহণ করে না।

যাদের অন্তরে সীমালংঘন প্রবণতা (বক্রতা) রয়েছে, তারাই কেবল মোতাশাবেহ্ আয়াত সম্পর্কে অনাবশ্যক অনুসন্ধিৎসা দেখায়। অর্থাৎ যারা বেদাতী তারা তাদের প্রবৃত্তিপ্রসূত অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য মোতাশাবেহ্ আয়াতের আশ্রয় নেয়। তারা মোহকাম আয়াতের দিকে আকৃষ্টি বোধ করে না, হাদিস শরীফেরও দ্বারস্থ হয় না। কর্তব্য এই যে, আমল করতে হবে মোহকাম আয়াত ও হাদিস শরীফ অনুযায়ী। মোতাশাবেহ্ আয়াত সম্পর্কে কেবল একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, মোহকাম আয়াতের মতো মোতাশাবেহ্ আয়াতও আমার প্রভুপ্রতিপালকের বাণী। আনুমানিক ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে নিষিদ্ধ।

উম্মতের ঐকমত্য এবং সুবিদিত হাদিস শরীফের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, কিয়ামতের দিন ইমানদারগণ আল্লাহতায়ালাকে দেখবেন চতুর্দশী চাঁদের মতোন। সুতরাং একথা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। নিবৃত্ত হতে হবে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা থেকে। অন্য আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, 'কিয়ামতের দিন বহু মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে এবং আপন প্রতিপালকের দিকে তাকাবে।' এক্ষেত্রেও করনীয় একই। অর্থাৎ বিশ্বাস করতে হবে, কিন্তু অনাবশ্যক ব্যাখ্যার দিকে অগ্রসর হওয়া যাবেনা। 'আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর', 'আল্লাহ্ আরশের উপরে অধিষ্ঠিত' — এ সমস্ত আয়াত মোতাশাবেহ্। এগুলোকে মোহকাম আয়াত 'তার মতো কোনো কিছুই নয়' এর আওতায় এনে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। যারা এরকম করবেনা তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী (ফেতনাবাজ)।

জ্ঞাতব্য ঃ দারেমী হজরত ওমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, অতিসত্ত্বর তোমাদের নিকট এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যে বচসা শুরু করবে কোরআনের মোতাশাবেহ্ আয়াত নিয়ে। তখন তোমাদের কর্তব্য হবে রসুল স. এর সুন্নত দ্বারা এর মোকাবেলা করা। কেননা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতই কিতাবুল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, আমরা একবার হজরত ওমরের নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় একব্যক্তি এসে কোরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করলো। সে বললো, কোরআন মখলুক না গায়ের মখলুক (সৃষ্ট না অসৃষ্ট)? হজরত ওমর তাকে ধরে ফেললেন এবং তাকে টেনে নিয়ে হজরত আলীর কাছে গিয়ে বললেন, হে আবুল হাসান! এই লোকের কথা শুনুন। সে বলছে, কোরআন মখলুক না গায়ের মখলুক? হজরত আলী বললেন, এই অনাসৃষ্টি আপনার খেলাফত কালে প্রকাশিত হচ্ছে। আমার খেলাফতে হলে আমি এর

শিরোচ্ছেদ করতাম। দারেমীর গ্রন্থে হজরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি মদীনায় এসে কোরআনের মোতাশাবেহাত আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন শুরু করলো। তার নাম ছিলো সাবিগ। হজরত ওমর খেজুরের খোলা চাবুক হাতে নিয়ে তাকে তলব করলেন। সে এলে বললেন, তুমি কে? সে জবাব দিলো, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা সাবিগ। হজরত ওমর বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা ওমর, একথা বলেই তিনি চাবুক দিয়ে তাকে মারতে শুরু করলেন এবং তার মাথা রক্তাক্ত করে দিলেন। সাবিগ চিৎকার করে বলে উঠলো, আমিরুল মুমিনীন থামুন! যে চিন্তা আমার মাথায় ছিলো, এখন আর তা নেই।

আবু ওসমান সূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বসরায় এই কথা বলে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, সাবিগের সাথে কেউ ওঠাবসা কোর না। এরপর থেকে আমাদের মজলিশে সাবিগ এসে পড়ার সাথে সাথে আমরা পৃথক হয়ে যেতাম। মজলিশই ভেঙে দিতাম, শতলোকের মজলিশ হলেও। হজরত মোহাম্মদ বিন শিরিন বলেছেন, হজরত ওমর হজরত আবু মুসা আশআরীকে লিখেছিলেন, সাবিগের সাথে ওঠাবসা কোরনা এবং তার মাসিক বেতনের পারিশ্রমিক দিওনা।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আহলে কালাম (মোতাজিলা, ক্বদরিয়া ইত্যাদি) দের শাস্তি এটাই যা হজরত ওমর নির্ধারণ করেছিলেন সাবিগের জন্য। তাদেরকে কশাঘাত করতে হবে এবং উটে চড়িয়ে তাদের আপন গোত্রের দিকে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং বলে দিতে হবে, যারা কোরআন ও সুন্নতকে ছেড়ে দিয়ে এলমে কালামের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়েছে তাদের শাস্তি এটাই।

বর্ণিত হয়েছে, ইসলামের ব্যাপক প্রসার দেখে ইহুদীরা হিংসার আগুনে দগ্ধ হতে লাগলো। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, মুসলমানদের এই উন্নতি ইসলামের কারণেই হচ্ছে। ইসলামকে প্রতিহত করবার জন্য তারা দু'টি উপায় অবলম্বন করলো — ধোঁকা দেয়ার জন্য প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং ভুল ব্যাখ্যা দিতে লাগলো মোতাশাবেহ আয়াত সমূহের। গড়ে তুললো ইসলামের নামে ইসলামবিরোধী দল উপদল। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে উঠতে লাগলো, হারুরিয়া, মোতাজিলা, রাফেজী ইত্যাদি বাতিল সম্প্রদায়।

মোতাশাবেহ আয়াতের মর্মার্থ কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল জ্ঞান মোতাশাবেহ আয়াতের অর্থ জানার জন্য যথেষ্ট নয়। তবে, রসুলে পাক স. এবং তাঁর উম্মতের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা এর অর্থ জানেন। আল্লাহ্ জানান বলেই জানেন। যেমন, এক আয়াতে এসেছে, 'আকাশ ও পৃথিবীর কেউ গায়েব জানে না, আল্লাহ্ ব্যতীত' — একথার অর্থ আল্লাহ্ না জানালে নিজে নিজে কেউ গায়েব জানেনা। এক আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, ছুম্মা ইন্না

আলাইনা বায়ানাহ (অতঃপর এটা বর্ণনা করে দেয়া আমার দায়িত্ব) — এই আয়াতদৃষ্টে বোঝা যায়, কোরআনের মোহকাম এবং মোতাশাবেহ উভয় প্রকারের আয়াতের অর্থ জানা রসুলপাক স. এর জন্য জরুরী। কোরআনের কিছু অংশ জানা এবং কিছু অংশ অজানা — এরকম অবস্থা রসুল স. এর জন্য শোভনীয় নয়। অন্যথায় কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এবং আল্লাহ্তায়ালা হবেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী (কারণ তিনি বলেছেন, বর্ণনা করে দেয়া আমার দায়িত্ব)।

বিশুদ্ধ মত এটাই, যা আমরা সুরা বাকারার ব্যাখ্যায় প্রথমে লিখে দিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে মোতাশাবেহ একটি গোপন রহস্য, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসুলের মধ্যে। এই জ্ঞান সাধারণের জন্য নয়, বরং সাধারণদের পক্ষে এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভবই নয়। তবে কামেল ব্যক্তিরা এর ব্যতিক্রম। তাঁরা এলমে লাদুন্নীর মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করতে পারেন। আল্লাহ্তায়ালার জাত এবং সেফাতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারীরা এই জ্ঞান পেয়ে থাকেন। চেষ্টা কিংবা চিন্তা গবেষণা এক্ষেত্রে অচল।

'যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা বলে, 'আমরা ইহা বিশ্বাস করি' — জ্ঞানে সুগভীর যারা তারাই সুন্নত ওয়াল জামাত। তাঁরা সুদৃঢ়ভাবে মোহকামকে ধারণ করেছে এবং কোরআন মজীদের তাফসীরে সাহাবা এবং তাবেয়ীদের এজমাকে মেনে নিয়েছে। মোতাশাবেহকে করেছে মোহকামের অনুকূল। তাঁরা কুপ্রবৃত্তির কামনা ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত। কেউ কেউ বলেছেন, 'জ্ঞানে সুগভীর' বলতে ওই সমস্ত আহলে কিতাবদেরকে বোঝানো হয়েছে যাঁরা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। আমি বলি, এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। মারেফাতবিদগণ বলেন, জ্ঞানে সুগভীর ওই সমস্ত লোক, যাঁরা নফস ও ইন্দ্রিয়প্রবণতাকে ফানা করে কামনাবাসনা থেকে পুরাপুরি পৃথক হতে পেরেছেন। আল্লাহ্তায়ালার জাতী নূরের রহস্যময়তায় তাঁরা এরকম নিমজ্জিত যে, সন্দেহের উদ্রেক তাঁদের মধ্যে হয়ই না। তাঁরা এমন বলেন, পর্দা উঠিয়ে দিলেও যতোটুকু বিশ্বাস আমাদের রয়েছে তার চেয়ে বেশী হবে না। অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাসে অতিরিক্ত কিছুর প্রবেশাধিকার নেই। আমাদের ইমান আইনে মোশাহেদা (প্রত্যক্ষগোচরতা নির্ভর)। আমাদের হক্কুল একীন হাসিল হয়ে গিয়েছে (সুফীগণের পরিভাষায় আল্লাহ্র নূর অবলোকন করাকে মোশাহেদা বলে)।

তিবরানী ও অন্যান্যরা হজরত আবু দারদা থেকে উল্লেখ করেছেন, একবার রসুল স. কে ওয়ার রসেখীনা ফিল ইলম (জ্ঞানে সুগভীর) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, যার জিহ্বায় সত্য কসম উচ্চারিত হয়, অন্তর স্থির থাকে এবং উদর ও লজ্জাস্থান হারাম থেকে মুক্ত তারাই জ্ঞানে সুগভীর। আমি বলি, এই বৈশিষ্ট্য সুফীদের মধ্যে পাওয়া যায়। আয়াতের শব্দবিশ্লেষণের মধ্যে হানাফী ও শাফেয়ীদের মতানৈক্য রয়েছে। একদল বলেন যে, 'ওয়ার রসিখূন' বাক্যের

'ওয়াও' অব্যয়টি সংযোজক হওয়ার কারণে অর্থ দাঁড়াবে এরকম — মোতাশাবেহাত আল্লাহ্ জানেন এবং ওলামায়ে রসিখিনও জানেন। ইয়াকুলূনা আমান্না বিহি - অর্থাৎ ওলামায়ে রসিখিন বলেন, মোতাশাবেহাত এর এই জ্ঞানটুকু আমরা রাখি যে, সম্পূর্ণ কোরআনই আমাদের প্রভুপ্রতিপালক অবতীর্ণ করেছেন আর আমরা এর উপর ইমান এনেছি। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে — লিল ফুক্বারাইল্লাজিনা উখরিজু মিন দিয়ারিহিম — ওয়াল্লাজীনা তাবাউউয়ায়ু দ্দারা ওয়াল ইমান. অতঃপর বলা হয়েছে ওয়াল্লাজীনা জা-উ মিমবা'দিহিম ইয়াক্বলূনা রব্বানাগ্ফিরলানা ওয়ালিইখওয়া মিনাল্লাজীনা সাবাকুনা বিল ইমান। এখানে ইয়াক্বলূনা অর্থাৎ 'তারা বলে' এই কথাটি ওলামায়ে রসিখিনের বিশ্বাসগত অবস্থা - এরকম বর্ণনা করেছেন মুজাহিদ। এবং হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আমি 'ওয়ার রসিখূনা ফিল ইলম' এর অন্তর্ভূত— অর্থাৎ আমি মোতাশাবেহ্র তাফসীর জানি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, যাঁরা মোতাশাবেহ্র অর্থ জানেন আমিও তাদের মধ্যে একজন।

অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, 'ওয়ার রসিখূন' এর 'ওয়াও' বিগত বাক্য ইল্লাল্লাহ্ এর উপর শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে নতুন বাক্য। হজরত উবাই বিন কাব, হজরত আয়েশা এবং হজরত ওরওয়া বিন জুবায়েরের বর্ণনাও এরকম ছিলো। তাউসের বর্ণনায় এই বক্তব্যের সম্পর্ক হজরত ইবনে আব্বাসের দিকেও প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। হাসান বসরী এবং অধিকাংশ তাবেয়ীদের মত ছিলো এরকমই। কুসাই, ফারা এবং আখফাসের নিকট এই বক্তব্যই পছন্দনীয় ছিলো। এর সমর্থন রয়েছে হজরত ইবনে মাসউদের দ্বিতীয় ক্বেরাতের দ্বারাও। তাঁর ক্বেরাত অনুযায়ী 'ওয়ার রসিখুন' এর সংযোগ আল্লাহ্র উপর হওয়া সম্ভব নয়। হজরত উবাই ইবনে কাবের ক্বেরাতেও এই ধারণার সমর্থন মিলে। এইজন্য ওমর বিন আবদুল আজীজ র. বলেছেন, তফসীরে কোরআনের বিদ্যায় 'আমরা ইহা বিশ্বাস করি' এই কথাটি রসিখীন (জ্ঞানে সুগভীর) এর জ্ঞানের শেষ সীমা।

'সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত' — এখানে সমস্ত বলতে মোহকাম, মোতাশাবেহ্, নাসেখ, মনসুখ এবং যার মর্মার্থ জানা যায় এবং যার মর্মার্থ জানা যায় না — সমস্ত কিছুকেই বোঝানো হয়েছে।

আমি বলি, রসেখীনের হাল ওই সমস্ত লোকের হালের বিপরীত, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার প্রভাবে যাদের অন্তর্বিকৃতি ঘটেছে। তাদের মত প্রবৃত্তিপ্রসূত। যখন জ্ঞানের আলো তাদের সম্মুখে প্রতিভাসিত হয় এবং শরিয়তের কোনো হুকুম তাদের ধারণার অনুকূলে আসে তখন সেই প্রতিভাস তাদেরকে অল্প কিছুদূর যেতে সাহায্য করে। তখন তারা তাকে মেনে নেয়। কিন্তু কোরআনের কোনো হুকুমের ব্যাখ্যা না বুঝলে তারা হয়ে পড়ে হতবিহ্বল। শরিয়তের হুকুম তখন হয়ে উঠে তাদের মতের প্রতিকূল। তারা হয়ে পড়ে অমান্যকারী।

বাগবী লিখেছেন, এই বক্তব্য আয়াতের প্রকাশ্য অর্থমন্ডিত এবং আরবী ব্যাকরণের পূর্ণ অনুকূল।

'এবং বোধশক্তি সম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না' — বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিচয় এই বাক্যাংশটিতে ফুটে উঠেছে। যার জ্ঞান নেই তাকে জ্ঞানীদের উপর নির্ভর করতে হবে। না জানার কারণে জানার ইচ্ছাকে রুদ্ধ করা, মুর্খদের সাথে একাত্ম হয়ে অজ্ঞতাকে মেনে নিয়ে বিভ্রান্তিতে নিপতিত থাকা কোনো জ্ঞানীর কাজ নয়।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৮

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ○

❑ হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য-লংঘন প্রবণ করিওনা এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে করুণা দাও, তুমিই মহা দাতা।

এই আয়াতটি একটি পবিত্র প্রার্থনা। বক্তব্য হচ্ছে, হে আমাদের প্রতিপালক! কুটিলতাকন্টকিত মানুষের মতো আমাদের অন্তরকে সত্যবিমুখ কোর না। তুমি আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করে আমাদেরকে পথ-প্রদর্শন করেছো। মোহকাম ও মোতাশাবেহ্র উপর বিশ্বাসবান হতে সুযোগ দান করেছো। আমাদেরকে রহমত অর্থাৎ সহায়তা এবং ইমানী শক্তি দান করো। নিশ্চয়ই তোমার দান সুপ্রচুর। প্রয়োজন পূরণ করো তুমি-ই।

এখানে প্রমাণিত হচ্ছে, হেদায়েত কিংবা গোমরাহী সবকিছুই আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্তনির্ভর। সবকিছুই নির্ভর করে তাঁর সহায়তা (তওফিক) দেয়া না দেয়ার উপর। তিনি আপন বান্দাদের প্রতি মেহেরবান। কিন্তু মেহেরবানী করতে বাধ্য নন।

হজরত নাওয়াস বিন সাময়ান বর্ণনা করেন, কোনো অন্তরই আল্লাহ্তায়ালার দুই আঙ্গুলের আওতাবহির্ভূত নয়। তিনি অন্তরসমূহকে ইচ্ছা করলে সোজা রাখেন, ইচ্ছা করলে বক্র করে দেন। রসুল স. প্রার্থনা করতেন, হে অন্তরের আবর্তনবিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরসমূহ তোমার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখো।

সম্মান, অসম্মান আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্ত অনুসারেই হয়ে থাকে। কিয়ামত পর্যন্ত তিনি কোনো সম্প্রদায়কে সম্মানিত এবং কোনো সম্প্রদায়কে অসম্মানিত করতে থাকবেন। এই ধরনের হাদিস ইমাম আহমদ এবং তিরমিজি হজরত উম্মে

সালমা থেকে এবং মুসলিম হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে এবং তিরমিজি ও ইবনে মাজা হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। বোখারী ও মুসলিম জননী আয়েশা এবং হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, অন্তর সমূহ এরকম — যেমন কোনো পালক খোলা মাঠে পড়ে রয়েছে এবং বাতাস তাকে এদিক ওদিক করে দিচ্ছে। আহমদ।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

❒ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানবজাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করিবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই; আল্লাহ্ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না।

এই আয়াতটিও একটি পুতপবিত্র প্রার্থনা। বলা হচ্ছে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করি, কিয়ামত নিশ্চিত। তুমি সেদিন বিচারের জন্য সকলকে একত্রিত করবে — একথাও নিশ্চিত। তোমার নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম হয় না। তোমার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অঙ্গীকার ভঙ্গ তোমার মর্যাদার পক্ষে অশোভনীয়।

এই বাক্যের প্রেক্ষিতে ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে শাস্তির মেয়াদকে দীর্ঘায়িত করা আমাদের মতে বৈধ। তওবা করা হলেও। না হলেও। মোতাজিলারা বলে, শাস্তির অঙ্গীকার বিলম্বিত হওয়া বৈধ। প্রমাণ হিসাবে তারা এই আয়াতকে পেশ করে।

আমরা বলি, এই আয়াত মতলক নয় মুকাইয়েদ অর্থাৎ আসল নয় বরং শর্ত। মন্দের শাস্তি শর্তযুক্ত। ফাসেক যদি তওবা না করে তবে শাস্তি হবে। তওবা করলে হবে না। তওবা না করার কারণে শাস্তি হলে, ক্ষমা না করার কারণে শাস্তি হবে। অর্থাৎ পাপীদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা না করলে আযাব হবে। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। অন্যান্য পাপগুলো তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন।' আরো বলেছেন, 'তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন — যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন।' অন্যত্র বলেছেন, 'বিপথগামীরা ব্যতীত আল্লাহ্র রহমত থেকে কেউ নিরাশ হয়না।' আবারো বলেছেন, 'আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।' এই প্রসঙ্গের হাদিস রয়েছে অনেক।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান সন্তুতি আল্লাহের নিকট কোন কাজে লাগিবেনা; এবং ইহারাই অগ্নির ইন্ধন।

❒ ফেরাউনী সম্প্রদায় ও তাহাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করিয়া অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে আল্লাহ্ তাহাদের পাপের জন্য তাহাদিগকে শাস্তিদান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ দন্ডদানে অত্যন্ত কঠোর।

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে বল, 'তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হইবে এবং তোমাদিগকে জাহান্নামে একত্রিত করা হইবে। আর উহা কত নিকৃষ্ট আবাস স্থল!'

কাফের (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) বলতে এখানে ইহুদী, খৃষ্টান এবং সকল প্রকার মূর্তিপূজককে বোঝানো হয়েছে। তাদের সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি আসল কাজের বেলায় নিষ্ফল হবে। এসবের কারণে তারা আল্লাহ্ পাকের রহমতও লাভ করতে পারবে না, আল্লাহ্তায়ালার আজাবও রোধ করতে পারবে না। তারাই দোজখের ইন্ধন। তাদের আচরণ ফেরাউন সম্প্রদায়ের মতো। ফেরাউন সম্প্রদায় নবীদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতো। এরাও তাই করে। ফেরাউন সম্প্রদায়ের পূর্বে যারা ছিলো, তাদের সাথেও এদের বিশ্বাস ও কর্মগত সাযুজ্য রয়েছে। তারা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহকে মিথ্যাচ্ছন্ন করেছে — তাই আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছেন এবং শাস্তি দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী। আর তাঁর শাস্তিও সুদৃঢ়।

আবু দাউদ, ইবনে জারীর এবং বায়হাকী মোহাম্মদ বিন ইসাহাকের ধারাবাহিকতায় সাইদ বিন জোবায়ের ও ইকরামার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এভাবে, বদরবিজয়ের পর রসুলে পাক স. মদীনায় ফিরে এসে বনী কায়নুকার বাজারে ইহুদীদেরকে একত্রিত করলেন। বললেন, শোনো ইহুদীরা! ইতোপূর্বে তোমাদের উপর কোরায়েশদের মতো বিপদ নেমে এসেছিলো, সুতরাং মুসলমান হয়ে যাও। ইহুদীরা বললো, মোহাম্মদ! কোরায়েশদের কিছু লোকদের হত্যা করেছো বলে অহংকার কোর না। তারা তো অনভিজ্ঞ। যুদ্ধবিদ্যা তারা জানেই না। আমাদের সাথে যুদ্ধ করলে বুঝবে আমরা কেমন। আমাদের তুল্য কেউ নেই। এই কথোপকথনের পর আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, 'হে নবী ! আপনি কাফেরদেরকে অর্থাৎ ওই সমস্ত ইহুদীদেরকে বলে দিন, অতি সত্ত্বর তোমরা পরাজিত হবে।' আল্লাহ্তায়ালার ঘোষণা সফল হলো। বনী কোরাইজাকে হত্যা করা হলো। বনি নাজিরকে তাড়িয়ে দেয়া হলো। খয়বর দুর্গ বিজিত হলো। এবং সেখানকার ইহুদীদের উপর জিজিয়া কর নির্ধারিত হলো।

মুকাতিল রা. বর্ণনা করেন, এই আয়াত বদর যুদ্ধের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। 'কাফের' দ্বারা এখানে মক্কার মূর্তিপূজকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ বলা হয়েছে, আপনি মক্কার কাফেরদেরকে বলে দিন, তোমরা বদরে পরাজিত হবে। রসুল পাক স. তাদেরকে বদরের দিন বলেছিলেন, আল্লাহ তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত। তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

আবু সালেহের বর্ণনা থেকে কালাবী, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন, বদর যুদ্ধে অংশীবাদীরা পরাজিত হলে মদীনার ইহুদীরা বলতে শুরু করলো, আল্লাহর কসম! তিনি তো ওই নবী যার সুসংবাদ হজরত মুসা আ. দিয়েছিলেন। তাঁর পতাকা অপ্রতিরোধ্য। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, রসুল স. এর অনুসারী হওয়াই উত্তম। কেউ কেউ বললো, এতো তাড়াতাড়ি কেনো? আরো দু'একটি ঘটনা দেখে নাও। এরপর উহুদ যুদ্ধে সাহাবীগণ পরাজিত হলে ইহুদীরা দ্বিধাদীর্ণ হয়ে পড়লো। প্রবৃত্তি প্রবল হলো, তারা আর মুসলমান হলো না। মুসলমান ও ইহুদীর মধ্যে যে সন্ধি ছিলো, তা তারা ভঙ্গ করে ফেললো নির্ধারিত সময়ের আগেই। কাব বিন আশরাফ সাত সদস্যের এক দল নিয়ে মক্কায় পৌছলো এবং মক্কাবাসীদেরকে যুদ্ধে উৎসাহিত করতে লাগলো। সিদ্ধান্ত হলো, তারা একযোগে রসুল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তখন আল্লাহতায়ালা ওহি অবতীর্ণ করে জানালেন, তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর জাহান্নাম কতোই না নিকৃষ্ট আবাস।

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِیْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْیَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ۝

❐ দুইটি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিলো। একদল আল্লাহের পথে সংগ্রাম করিতেছিল, অন্যদল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ছিলো; তাহারা উহাদিগকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখিতে ছিল। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় ইহাতে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে।

যুদ্ধের প্রান্তরে মুখোমুখি দুই দল—এই অবস্থা আল্লাহতায়ালার মহান নিদর্শন। সত্য প্রত্যাখ্যানকারী দল ইহুদী অথবা মুশরিক। আয়াতের উদ্দেশ্য ইহুদীরা। যদি পূর্ববর্তী আয়াতের উদ্দেশ্য ইহুদীরা হয়, অথবা মুশরিকেরা যদি পূর্ববর্তী আয়াতের উদ্দেশ্য মক্কার মুশরিকরা হয়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, হে মুশরিকের দল দেখো, আমার নবুয়তের নিদর্শন এবং প্রমাণ কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহর পথে সংগ্রামকারীরা সংখ্যায় ছিলেন তিনশ' তেরজন। সত্তরজন মুহাজির এবং দুইশ' ছত্রিশজন আনসার। মোহাজিরদের পতাকা বহন করছিলেন হজরত আলী — এটাই বিশুদ্ধ বর্ণনা। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন পতাকা বহনকারী ছিলেন হজরত মুসয়াব বিন উমাইর। আনসারদের নিশানবাহী ছিলেন, হজরত সা'দ বিন ওবাদা। সেনাদলের উট ছিলো সতেরটি, ঘোড়া দুইটি। একটি হজরত মেকদাদ বিন আমরের এবং অন্যটি হজরত মারসাদ বিন আবী মারসাদের। এছাড়া অন্য সবাই ছিলেন পদাতিক। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিলো, ছয়টি বর্ম এবং আটটি তরবারী।

অপর দলটি মক্কার মুশরিকদের। তাদের সৈন্য সংখ্যা নয়শত পঞ্চাশ। সেনাপতি ছিলো উৎবা বিন রবীয়া বিন আবদে শামশ। পাঁচশ ঘোড়া ছিলো তাদের। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো বদর প্রান্তরে। এ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন রসুল পাক স. স্বয়ং। এটাই মুসলমান ও কাফেরদের প্রথম যুদ্ধ। হিজরতের আঠার মাস পরে দ্বিতীয় হিজরীতে রমজান মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। কাফেররা মুসলমান বাহিনীকে দ্বিগুণ দেখছিলো। এখানে কাফের বলতে ইহুদীদেরকে বোঝানো হলে, বুঝতে হবে, ওই সমস্ত ইহুদীরা যারা বদর প্রান্তরে পৌঁছেছিলো এই উদ্দেশ্যে যে, দেখা যাক যুদ্ধের মোড় কোন দিকে ঘোরে। অবস্থা এ রকম

ছিলো যে, কখনো মুসলমানরা কাফেরদেরকে দ্বিগুণ দেখছিলো আবার কখনো কাফেররা দ্বিগুণ দেখছিলো মুসলমানদেরকে। 'দ্বিগুণ' অর্থ এখানে অধিক অথবা অত্যাধিক। সংখ্যাগত গণনার ভিত্তিতে দ্বিগুণ নয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে কাফেররা দেখেছিলো, মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম। এই অবস্থা তাদেরকে উদ্ধত করে তুললো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তারা দেখলো মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ। তখন তারা ভীত হলো, মুষড়ে পড়লো। পরিশেষে পরাজয় বরণ করলো। অপর দিকে কাফেরদের সংখ্যা কম দেখতে পেয়ে মুসলমানরা দৃঢ়চিত্ত হলো। আর দৃঢ়চিত্ততার ফল স্বরূপ বিজয়ী হলো। তাদের দৃঢ়চিত্ততার মূল কারণ অবশ্য ছিলো, আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুতি, 'অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে একশতজন দৃঢ়পদ থাকে, তবে তারা দুইশত জনের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।'

হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, প্রথমে আমরা কাফেরদেরকে দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিলাম। পরে দেখলাম, তারা ও আমরা সমান সংখ্যক। এরপরে আমাদের দৃষ্টিতে তাদের সংখ্যা গেলো কমে। আমি আমার সামনের জনকে বললাম, আশ্চর্য! আমাদের একজনকে তো সত্তরজন মনে হচ্ছে। তিনি বললেন, আমার তো মনে হচ্ছে, একশ'।

আল্লাহতায়ালা যাকে চান তাকে আপন শরণ দানে শক্তিশালী করেন। এই ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কমকে বেশী দেখানো এবং প্রায় নিরস্ত্রদেরকে পূর্ণ সশস্ত্রদের উপরে বিজয়ী করা আল্লাহতায়ালা ইচ্ছা ও সাহায্যেই সম্ভব। এই ঘটনা প্রত্যক্ষকারী যারা একদল অপর দলকে দেখেছে অথবা যারা উভয় দলকে দেখেছে তাদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۝

❒ নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেত খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুন্দর করা হইয়াছে। এই সব ইহ-জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ, তাহার নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল।

সৌন্দর্যের প্রতি আসক্তি মানুষের স্বভাবজ ব্যাপার। কাম্য বস্তু সকল সময়ের জন্যই প্রিয়। পার্থিব সৌন্দর্য পৃথিবীপ্রেমীদেরকে মোহিত করে। শারীরিক শক্তি, সুন্দর অবয়ব, সুন্দর পোশাক, ঘোড়া অথবা বৈভব, সম্মান — এ সমস্তকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। নৈসর্গিক সৌন্দর্য মানুষকে অভিভূত করে। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করেছি।' অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের দিকেও মানুষের আকৃষ্টি রয়েছে। এই আকৃষ্টি বিশুদ্ধতার দিকেও হতে পারে। অবিশুদ্ধতার দিকেও হতে পারে। যেমন, অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'এবং তিনি তোমাদের অন্তরকে দিয়েছেন ইমানের প্রতি অনুরাগ।' বিপরীত দিকের দৃষ্টান্ত এ রকম, 'তাদের মন্দ আমল তাদের চোখে সুশোভিত করা হয়েছে।'

কামনা বাসনা প্রিয় বস্তুসমূহের প্রতি ধাবিত হয়। সৌন্দয্য নির্ধারিত হয় অন্তরের আকর্ষণের ভিত্তিতে। প্রেম, প্রেমাষ্পদ, কামনা, দুই ধরনের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।

১. সদুপদেশ এবং সত্যান্বেষণ মিলিতভাবে এক প্রকার আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

২. স্বাভাবিক বৃত্তি মানুষকে মগ্ন করে রাখে সম্পদ, সন্তান সন্তুতি ও রমণীদের প্রতি। বিশুদ্ধতার প্রশ্ন এক্ষেত্রে মুখ্য কিছু নয়। লাইলী এবং লাইলীর মহব্বত — দুইই ছিলো কায়েসের কাছে প্রিয়। সে বলেছিলো,ইয়া ইলাহি, লাইলীর মহব্বত থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন কোর না।

সাহেবে কাশ্শাফ লিখেছেন, আল্লাহতায়ালার নিকট থেকে পুণ্যার্জনের অভিলাষকে প্রবল করার মাধ্যমে পার্থিব শোভন সামগ্রীসমূহের আকর্ষণমুক্ত হওয়া সম্ভব। সতর্কতা ও বিরত থাকার অনুশীলন থাকতে হবে। পার্থিব আকর্ষণ মূলত আপন প্রবৃত্তিরই আকর্ষণ। এই আকর্ষণ মানবসত্তাকে পূণ্যপথ থেকে সরিয়ে রাখে। সুশোভিত বস্তুসমূহের স্রষ্টা আল্লাহ। এ সমস্তের প্রতি আকর্ষণও সৃষ্টি করেছেন তিনিই। করেছেন এ কারণে যে, বিপরীত পরিস্থিতির মাধ্যমেই পরীক্ষা সম্পন্ন হতে পারে। যেমন তিনি বলেছেন, 'ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুকে আমি সৌন্দর্যের উপকরণ করে দিয়েছি, যেনো আমি মানুষকে পরীক্ষা করে নিই — অধিকতর উত্তম আমল সম্পাদনকারী কারা।' দ্বিতীয়তঃ পৃথিবী আমলের স্থান। তৃতীয়তঃ পার্থিব সৌন্দর্যরাজি যেনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ হয়। চতুর্থতঃ আখেরাতের কল্যাণ নিষিদ্ধতা বর্জনের মধ্যেই। পঞ্চমতঃ এই পরীক্ষার মাধ্যমে ফেরেশতাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। ষষ্ঠতঃ কাফেরদের পতনের পথ সুগম করে দেয়া হয়। যেমন বলা হয়েছে, 'তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট করেন।' অতপর এ কথা সহজে অনুমেয় যে, জীবনের এই বৈপরীত্যের মধ্যে রয়েছে হিকমত। রয়েছে চিরস্থায়ী জীবন লাভের নন্দিত সাধনার সুযোগ।

সৌন্দর্যের স্রষ্টা আল্লাহ। সাধারণভাবে সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্টি ক্ষতিকর নয়। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'আপনি বলুন কে হারাম করলো আল্লাহর সৃষ্ট পোশাক যা তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য বানিয়েছেন।' কিন্তু সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ যদি সৌন্দর্যের স্রষ্টা সম্পর্কে উদাসীন করে দেয়, তবেই বিপদ। এই বিস্মরণের কারণ শয়তান এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা। বিস্মৃত মানুষ তার আপন কর্মেই মগ্ন। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'আর এমনিভাবে আমি সুশোভিত করে দিয়েছি প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাদের কার্যসমূহকে।'

এবং আমি সুসজ্জিত করেও রেখেছি তাদের কার্যাবলীকে। তাই তারা উদভ্রান্তির শিকার।' অন্যত্র বলেছেন, 'শয়তান তাদের কাজগুলোকে তাদের দৃষ্টিতে লোভনীয় করে রেখেছে।' আরো বলেছেন, 'শয়তান তাদের কার্যগুলোকে আকর্ষণীয় করে রেখেছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে দূরে রেখেছে।' এই আয়াতে পার্থিব সৌন্দর্যের তালিকায় রমণী, সন্তান-সন্তুতি, বিপুল বিত্ত-বৈভব, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেতখামারের কথা বলা হয়েছে। বিপুল বিত্ত-বৈভবের সংজ্ঞা সুনির্ধারিত নয়। হজরত মুআজ বিন জাবাল বলেছেন, এর পরিমাণ দুইশত আউকিয়া। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বার শত মিসকাল অথবা বার হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দিনার। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের এবং হজরত ইকরামা বলেছেন, শত হাজার এবং শত সের শত রেতল (পাউন্ড) এবং শত মেসকাল এবং শত দিরহাম (অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর পরিমাণ একশত)। সুদ্দী বলেছেন, চার হাজার মিসকাল। হাকেম বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুকেই বিপুল বিত্ত-বৈভব (ক্বিনতর) বলা যেতে পারে। কেউ কেউ বলেন, গাভীর চামড়া ভর্তি মেশক হলো ক্বিনতর। বিষয়টি মতানৈক্যদীর্ণ।

ক্বিনতরের পরের শব্দটি 'মুক্বনতর' এর অর্থ, পুঞ্জীভূত সম্পদ বা রাশিকৃত বৈভব। জুহাক বলেছেন, এর অর্থ — সুদৃঢ় (মজবুত)। সাদী বলেছেন, এর অর্থ সম্পদ জমানোর স্থান (ব্যাংক)। ফারাহ বলেছেন, কয়েক গুণ অর্থাৎ দ্বিগুণ চর্তুগুণ — এ রকম।

মুক্বনতরের পরের শব্দ যাহাব-এর এক অর্থ যাওয়া। আসল অর্থ স্বর্ণরৌপ্য। যাওয়া আসা স্বর্ণরৌপ্যের স্বভাব।

এর পরের উল্লেখে রয়েছে চিহ্নিত অশ্ব এবং গবাদিপশু — উট, গাভী, মহিষ, বকরী ইত্যাদির কথা। সব শেষে রয়েছে শস্যক্ষেত্র। আল্লাহ্তায়ালা জানিয়েছেন, এ সমস্ত বস্তু মনকে ভোলায়। এমনভাবে ভোলায় যে, এ সবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার কথা আর মনে পড়ে না। আল্লাহতায়ালা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, এ সমস্ত কিছু ধ্বংসশীল; প্রকৃত আশ্রয় আল্লাহতায়ালাই। হজরত কাতাদা বলেন, হজরত ওমর এই আয়াত পাঠ শেষে বলতেন, হে আমার আল্লাহ! আমার ও

আমার সন্তান সন্তুতির জন্য ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ নির্ধারণ করুন এবং দান করুন আখেরাতের উত্তম অংশ। আর আখেরাতই তো স্থায়ী।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ○

❒ বল, আমি কি তোমাদিগকে এই সব বস্তু হইতে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দিব? যাহারা সাবধান হইয়া চলে তাহাদের জন্য উদ্যানসমূহ রহিয়াছে যাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহের নিকট হইতে সন্তুষ্টি রহিয়াছে। আল্লাহ্ তাহার দাসদের দ্রষ্টা।

পার্থিব ধ্বংসশীল সৌন্দর্যের বিপরীতে আল্লাহতায়ালা সংবাদ দিয়েছেন জান্নাতের, পূতপবিত্র রমণীদের, যারা ঋতুবতী হওয়া থেকে পবিত্র, প্রাকৃতিক প্রয়োজনাদি থেকে মুক্ত এবং কুমারী। শেষে বলেছেন, আল্লাহতায়ালার সন্তোষভাজন হওয়ার কথা। সন্তান সন্তুতির উল্লেখ করেন নি। কেননা, সন্তান লাভের ইচ্ছা এবং প্রয়োজন হয় পৃথিবীতে। ঘোড়া, চতুস্পদ জন্তু এবং স্বর্ণরৌপ্যেরও উল্লেখ করেননি। কারণ এ সমস্তের প্রয়োজনও বেহেশতবাসীরা অনুভব করবেন না।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহতায়ালা বলবেন, হে বেহেশতীবৃন্দ। বেহেশতীরা উত্তর দিবে, হে আল্লাহ্, আমরা উপস্থিত। কল্যাণসমূহ তোমারই। আল্লাহতায়ালা বলবেন, তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা কি আরো বাড়িয়ে দেবো? তাঁরা বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আরো কিছু কি আছে! আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের উপর অবতীর্ণ করবো আমার সন্তোষ। কখনো আর অসন্তুষ্ট হবো না। বোখারী, মুসলিম।

আমি বলি, এই আয়াতে বেহেশতের উল্লেখ করে মানুষের অন্তরের সমস্ত কামনা বাসনা চরিতার্থ হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, বেহেশতে তোমরা যা চাইবে তাই পাবে। তোমাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে। সন্তান সন্তুতি,

আপনজন বেহেশতে একত্রিত হবে। পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎও হবে। আল্লাহ বলেছেন, আমি তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে সমমর্যাদাভূত করবো। তাদের আমলসমূহ বিন্দু পরিমাণও সংকুচিত করবো না। একবার রসুলে পাক স. কে জিজ্ঞেস করা হলো, জান্নাতে কি কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হবে? রসুল স. বললেন, সন্তান লাভের ইচ্ছা হলে গর্ভধারণের ঘটনা ঘটবে এক ঘন্টার মধ্যেই। জন্মলাভ করার পর শিশুর বয়স নির্ধারিত হবে জান্নাতবাসীর ইচ্ছানুসারে। তিরমিজি।

তিরমিজি বলেছেন, এই হাদিসটি হাসান। বায়হাকীও এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। হান্নাদ তাঁর জুহুদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন হজরত আবু সাঈদের বর্ণনা থেকে। আরো উল্লেখ করেছেন হাকেম এবং ইসপাহানী।

জান্নাতে স্বর্ণরৌপ্যও থাকবে। বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহতায়ালার এক জান্নাত এ রকম, যার ভবনসমূহ নির্মিত হয়েছে রূপা ও সোনার ইট দিয়ে, এগুলোকে জোড়া দেয়া হয়েছে মেশক আম্বর দিয়ে। বায্যার, তিবরানী। বায়হাকী হজরত আবু সাঈদ থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করেছেন, দুটি বেহেশত থাকবে রৌপ্য নির্মিত, যার তৈজসপত্র এবং আসবাবসামগ্রী সবই হবে রূপার। দু'টি বেহেশত হবে সোনার, তার তৈজসপত্র এবং আসবাবাদি সোনারই হবে। বোখারী, মুসলিম।

বেহেশতে ঘোড়া ও চতুষ্পদ জন্তু থাকার কথাও জানা যায়। একবার এক বেদুইন বললেন, হে আল্লাহর রসুল, আমি ঘোড়া ভালোবাসি। বেহেশতে কি ঘোড়া থাকবে? রসুল স. বললেন, তুমি বেহেশতে প্রবেশ করলে তোমাকে দেয়া হবে ইয়াকুতের ঘোড়া। তার দু'টি পাখা হবে। তোমাকে তাতে বসানো হবে। তারপর তুমি যেমনটি চাইবে, ঘোড়া তোমাকে তেমনিভাবে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, হজরত আবু আইয়ুব থেকে।

ইবনে মোবারক হজরত শফী বিন মানে থেকে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতের আনন্দসম্ভারের মধ্যে এরকম ব্যবস্থা থাকবে যে, তাঁরা একে অপরের নিকট সাক্ষাত করতে গেলে উট এবং ঘোড়ায় চড়ে যাবে এবং জুমআর দিনে তাদেরকে দেয়া হবে লাগামবিশিষ্ট জীন সজ্জিত ঘোড়া। সেগুলো কখনো মলমূত্র পরিত্যাগ করবে না। আল্লাহ জান্নাতীদেরকে এগুলোর উপরে চড়িয়ে যেখানে নিতে ইচ্ছা করেন নিয়ে যাবেন।

হজরত ইবনে আবুদ্দুনিয়া এবং আবু শায়েখ ও ইসপাহানী হজরত আলীর মারফু হাদিসে বর্ণনা করেন, বেহেশতের এক বৃক্ষের উচ্চ অংশ থেকে পোশাক পরিচ্ছদ এবং নিচের অংশ থেকে শাদা কালো মিশ্রিত সোনার ঘোড়া সৃষ্ট হবে। সেগুলোর জীন হবে মোতির এবং লাগাম হবে ইয়াকুতের তৈরী। সেগুলোর দু'টি করে ডানা থাকবে। ডানাগুলো হবে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। ঘোড়াগুলো মলমূত্র পরিত্যাগ করবে না। এগুলোর আরোহী হবেন আল্লাহর ওলীগণ। তাঁরা উড়ন্ত

ঘোড়ায় চড়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবেন। নিচের মানুষেরা বলবেন, তাঁরা তো আমাদের আলোকে অন্ধকার করে দিয়েছেন। (আল্লাহ্ অথবা ফেরেশতা) বলবেন, তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করতো আর তোমরা করতে কার্পণ্য। তারা করতো জেহাদ আর তোমরা ছিলে জেহাদবিমুখ।

ইবনে মোবারক, হজরত ইবনে ওমরের উক্তি উল্লেখ করেছেন, জান্নাতে উত্তম অশ্ব এবং উচ্চ মানের উট থাকবে। ওগুলোর আরোহী হবে জান্নাতিরা। ইবনে ওহাব, হাসান বসরীর উক্তি উল্লেখ করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, সবচেয়ে নিম্নমর্যাদাধারী জান্নাতবাসীর থাকবে হাজার হাজার গেলমান (অল্পবয়স্ক পরিচারক)। তারা ইয়াকুতের লাল ঘোড়ার উপর চড়বে। ঘোড়াগুলোর ডানা হবে স্বর্ণনির্মিত।

জান্নাতে চাষাবাদের বিবরণও পাওয়া যায়। বোখারী হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, একজন জান্নাতবাসী আল্লাহতায়ালার নিকট কৃষিকর্মের অনুমতি চাইলে আল্লাহ বলবেন, জান্নাত কি তোমার অভিলাষ পূরণে যথেষ্ট নয়? বেহেশতবাসী আরজ করবেন, কেনো নয়। কিন্তু আমি যে চাষাবাদ করতে চাই। সে চাষাবাদ শুরু করবে। চোখের পলকে তার প্রান্তর হয়ে উঠবে শস্যময়। ফসল কর্তনের পর তার ফসল জমা হয়ে যাবে পাহাড় পরিমাণ। আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার কোনো ইচ্ছা অপূরণীয় রাখবো না।

তিবরানী এবং আবু শায়েখও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় আরো রয়েছে, ক্ষেতের একেকটি সব্জী হবে বারো হাত লম্বা এবং এর জন্য তাকে কোনো পরিশ্রমও করতে হবে না। স্তূপীকৃত ফসল হয়ে যাবে টিলার মতো।

এবার সন্তান সন্তুতি প্রসঙ্গ। সন্তান-সন্তুতি তারাই লাভ করবে পৃথিবীতে যাদের সন্তান হয়েছিলো। যাদের হয়নি তারাও ইচ্ছা করলে সন্তান সন্তুতি লাভ করবে। সাধারণভাবে জান্নাতবাসীদের সন্তান লাভের বাসনা থাকবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতবাসী কেউ সন্তান চাইলে, পাবে। কিন্তু এ ধরনের ইচ্ছা সাধারণত হবে না।

এরপর আল্লাহ পাক এমন এক নেয়ামতের উল্লেখ করবেন, যা অনুভবসাপেক্ষ নয়। এটাই সর্বোচ্চ নেয়ামত — আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি। আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টিই পৃথিবীর নেয়ামত থেকে জান্নাতের নেয়ামতসমূহকে সম্মানিত করেছে। পৃথিবী অভিসম্পাতগ্রস্ত এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই অভিশপ্ত। অবশ্য পৃথিবীর জাকেরীণ (আল্লাহর স্মরণকারী), আলেমে দ্বীন এবং দ্বীনের এলেম অন্বেষণকারীগণ এর ব্যতিক্রম। তিবরানী হজরত ইবনে মাসউদ থেকে, হজরত আবু দারদা থেকে এবং ইবনে মাজা হজরত আবু হোরায়রা থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন।

রবিয়া হারাসী রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমাকে স্বপ্নে বলা হয়েছে, একজন নেতা একটি গৃহ নির্মাণ করলেন। আপ্যায়ণের জন্য আহার্য প্রস্তুত করলেন। তারপর নিযুক্ত করলেন একজন আহবানকারীকে। যে সাড়া দিলো, সে ওই ঘরে প্রবেশ করতে পারলো এবং পানাহার করে পরিতৃপ্ত হলো। গৃহস্বামী (নেতা)ও আনন্দিত হলেন। যে বিমুখ থাকলো সে গৃহে প্রবেশ করতে পারলো না, পানাহারের সুযোগও পেলো না। তার প্রতি গৃহস্বামী অসন্তুষ্ট হলেন। এর ব্যাখ্যায় রসুল স. বললেন, গৃহস্বামী হলেন আল্লাহ। আহবানকারী মোহাম্মদ স.। গৃহটি ইসলামের গৃহ। আর নিমন্ত্রণের স্থান বেহেশত। দারেমী।

আমি বলি, পৃথিবীর বিত্ত-বৈভবকে আল্লাহ ভালোবাসেন না। তাই এদিকে মগ্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'আর আপনি কখনো ওই সমস্ত বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করবেন না, যদ্বারা ভোগোন্মত্ত কাফেরেরা পরিতৃপ্ত হয়, ওসব তো শুধু পার্থিব জীবনের চমক।' জান্নাতের বিত্ত-বৈভব আল্লাহতায়ালার পছন্দনীয়। এর প্রতি যারা আকৃষ্ট হয় তারাই প্রশংসার পাত্র। এ মতন আকৃষ্টিই আল্লাহতায়ালা চান। যেমন আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'এ রকম বস্তুর প্রতি লালসা করা উচিত।' পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংসশীল, নতুনত্বের কলংকে কলংকিত। এ সমস্ত ধ্বংসশীল বস্তু আল্লাহতায়ালার পূর্ণত্বের প্রতিচ্ছবিকে অবলম্বন করে অস্তিত্ব লাভ করে এবং চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এ সমস্তের অস্তিত্ব আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের প্রতিচ্ছায়া তুল্য। যেমন, অজ্ঞতা অস্তিত্বশীল হয় প্রজ্ঞারূপে আল্লাহতায়ালার জ্ঞানের আবির্ভাবে। অক্ষমতা রূপ নেয় ক্ষমতার, আল্লাহতায়ালার ক্ষমতার সহায়তায়। সৃষ্টির এ রকম জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রতিবিম্বনির্ভর। এভাবেই চলেছে নিত্য নতুন সৃজনশীলতা। এতে কোনো কল্যাণ নেই, পূর্ণতাও নেই। এর পরিণাম নিশ্চিত ধ্বংস। কিন্তু আখেরাত এর বিপরীত। আখেরাত আল্লাহতায়ালার গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত বলে এর অস্তিত্ব হবে অক্ষয়, চিরস্থায়ী। তাই আখেরাতের আকর্ষণ আল্লাহতায়ালার আকর্ষণের মতো। আখেরাতের ভালোবাসা প্রকৃত অর্থে আল্লাহতায়ালারই ভালোবাসা।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র. লিখেছেন, নবী এবং ওলীগণের আকর্ষণ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো দিকে হয় না। কিন্তু দেখা যায় হজরত ইয়াকুব আ. হজরত ইউসুফ আ. এর প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট ছিলেন। রহস্য এই যে, হজরত ইউসুফ আ. এর সৌন্দর্য ছিলো অবিকল জান্নাতবাসীদের সৌন্দর্য। তাই তাঁর প্রতি মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালারই মহব্বত ছিলো। রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, আমি যদি কাউকে খলিল (বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করতাম, তবে গ্রহণ করতাম আবু বকরকে। কিন্তু তোমাদের সাথী যে আল্লাহকেই খলিল রূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। মুসলিম।

জ্ঞাতব্য ঃ মুমকিনুল ওজুদ বা প্রত্যেক সম্ভাব্য বস্তুই বিলয়শীল। চিরন্তন নয়।

ইস্কান্দরের ইহুদীরা এবং তাদের অভিভাবকগণ সম্ভাব্য বস্তুনিচয়কে চিরন্তন বলে থাকে। তারা বলে, প্রত্যেক সম্ভাব্য বস্তু নিজে নিজেই হয়, কেউ সৃষ্টি করে না। কিন্তু কারণের দিক থেকে এদের অস্তিত্ব চিরন্তন, যার কোনো আরম্ভ নেই। আমরা বলি, সম্ভাব্য বস্তু সমূহের মূল বিনষ্টি ও ক্ষতিগ্রস্ততা। ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে অস্তিত্বের অভ্যুদয় সম্ভব নয়। সৃষ্টজগতের সকল কর্মকান্ড আল্লাহতায়ালার জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সৃষ্টজগতের উপর আল্লাহাতায়ালার গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া পতিত হলে সৃষ্টি বিকশিত হয়ে ওঠে। অজ্ঞ মানুষ এই ছায়াকেই প্রকৃত অস্তিত্ব মনে করে থাকে। অস্তিত্ব অর্থ, চিরন্তন অস্তিত্ব। কিন্তু সৃষ্টি তো চিরন্তন নয়। চোখের সামনে আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি, সবকিছুর গতি ও পরিণতি ধ্বংস ও ক্ষতির দিকে। সুতরাং বিলিয়মানতাই যার পরিণতি তা কখনো কল্যাণকর হতে পারে না। পূর্ণ সৌন্দর্যমন্ডিতও হতে পারে না। প্রতিচ্ছায়ার প্রকৃত ভিত্তি নেই। স্থায়ী সৌন্দর্যও নেই। অপরদিকে আখেরাতের নেয়ামত সম্ভার এবং বিপদ মুসিবত চিরস্থায়ী। তার শুরু আছে শেষ নেই। বরং তা যেনো আল্লাহতায়ালার পূর্ণ গুণাবলীর প্রকাশ। সেখানে প্রতিবিম্বজাত কিছু নেই। আল্লাহতায়ালার দয়া এবং নির্দয়তা সেখানে চিরস্থায়ী। তাই নবী এবং ওলিগণ এবং তাদের পথ প্রদর্শন প্রচেষ্টা কল্যাণকর। কারণ, তাঁরা পৃথিবীতে অবস্থানকালেও আখেরাতের অভিলাষী। আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬, ১৭

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ۝

❒ যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করিয়াছি; সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে আগুনের আজাব হইতে রক্ষা কর;'

❒ তাহারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং ঊষাকালে ক্ষমা প্রার্থী।

আমরা বিশ্বাস করেছি, সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো — এ রকম কথায় প্রমাণিত হচ্ছে, শুধুমাত্র ইমানই ক্ষমা লাভের জন্য যথেষ্ট। হজরত মুআজ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বান্দাদের উপর আল্লাহর দাবী এই যে, তারা তাঁর

ইবাদত করবে আর কোনোকিছুকে তাঁর অংশী করবে না। এবং আল্লাহর উপর বান্দাদের দাবী এই যে, মুশরিক (অংশীবাদী) ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেয়া হবে না। হজরত মুআজ বললেন, হে আল্লাহর রসুল। আমি কি মানুষকে এই সুসংবাদটি জানাবো না? রসুল স. বললেন, না। কারণ, এ কথার উপর ভরসা করে মানুষ বসে থাকবে (আমল করবে না)। বোখারী, মুসলিম।

'ধৈর্যশীল' অর্থ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণকারী। পরিত্যাগ করতে হবে প্রবৃত্তির লেলিহান আকাঙ্খা এবং যা কিছু অসৎ। মেনে নিতে হবে আল্লাহতায়ালার আনুগত্য এবং যা কিছু শুভ।

'সত্যবাদী' অর্থ কথোপকথনে, প্রার্থনায় এবং সাক্ষ্য প্রদানে সত্যনিষ্ঠ হওয়া। আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সত্যটিকে প্রকাশ করা। সে সত্যটি হচ্ছে — "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু।"

জ্ঞাতব্য ঃ সত্য শব্দটির পরিসর ব্যাপক। মিথ্যা শব্দটিও ব্যাপক অর্থসম্পন্ন। সাধারণভাবে বক্তব্য, দাবী, ঘটনার বিবরণ, সাক্ষ্যদান — সকল ক্ষেত্রেই সত্য মিথ্যার ব্যাপক সীমানা রয়েছে। সুফীগণের পরিভাষায়, সত্য মিথ্যার অন্য অর্থেরও অবকাশ আছে। সালেক (আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমণকারী) যখন সুলুকের (আধ্যাত্মপথে) পথে বিভিন্ন মঞ্জিল অতিক্রম করতে থাকে তখন অসতর্কতা ও অজ্ঞতার কারণে এ সমস্ত মঞ্জিলের কোনো একটিকে মূল গন্তব্যস্থল বলে ভুল করে বসে। এ রকম অবস্থায় তারা যা কিছু বলে তা অসত্য। এ রকম অবস্থাও প্রকৃত সত্যবাদী বলে বিবেচিত হওয়ার অন্তরায়। ওয়াল্লাহু আলাম।

'অনুগত' অর্থ প্রতিনিয়ত আল্লাহতায়ালার আনুগত্যসংলগ্ন থাকা। উদ্দেশ্য, আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ।

'ব্যয়কারী' অর্থ আপন সম্পদ আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে ব্যয়কারী।

'উষাকালে ক্ষমা প্রার্থনা' বলতে বোঝানো হয়েছে আল্লাহতায়ালার ভয়ে আপন অক্ষমতাকে স্বীকার করে ক্ষমা যাঞ্চা করা। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহতায়ালার পরাক্রম ও মর্যাদার উপযোগী ইবাদত বান্দার আওতায় নেই, তাই বান্দা যদি মনে করে আমার সমস্ত সৎকর্ম ও অন্যান্য কার্যনিচয় আল্লাহতায়ালাই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সুযোগ দান করেছেন ইবাদতের, তখন সে জানতে পারে ইবাদত কবুল হওয়াও আল্লাহতায়ালার নিছক অনুগ্রহ বৈ অন্য কিছু নয়। এই নেয়ামতের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশও সম্ভবপর নয়। তাই আল্লাহ তাঁর ক্ষমা ও সন্তোষ দ্বারা যদি সমস্তকিছুকে আবৃত করে নেন, তবেই মুক্তি। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'তিনি নিজ অনুগ্রহে মুসলমান করে দিয়েছেন। হে আমার প্রেমাস্পদ, আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন — মুসলমান হয়ে যাওয়ায় আমাকে কোনো অনুগ্রহ করা হয়নি বরং আল্লাহতায়ালাই তাঁর আপন অনুগ্রহে তোমাদেরকে ইমান গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন (তোমরা স্বীকার করবে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

উষাকালে প্রার্থনা বলতে এখানে সেহেরীর সময় ক্ষমা প্রার্থনাকে বোঝানো হয়েছে। এই সময়ই প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার প্রকৃষ্ট লগ্ন। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহতায়ালা প্রেমাতিশয্যবশতঃ অবতরণ করেন পৃথিবীর নিকটতম আকাশে এবং বলেন, 'আমি বিশ্বসমূহের অধিপতি। কেউ প্রার্থনা জানালে আমি প্রার্থনা মঞ্জুর করবো, যাঞ্চা করলে দান করবো, ক্ষমাপ্রার্থী হলে ক্ষমা করবো। বোখারী ও মুসলিম।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, পরম প্রভুপ্রতিপালক তাঁর যুগল বাহু বিস্তার করে বলতে থাকেন, 'কে আছো ঋণপীড়িত আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো।' উষার অভ্যুদয় পর্যন্ত অনুরণিত হতে থাকে প্রেমময় প্রভুপ্রতিপালকের এই আহবান।

বাগবী হাসান বসরীর উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, হজরত লোকমান তাঁর ছেলেকে বললেন, তুমি মোরগের চেয়ে পশ্চাদবর্তী হয়ো না। সেহেরীর সময় মোরগ জেগে ওঠে আর তুমি তখন শয্যাশায়ী থাকো।

হজরত জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, উষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী তারাই যারা ফজরের নামাজ জামাতের সাথে সম্পন্ন করে থাকেন। হাসান বসরী বলেছেন, ওই ব্যক্তি যিনি তার তাহাজ্জুদ নামাজকে সেহেরী পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নাফে বলেছেন, হজরত ইবনে ওমর সারারাত ইবাদত করতেন। বলতেন, হে নাফে! সেহেরীর সময় হয়েছে নাকি? আমি বলতাম, এখনো হয়নি। তিনি পুনরায় নামাজ শুরু করতেন। আবারো প্রশ্ন করলে, আমি যখন বলতাম জী হ্যাঁ, তখন তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং সকাল পর্যন্ত দোয়া করতে থাকতেন।

এই আয়াতে ধৈর্য্যশীল বলতে পবিত্র অন্তর এবং পবিত্র প্রবৃত্তিধারীদেরকে বোঝানা হয়েছে। সুফী সম্প্রদায় এ সমস্ত গুণের অধিকারী। মুজাহিদ এবং শহীদও ধৈর্যশীল সম্বোধনের যোগ্য। সত্যবাদী বলতে ওই সমস্ত আলেমকে বোঝায়, যাঁরা দ্বীনের বিভিন্ন বিবরণকে অবিকৃতভাবে বর্ণনা করে থাকেন।

অনুগত বান্দা তাঁরাই, যাঁদের নামাজ দীর্ঘ ক্বেরাত বিশিষ্ট হয়। যাঁদের প্রার্থনা উপস্থাপিত হয় ভয় ও আশার মাধ্যমে।

ব্যয়কারী বান্দা তাঁরা, যাঁরা তাঁদের বৈধ উপার্জন আল্লাহতায়ালার পথে খরচ করেন। আর ক্ষমাপ্রার্থী বান্দারা হলেন সেই সমস্ত মানুষ, যাঁরা অসাবধানতাবশতঃ ভুল করে ফেললে তওবা করে ফেলেন। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, কসম ওই পবিত্র ব্যক্তিত্বের যাঁর কুদরতের আওতায় আমার জীবন, তোমরা পাপ না করলে আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে উঠিয়ে নিতেন (ধ্বংস করে দিতেন) এবং তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতেন ওই সমস্ত মানুষকে

যারা পাপ করতো। তওবাও করতো। এবং আল্লাহ্ তাদের পাপ ক্ষমা করে দিতেন। মুসলিম, ইমাম আহমদ।

আবু ইয়ালী হজরত আবু সাঈদ থেকে এ রকমই বর্ণনা করেছেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৮

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا ۢ بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝

❒ আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই এবং তিনি ন্যায়-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

বাগবী, কালাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, শামদেশের দু'জন ইহুদী আলেম রসুল পাক স. এর দরবারে হাজির হলেন। মদীনায় এসেই তাঁরা বলতে শুরু করলেন, এ তো সেই শহর যেখানে আবির্ভূত হবেন শেষ নবী মোহাম্মদ। রসুল স. কে দেখেই তাঁরা চিনতে পারলেন। বললেন, আপনি কি মোহাম্মদ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁরা পুনরায় বললেন, আপনি কি আহমদ? রসুল স. বললেন, আমি আহমদও। মোহাম্মদও। তাঁরা বললেন, আমরা একটি প্রশ্ন করতে চাই? উত্তর দিতে পারলে আমরা আপনাকে মেনে নেবো। রসুল স. বললেন, বলুন। তাঁরা বললেন, আল্লাহর কিতাবে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য কোনটি? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর ইহুদী আলেম দু'জন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ সকল প্রাণীর শরীর তৈরীর চার হাজার বছর আগে রূহ (প্রাণ) সৃষ্টি করেছেন। তারও চার হাজার বছর আগে নির্ধারণ করেছেন তাদের রিজিক। সৃষ্টির অভ্যুদয়ের পূর্বে আল্লাহ ছিলেন একা। আকাশ পৃথিবী ছিলো না। পাপ পুণ্যও ছিলো না। তখনই তিনি তাঁর এককত্বের সাক্ষ্য ঘোষণা করেছিলেন।

আল্লাহতায়ালার সাক্ষ্য ঘোষণার পর এই আয়াতে ফেরেশতা এবং ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণের সাক্ষ্য দানের কথা বলা হয়েছে। ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণ আল্লাহতায়ালাকে ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস রাখেন। দান এবং জ্ঞান — সকল বিষয়েই আল্লাহ ন্যায়নীতিতে সুস্থির। তিনি মালিকুল মুলক, সারা জাহানের অধিপতি। আপন পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি তাঁর বিশাল রাজ্য পরিচালনা করেন। পুণ্য প্রদান করতে অথবা শাস্তি প্রদান করতে তিনি বাধ্য নন। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিতে পারেন। এই আয়াতের তাফসীর মোতাজিলা মতের সম্পূর্ণ

বিরুদ্ধে। তাদের মতে পুণ্যশীল এবং পাপীদেরকে সওয়াব ও শাস্তি প্রদান করতে তিনি বাধ্য (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহতায়ালা মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। প্রথমে ক্ষমতা এবং পরে জ্ঞান। তাই এখানে হাকিম (মহাজ্ঞানী) এর পূর্বে আজিজ (মহাপরাক্রমশালী) এর উল্লেখ করা হয়েছে (আজিজুল হাকিম)।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

❒ ইসলাম আল্লাহের নিকট একমাত্র দ্বীন। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটাইয়াছিল। আর, কেহ আল্লাহের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিলে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

হজরত কাতাদা বর্ণনা করেন, সমস্ত নবী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই) এই সাক্ষ্যসহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে আউলিয়া সম্প্রদায়ের মাননীয় ও আচরণীয় মত এটিই। এই মত ও পথই ইসলাম। এই ইসলামই আল্লাহতায়ালার নিকট একমাত্র দ্বীন হিসাবে গৃহীত।

ইমানকে ইসলামের অন্তর্ভুত বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু ইমানকে মূল ইসলামের সমার্থক না বলে আংশিক ইসলাম ধরা হয়েছে। যেমন, ইসলামের ব্যাখ্যায় রসুল স. বলেন, এ কথার স্বীকৃতি দেয়া যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (ইমান), নামাজ কায়েম করা, জাকাত দেয়া, রমজান শরীফের রোজা রাখা এবং সামর্থে কুলালে হজ করা। ইসলামের এই ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন জিব্রাইল আ.এর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে। হাদিসটি দীর্ঘ, যার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে বোখারী ও মুসলিমে।

ইসলাম বলতে কেবল শরিয়তে মোহাম্মদী স. কেও বুঝে নেয়া যেতে পারে। পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্মমত রহিত করে মোহাম্মদ স. এর শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, এখন নবী মুসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিলো না। হজরত জাবের থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও বায়হাকী। হজরত আনাস তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠকালে যখন শাহেদ আল্লাহ আয়াতটি পড়তেন তখন বলতেন, আমি ওই সাক্ষ্যই দিচ্ছি যা আল্লাহ

দিয়েছেন। আমি আমার সাক্ষ্যকে আল্লাহর নিকট জমা রাখছি। আর ইসলাম আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বীন — আমার এই সাক্ষ্য আল্লাহর নিকট আমার জমানো সম্পদ। নামাজ শেষে তাঁর এ সমস্ত কথা সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিতেন, আমাকে আবদুল্লাহর বর্ণনাসূত্রে আবু ওয়ায়েল বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, এ রকম সাক্ষ্যদাতাকে যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সকাশে দন্ডায়মান করানো হবে; তখন আল্লাহ বলবেন, 'এই বান্দার জন্য আমার নিকটে রয়েছে এক অঙ্গীকার, এখনই আমার অঙ্গীকার পূরণের সময়। আমি আমার এই বান্দাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবো।' বাগবী, তিবরানী, বায়হাকী।

বায়হাকীর বর্ণনাসূত্রটি অবশ্য দুর্বল।

আল্লাহতায়ালার মনোনীত ধর্ম যে ইসলাম — একথা তওরাত ও ইঞ্জিলেও ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু আহলে কিতাবগণ আল্লাহতায়ালার এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও মতানৈক্য করবার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। তাদের কেউ কেউ অস্বীকার করেছে মোহাম্মদ স. এর নবুয়তকে। আবার কেউ কেউ বলেছে, তিনি কেবল আরববাসীদের নবী। তাদের এ সমস্ত মতানৈক্য অজ্ঞতাবশতঃ ছিলো না, ছিলো হিংসাবশতঃ। নেতৃত্ব ও রাজত্বের অবসান চিন্তাই তাদেরকে হিংসুক করে তুলেছিলো।

ইবনে জারীর, হজরত মোহাম্মদ বিন জাফরের উক্তি উল্লেখ করেছেন, এই আয়াত নাজরানের খৃষ্টানদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো ইঞ্জিল, যাতে তাদের বিকৃতবিশ্বাসবিরোধী প্রমাণ মওজুদ ছিলো। তবু তারা প্রচার করতো, হজরত ঈসা আল্লাহতায়ালার পুত্র। অপরদিকে ইহুদীরাও ছিলো আল্লাহতায়ালার প্রমাণের সাথে মতানৈক্যকারী। তারা আল্লাহতায়ালার এই ঘোষণা জানতো যে, হজরত ঈসা আল্লাহতায়ালার বান্দা ও রসুল। তবুও কুটিলতাশ্রয়ী ইহুদীরা হিংসা বশতঃ মতানৈক্য করলো। হজরত ঈসার নবুয়তকে অস্বীকার করলো তারা, তাঁর পবিত্রা জননীকে দিলো ব্যভিচারের অপবাদ।

ইবনে আবী হাতেম, রবী'র উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, হজরত মুসা আ. মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বনী ইসলাইলের সত্তরজন আলেমকে ডাকলেন এবং তাদের কাছে আমানত রাখলেন পবিত্র তওরাত। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন ইউশা ইবনে নুনকে। তিনশ' বছর অতিবাহিত হলো, তার পর দেখা দিলো মতপার্থক্য। এই আয়াতে মতপার্থক্য বলতে ওই সত্তরজন আলেমের অধস্তন অপদার্থ সন্তানদেরকেই বোঝানো হয়েছে। কেবল মতপার্থক্য নয়, তারা শুরু করলো রক্তক্ষয়ী হানাহানি। বিশৃংখলা যখন চরম রূপ নিলো, তখন আল্লাহতায়ালা তাদের উপরে অত্যাচারী রাজা বখত নসরকে প্রবল করে দিলেন।

আয়াতের শেষে আল্লাহতায়ালা কাফেরদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন এই বলে যে, আল্লাহতায়ালার নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারীদের হিসাব গ্রহণে অথবা শাস্তি প্রদানে তিনি অত্যন্ত তৎপর।

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ○

❒ যদি তাহারা তোমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে তুমি বল, 'আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি।' এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে ও নিরক্ষরদিগকে বল, 'তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করিয়াছ?' যদি তাহারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তাহারা পথ পাইবে। আর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমার শুধু প্রচার করা কর্তব্য। আল্লাহ দাসদের দ্রষ্টা।

আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয় নবীর মাধ্যমে কাফেরদের প্রতর্কপ্রবণতার জবাব শিক্ষা দিয়েছেন এই আয়াতে। তাদের বিতর্কবিদ্বিষ্টতার জবাবে জানিয়ে দিতে হবে, আমরা তো আল্লাহ্তায়ালার নিকট আত্মসমর্পণকারী। আমরা আমাদের অন্তর বাহির আল্লাহতায়ালার নির্দেশে সমর্পণসর্বস্ব করে নিয়েছি। হে নবী আপনি বলে দিন, যখন একথা স্বতঃপ্রমাণিত এবং তওরাত ও ইঞ্জিল সমর্থিত যে, আল্লাহতায়ালার নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম — এরপরও কি হে কাফের সম্প্রদায় তোমরা দৃঢ়পদ থাকবে তোমাদের কুফরীর উপরেই? এই প্রশ্নটি এক অর্থে আদেশও। বলা হচ্ছে তোমরাও মুসলমান হয়ে যাও। বার বার তোমরা বাদানুবাদে লিপ্ত হচ্ছো। তোমরা কি এতোটুকুও জানো না যে, ঝগড়াবিবাদের কোনো প্রশ্রয় প্রকৃত ইসলামে নেই। দেখো, প্রকৃত ইসলাম পেশ করেছি আমরাই। তোমরা আল্লাহতায়ালার শরিয়ত মানো না। কোনো নবীকে বলো, আল্লাহ্র পুত্র। কোনো নবীকে বলো, ব্যভিচারজাত। লজ্জাহীন তোমরা। আল্লাহতায়ালার সাথে শরীক করতে, আল্লাহতায়ালার পয়গম্বর এবং তাঁর কিতাব সমূহকে অস্বীকার করতে তোমরা এতোটুকু লজ্জাও অনুভব করোনি। অথচ তোমরা তোমাদের জঘন্য মতবাদকে বলে থাকো ইসলাম। দেখো আমাদেরকে। আমাদের ইসলামকে। আত্মঅহমিকা এবং প্রবৃত্তিজাত কামনা বাসনা আমাদের নেই। আমরা তো আমাদের প্রবৃত্তিকে আল্লাহতায়ালার সন্তোষনির্ভর করেছি। তোমরা লজ্জিত হও। পরিত্যাগ করো সকল অশুভকে। মুসলমান হয়ে যাও আমরা যেমন হয়েছি। আহলে কিতাবগণ জবাব দিলো এভাবে, আমরা তো প্রথম থেকেই মুসলমান। রসুল পাক স. বললেন, আমরা তো ঈসা আ. কে আবদুল্লাহ, আল্লাহর রসুল এবং

কালেমাতুল্লাহ বলি। তোমরা কি একথা স্বীকার করো? তারা বললো, আল্লাহর সাহায্য চাই। ঈসা কি বান্দা? আল্লাহতায়ালা প্রত্যুত্তোরে তাঁর প্রিয়তম নবীকে জানালেন, হে নবী! আপনার কর্তব্যকর্ম তো কেবল প্রচার করা। তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে এতে আপনার কোনো ক্ষতি নেই। হেদায়েত দান নয়, হেদায়েতের বাণী পৌঁছে দেয়াই আপনার কাজ। আমার দৃষ্টি মুমিন ও কাফের সকলের প্রতি নিবদ্ধ। তাদের উপযুক্ত প্রতিদান আমারই আওতাভূত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ২১

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ○

❒ যাহারা আল্লাহের নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করে, অন্যায় রূপে নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যাহারা ন্যায় পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাহাদিগকে হত্যা করে তুমি তাহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

আল্লাহতায়ালার নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারীরূপে এখানে ইহুদীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তারা প্রত্যাখ্যান করেছে কোরআন ও ইঞ্জিলকে এবং তওরাতের ওই সমস্ত আয়াতকে, যাতে রসুল স. এর প্রশংসাসূচক বিবরণ ছিলো। তাদের পূর্বপুরুষরা নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। রসুল স. এর সঙ্গে তারা সে রকমই আচরণ করতে চায়। তারা রসুল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে। যাদুর মাধ্যমে তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। আমন্ত্রিত অতিথি করে খাদ্যে বিষমিশ্রিত করে দিয়েছে। পরবর্তীতে সেই বিষক্রিয়াই হয়েছিলো তাঁর পার্থিব জীবনাবসানের কারণ। কেবল নবী রসুলই নন, তাঁদের প্রকৃত অনুসারী ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দানকারীদেরকেও তারা হত্যা করেছে।

ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, বনী ইসরাইলের নবীদের নিকট ওহি আসতো। কিন্তু সকলে পূর্ণ কিতাবধারী ছিলেন না। তাঁরা ওহি অনুসারে মানুষকে সদুপদেশ দিতেন। তাঁদেরকেও শহীদ করে দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে তাঁদের অনুসারীরা সদুপদেশ দানের দায়িত্ব স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন, তাঁদেরকেও শহীদ করে দেয়া হয়েছে।

বাগবী, হজরত ওবায়দা বিন জাররাহ্র উক্তি বর্ণনা করেন, হজরত জাররাহ বলেছেন, আমি রসুল স. এর নিকট আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসুল! কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে কার? রসুল স. বললেন, যে ব্যক্তি কোনো নবীকে হত্যা করেছে অথবা তাঁকে অমান্য করতে উদ্যত হয়েছে এবং সৎকাজ করতে নিষেধ করেছে। এরপর রসুল স. 'যারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে.....তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই' — এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর পুনঃ এরশাদ করলেন, হে ওবায়দুল্লাহ! বনী ইসরাইলেরা একই সময়ে তেতাল্লিশজন নবীকে হত্যা করেছিলো। এ হত্যাকান্ডগুলো সংঘটিত হয়েছিলো দিনের প্রথম ভাগে। তাদের প্রকৃত অনুসারী একশত বিশজন পুণ্যশীল ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে যখন উদ্যত হলেন, তখন তাঁদেরকেও শহীদ করে দিলো পাপিষ্ঠরা। এ হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিলো দিবসের শেষ ভাগে। ওই পাপিষ্ঠদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এই আয়াতে। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয়তম নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ২২

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ○

❐ এই সব লোক, ইহাদের ইহকাল ও পরকালের কার্যাবলী নিষ্ফল হইবে এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

ইবনে মুনজির, ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম, হজরত ইকরামার বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একবার ইহুদীদের এক বিদ্যায়তনে গমন করে ইহুদীদেরকে আল্লাহতায়ালার দিকে আহবান জানালেন। ইহুদী নাঈম বিন আমর এবং হারেস বিন জায়েদ জিজ্ঞেস করলো, মোহাম্মদ তুমি কোন ধর্মে আছো? তিনি স. বললেন, ইব্রাহিমের ধর্মে আছি। তারা বললো, ইব্রাহিম তো ইহুদী ছিলেন। রসুল স. বললেন, তবে এসো। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা হোক তওরাতের মাধ্যমে। এ প্রস্তাব তারা মানলোনা। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত —

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَٰبِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ○

❒ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হইয়াছিলো? তাহাদিগকে আল্লাহের কিতাবের দিকে আহবান করা হইয়াছিলো যাহাতে উহা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয়; অতঃপর তাহাদের একদল ফিরিয়া দাঁড়ায়, আর তাহারাই পরাঙমুখ;

এখানে আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তওরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সামান্যই। তাছাড়া তওরাতের সকল হুকুম আহকামের প্রতি তারা বিশ্বাসীও নয়। তাই রসুল স. তাদেরকে তওরাতের সিদ্ধান্তের প্রতি আহবান জানালে তারা গড়িমসি করেছে।

কালাবী, আবু সালেহর বর্ণনা হতে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন, খয়বরের একজন পুরুষ ও একজন নারী ব্যভিচার করলো। তওরাতের নির্দেশ হচ্ছে, তাদেরকে রজম করতে হবে (কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে)। অপরাধী ও অপরাধিনী ছিলো প্রভাবশালী। তাই ইহুদীরা তাদেরকে রজম করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হলো। তারা বিষয়টি রসুল স. এর নিকটে এই ধারণায় পেশ করলো যে, হয়তো রজম থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু রসুল স. অপরাধীদ্বয়কে রজম করতে নির্দেশ দিলেন। নোমান বিন আউফা এবং বাহরী বিন আমর বললো, মোহাম্মদ! আপনার সিদ্ধান্ত ভুল। রসুল স. এরশাদ করলেন, তওরাত আনো। মীমাংসা হবে তওরাত অনুযায়ীই। তারা বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন। রসুল স. বললেন, তোমাদের মধ্যে তওরাতের সবচেয়ে বড় আলেম কে? তারা বললো, ফদকের অধিবাসী ইবনে সুরিয়া। এর পর ইবনে সুরিয়াকে ডেকে আনা হলো মদীনায়। ইত্যবসরে তার অবস্থা সম্পর্কে হজরত জিব্‌রাইল আ. রসুল স. কে জানিয়ে দিলেন। সে হাজির হলে রসুল স. বললেন, তুমি কি ইবনে সুরিয়া? সে জবাব দিলো, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, ইহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম কি তুমি? সে বললো, মানুষেরা এ রকমই মনে করে। রসুল স. তাকে তওরাত পড়তে নির্দেশ দিলেন। সে পড়তে শুরু করলো। পড়তে পড়তে সে যখন রজমের আয়াতের নিকট এলো, তখন আয়াতটি

হাত দিয়ে ঢেকে ফেললো। এবং এর পর থেকে পড়তে শুরু করলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, হে আল্লাহর রসুল! সে রজমের আয়াত ছেড়ে দিয়েছে। এই বলে তার কাছ থেকে তওরাত কিতাবটি নিয়ে তিনি নিজেই ইহুদীদেরকে শুনিয়ে দিলেন যে, বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারীর ব্যভিচার সাক্ষ্যসহ প্রমাণিত হলে সঙ্গেসার করে দাও। আর ব্যভিচারিণী গর্ভবতী হলে প্রসবকাল পর্যন্ত শাস্তি স্থগিত রাখো। রসুল স. এবার সঙ্গেসারের জন্য চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন। ইহুদীরা মনঃক্ষুণ্ন হয়ে চলে গেলো। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো।

হজরত কাতাদা বলেন, আয়াতের অর্থ — ইহুদীদেরকে আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কোরআনের দিকে ডাকা হলো। কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জুহাক বলেছেন, আল্লাহতায়ালা ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায় এবং রসুল স. এর মধ্যে কোরআনকে মীমাংসাকারী নির্ধারণ করেছেন। আর কোরআন সিদ্ধান্ত দিয়েছে, ইহুদী ও নাসারাগণ সত্যানুসারী নয়। তাই তারা কোরআনের প্রতি বিমুখ।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ২৪, ২৫

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۖ وَّغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۣ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

❒ এই হেতু যে তাহারা বলিয়া থাকে 'অগ্নি দিন কতক ব্যতীত আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না।' তাহাদের নিজেদের দ্বীন সম্বন্ধে তাহাদের মিথ্যা উদ্ভাবন তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে।

❒ কিন্তু সেই দিন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তাহাদের কী অবস্থা হইবে? যে দিন আমি তাহাদিগকে একত্র করিব এবং প্রত্যেককে তাহার অর্জিত কর্মের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না!

আল্লাহতায়ালার আযাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে ইহুদীরা বিষয়টিকে হাল্কা মনে করতো। তাদের ধারণা, দোজখের আগুন তাদেরকে স্পর্শ করতেই পারে না। যদি করে তবে তা মাত্র চল্লিশ দিনের জন্য করবে। এবং তা করবে তাদের পূর্বপুরুষদের চল্লিশ দিনের বাছুর পূজার জন্য। আর সে শাস্তিও পূর্ণ

শাস্তি হবে না। শাস্তি হবে নামমাত্র। তাদের এই মনগড়া ধারণাই তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে। তারা আরো ধারণা করে, তাদের পূর্বপুরুষগণ যেহেতু নবী ছিলেন, তাই তাঁদের সুপারিশ তারা পাবেই। তাদের সামনে হজরত ইয়াকুব আ. এর সঙ্গে আল্লাহতায়ালার কৃত প্রতিশ্রুতির বিষয়টিও ছিলো। আল্লাহতায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ইয়াকুব আ. এর বংশধরদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন না।

কিন্তু সেই দিন তাদের কী অবস্থা হবে, যেদিন আল্লাহতায়ালা তাদেরকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেকের অর্জিত কর্মের প্রতিফল দান করবেন। হজরত কাতাদা বলেছেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে, রসুল স. প্রার্থনা করেছেন, হে আমার প্রতিপালক! পারস্য ও রোমের শাসনভার আমার উম্মতকে দান করো।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আনাস বিন মালেক বলেছেন, মক্কা বিজয় শেষে রসুল স. তাঁর উম্মতের পারস্য ও রোম রাজ্যের শাসনভার লাভের সুসংবাদ পেলেন। মুনাফিক ও ইহুদীরা বলতে লাগলো, কোথায় মোহাম্মদ আর কোথায় প্রবল পরাক্রান্ত পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য । মোহাম্মদ স. এর জন্য কি মক্কা এবং মদীনাই যথেষ্ট নয় । তাদের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করলেন পরবর্তী আয়াত ।

উপরের বর্ণনা দু'টিতে বিরোধাভাস রয়েছে । কিন্তু আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত একটিই । আল্লাহ্তায়ালার নিকট রোম ও পারস্য রাজ্যের শাসনভার লাভের প্রার্থনা এবং সরাসরি বিজয়লাভের সংবাদ প্রচার দু'টোই সঠিক । প্রথমে প্রার্থনা । তারপর প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার পর সুসংবাদ প্রচার। প্রার্থনা মঞ্জুরের বিষয়টি তিনি জানতে পেরেছিলেন ওহির মাধ্যমে। বায়যাবী লিখেছেন, খন্দক যুদ্ধের সময় যখন রসুল স. পরিখা খনন শুরু করলেন, তখন এই সিদ্ধান্ত দিলেন যে, প্রতি দশজন মিলে বিশ হাত মাটি খনন করতে হবে। খনন কার্য চলার সময় একস্থানে দেখা গেলো একটি বৃহৎ পাথর, যা ভাঙা সম্ভব হচ্ছিলোনা। অপসারণ ছিলো দুরূহ। হজরত সালমান ফারসীর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে রসুল স. ঘটনাস্থলে এলেন এবং কোদাল দিয়ে পাথরটির গায়ে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, পাথরটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো। আঘাতকালে এমন একটি আলো বিচ্ছুরিত হলো, যাতে দৃষ্টিগোচর হলো মদীনার দুই প্রান্তরেখা। রসুল স. তকবীর উচ্চারণ করলেন। সাহাবীগণও উচ্চারণ করলেন, আল্লাহু আকবর। রসুল স. বললেন, এই আঘাতের আলোয় আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো হেরা (পারস্যের গুরুত্বপূর্ণ শহর)। রসুল স. পুনরায় আঘাত করলেন এবং বললেন, এই আঘাতে আমার দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠলো রোম সাম্রাজ্যের লাল টিলা সমূহ। পুনরায় আঘাত করলেন রসুল স.। বললেন, এবার আমার সামনে প্রতিভাসিত হলো ইয়ামেনের সানায়া শহরটি। জিব্রাইল আমাকে জানিয়ে দিলেন, আমার উম্মতেরা এ সমস্ত রাজ্য জয় করবে।

মুনাফিকেরা বলতে লাগলো, কী আশ্চর্য কথা! মোহাম্মদ যে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কারণ, তোমরা তো মদীনা হেফাজত করতেই হিমসিম খাচ্ছো। শত্রুর ভয়ে মদীনার চার পাশে খনন করছো পরিখা। বায়হাকী এবং আবু নাঈমও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা এই ঘটনাকেই পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলে উল্লেখ করেন। অপরদিকে ইবনে খাজিমা হজরত কাতাদা থেকে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণটি দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, এই ঘটনাটি নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ২৬

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

❐ বল হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ক্ষমতা কাড়িয়া লও; যাহাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

মালিকুল মুলক অর্থ সাম্রাজ্য সমূহের মালিক। সাম্রাজ্য সমূহের নিরঙ্কুশ অধিকার তাঁর। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন তেমনটিই হয়। যাকে যত ইচ্ছা দান করেন । তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে রাজ্যাধিপতি হওয়ার অধিকার কারো নেই। যাকে ইচ্ছা তিনি সম্মানিত করেন। যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। সহায়তা দানের মাধ্যমে কাউকে করেন পুণ্যলাভের উপযোগী। মর্যাদামন্ডিত করেন পৃথিবী ও আখেরাত উভয় স্থানে। আবার সহায়তা সংকোচন করে কাউকে করেন অপমানিত, শাস্তিযোগ্য। সমূহ কল্যাণ তাঁরই অধিকারাধীন। আলেমগণ বলেন, এই আয়াতে কেবল কল্যাণের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বিষয়টি ছিলো রসুলে পাক স. এর উম্মতের রোম ও পারস্য বিজয় সম্পর্কিত সুসংবাদ। কেউ কেউ বলেন, কল্যাণই মূল । কল্যাণ দানের সংবাদে অকল্যাণের প্রসঙ্গ অনুল্লেখ্য থাকাই শোভনীয় । অথবা এমন বলা যায়, কেবল আদব রক্ষার্থেই এখানে অকল্যাণ প্রকাশের বক্তব্য স্থগিত রাখা হয়েছে।

আমি বলি, আল্লাহ্তায়ালা কেবলই কল্যাণ। তাঁর পবিত্র সত্তা সকল ক্ষতি ও বিনষ্টি থেকে পবিত্র। অকল্যাণ তো মুমকিনাতে অজুদের (সম্ভাব্য অস্তিত্বের) জন্য।

অজুদে হাকিকী (প্রকৃত অস্তিত্ব অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা) নিছক কল্যাণ। সম্ভাব্য অস্তিত্ব তো মূলে ছিলো আদম (নাস্তি)। সুতরাং আদম বা নাস্তি জাত অকল্যাণের উল্লেখ এই আয়াতের প্রার্থনায় নেই । তাই 'কল্যান তোমার হাতেই' - একথা বলা সঙ্গত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ মুমকিনুল অজুদ (সম্ভাব্য অস্তিত্ব) আসলে বিলিনতা (ফানা) আর বিলিনতায় কোনো কল্যাণ থাকেনা । সুতরাং সম্ভাব্য অস্তিত্ব যেহেতু প্রতিবিম্বজাত, মূল নয় — তাই আমরা বলি, প্রতিবিম্বের অধিকারও যেহেতু তাঁর, সেহেতু যাবতীয় ক্ষতি ও মন্দ তাঁর অধিকারভূত । কিন্তু এর মালিকানা উল্লেখ করা অর্থহীন । কারণ অস্তিত্বহীনতার মালিকানা হয় না।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন। বান্দাদের ক্ষমতা একধরনের ধারণানির্ভর ব্যাপার। যার কারণে তাদেরকে কর্মক্ষম বলা যেতে পারে। তাদের অস্তিত্ব ও কর্ম সমূহের স্রষ্টা আল্লাহ্‌তায়ালাই। যেমন তিনি বলেছেন, 'এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা কি জানো না?'

আমরা বলি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মন্দ সমূহের উপরেও ক্ষমতাবান। যেমন ক্ষমতাবান কল্যাণের উপর। অতঃপর এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্ কল্যাণের ইচ্ছা করলেই কল্যাণ লাভ হয়। না করলেই ক্ষতি। কারণ ক্ষতি সৃষ্টির মূল অবলম্বন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ২৭

تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

❐ তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর; তুমিই মৃত হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর।

আল্লাহতায়ালা রাতের এক অংশকে দিনের মধ্যে এবং দিনের এক অংশকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। একটিকে বৃদ্ধি করে অপরটিকে সংকুচিত করেন। এভাবে এগিয়ে চলেছে সময় — দিনের পরে রাত, রাতের পরে দিন। তিনিই মৃত থেকে জীবনের উদ্ভব ঘটান। জীবনকে করে তোলেন মৃত্যুনিথর। যেমন, ডিম থেকে বাচ্চা, বাচ্চা থেকে ডিম। বীজ থেকে বৃক্ষ, বৃক্ষ থেকে বীজ। হজরত ইবনে মাসউদ, সাঈদ বিন জোবায়ের, মুজাহিদ, কাতাদা, ইকরামা,

কালাবী এবং যুজাজ এরকমই বলেছেন। কিন্তু হাসান বসরী এবং আতা বলেছেন, আল্লাহ কাফের থেকে মুমিন এবং মুমিন থেকে কাফের সৃষ্টি করেন। কাফের মৃত, মুমিন জীবিত।

যাকে খুশী তাকে অপরিমিত রিজিক দান করেন আল্লাহ। বাগবী তাঁর আপন বর্ণনাসূত্রে হজরত আলী রা. থেকে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, সুরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সুরা আলে ইমরানের দুই আয়াত (আয়াত নং ১৮, ইন্নাদ্দিনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম পর্যন্ত এবং আয়াত নং ২৬ — ২৭) শাফায়াতের জন্য কবুল করে নিয়েছেন। আল্লাহর সঙ্গে এগুলোর কোনো পর্দা নেই। তারা বলে থাকে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি পৃথিবীতে আমাদেরকে এমন মানুষের নিকট পাঠাতে চাও, যারা তোমার অবাধ্য হবে। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন, আমার জাতের কসম! আমার বান্দাদের মধ্যে যারা প্রত্যেক নামাজের পর তোমাদের কাউকে তেলাওয়াত করবে, আমি তাদের আবাস হিসাবে নির্ধারণ করবো জান্নাতকে। দান করবো খাতিরাতুল কুদস (একটি সম্মানিত স্থান)। আমি অবশ্যই তাদের প্রতি নিবদ্ধ করবো রহমতের দৃষ্টি এবং প্রতিদিন তাদের প্রয়োজন পূরণ করবো সত্তর রকমের, যার নিম্নতম স্তরটি হবে গোনাহসমূহের মাগফেরাত। প্রয়োজনসমূহ হবে আখেরাত সম্পর্কিত। পৃথিবীর প্রয়োজন নয়। আর গোনাহসমূহের ক্ষমা আখেরাতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে নিম্নতম। আমি তাদেরকে শত্রু এবং শত্রুর হিংসানল থেকে রক্ষা করে বিজয়ী করে দেবো।

তিবরানী, হজরত মুআজ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি তোমাকে এমন একটি দোয়া শিক্ষা দেবো, যা পড়লে আল্লাহ তোমার ঋণ পরিশোধ করে দেবেন, ঋণ পাহাড় সমতুল্য হলেও। আল্লাহুম্মা মালিকুল মূলক থেকে বিগইরি হিসাব পর্যন্ত এবং রহমানাদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাতে ওয়া রহিমাহু মা তু'তি মানতাশাউ মিনহুমা ওয়া তামনাউ মানতাশাউ ইরহামনি রহমাতান তুগনিনি বিহা আন রহমাতি বিমান সিওয়াকা।

'হে পৃথিবী ও আখেরাতের করুণাশীল আল্লাহ। আমার প্রতি করুণা বর্ষণ করো উভয় জগতের। তুমি যাকে ইচ্ছা দান করো এবং যাকে ইচ্ছা দান থেকে বিরত থাকো। তোমার রহমত দ্বারা আমাকে অভাব মুক্ত করে দাও, তুমি ছাড়া রহমত বর্ষণকারী আর কেউ নেই।'

ইবনে জারীর, সাঈদ এবং ইকরামার বর্ণনাসূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন, হেজাজ বিন আমর, আমর বিন আশরাফের মিত্র ছিলো এবং ইবনে আবীল হাকীক এবং কায়েস বিন জায়েদের সাথে আনসারদের কিছু লোকের গোপন বন্ধুত্ব ছিলো এই মর্মে যে, যেনো ধর্ম থেকে তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

রেফায়া বিন মুনজির এবং আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের এবং সাঈদ বিন খাইসুমা আনসারদের বললেন, আপনারা ইহুদীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন যাতে তারা আপনাদেরকে পথচ্যুত না করতে পারে। আনসারগণ বললেন, তাঁরা তাঁদের গোপন বন্ধুত্ব ছাড়তে পারবেন না। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ২৮

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

❐ বিশ্বাসীগণ যেন বিশ্বাসীগণ ব্যতীত অবিশ্বাসীগণকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ না করে। যে কেহ এইরূপ করিবে তাহার সহিত আল্লাহের কোন সম্পর্ক থাকিবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাহাদের নিকট হইতে কোন ভয় আশংকা কর তবে তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে সতর্কতার সহিত সাবধানে থাকিবে। আর আল্লাহ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন। এবং আল্লাহের দিকেই প্রত্যাবর্তন।

এই আয়াতে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে মুসলমানদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাগবী মুকাতিলের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, হাতেম ইবনে আবী বালতাকে উদ্দেশ্য করে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মক্কার কাফেরদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। বাগবী, আবু সালেহের বর্ণনাসূত্রে কলবীর উক্তি উল্লেখ করে আরো বলেছেন, এই আয়াত আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং তার মুনাফিক সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মুশরিক এবং ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক রাখতো। তাদের মাধ্যমে রসুল স. সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতো কাফেরেরা। কাফেরদের উদ্দেশ্য ছিলো গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রসুল স. এর ক্ষতি সাধন করা। আল্লাহতায়ালা এই আয়াত নাজিলের মাধ্যমে বিশ্বাসীগণকে কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত করে দেন।

জ্ঞাতব্য ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা ইমানের একটি মহামর্যাদামণ্ডিত স্তর। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, মানুষ তারই সাথী হবে, যার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব থাকবে। অর্থাৎ যে যে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করবে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সে তাদের সঙ্গে

থাকবে। হজরত আনাসের বর্ণনার শব্দগুলো এ রকম, তারই সঙ্গী হবে তুমি যার প্রতি থাকবে তোমার ভালোবাসা। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু মুসা বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন, সৎ এবং অসৎ মানুষের সংসর্গ যথাক্রমে কস্তুরী বিক্রেতা ও কর্মকারের মতো। কস্তুরী বিক্রেতা হয়তো তোমাকে কিছু কস্তুরী দিয়ে দিতে পারে অথবা তুমি তার নিকট থেকে কিছু কস্তুরী কিনে নিতে পারো। কমপক্ষে কস্তুরীর সুবাস তো পাবেই। পক্ষান্তরে কর্মকারের পাশে থাকলে আগুনের ফুলকি এসে তোমার পরিধেয়কে পুড়িয়ে দিতে পারে। কমপক্ষে ধোয়ার দুর্গন্ধ তো পাবেই। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. হজরত আবু জর রা. কে বললেন, হে আবু জর! ইমানের কোন স্তরটি সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ়? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই সম্যক জ্ঞাত। রসুল স. বললেন, কেবল আল্লাহতায়ালার সন্তোষার্থে পারস্পরিক সখ্য স্থাপন করা। আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করা। বায়হাকী।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, মহব্বত ফিল্লাহ ও বুগযু ফিল্লাহ (আল্লাহর জন্যই বন্ধুত্ব ও আল্লাহর জন্যই শত্রুতা) আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আহমদ, আবু দাউদ। এ ধরনের হাদিস রয়েছে অনেক।

কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে আল্লাহতায়ালার সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না। মুমিনদের সঙ্গে যেমন কাফেরদের মহব্বত হতে পারে না; তেমনি আল্লাহতায়ালার সাথেও কাফেরদের সখ্য হতে পারে না। তবে কাফেরদের দ্বারা যদি কোনো বিপদাশংকার সম্ভাবনা থাকে, তখন বাহ্যিকভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করা বৈধ। অন্তরের বন্ধুত্ব কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়। সকল অবস্থায় সতর্ক থাকতে হবে যেনো মুসলমানদের কোনো গোপন তথ্য তারা জানতে না পারে। কারণ, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে কাফেররা মুসলমানদের ক্ষতি করতে সদা সচেষ্ট থাকে। কেউ কেউ বলেন, ইসলাম পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাকিয়া করা নাজায়েজ (তাকিয়া অর্থ মন চায়না তবুও বিপদাশংকার কারণে করতে হয়)। হজরত মুআজ বিন জাবাল বলেন, প্রথম দিকে যখন ইসলাম পূর্ণবিকশিত হয়নি, তখন তাকিয়া জায়েয ছিলো। কিন্তু এখন শত্রুর সাথে তাকিয়া করা মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়।

আল্লাহতায়ালা নিজের সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছেন। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে সকলকে। তখন তাঁর কঠোর হিসাবের আওতা থেকে বের হওয়ার শক্তি কারো হবে না। সুতরাং সাবধান! কাফেরদের বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করতেই হবে।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا ۢ بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ ۢ بِالْعِبَادِ ۝

❒ বল, তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা যদি তোমরা গোপন অথবা ব্যক্ত কর আল্লাহ উহা অবগত আছেন এবং আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে তাহাও অবগত আছেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❒ যে দিন প্রত্যেকে সে যে — ভাল কাজ করিয়াছে এবং সে যে — মন্দ কাজ করিয়াছে তাহা বিদ্যমান পাইবে, সেদিন সে কামনা করিবে তাহার ও উহার মধ্যে দূর ব্যবধান। আল্লাহ্ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন। আল্লাহ দাসদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

আল্লাহতায়ালাই সকল কিছুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তাই তাঁর কাছে কোনোকিছু গোপন থাকতেই পারে না। সুতরাং অবাধ্যতা ও উন্নাসিকতা চরম বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক নয় কি? আল্লাহতায়ালার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। আখেরাতে শাস্তি তো হবেই, পৃথিবীতেও শাস্তি হতে পারে। সুতরাং কাফেরদের মহব্বত অবশ্য বর্জনীয়।

সামনে সেই দিন, যেদিন সকলের সামনে এসে দাঁড়াবে ভালো অথবা মন্দ। নবী রসুলদের সামনে উপস্থিত হবে শুধুই পুণ্য, মন্দ কোনোকিছুই তাঁদের আমলনামায় নেই। কাফেরদের অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। অবিশ্বাস ও অংশীবাদীতার কারণে তাদের সকল আমলই হবে মন্দ, শুধুই মন্দ। আর সাধারণ ইমানদারদের হবে কিছু ভালো, কিছু মন্দ, কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র। তিনি মুমিনদের উত্তম আমল প্রকাশ্যে তাদের সামনে উপস্থিত করবেন। কিন্তু মন্দ আমল প্রকাশ করবেন না। আমলকারী তার পাপসমূহ দেখতে পাবে এবং চাইবে আল্লাহ যদি গোনাহ সম্পর্কে না জানাতেন, জানালেও যদি পর্দার ভেতরে কেবল তাকেই অবগত করাতেন। বোখারী ও

মুসলিমে হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনাসূত্রে এসেছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহতায়ালা মুমিনকে ডেকে তার উপর আপন হাত স্থাপন করে একান্তে বলবেন, তোমার কি ওই গোনাহের কথা মনে পড়ে? তোমার কি ওই অপরাধ স্মরণে আছে? বান্দা আরজ করবে, নিশ্চয় হে আমার আল্লাহ্! অপরাধ স্বীকারের পর বান্দা যখন শাস্তির জন্য শংকিত হবে, তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার গোনাহ গোপন রেখেছিলাম। আজ সে গোনাহ মাফ করে দিচ্ছি। এরপর পুণ্যের আমলনামা তাকে দিয়ে দেয়া হবে। কাফের ও মুনাফিকদের অবস্থা হবে অন্য রকম। তাদের অপরাধসমূহ সকলের সামনে প্রকাশ করে দেয়া হবে। বলা হবে, 'যারা আপন প্রতিপালককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, শুনে নাও এ রকম জালেমদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত (লানত)।

আখেরাতে অবস্থা হবে এ রকম, প্রত্যেক মানুষ তার পুণ্য, পুণ্যের আমলনামা এবং পুণ্যের সওয়াব পাবে। পুণ্য, আমলনামা ও সওয়াব উপস্থিত থাকবে তাদের সামনে। অথবা মন্দ আমল, মন্দ আমলনামা এবং আযাব লাভ করবে। তাদের সামনে উপস্থিত হবে, গোনাহ, গোনাহের আমলনামা এবং তার শাস্তি। ওই সময় তারা কামনা করবে, তাদের এবং বিনিময় দিনের মধ্যে যদি দূর ব্যবধান থাকতো। পুণ্যবানেরাও সেদিন আযাবের ভয়ে পুণ্য লাভের ইচ্ছা করবে না। হাসান বসরী বলেন, কোনো প্রকার মন্দই যেনো তাদের সামনে উপস্থিত না হয়, প্রত্যেক মানুষ এরকমই ইচ্ছা করবে। কেউ কেউ বলেছেন, মানুষেরা মনে করতে থাকবে, হায়। যদি সে মন্দ আমল কোনোদিনই না করতো।

হজরত আদী বিন হাতেম বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তোমাদের সঙ্গে আল্লাহ এমনভাবে বাক্যালাপ করবেন যে, মধ্যবর্তী কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষক থাকবে না। থাকবে না কোনো আড়াল। ডান দিকে দৃষ্টি করলে সে দেখবে তার নেক আমলসমূহ। বাম দিকে তাকালে দেখবে মন্দ আমলসমূহ। আর সামনে দেখানো হবে আগুন। অতএব; তোমরা সেই আগুন থেকে বাঁচতে চেষ্টা করো, এক টুকরা খেজুর অথবা খোরমা দান করে হলেও। পূর্বের আয়াতে কাফেরদের প্রতি আল্লাহতায়ালার ব্যবহারের বর্ণনা ছিলো। এই আয়াতের শেষে রয়েছে মুমিনদের প্রতি আল্লাহতায়ালার ব্যবহারের বর্ণনা। বলা হয়েছে, 'আল্লাহতায়ালা তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।' তাই ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে দাসদের সংশোধনই দয়াময় প্রভু প্রতিপালকের অনুগ্রহপ্রবণ অভিপ্রায়।

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ○

❐ বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'

❐ বল, 'আল্লাহ ও রসুলের অনুগত হও।' যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণকে ভালবাসেন না।

ইবনে জারীর এবং ইবনে মুনজির, হাসান বসরী থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর উপস্থিতিতে কিছু লোক বলেছিলো, হে মোহাম্মদ! আল্লাহর কসম আমরা আপনার প্রতিপালককে ভালোবাসি। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

ইবনে ইসহাক এবং ইবনে জারীর, মোহাম্মদ বিন জাফর বিন জোবায়েরের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, নাজরানের প্রতিনিধিদল যখন বললো, আমরা মসীহের উপাসনা করি আল্লাহর মহব্বতে। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

বাগবী লিখেছেন, ইহুদী ও নাসারাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। তারা বলতো, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তার প্রিয় পাত্র। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি জুহাক বর্ণনা করেছেন এভাবে, কতিপয় কোরাইশ কাবাগৃহের ভিতরে মূর্তি স্থাপন করলো এবং তার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলো শতর মোরগের ডিম (শতর খুব বড় ধরনের মোরগ যা আফ্রিকা ও আরবে পাওয়া যায়) আর কানে পরিয়ে দিলো বালী। তারপর সেজদা করতে শুরু করলো। এমন সময় রসুল স. এলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, হে কোরাইশবৃন্দ, তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহিম ও ইসমাইলের ধর্মমতের বিরুদ্ধাচরণ করছো। তারা বললো, আমরা তো আল্লাহর মহব্বতেই মূর্তিপূজা করছি। যেনো মূর্তি আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকট পৌছে দেয়। অতঃপর এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

প্রেমিকজন প্রেমাষ্পদের স্মরণেই বিভোর থাকে। তার মগ্নতা এ মতোন প্রবল হয় যে, অন্য কোনোকিছুর খেয়াল থাকেই না। চিন্তা জুড়ে কেবলই বিরহবিভোরতা। উপায়বিহীনতা। প্রেম ভালোবাসার প্রকৃতিই এই। প্রেম হচ্ছে অন্তরের আগুন, যে আগুনে প্রিয়তম ব্যতীত অন্য সব কিছু ভস্মীভূত হয়ে যায়। এমনকি আপন অস্তিত্বের অনুভূতি পর্যন্ত তার দৃষ্টিগোচর হয় না। পরিণাম দাঁড়ায়

এই যে, সে পছন্দ করতে থাকে তাই; যা তার প্রেমাস্পদের পছন্দনীয় এবং ঘৃণা করতে থাকে ওই সমস্ত বস্তুকে যা তার প্রিয়তমের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য। তার প্রিয়তমের ইচ্ছাই হয় তার ইচ্ছা। তখন সওয়াব লাভের বাসনা আর থাকে না। শাস্তির ভয়ও অন্তরে জাগে না। যদিও তার পথযাত্রায় পরীক্ষিত হতে থাকে পুণ্যাকাংখা ও পাপাশংকা। তার উদ্দেশ্যের সকল পরিসর ভরে যায় প্রিয়তমের সন্তোষ কামনায়। বান্দার মহব্বতের প্রকৃত তত্ত্ব এই।

আল্লাহ্‌র মহব্বত এরকম নিমগ্নতা এবং বিরহবিধুরতা থেকে পবিত্র। তাঁর মহব্বতে বিস্মৃতি নেই। তাঁর প্রেম এমন এক শক্তি যা তাঁর বান্দাকে আপন সন্নিধানে টেনে আনে, যে আকর্ষণ ছিন্ন করার ক্ষমতা তাঁর প্রেমিক বান্দার নেই। তাঁর মহব্বতের প্রতিক্রিয়াতে বান্দা লাভ করে অক্ষয় প্রেমের আকুতি। সর্মপিত হয় প্রেমপথে। বান্দার মহব্বত আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বতের শাখা কিংবা ছায়া। প্রেম এসে থাকে আল্লাহ্‌তায়ালার দিক থেকেই। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, 'আর আমি আপন সকাশ থেকে তোমার উপর প্রেম ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছি।' অন্যস্থলে বলেছেন, 'তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তাঁরাও তাঁকে ভালোবাসে।' এতে প্রমাণিত হয় মহব্বতের সূচনা হয় আল্লাহ্‌তায়ালার দিক থেকেই। বান্দা তার অন্তরে তা ধারণ করে প্রেমিক হয়।

আমাদের এই বর্ণনা মহব্বতে জাতী সম্পর্কীয় (সত্তাগত মহব্বতই মহব্বতে জাতী)। কিন্তু বায়যাবী মহব্বতের বিবরণ দিয়েছেন এই ভাবে, প্রেমিক তাঁর প্রেমাস্পদের বিশেষ কোনো গুণ বা কতিপয় গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্খী হয় — এরকম মহব্বতের নাম মহব্বতে সিফাতী যা মহব্বতে জাতী থেকে কিছুটা দূরবর্তী। সন্তানের প্রতি মায়ের মহব্বত মহব্বতে জাতীয়ার নমুনা। কারণ গুণ নয় অন্তরের অন্তঃস্থলের আকর্ষণই এখানে প্রধান। মহব্বতে ইলাহীর স্তর কিন্তু এরকম অবস্থা থেকে অনেক উর্ধ্বে। রক্তের সম্পর্ক, বংশের সম্পর্ক সেখানে কোনোই প্রশ্রয় লাভ করে না।

বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা, হজরত ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য সাহাবীগণের যে সমস্ত মারফু বিবরণ এসেছে, সেগুলোর শব্দবিন্যাস ভিন্ন হলেও অর্থ এক। আল্লাহ্‌তায়ালার একশত রহমতের মধ্যে একটি রহমত তিনি সৃষ্টিকুলকে বন্টন করে দিয়েছেন, যার কারণে তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করে। বাকী নিরানব্বইটি রহমত তিনি রেখে দিয়েছেন তাঁর আউলিয়াদের জন্য (যার পূর্ণ প্রকাশ হবে কিয়ামতের দিন)। বাগবী বলেছেন, আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার ভালোবাসার নিদর্শন এই যে, সে তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে, আনুগত্যকে আশ্রয় করবে এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে জীবন যাপন করবে। আর বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বতের নিদর্শন এই যে, তিনি বান্দাদেরকে গ্রহণ করবেন, সওয়াব দান করবেন এবং ক্ষমা করবেন। বাগবীর এই বর্ণনা অবশ্য প্রকৃত মহব্বত নয়, মহব্বতের নিদর্শন মাত্র।

আল্লাহ্তায়ালার ভালোবাসা পেতে হলে নবীর অনুসরণ মেনে নিতে হবে। মহব্বত যেহেতু আল্লাহ্তায়ালার দান, আর সকল দানের মাধ্যম যেহেতু নবী রসুলগণ, তাই তাঁদের অনুসরণের মাধ্যম ব্যতিরেকে ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্র রসুলের অনুসরণ না হওয়াই ভালোবাসা না হওয়ার প্রমাণ। এরকম ভালোবাসার দাবীকে আল্লাহ্তায়ালার কিতাব মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা ভালোবাসবেন তখনই, যখন মানুষ নবী-আনুগত্যকেই একমাত্র আচরণীয় জীবনাদর্শ করবে।

একটি প্রশ্ন ঃ এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, নবী আনুগত্যের পরিণামফলই আল্লাহ্তায়ালার ভালোবাসা। অর্থাৎ প্রথমে বান্দার ভালোবাসা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি। পরে আল্লাহ্তায়ালার ভালোবাসা বান্দাদের প্রতি। কিন্তু ইতোপূর্বে বলা হয়েছে মহব্বতের সূচনা হয় আল্লাহ্তায়ালার দিক থেকেই। জবাবে একথা বলা যেতে পারে, দু'টি অবস্থাই সঠিক। আল্লাহ্তায়ালার ভালোবাসা বান্দারা পায় দুই ভাবেই। প্রথমে আল্লাহ্তায়ালার নিকট থেকে দান হিসেবে পরে নবী আনুগত্যের পরিণাম হিসেবে। প্রেম ভালোবাসার শেষ ফল ক্ষমা প্রাপ্তি। আল্লাহ্তায়ালা তাই বলেছেন, 'আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের গোনাহ্ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ্তায়ালা ক্ষমাশীল দয়াময়।'

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার সঙ্গীদেরকে বললো, দেখেছো, মোহাম্মদ তাঁর আনুগত্যকে আল্লাহ্র আনুগত্য হিসাবে চালিয়ে দিতে চায়। ভাবখানা এই যেনো আমরা তাঁকে ওরকম ভালোবাসি যেমন খৃষ্টানেরা ঈসাকে ভালোবাসে। তখন অবতীর্ণ হলো, 'বলো আল্লাহ্ ও রসুলের অনুগত হও।' এর অর্থ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের অনুসরণ সমার্থক। রসুল স. এর অনুসরণই আল্লাহ্তায়ালার অনুসরণ। এজন্য তিনি স. এরশাদ করেছেন, আমার সকল উম্মত বেহেশ্তী, অস্বীকারকারীরা ছাড়া। সাহাবী রা. গণ আরজ করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসুল, অস্বীকারকারী কারা? তিনি বললেন, আমার কথা যারা মানবে তারা বেহেশ্তী আর যারা মানবেনা তারা অস্বীকারকারী। বোখারী ও মুসলিম।

এই হাদিসে রসুল স. তাঁর অনুসারীদের জান্নাতী বলেছেন। অন্যত্র বলেছেন, যে ব্যক্তি মোহাম্মদের অনুসরণ করলো, সে আল্লাহ্তায়ালারই অনুসরণ করলো এবং যে মোহাম্মদের অবাধ্য হলো সে আল্লাহ্তায়ালার অবাধ্য হলো। বোখারী।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুসরণ থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা কাফের। কাফেররা আল্লাহ্তায়ালার ভালোবাসার পাত্র নয়। আল্লাহ্তায়ালার মহব্বত কেবল মুমিনদের জন্যই নির্ধারিত। মূলকথা এই যে, রসুলের অনুসরণ থেকে বিরত থাকাই

আল্লাহ্‌তায়ালার ভালোবাসা না পাওয়ার প্রমাণ। ভালোবাসা না পাওয়ার কারণে তারা ক্ষমা থেকেও বঞ্চিত হবে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ○
ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

❑ আদম, নূহ ও ইব্রাহিমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে আল্লাহ বিশ্বজগতে মনোনীত করিয়াছেন।

❑ বংশানুক্রমে ইহারা একে অপর হইতে জাত। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আদম আ. সকল মানুষের পিতা। বেহেশতে ফেরেশতারা তাঁকে সেজদা করে সম্মান জানিয়েছিলো। তিনিই প্রথম নবী। সকল নবী রসুল তাঁরই অধস্তন পুরুষ। এর পর প্রেরিত হলেন হজরত নূহ আ., যখন মানুষ হয়ে পড়েছিলো দ্বিধাবিভক্ত। আশ্রয় নিয়েছিলো পরস্পরবিরোধী বলয়ে, বিশ্বাসে অথবা অবিশ্বাসে। হজরত নূহ আ. এর বদদোয়ায় নেমে এসেছিলো মহাপ্লাবন। নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো অবিশ্বাসীরা। অতঃপর হজরত ইব্রাহিম আ. এর বংশধর এবং ইমরানের বংশধরের মধ্য থেকে আল্লাহতায়ালা মনোনীত করেছিলেন নবী ও রসুল। হজরত ইব্রাহিম আ. থেকে ইসমাইল আ., ইসহাক আ., ইয়াকুব আ., ইসবাত আ., ইমরান আ. এবং সর্বশেষে মোহাম্মদ স.। মুকাতিলের উক্তিতে বংশানুক্রমের বর্ণনা এরকম — ইমরান বিন ইয়াসহার বিন কাহাত বিন লাবী বিন ইয়াকুব আ.। এই ইমরানই হজরত মুসা আ. এবং হজরত হারুন আ. এর পিতা ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ইমরান ছিলেন মাসানের পুত্র। মাসান ছিলেন হজরত সুলায়মান আ. এর বংশধর। এই ইমরান ছিলেন হজরত মরিয়ম আ. এর পিতা। হাসান বসরী এবং ওহাব বলেছেন, এই আয়াতে ইমরান বলতে ইমরান বিন মাসানকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তিনি মরিয়ম আ. এর পিতা ছিলেন না। বরং মরিয়ম আ. এর পিতা ইমরান ছিলেন আশহামের পুত্র। আশহাম ছিলেন আমুনের পুত্র। আমুন ছিলেন হজরত সুলায়মান আ. এর বংশভূত। ইমরান বিন মাসান এবং ইমরান বিন আশহামের মধ্যে এক হাজার আশি অথবা এক হাজার আটশত বছরের ব্যবধান ছিলো। উল্লেখ্য যে, এখানে ইমরান বলতে মরিয়ম আ. এর পিতাকেই বোঝানো হয়েছে। হজরত আদম, হজরত নূহ, হজরত ইব্রাহিম এবং হজরত ইমরান — এই চারজনের পৃথক উল্লেখ এ জন্যই করা হয়েছে যে, সকল নবী রসুল অথবা অধিকাংশ নবী রসুল

তাঁদের বংশসুত্রেই এসেছেন। 'আলাল আলামীন' অর্থ সমগ্র বিশ্বজগত, যাতে মনুষ্যজগত ও ফেরেশতা জগতও অন্তর্ভূত। ইব্রাহিমের বংশধরের মধ্যে তিনি সহ মুসা আ. ঈসা আ. এবং হজরত মোহাম্মদ স. ও শামিল। প্রকাশ থাকে যে, তাঁরা সকল ফেরেশতা এবং সকল মানুষ থেকে উত্তম ছিলেন। তাই এই আয়াত বিশেষ মানুষকে বিশেষ ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম প্রমাণিত করেছে। বাগবী হজরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, ইহুদীরা বলতো, আমরা ইব্রাহিম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের সন্তান। আমরাই তাঁদের দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন আল্লাহতায়ালা এই আয়াত নাজিল করেন। উদ্দেশ্য, তাঁদের বংশ বা তাঁদের বংশের শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ স. আল্লাহতায়ালার মনোনীত। অথচ তোমরা তাঁর অনুসরণ বিমুখ। সুতরাং তোমাদের দাবী কীভাবে সত্য বলে গণ্য হতে পারে! বায়যাবী লিখেছেন, ইতোপূর্বে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহতায়ালা রসুলের আনুগত্যকে অপরিহার্য করে দিয়েছেন এবং প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, রসুলের অনুসরণই আল্লাহতায়ালার ভালোবাসা লাভের কারণ। তাই পরের আয়াতে পূর্ববর্তী নবী রসুলদের মর্যাদা বর্ণনা করে নবীদের আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতে নবী — আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ লাভের কথা যেমন বিবৃত হয়েছে তেমনি অনুসরণবিমুখতার কারণে তাঁদের শত্রুদের লাঞ্ছনা এবং ধ্বংসের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, আদম আ. এর দুশমন ইবলিসকে দেয়া হয়েছে অভিসম্পাত, নূহ আ. এর শত্রুদেরকে দেয়া হয়েছে সলিলসমাধি, হজরত ইব্রাহিম আ. এর সময়ের সমস্ত মানুষ ছিলো কাফের। তাদের বিরুদ্ধে তিনি নবী ইব্রাহিমকে মনোনীত করেছেন এবং তাঁর শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। হজরত মুসা আ. এবং হারুন আ. কে যাদুকরদের উপর বিজয়দান করেছিলেন। ফেরাউন ও তার সৈন্যদের বিশাল বাহিনীকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন নীল দরিয়ায়।

আমি বলি, হজরত ঈসা আ. কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হলে তাঁর অনুসারীরা অত্যন্ত বিপর্যস্ত বোধ করলেন। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাঁদেরকে প্রবল করলেন এবং কাফেরদের উপরে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদেরকে প্রবল থাকার ঘোষণা দিলেন, 'আর যারা তোমার কথা মান্য করে তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে বিজয়ী করবো।' হজরত আদম আ. হজরত নূহ আ. এবং আলে ইব্রাহিম ও আলে ইমরানের কথা এ কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে। রসুলে পাক স. এর কথা উল্লেখ করা হয়নি এ কারণে যে, সমগ্র মানবতার উপরে তাঁর বিশাল বিজয়ের পরিকল্পনা রয়েছে সামনে। তাঁর বিজয়ের সূচনা হবে অতি সত্ত্বরই।

উপরোল্লিখিত নবী চতুষ্টয়ের মাধ্যমে ব্যাপক বংশবিস্তৃতি ঘটেছে। তাঁরা ছিলেন একে অন্যের বংশ সম্পর্কিত এবং পরস্পর পরস্পরের সাহায্যপুষ্ট। তাঁদের

বহুবিচিত্র সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে আল্লাহতায়ালা মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং কোরাইশদের মধ্য থেকেও রসুল পাক স.কে আল্লাহতায়ালা মনোনীত করেছেন — এতে কোরাইশদের বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ্তায়ালা ওই ব্যক্তিদের কথা উত্তমরূপে শ্রবণ করেন এবং উত্তমরূপে জানেন, যারা সন্দেহ, বিস্ময়ের দোলায় দোদুল্যমান থাকে। তাদের অন্তরের উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবগত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৩৫

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

❒ স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যাহা আছে তাহা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করিলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হইতে ইহা কবুল কর, তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

ইমরানের পিতার নাম ছিলো মাসান অথবা আশহাম। মাসানের সন্তানেরা ছিলেন বনি ইসরাইলের নেতা। তাঁদের মধ্যে অনেকে হয়েছিলেন আলেম। কেউ কেউ হয়েছিলেন বাদশাহ। ইমরানের স্ত্রীর নাম হান্না বিনতে ফাকুদ। তিনি তখন বৃদ্ধা। ইবনে জারীর, ইবনে ইসহাক ও ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, একদিন একটি গাছের ছায়ায় বসেছিলেন তিনি। হঠাৎ দেখলেন, একটি পাখি তার বাচ্চার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে খাওয়াচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে সন্তান লাভের অভিলাষ জেগে উঠলে তাঁর অন্তরে। তিনি সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানালেন। আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন। গর্ভবতী হলেন তিনি। বললেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আমার উদরের সন্তানকে আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতে উৎসর্গ করবো। পৃথিবীর ব্যস্ততায় আমি তাকে সংশ্লিষ্ট করবো না। সে স্বাধীনভাবে যেনো কেবল তোমার উপাসনায় নিয়োজিত থাকতে পারে।

ইহুদীদের ধর্মমতে এ ধরনের মানতের ব্যাপক প্রচলন ছিলো। ইবনে জারীর, কাতাদা ও রবী থেকে এরকম বলেছেন, তাদের আলেম এবং নবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যারা তাদের সন্তানকে বাইতুল মুকাদ্দাসের সেবায় উৎসর্গ না করেছেন। এ ধরনের উৎসর্গীকৃত সন্তানেরা যৌবনে পদার্পণ না করা পর্যন্ত গির্জার সেবায় মগ্ন থাকতেন। যৌবনে পৌছার পর ব্যাপারটি হতো তাঁদের ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে তাঁরা বাকি জীবন সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারতেন। ইচ্ছা করলে অন্য কোথাও চলে যেতে পারতেন। উল্লেখ্য, এ নিয়ম ছিলো শুধু পুত্রসন্তানের

বেলায়। কন্যাসন্তানকে উৎসর্গ করার নিয়ম ছিলো না। স্ত্রীর প্রার্থনা শুনে ইমরান বললেন, কী বলছো তুমি? মেয়ে হলে কেমন হবে! দু'জনই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সন্তান প্রসবের আগেই মৃত্যু হলো ইমরানের। তারপর একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন বিবি হান্না।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৩৬

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

❒ অতঃপর যখন সে উহাকে প্রসব করিল তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করিয়াছি।' সে যাহা প্রসব করিয়াছে আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবগত। 'ছেলে তো মেয়ের মতো নয়, আমি উহার নাম মরিয়ম রাখিয়াছি।' 'এবং অভিশপ্ত শয়তান হইতে তাহার ও তাহার বংশধরদের জন্য তোমার শরণ লইতেছি।'

প্রসবের পর বিবি হান্না বললেন, 'আমি যে কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।' চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি। এই মেয়ে কীভাবে খেদমত করবে বাইতুল মুকাদ্দাসের। মেয়েদের যে কিছু শারিরীক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা সার্বক্ষণিক খেদমতের অন্তরায়। কিন্তু আল্লাহতায়ালার সকল সিদ্ধান্তই কল্যাণময়। বিশ্বাসিনী হান্না আল্লাহতায়ালার সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করে কন্যা সন্তানকেই উৎসর্গ করে প্রার্থনা জানালেন, অভিশপ্ত শয়তান থেকে এই শিশু কন্যা এবং তার বংশধরগণ যেনো নিরাপদ থাকে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. বলেছেন, এমন কোনো মানব শিশু নেই, ভূমিষ্ঠকালে শয়তান যাকে স্পর্শ না করে। কিন্তু মরিয়ম এবং তাঁর পুত্র ঈসা এর ব্যতিক্রম। সদ্যজাত শিশু কেঁদে ওঠে শয়তানের স্পর্শের কারণেই। হজরত আবু হোরায়রার দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে, সদ্যভুমিষ্ঠ শিশুর চিৎকার শয়তানের স্পর্শাঘাতেরই প্রতিক্রিয়া। মরিয়ম এবং ঈসাকেও শয়তান স্পর্শ করতে উদ্যত হয়েছিলো, কিন্তু আল্লাহতায়ালার হেফাজতের অনড় অন্তরাল ছিলো মাঝখানে।

আমি বলি, বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, হজরত ফাতেমা এবং হজরত আলীর বিবাহকালে রসুল স. বলেছিলেন, ইলাহি আমি তাঁকে ও তাঁর আওলাদকে

বিতাড়িত শয়তানের আক্রমণ থেকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম। হজরত আলী এরকম বলেছেন। হজরত আনাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে হাব্বান। উল্লেখ্য, বিবি হান্নার প্রার্থনা অপেক্ষা রসুল পাক স. এর প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার অধিক উপযোগী। আমি ধারণা করি, হজরত ফাতেমা এবং তাঁর বংশধরদেরকেও আল্লাহতায়ালা শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৩৭

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ
يٰمَرْيَمُ أَنّٰى لَكِ هٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۖ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ
مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

❒ অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহাকে ভালভাবেই গ্রহণ করেন এবং তাহাকে ভালভাবে মানুষ করেন এবং তিনি তাহাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। যখনই যাকারিয়া কক্ষে তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে যাইত তখনই তাহার নিকট খাদ্য সামগ্রী দেখিতে পাইত। সে বলিত, 'হে মরিয়ম! এই সব তুমি কোথায় পাইলে?' সে বলিত, 'উহা আল্লাহের নিকট হইতে।' আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন।

আল্লাহতায়ালা পূর্ণ সন্তুষ্টির সঙ্গে কবুল করে নিলেন মরিয়মকে। সারা পৃথিবীর রমণীদের উপরে মর্যাদাবতী করলেন তাঁকে। পূর্ণ নিরাপদ করলেন পাপ থেকে এবং ঋতুস্রাব থেকে। আল্লাহতায়ালার বিশেষ দৃষ্টিতে প্রতিপালিত হতে লাগলেন বিবি মরিয়ম। অন্যান্য শিশু এক বৎসরে যতটুকু বেড়ে উঠতো তিনি ততটুকু বেড়ে উঠতেন একদিনেই।

ইবনে জারীর, ইকরামা, কাতাদা এবং সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, বিবি হান্না শিশু মরিয়মকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে মসজিদের মাশায়েখের সামনে রেখে দিলেন। মাশায়েখ ছিলেন হারুনের সন্তান এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের মোতাওয়াল্লী। হান্না বললেন, 'একে গ্রহণ করুন।' মরিয়ম ছিলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের ইমামের কন্যা। তাই সকল মাশায়েখ তাকে গ্রহণ করতে চাইলেন। হজরত যাকারিয়া বললেন, আমার অধিকার বেশী। এই শিশুর খালা আমার স্ত্রী। মরিয়মের খালার নাম ছিলো

আসিয়া বিনতে ফাকুদ। নবী ইয়াহিয়া আ. এর জননী ছিলেন তিনি। তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের মাশায়েখ ছিলেন সর্বমোট সাতাশ জন। তাঁরা লটারীর মাধ্যমে শিশু মরিয়মের অধিকার নিশ্চিত করতে সম্মত হলেন। গেলেন এক নদীর তীরে। সুদ্দী বলেছেন, নদীটির নাম উরদুন। সবাই নিজেদের কলম নদীতে ফেলে দিলেন। যার কলম পানিতে স্থির দাঁড়িয়ে থাকবে, তাঁরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে — এই ছিলো সিদ্ধান্ত। হজরত যাকারিয়া আ. এর কলম পানিতে স্থির হয়ে ভেসে রইলো, অন্যদের কলম গেলো ভেসে।

শিশু মরিয়মের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন হজরত যাকারিয়া। তিনি ছিলেন এজেনের সন্তান। এজেন ছিলেন মুসলিমের এবং মুসলিম ছিলেন সুদুনের সন্তান। সুদুন ছিলেন হজরত সুলায়মান আ. এর পুত্র। হজরত যাকারিয়া মরিয়মের জন্য একটি প্রকোষ্ঠ (হুজরা) নির্মাণ করলেন। দুগ্ধদানের জন্য এক মহিলাকে নিয়োজিত করলেন। পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত করলেন ইয়াহিয়া জননীকে। যখন যৌবনবতী হলেন মরিয়ম, তখন মসজিদের মধ্যে একটি বালাখানা (মেহরাব) তৈরী করে দিলেন হজরত যাকারিয়া, যার দরোজা ছিলো মসজিদের ভিতরের দিকে। সিঁড়ি ছাড়া সে বালাখানায় ওঠা যেতো না। হজরত যাকারিয়া ছাড়া মরিয়মের বালখানায় প্রবেশ করতো না কেউ। হজরত যাকারিয়া দেখতে পেতেন, মরিয়মের সামনে রয়েছে অমৌসুমী ফল। গ্রীষ্মের ফল শীতে এবং শীতের ফল গ্রীষ্মে দেখতে পেতেন তিনি। বলতেন, ফলগুলো কোত্থেকে এসেছে? মরিয়ম উত্তর দিতেন, আল্লাহর নিকট থেকে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, মরিয়মের আহার্যবস্তু আসতো জান্নাত থেকে। হাসান বসরী বলেছেন, হজরত মরিয়ম কারো দুগ্ধ পান করেননি। তাঁর রিজিক আসতো জান্নাত থেকে। তাঁর পুত্র ঈসার মতো তিনিও শিশুকালে কথা বলতেন।

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন' — এই বাক্যটি বিবি হান্নারও হতে পারে, আল্লাহতায়ালারও হতে পারে।

এই ঘটনা থেকে আউলিয়াদের কারামতের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেউ কেউ একে হজরত যাকারিয়ার মোজেজা বলেছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। যাকারিয়ার জানা ছিলো না বলেই বলতেন, এ সব কোত্থেকে এসেছে?

হজরত জাবের থেকে আবুল ইয়ালী বলেছেন, হজরত সাইয়্যেদা ফাতেমা একবার রসুল স. এর খেদমতে সামান্য রুটি ও যৎসামান্য গোশত্ হাদিয়া পাঠালেন। রসুল স. হাদিয়াসহ নিজেই হজরত ফাতেমার নিকট গিয়ে বললেন, প্রিয় কন্যা। এগুলো নাও। হজরত ফাতেমা নিলেন এবং ঢাকনা খুলে দেখলেন, প্রচুর রুটি ও গোশত্। রসুল স. বললেন, এসব কোত্থেকে এসেছে? ফাতেমা বললেন, আল্লাহর নিকট থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান তাকে অপরিমিত

রিজিক দান করেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহতায়ালার অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনিই তোমাকে বনীইসরাইলের নারীদের নেত্রী মরিয়মের মতো করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি স. তাঁর কন্যা, জামাতা এবং দুই নাতিসহ আহার করলেন। উদ্বৃত্ত আহার্য বন্টন করে দেয়া হলো প্রতিবেশীদের মধ্যে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ○ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّیْ فِی الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِیْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِیَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِیْ عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ○ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْٓ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۚ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِیِّ وَالْاِبْكَارِ ○

❐ সেখানেই যাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হইতে সৎ বংশধর দান কর। তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।'

❐ যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাঁড়াইয়াছিলেন তখন ফেরেশতাগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন, সে হইবে আল্লাহের বাণীর সমর্থক, নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।'

❐ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হইবে কিরূপে? আমার তো বার্ধক্য আসিয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা!' সে বলিল, 'এইভাবেই।' আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

তাফসীরে মাযহারী/১৯৪

❒ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বলিলেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইংগিতে ব্যতীত কথা বলিতে পারিবে না। আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করিবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিবে।'

বিবি মরিয়মের অলৌকিক রিজিক প্রাপ্তি থেকে একটি সুপ্ত ইচ্ছে জেগে উঠলো হজরত যাকারিয়া আ. এর মনে। বয়োবৃদ্ধ ছিলেন তিনি। তাঁর স্ত্রীও গর্ভধারণের বয়স পেরিয়েছিলেন অনেক আগেই। তবুও হজরত যাকারিয়া আ. আল্লাহতায়ালার কাছে প্রার্থনা জানালেন একটি সন্তানের জন্যে। আল্লাহতায়ালার ক্ষমতা অপার। তিনি যা চান তাই হয়। তিনি যেমন মরিয়মকে অলৌকিক উপায়ে আহার্য দান করতে পারেন তেমনি সন্তান লাভের সময় বিগত হলেও সন্তান দিতে পারেন। তাই তিনি প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে সৎ সন্তান দান করো।

হজরত যাকারিয়া ছিলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রধান মাশায়েখ। কোরবানী উপস্থাপন করা, কোরবানী গাহের দরোজা উন্মুক্ত করা — এ সমস্ত দায়িত্ব ছিলো তাঁর। বিনা অনুমতিতে তাঁর প্রকোষ্ঠে কেউ প্রবেশ করতে পারতো না। কিন্তু একদিন তিনি যখন নামাজে দন্ডায়মান, তখন শ্বেতবস্ত্র পরিহিত এক যুবকরূপে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন হজরত জিব্‌রাইল আ.। তিনি সম্বোধন করলেন, যাকারিয়া! আল্লাহতায়ালা তোমাকে সুসংবাদ জানাচ্ছেন, তোমার পুত্র সন্তান হবে। তার নাম হবে ইয়াহ্‌হিয়া। সে হবে আল্লাহের বাণীর সমর্থক (ঈসা কালেমাতুল্লাহের সমর্থক)। হবে পুণ্যবানদের অন্তর্ভূত একজন নবী, নেতা এবং ইন্দ্রিয় বিজয়ী। হজরত যাকারিয়া জিব্‌রাইল আ. এর প্রতি দৃষ্টিপাত না করেই তাঁর প্রার্থনায় নিবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি বয়োবৃদ্ধ। আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। পুত্রসন্তান কেমন করে হবে! — এ রকম বিস্ময়বোধ মানুষের স্বভাবজাত। প্রকৃতপক্ষে সন্তান লাভের অলৌকিক ঘটনাটি কীভাবে ঘটবে তাই জানতে চাইছিলেন তিনি। তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে কি যৌবনকাল ফিরিয়ে দেয়া হবে। না কেবল স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দূর করে দেয়া হবে। নাকি অন্য কোনো স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান দেয়া হবে, ইত্যাকার অনেক কৌতুহলের দোলায় দোদুল্যমান ছিলেন তিনি।

হজরত যাকারিয়ার বয়স ছিলো তখন বিরানব্বই বৎসর, কালাবী এ কথা বলেছেন। আর জুহাক বলেছেন, তাঁর বয়স ছিলো একশ' বিশ বছর এবং তাঁর স্ত্রীর বয়স ছিলো অষ্টানব্বই বছর।

আল্লাহতায়ালা কর্তৃক প্রেরিত সুসংবাদে পূর্ণ আস্থা রেখে হজরত যাকারিয়া যখন একটি নিদর্শন চাইলেন, তখন তাঁকে জানানো হলো, এক সময় যখন এমন হবে যে, আল্লাহতায়ালার অত্যধিক জিকির এবং সন্ধ্যা ও সকালে তাঁর পবিত্রতা ও

মহিমা ঘোষণায় ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তিনি কথা বলতে পারবেন না। কিছু বলতে চাইলে ইঙ্গিতে বোঝাতে হবে। আতা বলেন, কথা না বলতে পারার অর্থ তিন দিন রোজা রাখা। ওই সময়ের নিয়ম ছিলো, রোজাদারদেরকে ইশারায় কথা বলতে হবে। মুখে কথা বলা যাবে না।

নিদর্শন প্রকাশিত হলো একদিন। যথা সময়ে জন্মগ্রহণ করলেন আল্লাহ্‌র নবী হজরত ইয়াহ্‌ইয়া আ.। হজরত ঈসা আ. এর চেয়ে ছয় মাসের বড় ছিলেন তিনি। ছিলেন ঈসা আ. এর সর্বপ্রথম সমর্থনকারী। বাল্য বেলায় খেলাধুলায়রত কিছু বালকের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে সমবয়সীরা তাঁকে খেলাধুলার জন্য আহবান জানালে তিনি বলেছিলেন, খেলাধুলার জন্য আমি জন্মগ্রহণ করিনি। তিনি ছিলেন নিষ্পাপ।

ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে আসাকের হজরত আমর বিন আস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহতায়ালার এমন কোনো বান্দা নেই, যে গোনাহ ব্যতীত তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান হবে। ব্যতিক্রম কেবল ইয়াহহিয়া বিন যাকারিয়া। তিনি ছিলেন নেতা। এলেম, ইবাদত, পরহেজগারী, চরিত্র সুষমা, সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়। ছিলেন ইন্দ্রিয়বিজয়ী। এবং অবশ্যই নবীর বংশধর।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৪২, ৪৩

❒ স্মরণ কর যখন ফেরেস্তাগণ বলিয়াছিল, 'হে মরিয়ম! আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীর মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করিয়াছেন।'

❒ হে মরিয়ম! 'তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজ্‌দা করো এবং যাহারা রুকু করে তাহাদের সহিত রুকু কর।'

আল্লাহ্‌তায়ালা বিবি মরিয়মকে মনোনীত করেছিলেন জাতী তাজাল্লীর জন্য। সুফীগণ বলেছেন, এর অর্থ কামালিয়াতে নবুয়ত। নবীগণ মাধ্যম ব্যতীত সত্তাগতভাবে এই কামালিয়াত লাভ করে থাকেন। আর সিদ্দিকগণ এই কামালিয়াত লাভ করে থাকেন সাধারণ মর্যাদাধারী নবীগণের মাধ্যমে। মরিয়ম ছিলেন সিদ্দিকা। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে পবিত্র করেছিলেন। এর অর্থ পাপ থেকে রক্ষা করে অথবা পাপপ্রভাব মিটিয়ে দিয়ে শয়তানের পথ চিররুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁকে পুরুষের স্পর্শ থেকে পবিত্র

রেখেছিলেন। এই পবিত্রতার মধ্যে ঋতুবতী হওয়া থেকে পবিত্র হওয়ার কথাও রয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে রমণীকুলের নেতৃত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন।

হজরত আলী বলেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, মরিয়ম বিনতে ইমরান তাদের সময়ে নারীদের মধ্যে উত্তম ছিলেন। আর আমাদের সময়ের সর্বোত্তমা হচ্ছেন হজরত খাদিজা। হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, বিশ্বের সমস্ত রমণীদের মধ্যে মরিয়ম বিনতে ইমরান, খাদিজা বিনতে খোয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া সর্বোত্তমা। তিরমিজি।

হজরত আবু মুসা আশআরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল (পূর্ণ) কিন্তু নারীদের মধ্যে কামেল মরিয়ম বিনতে ইমরান এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া। আর অন্য নারীদের তুলনায় হজরত আয়েশার ফযীলতের দৃষ্টান্ত এরকম যেমন সাধারণ আহার্যের তুলনায় ঝোলে ভেজা রুটি (শুরুয়ায় ভেজানো নরম রুটি)।

আমি বলি, এই এরশাদের অর্থ, মরিয়ম ও আসিয়া শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁদের সময়ের নারীদের মধ্যে। কিন্তু হজরত আয়েশার ফযীলত সকল নারীদের উপর। এমনকি মরিয়ম এবং আসিয়ার উপরেও।

বোখারী ও মুসলিমে জননী আয়েশা বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ফাতেমা তুমি বেহেশ্তী রমণীদের নেত্রী হবে। অথবা বলেছেন, বিশ্বাসবতীদের নেত্রী হবে। এ সংবাদে কি তুমি আনন্দিত নও?

আবু দাউদ, নাসাঈ এবং হাকেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, বেহেশ্তিনীগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাশালিনী হজরত খাদিজা বিনতে খোয়াইলিদ এবং ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ স.।

আহ্মদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম হজরত হোজায়ফা থেকে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, এক ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হলেন। আমাকে সালাম করলেন এবং সুসংবাদ দিলেন যে, ফাতেমা জান্নাতিনীগণের নেত্রী। অন্য এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ফাতেমা জান্নাতবাসিনীগণের অগ্রবর্তিনী, মরিয়ম ব্যতীত। হজরত উম্মে সালমার উদ্ধৃতি দিয়ে তিরমিজি বলেছেন, হজরত ফাতেমা বলেন, আমাকে রসুল স. জানিয়েছেন, তুমি জান্নাতী ললনাদের নেত্রী, মরিয়ম বিনতে ইমরান ব্যতীত।

এই বর্ণনাদ্বয় দৃষ্টে বোঝা যায়, হজরত ফাতেমা মরিয়মের তুলনায় অনুত্তমা। কিন্তু এখানে একথাও প্রমাণিত হয়না যে, মরিয়ম ফাতেমা অপেক্ষা উত্তম। বোখারী ও মুসলিম হজরত মুসাওয়ার বিন মাখরামার বর্ণনাসুত্রে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, ফাতেমা আমার অংশ। এরকম বর্ণনা করেছেন আহমদ,

তিরমিজি এবং হাকেম হজরত ইবনে জোবায়ের থেকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, সকল পুরুষ ও রমণীদের উপর হজরত ফাতেমার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছে। ইমাম মালেক বলেছেন, আমাদের কাউকে রসুল স. এর টুকরার মতো মনে করা হয়নি। কিন্তু জমহুর আহলে সুন্নতের মত, নবী রসুল এবং সিদ্দিকীন ছাড়া অন্যদের উপরে এই শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে হবে।

অতঃপর হজরত মরিয়মের প্রতি এরশাদ হচ্ছে, 'বিনয়াবনত হও, সেজদা করো এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু করো।' একথায় প্রমাণিত হয় নামাজের ইমাম কোনো নারী হতে পারে না। তাই এই আয়াতে রুকুকারিণী নয়, রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করতে বলা হচ্ছে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৪৪

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

❐ ইহা অদৃশ্যলোকের সংবাদ — যাহা তোমাকে ঐশী-বাণী দ্বারা অবহিত করিতেছি। মরিয়মের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাহাদের মধ্যে কে গ্রহণ করিবে ইহার জন্য যখন তাহারা তাহাদের কলম নিক্ষেপ করিতেছিলো তুমি তখন তাহাদের নিকট ছিলেনা। এবং তাহারা যখন বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকট ছিলেনা।

জ্ঞান অর্জিত হয় দেখে এবং শুনে। কিন্তু রসুলপাক স. এই ঘটনা সমূহ দেখেনওনি, শোনেনওনি। তিনি অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মী) ছিলেন। তাই কোনো পুস্তক পাঠ করে এসমস্ত সংবাদ তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। এমন কোনো সংবাদদাতাও ছিলোনা যার মাধ্যমে সংবাদ জানা সম্ভব। তাঁর সময় এবং বিবি মরিয়ম ও হান্নার সময়ের ব্যবধান প্রায় পাঁচশত বৎসর। অতীতের এই ঘটনারাজি আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন প্রত্যাদেশের (ওহির) মাধ্যমে। এতেই তাঁর স. নবুয়তের প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁকে জানানো হচ্ছে, মরিয়মের অভিভাবকত্ব নিয়ে বাদানুবাদের সংবাদ, লটারীর মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সংবাদ, নদীর পানিতে কলম নিক্ষেপের সংবাদ ইত্যাদি।

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۙ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝

❐ স্মরণ কর যখন ফেরেস্তাগণ বলিল, হে মরিয়ম! আল্লাহ্ তাহার একটি কথার সুসংবাদ দিতেছেন। তাহার নাম মসীহ্ মরিয়ম তনয় ঈসা, সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হইবে।'

হজরত জিব্রাইল জানালেন, 'হে মরিয়ম! আল্লাহ্তায়ালার সুসংবাদ শ্রবণ করো। তিনি তোমাকে দান করবেন এক বাণী, যাঁর নাম হবে মসীহ্। ইহলোকে এবং পরলোকে তিনি হবেন সম্মানিত ও নৈকট্যভাজনদের অন্যতম। মসীহ্ ইবরানী শব্দ, এর অর্থ বরকতময়। কেউ কেউ বলেছেন তাঁকে মসীহ্ বলা হয়েছে এ কারণে যে, তিনি অপবিত্রতামুক্ত এবং পাপমুক্ত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাঁর পবিত্র হাতের স্পর্শে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা নিরাময় লাভ করতেন — তাই তাঁর নাম মসীহ্। আবার কেউ বলেছেন, স্থায়ী আবাস ছিলোনা তাঁর; থাকতেন মুসাফিরি হালে, তাই তাঁকে মসীহ্ বলা হয়েছে। ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, সত্যবাদী মসীহ্ হচ্ছেন হজরত ঈসা আ. আর মিথ্যাবাদী মসীহ্ হচ্ছে দাজ্জাল। অনেকে বলেছেন, মসীহ্ ওই ব্যক্তি যে এক চক্ষুবিশিষ্ট। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, দাজ্জাল বাম চক্ষু বিশিষ্ট এবং হজরত ঈসা ডান চক্ষু বিশিষ্ট। অর্থাৎ দাজ্জাল থেকে যেমন উত্তম চরিত্র দূর করে দেয়া হয়েছে, তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে ইমান, এলেম, জ্ঞান, ধৈর্য এবং অন্যান্য উত্তম গুণসমূহ থেকে; তেমনি হজরত ঈসাকে মুক্ত করা হয়েছে সকল মন্দ স্বভাব — মূর্খতা, লোভ, পৃথিবীপ্রীতি, কৃপণতা ইত্যাদি থেকে। এক চক্ষু বিশিষ্ট হওয়ার প্রকৃত অর্থ এই। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, আমি শরহে মাশারেকুল আনোয়ার পুস্তকে মসীহ্ শব্দের পঞ্চাশ প্রকার অর্থ দেখেছি।

ঈসা শব্দটি আরবী। এর ইবরানী প্রতিশব্দ ছিলো ইউশায়ু, অর্থ নেতা বা সর্দার। নাম ঈসা উপাধি মসীহ্ এবং উপনাম ইবনে মরিয়ম বা মরিয়ম তনয়। সাধারণভাবে নামের সঙ্গে পিতৃনাম সংযুক্ত করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন পিতা ব্যতিরেকেই। পরিচিতি দিয়েছেন মায়ের দিক থেকে। বলেছেন ইবনে মরিয়ম। এটা আল্লাহ্তায়ালার অসীম কুদরত। আল্লাহ্ জানিয়েছেন ইহ-পরকালে তাঁর সম্মানপ্রাপ্তির কথা। আরো জানিয়েছেন, সান্নিধ্যপ্রাপ্ত যাঁরা তিনি তাঁদের অন্যতম।

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ○

❒ সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিবে এবং সে হইবে পুণ্যবানদের একজন।

❒ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই আমার সন্তান হইবে কী ভাবে?' তিনি বলিলেন, 'এই ভাবেই।' আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।

❒ এবং তিনি তাহাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জিল।

সদ্যভূমিষ্ঠ হজরত ঈসা আ. দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলবেন, এটা তাঁর প্রথম মোজেজা (অলৌকিকত্ব)। পরিণত বয়সে কথা বলবেন তখন, যখন তিনি তাঁর বর্তমান আবাস চতুর্থ আকাশ থেকে নেমে আসবেন পৃথিবীতে। কারণ, পরিণত বয়সে পৌছানোর আগেই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। দুগ্ধপানকালে কথা বলার সংবাদ দিয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা সান্ত্বনা দিয়েছেন বিবি মরিয়মকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরত সম্পর্কে সন্দিহান মানুষদের প্রশ্নবাণ প্রতিহত করবেন সদ্যজাত শিশু নিজেই। এতে প্রমাণিত হয় আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরত, হজরত ঈসা আ. এর রেসালত এবং তাঁর পুণ্যবাদীতা।

বিস্মিত হলেন হজরত মরিয়ম। কুদরত সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে নিবেদন করলেন, আমি তো পুরুষের স্পর্শমুক্ত, তবে হে আমার প্রতিপালক! আমি জননী হবো কী ভাবে? আল্লাহ্‌তায়ালা জানালেন, এইভাবেই — আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা এবং কুদরত যেভাবে অবয়বশীল হয় স্বামী স্ত্রীর মাধ্যমে অথবা কেবল স্ত্রীর মাধ্যমে — সকল প্রকারই আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমতাভূত। তিনি যদি বলেন, 'হও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। তাঁর ইচ্ছা, কেবল মাতার মাধ্যমে ঈসাকে সৃষ্টি করবেন। শুনে নাও

আল্লাহ্ তাঁর অপার ক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে হজরত ঈসাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, প্রজ্ঞা (হিকমত)। শিক্ষা দিবেন তওরাত এবং ইঞ্জিল।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৪৯

وَرَسُوۡلًا اِلٰى بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اَنِّىۡ قَدۡ جِئۡتُكُمۡ بِاٰيَةٍ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ ۙ اَنِّىۡۤ اَخۡلُقُ لَـكُمۡ مِّنَ الطِّيۡنِ كَهَیْــئَةِ الطَّيۡرِ فَاَنۡفُخُ فِيۡهِ فَيَكُوۡنُ طَيۡرًاۢ بِاِذۡنِ اللّٰهِۚ وَاُبۡرِئُ الۡاَكۡمَهَ وَالۡاَبۡرَصَ وَاُحۡىِ الۡمَوۡتٰى بِاِذۡنِ اللّٰهِۚ وَاُنَبِّئُكُمۡ بِمَا تَاۡكُلُوۡنَ وَمَا تَدَّخِرُوۡنَ فِىۡ بُيُوۡتِكُمۡؕ اِنَّ فِىۡ ذٰ لِكَ لَاٰيَةً لَّـكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ۞

❐ এবং তাঁহাকে বনি ইসরাইলের জন্য রসুল করিবেন। সে বলিবে, 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন আনিয়াছি। আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পক্ষী সদৃশ আকৃতি গঠন করিব; অতঃপর উহাতে আমি ফুৎকার দিব; ফলে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে উহা পাখী হইয়া যাইবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্তকে নিরাময় করিব এবং আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবন্ত করিব। তোমরা তোমাদের গৃহে যাহা আহার কর ও মওজুদ কর তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব। তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।'

হজরত ঈসা আ. বনী ইসরাইলের জন্য রসুল। তাদের সামনে তিনি আল্লাহ্‌প্রদত্ত নিদর্শন পেশ করবেন। প্রথম নিদর্শন এই যে, তিনি মাটি দ্বারা প্রস্তুত করবেন একটি পাখির অবয়ব। তাতে ফুঁ দিবেন। আল্লাহ্‌র হুকুমে তখন পাখিটি জীবিত হবে। বাগবী বলেছেন, বাদুড় প্রস্তুত করেছিলেন হজরত ঈসা। প্রাণীদের মধ্যে বাদুড়ের গঠন প্রকৃতি অধিকতর দৃঢ় এবং পূর্ণ। তারা স্তন্যপায়ী, সুন্দর দন্তবিশিষ্ট। আবার স্ত্রী বাদুড় ঋতুবতীও হয়। এসব বৈশিষ্ট্য অন্য পাখিদের নেই। ওহাব বলেছেন, ফুৎকারের মাধ্যমে জীবিত পাখি উড়তে পারতো কেবল মানুষের দৃষ্টি সীমানায়। কিন্তু চোখের আড়াল হলেই মাটিতে পড়ে মরে যেতো। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার সরাসরি সৃষ্টি এবং বান্দার মাধ্যমে সৃষ্টির পার্থক্য। সৃষ্টি

আল্লাহ্‌তায়ালারই ক্ষমতাধীন। তাই আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমে পাখি জীবিত হবে — হজরত ঈসা আ. একথাটিও বলবেন।

দ্বিতীয় নিদর্শন এই, তিনি জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান করবেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ ওই ব্যক্তি যার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল এবং চোখ দিয়ে পানি পড়ে। ইকরামা বলেছেন, ওই ব্যক্তি যে দিনে বা রাতে কখনোই দেখতে পায়না।

তৃতীয় নিদর্শন — তিনি কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করবেন। তাঁর সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান পৌঁছেছিলো অত্যন্ত উচ্চস্তরে। তাই তাঁকে এই মোজেজা দেয়া হয়েছিলো, যাতে প্রমাণিত হয় মানুষের অর্জিত জ্ঞানবিজ্ঞান অপেক্ষা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শনই শ্রেষ্ঠ। হজরত মুসা আ. এর সময়ে যাদুবিদ্যার উন্নতি ছিলো তুঙ্গে। তাই তাঁকে দেয়া হয়েছিলো এমন মোজেজা, যাতে যাদুর দর্পচূর্ণ হয়। হজরত রসুলে পাক স. এর সময়ে ভাষা ও সাহিত্যের সৌকর্য ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে গর্বিত ছিলো আরববাসীরা। তাই কোরআন নাজিল হয়েছে শ্রেষ্ঠতম ভাষাশৈলী এবং সাহিত্যসুষমামন্ডিত হয়ে। এতে করে তাদের সাহিত্যদর্প তো চূর্ণ হয়েছেই তদুপরি এমন এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে তারা, যার জবাব দেয়া কখনোই সম্ভব নয়। বলা হয়েছে, তোমরা কোরআনের সুরার অনুরূপ একটি সুরা রচনা করতো দেখি। আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বা মোজেজার উদ্দেশ্য এটাই, যেনো মানুষ তার অহংকার চূর্ণ হতে দেখে বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে সহজে স্বীকার করে নিতে পারে সত্যকে।

ওহাব বিন মুনাব্বাহ্‌ বর্ণনা করেছেন, কোনো কোনো দিন হজরত ঈসার কাছে পঞ্চাশ হাজারের মতো রোগী জমা হয়ে যেতো। কেউ আসতে না পারলে তিনি নিজে তার কাছে চলে যেতেন এবং জন্মান্ধ ও কুষ্ঠগ্রস্তদের জন্য দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ্‌! তুমি আকাশ ও পৃথিবীবাসীদের প্রতিপালক। আকাশ ও পৃথিবীতে তুমিই উপাস্য। নভঃমন্ডল ও ভূমন্ডলের সবকিছুর উপরই তোমার নিরঙ্কুশ প্রতাপ। তুমি ছাড়া আকাশ — পৃথিবীতে প্রতাপশালী কেউ নেই। তুমিই নভঃবাসী এবং মৃত্তিকাবাসীদের প্রভূ। তুমি ছাড়া নভঃমন্ডল ও ভুমন্ডলের প্রভু কেউ নেই। তোমার অপার ক্ষমতা — মাটিতে, আকাশে, সবখানে। তুমি আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীদের মহামহিম সম্রাট। আমি তোমার জ্যোর্তিময় অবয়ব এবং তোমার মহামর্যাদামন্ডিত নাম নিয়ে তোমার সকাশে প্রার্থনা জানাই। তোমার সাম্রাজ্য চিরন্তন। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাশালী।'

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اِلٰهُ مَنْ فِي السَّمَآءِ وَاِلٰهُ مَنْ فِي الْاَرْضِ لَآ اِلٰهَ فِيْهِمَا

غَيْرُكَ وَاَنْتَ جَبَّارُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَجَبَّارُ مَنْ فِي الْاَرْضِ لَا جَبَّارَ

فِيْهِمَا غَيْرُكَ وَاَنْتَ مَلِكُ مَنْ فِي السَّمَآءِ وَمَلِكُ مَنْ فِي الْاَرْضِ

لَا مَلِكَ فِيْهِمَا غَيْرُكَ قُدْرَتُكَ فِي الْاَرْضِ كَقُدْرَتِكَ فِي السَّمَآءِ

سُلْطَانُكَ فِي الْاَرْضِ كَسُلْطَانِكَ فِي السَّمَآءِ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ

الْكَرِيْمِ وَوَجْهِكَ الْمُنِيْرِ وَمُلْكِكَ الْقَدِيْمِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ওহাব লিখেছেন, এই দোয়া পড়ে পাগল এবং ভীতিগ্রস্তদেরকে ফুঁ দিলে অথবা লিখে পানি পান করালে ইনশাআল্লাহ্‌তায়ালা নিরাময় হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত ঈসা আ. এর মাতৃভাষা ছিলো ইবরানী অথবা সুরিয়ানী। এই দোয়া তাঁর দোয়ারই আরবী রূপে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ নিদর্শন হচ্ছে মৃতকে জীবিত করা। বলা হয়েছে, 'বি ইজনিল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র হুকুমে)। জীবন দান আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়ভূত। একথার প্রমাণ রয়েছে এই শব্দটিতে। ইমাম বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ঈসা চারজনকে জীবিত করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন — ১. আজর ২. জনৈকা বৃদ্ধার ছেলে ৩. আশেরের কন্যা এবং ৪. শাম বিন নুহ্। আজর ছিলেন তাঁর বন্ধু। মৃত্যুকালে আজরের বোন তাঁকে সংবাদ পাঠালেন যে, আপনার বন্ধু মরণোন্মুখ। বন্ধুর আবাস ছিলো তিন দিনের দুরত্বে। মৃত্যুর তিনদিন পর হজরত ঈসা সহচরবৃন্দ সহ সেখানে পৌছলেন। তার বোনকে বললেন, আমাকে আজরের কবরের কাছে নিয়ে চলো। তারপর তার বোনের সঙ্গে আজরের কবরের নিকট গিয়ে হজরত ঈসা আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে আজরের জীবনভিক্ষা চাইলেন। আজর জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠে এলেন। এরপর দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন তিনি। তাঁর সন্তানও হয়েছিলো।

জনৈকা বৃদ্ধার ছেলের জানাযা যাচ্ছিলো হজরত ঈসার পাশ দিয়ে। তিনি দোয়া করলেন। বৃদ্ধার ছেলে জীবিত হয়ে তাকে বহনকারী খাটের উপর বসে পড়লো। তারপর কাপড় পরিধান করে নিচে নেমে এসে সে খাটটি উঠিয়ে নিলো নিজের কাঁধে। তারপর নিজের ঘরে চলে গেলো। সেও অনেক দিন জীবিত ছিলো এবং সন্তানের পিতাও হয়েছিলো।

তার নাম ছিলো আশের। আশের অর্থ ওশর আদায়কারী। তার এক কন্যা মারা যাওয়ার একদিন পর হজরত ঈসার দোয়ায় পূনর্জীবিত হয়েছিলো। পরবর্তী জীবনে সে সন্তানের জননী হয়েছিলো।

শাম বিন নুহের কবরের কাছে গেলেন হজরত ঈসা। আল্লাহ্‌র ইসমে আজম নিয়ে ডাকলেন তাকে। শাম বের হয়ে এলেন কবর থেকে। ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। মনে করলেন কিয়ামত সংঘটিত হবে বুঝি। ওই সময়ে মানুষের মাথার চুল পাকতো না। কিন্তু ভয়ে শামের মাথার অর্ধেক চুল শাদা হয়ে গেলো। বললেন, কিয়ামত কি হয়ে গিয়েছে? হজরত ঈসা বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র ইসমে আজম নিয়ে ডেকেছি। এখন তুমি ইচ্ছা করলে আবার মরে যেতে পারো। শাম বললেন, রাজি আছি, যদি মৃত্যুর শাস্তি থেকে রক্ষা পাই। হজরত ঈসা তার উদ্দেশ্য পুরণের জন্য দোয়া করলেন। দোয়া কবুলও হলো।

হজরত ঈসার আরেকটি নির্দশন এই যে, মানুষেরা গৃহে যা কিছু আহার করতো এবং যা জমা করে রাখতো তিনি তার বিবরণ দিতে পারতেন। সুদ্দী বলেছেন, হজরত ঈসা বিদ্যালয়ের শিশুদেরকে বলতেন, তোমাদের পিতা ঘরে এই সমস্ত খাবার তৈরী করেছেন। কোনো কোনো শিশুকে বলতেন, গিয়ে দেখো তোমার ঘরের লোকেরা অমুক জিনিস খেয়েছে এবং অমুক জিনিস উঠিয়ে রেখেছে। শিশুরা ঘরে গিয়ে খাবারের জন্য কাঁদতো। পিতামাতারা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে খাবার দিতো এবং জিজ্ঞেস করতো, এ কথা তোমাদের কে বলেছে ? শিশুরা বলতো, হজরত ঈসা। গৃহবাসীগণ বলতো, ওই যাদুকরের সঙ্গে কখনো মেলামেশা করোনা। একবার এলাকার সকল শিশুকে একটি ঘরে আটকে রাখা হলো। হজরত ঈসা খোঁজ নিতে নিতে সেখানে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, শিশুরা কোথায় ? লোকেরা বললো, এখানে কোনো শিশু নেই। তিনি বললেন, ওই আবদ্ধ ঘরে কারা? লোকেরা বললো, শুকর। তিনি বললেন, তাই হবে। ঘর খুললে দেখা গেলো সব শিশুরাই পরিণত হয়েছে শুকর শাবকে। সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। বনীইসরাইলেরা সিদ্ধান্ত নিলো, ঈসাকে হত্যা করতে হবে। বিবি মরিয়ম আশংকিত হলেন। তিনি প্রণাধিক পুত্রকে নিয়ে গাধায় আরোহন করলেন। চলে গেলেন মিশরে।

কাতাদা বলেছেন, ঘটনাটি মায়েদা সম্পর্কিত। বনী ইসরাইলেরা যেখানে থাকতো, সেখানে তাদের কাছে আকাশ থেকে মায়েদা (খাঞ্চা ভর্তি আহার্য) অবতীর্ণ হতো। ওই আহার্য ছিলো মান্না ও সাল্‌ওয়ার মতো। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো, ওই আহার্য আত্মসাৎ করা যাবে না। লুকিয়েও রাখা যাবে না। কিন্তু তারা নির্দেশ অমান্য করলো। হজরত ঈসা তাদের এমতো অপকর্মের কথা

বলে দিতে পারতেন। ওই অবাধ্যতার জন্যই আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে শূকর বানিয়ে দেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৫০, ৫১।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ○ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ○

❒ আমি আসিয়াছি আমার সম্মুখে তওরাতের যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতকগুলিকে বৈধ করিতে। এবং আমিও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন আনিয়াছি। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর।

❒ 'আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত করিবে। ইহাই সরল পথ।'

প্রত্যেক নবী তাঁর পূর্ববর্তী নবীকে সমর্থন করেন। নবুয়তের সূত্রপরম্পরার নিয়মই এই। হজরত ঈসা তাই বলেছেন, তওরাতে যা রয়েছে আমি তা সমর্থন করি। বলেছেন, 'তওরাতের কিছু নিষেধাজ্ঞাকে আমি বৈধতা দিতে এসেছি।' যেমন, চর্বি এবং গোশ্‌ত তওরাতে হারাম ঘোষিত হলেও এখন তা হালাল। এভাবে পূর্ববর্তী হুকুম রহিত হওয়াকে মনসুখ বলে। যে সমস্ত হুকুম বিশেষ কোনো সময়ের জন্য হয় সেগুলোকে পরবর্তী নবীর মাধ্যমে মনসুখ করাই আল্লাহ্‌তায়ালার নিয়ম। কোরআনুল করীমেও এরকম কিছু হুকুম রয়েছে যা পরবর্তীতে রসুল স. এর উপস্থিতিতেই রহিত করা হয়েছে। নতুন হুকুম জারি করার অর্থ এই নয় যে, পূর্ববর্তী হুকুমটি ভুল ছিলো। পূর্ববর্তী হুকুমও ঠিক। পরবর্তী হুকুমও ঠিক। একটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় অন্যটি বলবৎ হয়েছে।

নিদর্শনাবলীর উল্লেখ ইতোপূর্বে হওয়া সত্ত্বেও এখানে হজরত ঈসা পুনরায় নিদর্শন এনেছেন বলেছেন। পূর্বের নিদর্শন সমূহ ছাড়াও এখানে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ইঞ্জিল শরীফের সংযোজন করা হয়েছে। অথবা এও হতে পারে গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য এখানে পূর্ববর্তী নিদর্শন সমূহের পুনরোল্লেখ করা হয়েছে।

শেষে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন, আল্লাহ্ কে ভয় করতে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে। অর্থাৎ তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশাবলীকে মান্য করতে।

আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের প্রতিপালক — সুতরাং তাঁহার ইবাদত কর — এই বাক্যটিতে পূর্ণ ইমান এবং পূর্ণ আমল সম্পাদনের আহবান রয়েছে। প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহ্তায়ালাকে স্বীকার করলে এবং তাঁর ইবাদতে সমর্পিত হলে সকল ফেৎনার অবসান অবশ্যম্ভাবী। তাই বলা হচ্ছে, ইহাই সঠিক পথ। এরকম কথা বলে গিয়েছেন রসুলে পাক স. ও। একব্যক্তি যখন বলেছিলো, আমাকে এমন কথা বলে দিন যেনো অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে না হয়। রসুল স. বলেছিলেন, বলো আমি আল্লাহ্র উপর ইমান এনেছি এবং এই কথার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকো।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৫২, ৫৩, ৫৪

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○ رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○ وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ع

❒ যখন ঈসা তাহাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করিল তখন সে বলিল, 'আল্লাহের পথে কাহারা আমার সাহায্যকারী?' শিষ্যগণ বলিল, 'আমরাই আল্লাহের পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহে বিশ্বাস করিয়াছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, তুমি ইহার সাক্ষী থাক।'

❒ 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিয়াছি এবং আমরা এই রসুলের অনুসরণ করিয়াছি। সুতরাং আমাদিগকে সাক্ষ্য বহনকারীদের তালিকাভূক্ত কর।'

❒ এবং তাহারা চক্রান্ত করিয়াছিল আল্লাহ্ও চক্রান্ত করিয়াছিলেন, আল্লাহ্ চক্রান্তকারীদের শ্রেষ্ঠ।

হজরত ঈসা আ. এর মোজেজা যখন বারবার প্রত্যাখ্যাত হতে লাগলো, চতুর্দিকে মাথা তুলে দাঁড়ালো অবিশ্বাস, তখন তিনি চূড়ান্ত আহবান জানালেন, আল্লাহ্তায়ালার পথে কারা আমার সাহায্যকারী? তখন সাড়া দিলেন

হাওয়ারীবৃন্দ। বললেন, আমরা। আমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করি। আমরা বলি, আমরা বিশ্বাস করেছি আমাদের প্রতিপালক কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাবে এবং অনুসরণ করি এই রসুলের। সুতরাং হে আমাদের আল্লাহ্! আমরা যেনো সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভূত হই।

'হাওয়ারী' অর্থ খাঁটি বন্ধু। আরেকটি অর্থ অত্যধিক শুভ্র। খন্দক যুদ্ধের সময় রসুল স. তিনবার উচ্চ আওয়াজে যখন মানুষকে ডেকেছিলেন তখন তিনবারই ত্বরিৎ সাড়া দিয়েছিলেন জোবায়ের বিন আওয়াম। রসুল স. বলেছিলেন, প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী থাকে আর আমার হাওয়ারী জোবায়ের। বোখারী, মুসলিম।

কামুস অভিধানে বলা হয়েছে, হাওয়ারী অর্থ সাহায্যকারী। অথবা নবীদের সাহায্যকারী। কিংবা ধোপা ও খাঁটি বন্ধু। হজরত ঈসার সহচরবৃন্দকে তাদের বিশুদ্ধতার জন্য অথবা সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য হাওয়ারী বলা হয়। এরকম বলেছেন হাসান ও সুফিয়ান। কেউ কেউ বলেন, শাদা পোশাক পরিধান করতেন বলে তাদেরকে হাওয়ারী বলা হতো। ইবনে জারীর বলেছেন, তাঁরা ছিলেন ধোপা। মানুষের বস্ত্র ধৌত করতেন তাঁরা। জুহাক বলেছেন, তাঁদের অন্তর ছিলো নির্মল, পাপমুক্ত। ইবনে মোবারক বলেছেন, তাঁদের মুখমন্ডলে ছিলো ইবাদতের চিহ্ন এবং নূরের প্রভাব। কালাবী এবং ইকরামা বলেছেন, মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা, সংখ্যায় ছিলেন তাঁরা বারোজন। রূহ্ বিন কাসেম বলেন, আমি হজরত কাতাদাকে হাওয়ারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তাঁরা ছিলেন নবীর প্রতিনিধি। মুজাহিদ এবং সুদ্দী বলেছেন, তাঁরা জেলে ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, মাঝি।

একবার ইহুদীদের এক দল হজরত ঈসাকে যাদুকর বললো এবং তাঁর পবিত্রা জননীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলো। হজরত ঈসা তাদেরকে অভিসম্পাত দিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমে তৎক্ষণাৎ তারা হয়ে গেলো শূকর। তাদের নেতা ইহুদা এই ঘটনা দেখে ভয়ার্ত হলো। সে সবাইকে নিয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলো, হজরত ঈসা নবীকে হত্যা করতে হবে। যখন তারা হত্যা করতে উদ্যত হলো, আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত জিব্‌রাইল পাঠালেন। তিনি হজরত ঈসাকে আকাশে উঠিয়ে নিলেন। ইহুদা গৃহাভ্যন্তরে গিয়ে হজরত ঈসাকে হত্যা করার জন্য তিতিয়ানুস্‌কে নির্দেশ দিলো। আল্লাহ্‌তায়ালা তার আকৃতি হজরত ঈসার মতো করে দিলেন। লোকেরা ঈসা মনে করে তাকে হত্যা করলো। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, তারা চক্রান্ত করেছিলো, আল্লাহ্‌তায়ালাও চক্রান্ত করেছিলেন। আর আল্লাহ্‌তায়ালার চক্রান্তই ফলবতী হয়। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার অপার ক্ষমতা। তাঁর ক্ষমতার কাছে সকল কিছুই পরাভব মানতে বাধ্য।

إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسٰى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ
مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ○ وَأَمَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الظّٰلِمِينَ ○

❒ স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ বলিলেন, 'হে ঈসা ! আমি তোমার কাল পূর্ণ করিতেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া লইতেছি এবং যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে তোমাকে মুক্ত করিতেছি। আর তোমার অনুসারীগণকে কিয়ামত পর্যন্ত সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতেছি, অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।' তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটিতেছে আমি উহার মীমাংসা করিয়া দিব।

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে আমি তাহাদিগকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করিব এবং তাহাদের কোনো সাহায্যকারী নাই।

❒ আর যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং সৎকার্য করিয়াছে তিনি তাহাদের প্রতিফল পুরাপুরিভাবে প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীগণকে ভালোবাসেন না।

হাসান, কালাবী এবং জারিহ্ এই আয়াতের প্রথম বাক্যটির অর্থ করেছেন, আমি তোমাকে উত্তোলন করবো, মৃত্যু ব্যতীতই পৃথিবী থেকে উঠিয়ে আমার সকাশে আনবো। বাগবী অর্থ করেছেন দু'রকম। ১. আমি তোমাকে পুরাপুরি নিজের কাছে উঠিয়ে নেবো, তারা (ইসরাইলীরা) তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। ২. আমি তোমাকে আপন হেফাজতে নিয়ে আসবো অর্থাৎ নিরাপদ

রাখবো। ইবনে জারীর, রবী বিন আনাসের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'তাওয়াফ্‌ফি' অর্থ নিদ্রা, অর্থাৎ হজরত ঈসা নিদ্রাভিভূত হয়েছিলেন এবং নিদ্রাবস্থায়ই তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন তাওয়াফ্‌ফি অর্থ মৃত্যু। হজরত আলী বিন আবী তালহা থেকে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা অর্থ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যু প্রদান করবো। বাগবী লিখেছেন, এই দৃষ্টিকোন থেকে আয়াতের অর্থ হবে দু'রকম — ১. ওহাব বলেছেন, দিবসকালে তিন ঘন্টার জন্য হজরত ঈসাকে মৃত অবস্থায় রেখে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, ঈসায়ীরা বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা ঈসা আ. কে দিবসকালে সাত ঘন্টা মৃতাবস্থায় রাখার পর পূনর্জীবিত করে উঠিয়ে নিয়েছেন। ২. জুহাক বলেছেন, অর্থ এই যে, আকাশ থেকে অবতরণ করার পর ইহুদীদের হত্যা পরিকল্পনা থেকে নিরাপদ রেখে জীবনের আয়ু পূর্ণ করে আমি তোমাকে মৃত্যু প্রদান করবো — কিন্তু এর পূর্বে আমি তোমাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেবো।

আমরা মনে করি, তাওয়াফ্‌ফি অর্থ মৃত্যু ব্যতীতই আকাশে উঠিয়ে নেয়া। কেননা অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তারা ঈসাকে হত্যাও করেনি শূলেও দেয়নি।'

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী ওই জাত পাকের কসম! অতিসত্ত্বর ঈসা ইবনে মরিয়ম ন্যায় বিচারক হয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিজিয়া কর রহিত করবেন এবং ধনসম্পদ এমন বিপুলাকার করে দেবেন যে, কেউ ধন গ্রহণে আগ্রহী হবেনা। তখন একটি সেজদা হবে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু অপেক্ষা উত্তম। হাদিসটি বর্ণনা শেষে হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, যদি তোমরা তাঁকে মান্য করতে চাও তবে পড়, 'এবং নিশ্চয় আহলে কিতাবগণ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উপর ঈমান আনবে।' বোখারী, মুসলিম।

বোখারী, মুসলিমের দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ওই সময়ের অবস্থা কেমন হবে যখন হজরত ঈসা তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন এবং তোমাদের ইমাম হবে তোমাদের মধ্যে থেকেই। মুসলিমের এক বর্ণনায় অতিরিক্ত কয়েকটি কথা এসেছে, উটনীগুলোকে ছেড়ে দেয়া হবে, কিন্তু সেগুলোতে আরোহী হয়ে আক্রমণ করা যাবেনা। শত্রুতা, হিংসা এবং পরশ্রীকাতরতা উধাও হয়ে যাবে। মানুষকে সম্পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হবে কিন্তু কেউ আগ্রহ প্রকাশ করবেনা

বাগবী হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তাঁর যুগে মুসলমান ছাড়া অন্য সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। দাজ্জালও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীতে তিনি অবস্থান করবেন চল্লিশ বছর। তারপর মৃত্যুবরণ করবেন স্বাভাবিক নিয়মে। মুসলমানেরা তাঁর জানাজা পড়বেন।

হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন ওমর থেকে ইবনে জাওজী বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, ঈসা ইবনে মরিয়ম পৃথিবীতে নেমে এসে বিয়ে করবেন।

সন্তানের জনক হবেন। পঁয়তাল্লিশ বছর পর ইন্তেকাল করবেন। তাঁকে দাফন করা হবে আমার কবরের পাশে। আমি, ঈসা, আবুবকর এবং ওমর একসঙ্গে থাকবো।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সত্যপ্রতিষ্ঠ হয়ে জেহাদরত থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারাই বিজয়ী হবে। তারপর নেমে আসবেন নবী ঈসা। মুসলমানদের নেতা তাঁকে নামাজ পড়াতে বললে তিনি রাজী না হয়ে বলবেন, তোমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন জনের নেতা। তিনি একথা বলবেন কেবল এই উম্মতের সম্মান প্রকাশার্থে। মুসলিম।

মেরাজের হাদিসে এসেছে, রসুলুল্লাহ্ স. ঈসা ইবনে মরিয়মকে দ্বিতীয় আকাশে দেখেছেন। বোখারী ও মুসলিম।

আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা করেছেন, 'তোমার অনুসারীদেরকে আমি প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী করে রাখবো।' এর অর্থ তোমার অনুসরণকারীগণ দলিল প্রমাণে এবং অধিকাংশ সময়ে শক্তির দিক থেকেও কাফেরদেরকে পরাভূত করে রাখবে। রসুল স. এর পূর্বে হজরত ঈসার অনুসারীরা ছিলেন ইসরাইলী হাওয়ারীগণ। তাঁর স. আর্বিভাবের পর তাঁর অনুসারী বলতে মুসলমানদেরকে বুঝতে হবে। কারণ, মুসলমানরা তাঁকে নবী বলে মান্য করেছে এবং তাঁর তৌহিদের আহবানকে কবুল করেছে। মেনে নিয়েছে তাঁর সেই সুসংবাদকে, আমার পরে একজন নবী আসবেন যাঁর নাম আহমদ — আমি তাঁর সুসংবাদদানকারী। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর অনুসরণকারী বলতে কেবল খৃষ্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা সব সময় ইহুদীদের উপরে বিজয়ী থাকবে।

'অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন' — এই অমোঘ ঘোষনা হজরত ঈসা, তাঁর অনুসারী, সত্যপ্রত্যাখানকারী — সকলের জন্য। এর পরেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পৃথকভাবে সম্বোধন করে ইহকালে ও পরকালে কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। এই শাস্তি থেকে বাঁচাবে এরকম সাহায্যকারী তাদের নেই। থাকতে পারে না। ইহকালে হত্যা, জিজিয়া করারোপ, লাঞ্ছনা এবং পরকালে দোজখের শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত। আর ইমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য দেওয়া হয়েছে তাদের সৎকর্ম সমুহের পূর্ণ বিনিময় প্রদানের আশ্বাস। সীমালংঘনকারীদেরকে আল্লাহ্তায়ালা ভালোবাসেন না তাই তারা শাস্তিযোগ্য। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হজরত মরিয়মের তের বছর বয়সে হজরত ঈসা জন্মগ্রহণ করেন। বাবেল শহরে সিকান্দারের আক্রমণের পঁয়ষট্টি বছর পর ছিলো তাঁর আর্বিভাব কাল। ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তাঁর বয়স পৌছেছিলো তিরিশ বছরে। বয়স তেত্রিশে পৌছলে রমজান মাসের শবে কদরের দিন বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে তাঁকে আল্লাহ্পাক আকাশে উঠিয়ে নেন। তাঁর নবুয়তের সময় ছিলো মাত্র তিন বছর। এই ঘটনার পর হজরত মরিয়ম বেঁচে ছিলেন মাত্র ছয় বছর।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তিকে যখন ঈসা আ. এর আকৃতিবিশিষ্ট করে দেয়া হলো তখন তাকে ধরে ক্রুশবিদ্ধ করলো ইহুদীরা। হজরত মরিয়ম এবং অন্য এক মহিলা (হজরত ঈসার দোয়ায় যিনি উন্মাদিনী অবস্থা থেকে নিরাময় হয়েছিলেন) কাঁদতে কাঁদতে ক্রুশবিদ্ধ লাশের নিকটে গেলেন। হঠাৎ হজরত ঈসা প্রকাশিত হয়ে বললেন, কাঁদছেন কেনো? আল্লাহ্তায়ালা আমাকে প্রচুর কল্যাণসহ উঠিয়ে নিয়েছেন। তারা আমাকে কোনো কষ্ট দিতে পারেনি। এরপর অদৃশ্য হলেন তিনি। সাত দিন পর আল্লাহ্তায়ালা হুকুম করলেন, হে ঈসা ! পাহাড়ে ক্রন্দনরতা মরিয়মের নিকট অবতরণ করো। কারণ সে চিন্তিত, ব্যথিত এবং রোরুদ্যমান। ওখানে গিয়ে হাওয়ারীগণকেও একত্রিত করো। তাদেরকে পাঠিয়ে দাও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে। নির্দেশ দাও, যেনো তারা আল্লাহ্তায়ালার দিকে মানুষকে ডাকতে থাকে। হজরত ঈসা অবতরণ করলেন। নূর প্রজ্জ্বলিত হলো পাহাড়ে। হাওয়ারীগণ একত্রিত হলেন। তিনি তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিলে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে পুনরায় উঠিয়ে নিলেন আকাশে। সকাল হলো। হাওয়ারীগণ আদিষ্ট স্থানে পৌঁছে ওই স্থানের প্রচলিত ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৫৮

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○

❐ যাহা আমি তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি তাহা নিদর্শন ও সারগর্ভ বাণী হইতে।'

এই আয়াতটিও রসুলে পাক স. এর নবুয়তের প্রমাণ। এটা তাঁর মোজেজার অন্তর্ভূত। কেননা অতীতের এসমস্ত ঘটনাবলী আল্লাহ্তায়ালা না জানালে তিনি জানতেন না। অতএব তিনি যে আল্লাহ্র রসুল — এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ওয়াজ্জিক্রিল হাকিম (সারগর্ভ বাণী হইতে) অর্থ লাওহে মাহফুজ। লাওহে মাহফুজ শাদা মোতি নির্মিত এমন একটি দীর্ঘ ফলক যা পৃথিবী ও আকাশের মধ্যবর্তী শূন্য স্থানে আরশের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় বিদ্যমান।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৫৯, ৬০

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

❐ আল্লাহের নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তারপর তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'হও', ফলে সে হইয়া গেল।

❒ এই সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে, সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

হজরত আদম আ. সৃষ্ট হয়েছেন পিতা মাতা ব্যতিরেকেই। আর হজরত ঈসা আ. সৃষ্ট হয়েছেন পিতা ব্যতিরেকে। দু'জনেরই সৃষ্টি বিস্ময়কর। বরং হজরত ঈসা অপেক্ষা হজরত আদমের সৃষ্টি অধিক বিস্ময়কর।

এই আয়াত নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দলের বাদানুবাদের কারণে অবতীর্ণ হয়েছে। একবার তারা রসুল স. এর সকাশে এসে বললো, আপনি নাকি ঈসা আ. কে গালি দেন। তিনি বললেন, না তো। তারা বললো, আপনি যে তাঁকে বান্দা বলেন। রসুল স. বললেন, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা, আল্লাহ্‌র রসুল এবং কালেমাতুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র একটি হুকুম)। আল্লাহ্ তাঁকে মরিয়মের উদরে স্থাপন করেছিলেন। খৃষ্টানেরা রাগান্বিত হয়ে বললো, আপনি কি কখনো কোনো মানুষকে পিতা ছাড়া জন্ম নিতে দেখেছেন? তাদের প্রশ্নের জবাবে অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম, আউফ রা. এর মাধ্যমে এবং হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসূত্রে। ইবনে আবী হাতেম আরেকটি বর্ণনা করেছেন হাসান বসরীর মাধ্যমে। বর্ণনাটি এই — নাজরানের দু'জন পাদ্রী রসুলুল্লাহ্ স. এর খেদমতে হাজির হলো। একজন জিজ্ঞেস করলো, নবী ঈসার পিতা কে? রসুলে পাক স. এই প্রশ্নের জবাব আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট থেকে কামনা করলেন। তখন নাজিল হলো এই আয়াত। হতবাক হয়ে গেলো পাদ্রীদ্বয়। তারা এমত মূর্খ যে, অহরহ দেখছে যে ছাগলের বাচ্চা মানুষ থেকে অথবা মানুষের বাচ্চা ছাগল থেকে কখনোই জন্মলাভ করেনা কারণ, জাত এখানে ভিন্ন। সৃষ্টির মধ্যেই যদি এরকম সম্ভব না হয়, তবে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে তা সম্ভব হবে কীভাবে। আল্লাহ্‌তায়ালা একক, অমুখাপেক্ষী, চিরন্তন এবং আনুরূপ্যবিহীন। সুতরাং তিনি ঈসা আ. এর পিতা হবেন কেমন করে। হজরত ঈসা তো শরীর বিশিষ্ট অবক্ষয়শীল এক সৃষ্টি, যিনি পানাহার করেন। শয়ন করেন। মৃত্যু তাঁর অমোঘ নিয়তি। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা কারো পিতা বা পুত্র নন। কেউ তাঁর সমকক্ষও নয়।

জ্ঞাতব্য ঃ এই আয়াত থেকে শরয়ী কিয়াস প্রমাণিত হয়েছে। কেননা, হজরত আদমের সৃষ্টির উপর কিয়াস করে হজরত ঈসার পিতা ব্যতীত সৃষ্টি হওয়ার বৈধতা আল্লহ্‌তায়ালা এখানে প্রমাণ করেছেন। অতএব, যারা কেবল কোরআন সুন্নত ও এজমাকেই আহকাম মনে করেন, কিয়াস মানেন না; এই আয়াত তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ।

'সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইওনা' — অর্থ ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো সন্দেহে পতিত হয়োনা। ইহুদীরা হজরত ঈসা আ. এর পবিত্রা মাতাকে বলতো,

ব্যভিচারিণী। আর খৃষ্টানেরা হজরত ঈসাকে বলে আল্লাহ্‌র পুত্র। দুই দলই সংশয়বাদী, অবিশ্বাসী।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৬১, ৬২, ৬৩।

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا
نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ قف
ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ
الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ○ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ○

❒ তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর যে কেহ এই বিষয়ে তোমার সহিত তর্ক করে তাহাকে বল, 'আইস আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজদিগকে ও তোমাদের নিজদিগকে; অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং রাখি মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহের অভিশাপ।'

❒ নিশ্চয়ই ইহা সত্য কাহিনী। আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য ইলাহ্‌ নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।

❒ যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

আল্লাহ্‌তায়ালা এখানে রসুল পাক স. কে খৃষ্টানদের সঙ্গে মোবাহিলা করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। মোবাহিলা অর্থ পরস্পর পরস্পরকে অভিসম্পাত প্রদান। দুই পক্ষই আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট এই মর্মে প্রার্থনা করবে, মিথ্যাবাদীদের এবং তার আপনজনদের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার অভিশাপ বর্ষিত হোক। আল্লাহতায়ালার নির্দেশক্রমে রসুল স. মোবাহিলা করতে প্রস্তুত হলেন। মুসলিম এবং তিরমিজি হজরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাসের এর মাধ্যমে লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. হজরত আলী, হজরত ফাতেমা, হজরত হাসান এবং হজরত হোসেন কে ডাকলেন। বললেন, হে আমার আল্লাহ্‌! এরাই আমার আহলে বাইত (আপনজন)।

বাগবী লিখেছেন, রসুল পাক স. নাজরানের খৃষ্টানদের সামনে এই আয়াত পাঠ করলেন, এবং তাদেরকে মোবাহিলা করতে আহ্বান জানালেন। তারা বললো, আমরা পরামর্শ করে আগামীকাল আমাদের সিদ্ধান্ত জানাবো। তাদের মধ্যে আকিব ছিলো সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী। খৃষ্টানেরা তাকে প্রশ্ন করলো, হে আবদুল মসীহ্! আপনি কী বলেন? আকিব বললো, ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা ভালো করে ভেবে দেখো। মোহাম্মদ কিন্তু সত্য নবী। আল্লাহ্র কসম! নবীর সাথে মোবাহিলা করে কেউ জীবিত থাকতে পারেনা। তোমরা এরকম করলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা বরং মোহাম্মদের সঙ্গে সন্ধি করে দেশে ফিরে যাও। একথায় সবাই একমত হলো। পরদিন সকালে তারা যখন রসুল স. এর সকাশে হাজির হলো, তখন তাঁর স. কোলে ছিলেন হজরত হোসেন। হাত ধরে ছিলেন হজরত হাসান। পিছনে ছিলেন হজরত ফাতেমা এবং হজরত ফাতেমার পিছনে ছিলেন হজরত আলী। রসুল স. তাঁদেরকে বললেন, যখন আমি দোয়া করবো, তখন তোমরা বলবে আমিন। এই অবস্থা দেখে নাজরানের পাদ্রী বলতে লাগলো, হে খৃষ্টানেরা! আমি তো স্পষ্ট দেখছি, তিনি দোয়া করলে আল্লাহ্তায়ালা পাহাড়কেও স্থানচ্যুত করে দেবেন। কাজেই তোমরা মোবাহিলা কোর না। করলে সবাই মরে যাবে এবং রোজ কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আর কোনো খৃষ্টান অবশিষ্ট থাকবেনা। প্রতিনিধিরা বললো, হে আবুল কাসেম! আমরা আপনার সাথে মোবাহিলা করতে চাইনা। আপনি আপনার মতো থাকুন। আমরা আমাদের মতো থাকবো। রসুল স. বললেন, মোবাহিলা না করতে চাইলে মুসলমান হয়ে যাও। মুসলমানদের মতো তোমরাও সমঅধিকারসম্পন্ন হবে। তারা মুসলমান হতে অস্বীকার করলো। রসুল স. বললেন, এবার তোমাদের ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে। তারা বললো, আরবদের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি আমাদের নেই। আমরা এই শর্তে সন্ধি করছি, আপনি আমাদের উপর সেনা আক্রমণ চালাবেন না, আমাদেরকে সন্ত্রস্ত করবেন না এবং আমাদেরকে ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করবেন না। আমরা আপনাকে প্রতি বছর দুই হাজার জোড়া কাপড় দেবো। এক হাজার সফর মাসে এবং বাকি এক হাজার রজব মাসে। শর্ত অনুযায়ী তাদের সাথে সন্ধি করলেন রসুল স.। তিনি স. বলেছেন, আমার জীবনাধিপতি যিনি, তাঁর কসম দিয়ে বলছি, নাজরানবাসীদের মাথার উপর আযাব এসে গিয়েছিলো। তারা মোবাহিলা করলে বানর ও শুকর হয়ে যেতো এবং সমস্ত উপত্যকা অগ্নিময় হয়ে বর্ষিত হতো তাদের উপর। নাজরানের সমস্ত অধিবাসী এমন কি সেখানকার পক্ষীকুলও ধ্বংস হয়ে যেতো এবং বৎসর অতিবাহিত হওয়ার আগেই সমস্ত খৃষ্টান সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। আবু নাঈম তাঁর দালায়েল নামক পুস্তকে হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এই আয়াত থেকে রাফেজী সম্প্রদায় হজরত আলী রা. কে প্রথম খলিফা হিসেবে

প্রমাণ করে এবং অন্য তিন খলিফার খেলাফতকে বাতিল হিসেবে গণ্য করে। তাদের বক্তব্য, আয়াতে পুত্রগণ বলতে হজরত হাসান এবং হজরত হোসাইনকে, নারী বলতে হজরত ফাতেমাকে এবং নিজদিগকে (আনফুসানা) বলতে হজরত আলী রা. কে বোঝানো হয়েছে। অর্থ দাঁড়ায়, হজরত আলী মোহাম্মদ স. এর সমকক্ষ। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'নবী মুমিনদের সঙ্গে তাদের আত্মার চেয়েও অধিক সম্পর্ক রাখেন।' হজরত আলী এরকমই ছিলেন। কাজেই তিনি রসুল পাক স. এর পরে প্রথম ইমাম হওয়ার যোগ্য।

রাফেজীদের এই মত ভুল। কারণ, ১. রসুল স. এর সত্তা হজরত আলীর সত্তা থেকে অবশ্যই পৃথক। ২. পুত্রগণ শব্দটির মধ্যে হজরত আলী অন্তর্ভূত; কেননা জামাতা পুত্রেরই মতো। ৩. বংশগত আত্মীয় হলেই মর্যাদা সমান হবে, এমন বাধ্যকতা নেই ৪. রেসালতের সম্মাননায় হজরত আলীর প্রবেশাধিকার নেই। তিনি ইমাম হলেও রসুল নন। তাই সমকক্ষতার ধারণা আসতেই পারেনা ৫. এই আয়াত হজরত আলীর প্রথম খলিফা হওয়ার প্রমাণ হলে, রসুল পাক স. এর জীবদ্দশাতেই একথা সর্বজনবিদিত হতো। কিন্তু এরকম কোনো প্রমাণ নেই। অবশ্য এই ঘটনা থেকে এতোটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, হজরত আলী রসুল পাক স. এর প্রিয়জন।

আল্লাহ্তায়ালার ঘোষণা, হজরত ঈসার কাহিনীটি নিশ্চিত সত্য। আর তিনি ব্যতীত যেহেতু কোনো উপাস্য নেই, তাই হজরত ঈসাকে তাঁর পুত্র মনে করা স্পষ্ট অংশীবাদিতা। আল্লাহ্তায়ালার প্রতাপ, প্রজ্ঞা সমকক্ষতাবিহীন। সুতরাং কার সাধ্য তাঁর প্রতিপালকত্বের অংশী হয়। এরপরও যারা তৌহিদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, স্পষ্ট প্রমাণ অস্বীকার করে এবং বিশ্বাসের বাগানকে করে বিপর্যস্ত — তাদেরকে আল্লাহ্তায়ালা ভালো করেই জানেন। তারা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য।

মুফাসসিরগণ লিখেছেন, নাজরানের প্রতিনিধি দল মদীনায় এলে ইহুদীদের সাথে তাদের সাক্ষাত হলো। বিতর্কে প্রবৃত্ত হলো তারা। খৃষ্টানেরা বললো, ইব্রাহিম ছিলেন নাসারা। কাজেই আমরা তাঁর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখি। তাঁরই দ্বীনের অনুসরণ করি আমরা। ইহুদীরা বললো, ইব্রাহিম ইহুদী ছিলেন। আমরা তাঁর নিকটতম এবং তাঁর ধর্মমতের অনুসারী। রসুল পাক স. এই বিতর্কের মাঝখানে পড়ে বললেন, তোমরা দু'দলই নবী ইব্রাহিমের ধর্মমত থেকে বিচ্যুত। তিনি সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য হয়ে গিয়েছেলেন। আমিই তাঁর ধর্মমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই তোমরা সবাই ইব্রাহিমের দ্বীনের অর্থাৎ ইসলামের অনুসারী হও। ইহুদীরা বললো, খৃষ্টানেরা যেমন হজরত ঈসাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, আপনি তো চাইছেন, আমরাও আপনার সেইরূপ উপাসনা করি। খৃষ্টানেরা বললো, আপনি কি চান ইহুদীরা হজরত উযায়েরকে যেরূপ মনে করে আমরাও আপনাকে সেরূপ মনে করি? এই বাদানুবাদের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ○

❒ তুমি বল, 'হে কিতাবীগণ! আইস সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করি না, কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক করি না এবং আমাদের কেহ আল্লাহ্ ব্যতীত কাহাকেও প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করে না।' যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, 'আমরা আত্মসমর্পণকারী, তোমরা সাক্ষী থাক।'

তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের মূল কথা একই। আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত না করা, কোনোকিছুকে তাঁর সাথে শরীক না করা এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে প্রতিপালক সাব্যস্ত না করা — সকল আসমানী কিতাবের মূল নির্দেশ এরকমই। ইহুদী এবং নাসারারা এই নির্দেশচ্যুত। আল্লাহ্তায়ালা এখানে তাঁর প্রিয় রসুল মোহাম্মদ স. কে এই মূল নির্দেশের প্রতি আহবান জানাতে বলেছেন।

হজরত আদী বিন হাতেম বর্ণনা করেছেন, যখন এই আয়াত নাজিল হলো — 'তারা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে তাদের আলেম ও ধর্ম যাজকদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে,' তখন আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল ! আমরা তো আলেম ও মাশায়েখদের পুজা করিনা। তিনি স. বললেন, তারা কি হালালকে হারাম সাব্যস্ত করেনি। আর তোমরা কি তাদের অভিমত অনুযায়ী আমল করনি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারাতো গায়রুল্লাহ্কে প্রতিপালক বানিয়েছে। তিরমিজি এই বর্ণনাটিকে হাসান বলেছেন।

রসুলের আনুগত্যই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র আনুগত্য। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'যে রসুলের অনুসরণ করলো নিশ্চয় সে আল্লাহ্তায়ালারই অনুসরণ করলো।' ওলামা, আউলিয়া এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের হুকুম শরিয়ত সম্মত হলে তাও আল্লাহ্তায়ালার অনুসরণ বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ এরকম, 'তোমরা আল্লাহ্কে মানো, তাঁর রসুলকে মানো এবং তোমাদের নেতাদেরকেও মানো।' হজরত আলী রা. বলেছেন, যারা আল্লাহ্তায়ালার অবাধ্য, তাদের অনুসরণ বৈধ নয়। কেবল সৎকাজেই অনুসরণ জরুরী। বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ।

হজরত ইমরান বিন হাসিন এবং হজরত হাকিম বিন আমরে গিফারী বর্ণনা করেছেন, স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির অনুসরণ নাজায়েয।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। কোনো মারফু হাদিস সহীহ্ প্রমাণিত হলে, দেখতে হবে — এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কোনো হাদিস রয়েছে কি না। অথবা এই মারফু বর্ণনাটি অন্য কোনো হাদিস দ্বারা রহিত হয়েছে কি না। যদি দ্বিতীয় হাদিস না থাকে অথবা বর্ণনাটি রহিত বলে প্রমাণিত না হয় — এমতাবস্থায় যদি ইমাম আবু হানিফার অভিমত হাদিসটির প্রতিকূল হয়, তবে তাঁর অভিমত পরিত্যাগ করে সহীহ্ হাদিসটি গ্রহণ করতে হবে। এ অবস্থায় কেউ ইমামে আজমের অভিমত আঁকড়ে ধরে থাকলে তা হবে গায়রুল্লাহ্কে মেনে নেয়ার মতো। বায়হাকী তাঁর মাদখাল গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে আবদুল্লাহ বিন মোবারকের একটি উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্তিটি এই, আমি ইমাম আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি, যদি কোনো বর্ণনা রসুল পাক স. এর সঙ্গে মিলে যায়, তবে আমরা তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবো। সাহাবীর সঙ্গে মিলে গেলে তবে আমরা তাঁদের জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেবো। আর তাবেয়ীর সঙ্গে মিলে গেলে আমরা তার সমান্তরালে দাঁড়াবো। বায়হাকী লিখেছেন, ইমামে আজম বলেছেন, রসুল স. এবং সাহাবীদের বাণীর অনুকূল না হলে আমার কথাকে অগ্রাহ্য করো। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, সহীহ্ প্রমাণিত হাদিসই আমার মাজহাব।

আমরা বলি, আমল করার জন্য চার ইমামের যে কোনো একজনের অভিমতের সমর্থন থাকা জরুরী। অন্যথায় ঐকমত্যের (এজমার) বিরুদ্ধাচারণ অবশ্যম্ভাবী হবে। কেননা, তৃতীয় অথবা চতুর্থ যুগের পরে শাখাগত মাসআলায় আহলে সুন্নতের চারিটি মাজহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চম কোনো মাজহাব নেই। অতঃপর ঐকমত্য এই যে, যা চার ইমামের বিরুদ্ধে তা বাতিল। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন, 'এবং যে মুসলমানদের পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করবে, তাকে আমি যা খুশী তাই করতে দেবো এবং অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।'

প্রশ্ন উঠতে পারে, এমনও তো হতে পারে যে, কোনো হাদিস চার ইমামের কেউই জানাতে পারেন নি এবং তাঁরা সম্মিলিতভাবে হাদিসের বিরুদ্ধে একমত হয়েছেন তখন কি হবে? এর উত্তর হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে এই হাদিসটি অবশ্যই অন্য কোনো সহীহ্ হাদিস দ্বারা মনসুখ হয়ে গিয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ শরিয়তের কোনো আলেম কোনো মাসআলাকে জায়েয অথবা নাজায়েয বললে, তার বিরুদ্ধাচরণ করা ঠিক নয়। সুফী মাশায়েখগণ এই নিয়ম মেনে চলেন। প্রকৃতপক্ষে সুফীয়ায়ে কেরাম শরিয়ত বিগর্হিত কোনো কাজ করেন

না। তাদের পরিচয়ে একদল মূর্খই শরিয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। এই সমস্ত মূর্খের দ্বারা মাজারে সেজদা করা, তাওয়াফ করা, বাতি জ্বালানো, মাজারের উপরে মসজিদ তৈরী করা, ওরশের নামে মাজারে ঈদের মতো মেলা করা ইত্যাকার নাজায়েয কাজ সংঘটিত হয়।

হজরত আয়েশা রা. এবং হজরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসুল স. মৃত্যুশয্যায় একবার কম্বল দিয়ে তাঁর পবিত্র চেহারা ঢেকে নিলেন এবং শ্বাসকষ্টের কারণে পুনরায় মুখমণ্ডল অনাবৃত করে বললেন, ইহুদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহতায়ালার অভিসম্পাত, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সেজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। হজরত আয়েশা বলেছেন, এই কথার মাধ্যমে তিনি স. ইহুদী ও খৃষ্টানদের এ রকম কাজ থেকে মুসলমানদেরকে বিরত থাকতে বলেছেন। বোখারী, মুসলিম।

উসামা বিন জায়েদ রা. থেকে এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, এবং তায়ালসি। হাকেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিস বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। বলেছেন, কবর জিয়ারতকারিণীদের উপর এবং কবরকে যারা সেজদার স্থান বানায় এবং যারা কবরে চেরাগ জ্বালায় তাদের উপর আল্লাহর লানত। মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন, হজরত জুন্দুব বিন আবদুল মালেক রা. এর উক্তি, ওফাতের পাঁচ রাত পূর্বে আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, সাবধান! কবরকে সেজদার স্থান বানিওনা। আমি তোমাদেরকে এ রকম করতে কঠোরভাবে নিষেধ করছি।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, যারা তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের মূল শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়, তাদেরকে হে নবী, আপনি জানিয়ে দিন আমরা আসমানী কিতাবসমূহের মূল নির্দেশ মান্য করি; কিন্তু তোমরা মানো না।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আবু সুফিয়ান বিন হরব আমাকে জানিয়েছেন, হারকেল আমাকে (আবু সুফিয়ানকে) এবং কোরাইশদের এক দলকে ডাকলেন। তখন রসুল স. এর সঙ্গে আমাদের সন্ধি বলবৎ ছিলো। আমরা তাই শামদেশে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করে যাচ্ছিলাম। স্থানটির নাম ছিলো ঈলিয়া। সেখানেই হারকেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম আমরা। তখন তার দরবারে উপস্থিত ছিলো রোমের সর্দারগণ। হজরত দাহিয়া রা. এর মাধ্যমে রসুল স. যে চিঠিটি বসরার গভর্নরের নিকট পাঠিয়েছিলেন, হারকেল সেই চিঠিটি চেয়ে নিলেন। চিঠিটি ছিলো নিম্নরূপ।

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রসুল মোহাম্মদের নিকট থেকে রোমের প্রশাসক হারকেলের প্রতি। যে হেদায়েতের পথে চলে তার উপর শান্তি বর্ষিত

হোক। অতঃপর আমি তোমাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। মুসলমান হয়ে যাও। নিরাপত্তা লাভ করবে। আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। আর যদি অস্বীকার করো তবে প্রজাদের পাপও তোমার উপর পতিত হবে। হে আহলে কিতাব! সেই বাক্যের দিকে আগমন করো, যার মধ্যে তোমরা ও আমরা সমান। বাক্যটি এই, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না, কাউকে তাঁর সাথে শরীক করি না। এবং আল্লাহতায়ালার অনুমোদন ব্যতিরেকে কারো অনুসরণ করি না। এরপরও যদি তারা অমান্য করে তবে মুসলমানগণ তোমরা বলে দাও যে, 'হে আহলে কিতাবগণ, আমরা মান্য করি, আল্লাহতায়ালার আনুগত্য স্বীকার করি।' বোখারী, মুসলিম।

জ্ঞাতব্য ঃ রসুল পাক স. এই আয়াত নাজরান প্রতিনিধিদেরকে পড়ে শোনালেন। হারকেলের নিকটও লিখে পাঠালেন। সবাই সমর্থন করলো, অস্বীকার করলো না। কিন্তু প্রতিনিধিদল যাবার সময় এ রকম বলতে বলতে গেলো যে, একথা আমাদের কিতাবে নেই। এই আয়াতটি রসুলে পাক স. এর নবুয়তের অকাট্য প্রমাণ।

হজরত ঈসা এবং হজরত উযায়ের আল্লাহর পুত্র — এরকম কথা কোনো আসমানী কিতাবে নেই। তাই খৃষ্টানেরা কিতাব থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে মনগড়া প্রশ্ন করেছিলো, আপনি কি কোনো মানুষকে পিতা ব্যতীত জন্মলাভ করতে দেখেছেন?

বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহতায়ালা কতই না সুন্দররূপে হজরত ঈসার অবস্থা বর্ণনা করেছেন, হজরত আদমের প্রসঙ্গ টেনে সকল সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছেন। তবুও যখন তারা অবিশ্বাসে অটল রইলো, তখন জানালেন মোবাহিলার আহবান। এই আহবানেও যখন তারা সাড়া দিলো না, তখন উত্থাপন করলেন এই কথা — তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের মূল শিক্ষার দিকে এসো। তবু তারা নিঃসাড় রইলো। তাই পরিসমাপ্তি টানা হলো এইভাবে, তবে তোমরা সাক্ষী থাকো নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান।

ইবনে ইসহাক তাঁর আপন সনদে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, নাজরানের খৃষ্টানেরা যখন বললো, হজরত ইব্রাহিম নাসারা ছিলেন। এবং ইহুদীরা বললো, তিনি ইহুদী ছিলেন। তখন রসুলে পাক স. এর প্রতি আল্লাহতায়ালা অবতীর্ণ করলেন নিম্নের আয়াত।

يَٰٓأَهْلَ الْكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ التَّوْرَىٰةُ
وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجْتُمْ
فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○ مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا
وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

❒ হে কিতাবীগণ! ইব্রাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, যখন তওরাত ও ইঞ্জিল তাহার পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল? তোমরা কি বুঝনা?

❒ দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান আছে তোমরাই সে বিষয়ে তর্ক করিয়াছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই সে বিষয়ে কেন তর্ক করিতেছ? আল্লাহ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নহ।

❒ ইব্রাহীম ইহুদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিলো না; সে ছিলো একনিষ্ঠ, আত্মসমর্পণকারী এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

তওরাত ও ইঞ্জিল নাজিল হয়েছে হজরত ইব্রাহিমের অনেক পরে। হজরত ইব্রাহিমের এক হাজার বছর পরে হজরত মুসা নিয়ে এসেছিলেন তওরাত। তওরাতের ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয়েছিলো ইহুদী ধর্মমত। আর হজরত মুসার দুই হাজার বছর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজরত ঈসা। তিনি ছিলেন বনি ইসরাইলের শেষ নবী। তাঁর উপরে অবতীর্ণ হয়েছিলো ইঞ্জিল। নাসারা বা খৃষ্টান ধর্মমত সৃষ্টি হয়েছে ইঞ্জিলকে কেন্দ্র করে। আল্লাহতায়ালা তাই বলছেন, যিনি তোমাদের ধর্মমত সৃষ্টির বহু পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁকে তোমরা কিভাবে তোমাদের ধর্মমতভূত মনে করো? তোমাদের কি এতোটুকু জ্ঞানও নেই? আল্লাহ তায়ালার নিয়ম এই যে, পরবর্তী শরিয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী শরিয়তের শাখাগত অনেক নিয়ম রহিত হয়। আবার অনেক নিয়ম পূর্বাপর একই থাকে। যেমন, গায়রুল্লাহর ইবাদত, মিথ্যা ও জুলুম হারাম হওয়া, তওবার আহ্বান ইত্যাদি হুকুম সকল শরিয়তেই এক। সুতরাং এসব ব্যাপারে তওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখিত নিয়মের সঙ্গে হজরত ইব্রাহিমের মতাদর্শের মিল থাকলেও তাঁকে ইহুদী বা নাসারা হিসাবে কিছুতেই চিহ্নিত করা যায় না।

আল্লাহতায়ালা জানাচ্ছেন, তোমাদের বিতর্ক অনর্থক। না জেনে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া অসমীচীন। তওরাত ও ইঞ্জিলে মোহাম্মদ স. এর গুণাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে। একথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, মোহাম্মদ স. এর শরিয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত শরিয়ত রহিত করে দেয়া হবে। তোমরা কি তা জানো না? নাকি জেনেও গোপন করছো? কিন্তু আল্লাহতায়ালা প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করে তোমাদেরকে অপদস্থ করে দিচ্ছেন। অতএব, হে মূর্খের দল তোমরা কি তর্ক পরিত্যাগ করবে? ইহুদী কিংবা খৃষ্টান বিশ্বাস কেবল নয়, হজরত ইব্রাহিম ছিলেন সমস্ত বিকৃত বিশ্বাসের অস্বীকারকারী। প্রবৃত্তিবিরোধী, আল্লাহতায়ালার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী, ধর্মনিষ্ঠ। কিছুতেই তিনি অংশবাদীতার বৃত্তভূত নন। আর তোমরা আল্লাহতায়ালার নির্দেশ অমান্যকারী, নবী রসুলদের আদর্শচ্যুত। আল্লাহতায়ালা অংশীবাদীতাকে হারাম করেছেন। অথচ তোমরা একের মধ্যে তিন — এরকম কথা বলে, উযায়ের আ. ও ঈসা আ. কে আল্লাহর পুত্র বলে সুস্পষ্ট শিরিকে লিপ্ত আছো। তাই শিরিকের মূলোৎপাটনকারী নবী ইব্রাহিমের অনুসরণের দাবী তোমরা কিছুতেই করতে পারো না।

সুরা আল ইমরান আয়াত ৬৮

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ
اٰمَنُوا ۗ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ○

❐ যাহারা ইব্রাহিমের অনুসরণ করিয়াছিল তাহারা এবং এই নবী ও বিশ্বাসীগণ মানুষের মধ্যে ইব্রাহিমের ঘনিষ্টতম। আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক।

হজরত ইব্রাহিমের জীবদ্দশায় যাঁরা তাঁর অনুসারী হয়েছিলেন এবং রসুল মোহাম্মদ স. এর অনুসরণকারী মুমিনগণই হজরত ইব্রাহিমের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। এরা সকলে আল্লাহতায়ালার এককত্বে বিশ্বাসী। এরা কোরবানী করেন, খতনা করেন, কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়েন এবং হজ ও ওমরাহ প্রতিপালন করেন।

আল্লাহতায়ালা ইমানদারদের বন্ধু, অভিভাবক। ইমানদারগণ প্রথম নবী থেকে শুরু করে সকল নবীকে মান্য করেন। ইহুদী এবং খৃষ্টানেরা এ রকম নয়। বাগবী, কালাবীর বর্ণনাসূত্রে এবং মোহাম্মদ বিন ইসহাক জুহুরীর বর্ণনাসূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এরকমভাবে, হজরত জাফর বিন আবু তালেব কিছু সংখ্যক সাহাবীকে নিয়ে মক্কা থেকে হাবশায় চলে গেলেন। পরে রসুল স.ও মদীনায় হিজরত করলেন। বদর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ওই যুদ্ধে নিহত হলো

কোরাইশদের শ্রেষ্ঠ নেতারা। বন্দী হলো অনেকে। কোরাইশগণ পরামর্শ করলো, কিভাবে এর বদলা নেয়া যায়। তারা ঠিক করলো, হাবশার অধিপতি নাজ্জাশীর দরবারে উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতে হবে এবং তার কাছে ফেরত চাইতে হবে জাফর বিন আবু তালেব ও অন্যান্য হিজরতকারী সাহাবীদেরকে। সম্ভবত নাজ্জাশী তাদেরকে ফেরত দিবেন। তখন তাদেরকে হত্যা করে এর বদলা নিতে হবে। তাদের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমর বিন আস এবং আম্মার বিন আবু মুইতকে তায়েফের কিছু উৎকৃষ্ট চামড়া এবং অন্যান্য সামগ্রীসহ নাজ্জাশীর দরবারে পাঠানো হলো। তারা হাবশায় পৌছলো সমুদ্রপথে। নাজ্জাশীর দরবারে পৌছে তাকে সেজদা করলো এবং শান্তি প্রার্থনা করে নিবেদন করলো, আমাদের সম্প্রদায় আপনার কুশল কামনা করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদেরকে আপনার খেদমতে এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যে, আমাদের ধর্মমত ত্যাগকারী কিছু লোক আপনার এখানে পালিয়ে এসেছে — তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। তারা রসুলের দাবী উত্থাপনকারী এক মিথ্যাবাদীর অনুসারী। একদল অজ্ঞ লোক রয়েছে সেই তথাকথিত রসুলের সঙ্গে। আমরা তাদেরকে এক পাহাড়ের উপত্যকায় আটকে রেখেছি। সেখান থেকে তারা বাইরে আসতে পারে না। বাইরে থেকেও কেউ তাদের কাছে যায় না। ক্ষুৎপিপাসায় জর্জরিত তারা। উপায়ান্তর না দেখে সেই রসুল তাঁর আপন চাচাতো ভাইকে একটি ক্ষুদ্র দলসহ আপনার দেশে পাঠিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য — তারা আপনার ধর্মমতকে বিপর্যস্ত করবে, আপনার সাম্রাজ্যে আনবে বিশৃংখলা এবং ধ্বংস করবে আপনার প্রজাদেরকে। পূর্বাহ্নে সতর্ক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আপনি বরং তাদেরকে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন। আমরা তাদেরকে নিয়ে যাই। আপনিও নিরাপদ হোন। আপনি তাদেরকে তলব করুন। তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে আমরা যা বলেছি তা সত্য। দেখবেন, তারা আপনাকে সেজদা করবে না। তাদের উদ্দেশ্য মহৎ হলে অবশ্যই তারা সেজদাবনত হয়ে সম্রাটের সম্মান রক্ষা করবে।

নাজ্জাশী, আবু জাফর ও তাঁর সঙ্গীদেরকে তলব করলেন। শাহী দরবারের সন্নিকটে পৌছতেই আবু জাফর রা. উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, আল্লাহর দল উপস্থিত। তারা প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায়। নাজ্জাশীর কানে পৌছলো এই আওয়াজ। তিনি হুকুম দিলেন, তাদেরকে বলো তাঁরা যেনো পুনরায় তাঁদের পরিচয় উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন। হজরত জাফর তাই করলেন। নাজ্জাশী বললেন, জী হ্যাঁ। আল্লাহর জিম্মাদারীর সঙ্গে প্রবেশ করুন। হজরত জাফর ও নাজ্জাশীর এই কথপোকথন শুনে খুব দুঃখিত হলো আমর বিন আস ও আম্মার। হজরত জাফর ও তাঁর সঙ্গীগণ দরবারে প্রবেশ করলেন, কিন্তু সম্রাটকে সেজদা করলেন না। আমার বিন আস বললো, দেখুন তারা কেমন অহংকারী। নাজ্জাশী বললেন, আপনারা

সেজদা করলেন না কেনো? সকলেই তো শাহী সম্মান রক্ষা করে। হজরত জাফর বললেন, আমরা কেবল আল্লাহকেই সেজদা করি। যিনি আপনাকে ও অন্যান্য সম্রাটকে সৃষ্টি করেছেন। এই নিয়ম আমরা প্রতিপালন করতাম তখন, যখন মূর্তিপূজায় আবদ্ধ ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের মধ্যে একজন সত্য নবী প্রেরণ করেছেন। আমরা তার অনুসারী হয়েছি। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করতে নিষেধ করেছেন। সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের সম্মান রক্ষা করাকে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। বেহেশতবাসীরা এরকম সালাম বিনিময় করবে। নাজ্জাশী তওরাত ও ইঞ্জিলের মূল নীতি জানতেন। তিনি বুঝলেন, এঁদের কথাই সত্য। বললেন, চিৎকার করে দরবারে প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিলেন কে? হজরত জাফর বললেন, আমি। একথা নিশ্চিত যে, আপনি পৃথিবীর সম্রাটদের মধ্যে একজন সম্রাট। আমি চাই, আপনি দুই দলের সঙ্গে একেক করে কথা বলুন। আমর, হজরত আবু জাফরকে বললেন, তুমি আগে বলো। হজরত আবু জাফর বললেন, ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন আমরা কি গোলাম ছিলাম না স্বাধীন। আমর বললো, না তোমরা স্বাধীন এবং সম্মানী। নাজ্জাশী বললেন, গোলাম হওয়ার অপবাদ থেকে আপনারা মুক্ত। আবু জাফর বললেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা কি কোনো অন্যায় হত্যাকান্ড সংঘটিত করেছি? যার কারণে আমাদের প্রতি প্রতিশোধ নেয়া যায়। আমর বললো, না তোমরাতো কাউকে হত্যা করনি। আবু জাফর বললেন, আমরা কি অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ অপহরণ করে এনেছি? নাজ্জাশী বললেন, তোমরা কারো সম্পদ নিয়ে এলে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমি নিলাম। আমর বললো, এ রকম ঘটনা আদৌ ঘটেনি। নাজ্জাশী বললেন, তবে তোমরা কী চাও? আমর বললো, আমরা সকলে এক ধর্মের অনুসারী ছিলাম। কিন্তু এরা আমাদের ধর্মমত পরিত্যাগ করেছে। এ জন্যে আমাদের সম্প্রদায় এদেরকে ধরে নিয়ে যেতে এখানে পাঠিয়েছে। নাজ্জাশী বললেন, তোমাদের নতুন ধর্মমতের পরিচয় দাও। আবু জাফর বললেন, আগে শয়তানের ধর্ম পালন করতাম আমরা। আল্লাহ্কে অস্বীকার করতাম। পাথরের পূজা করতাম। এখন আমরা গ্রহণ করেছি দ্বীন-ই-ইসলাম। এই ধর্ম নিয়ে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন একজন রসুল। তিনি কিতাব নিয়ে এসেছেন। যেমন কিতাব নিয়ে এসেছিলেন হজরত ঈসা ইবনে মরিয়ম। নাজ্জাশী বললেন, তোমরা মহৎ কথা বলেছো। অত্যন্ত কোমল পথে চলেছো। নাজ্জাশী নহবত বাজাতে বললেন। নহবতের আওয়াজ শুনে দরবারে উপস্থিত হলো নাসারা আলেম ও মাশায়েখগণ। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নাজ্জাশী বললেন, যিনি ঈসা আ. এর উপর ইঞ্জিল শরীফ নাজিল করেছিলেন, সেই আল্লাহর কসম দিয়ে আমি তোমাদেরকে বলছি, বলো, হজরত ঈসা ও কিয়ামতের মধ্যবর্তীতে কোনো নবী

আবির্ভূত হবেন কি? ওলামাগণ বললেন, নিশ্চয়। হজরত ঈসা তাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনো। যে তাঁর প্রতি ইমান আনবে সে আমার উপরও ইমান আনবে। যে তাঁকে অস্বীকার করবে সে আমাকেও অস্বীকার করবে।

নাজ্জাশী, আবু জাফরকে বললেন, তিনি তোমাদেরকে কী বলেন? তাঁর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জানাও। আবু জাফর বললেন, তিনি আমাদেরকে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে শোনান। ভালো কাজ করতে বলেন, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেন। প্রতিবেশীদের প্রতি উত্তম আচরণ করতে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং এতিমদের সহায়তা করতে নির্দেশ দেন। আরো বলেন, আমরা যেনো কেবল আল্লাহরই ইবাদত করি — তাঁর সঙ্গে যেনো শরীক না করি। নাজ্জাশী বললেন, তিনি যা তোমাদেরকে পাঠ করে শুনিয়েছেন, তা থেকে আমাকে কিছু শোনাও। হজরত আবু জাফর সুরা আনকাবুত ও সুরা রুম থেকে পাঠ করলেন। কোরআনের মর্মস্পর্শী আবৃত্তি শুনে নাজ্জাশী ও তার সহচরদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হলো। নাজ্জাশীর সঙ্গীরা বললেন, আরো কিছু শোনাও। হজরত আবু জাফর সুরা কাহাফ পাঠ করলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে আমর বিন আস বললো, তারা হজরত ঈসা ও তাঁর মাকে গালি দেয়। নাজ্জাশী বললেন, হজরত ঈসা ও তাঁর মা সম্পর্কে তোমরা কী বলো? আবু জাফর সুরা মরিয়ম পাঠ করে শোনালেন। নাজ্জাশী একটি মেসওয়াকের এক ক্ষীণ অংশ ছিঁড়ে নিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! এই বর্ণনায় যা রয়েছে, তা থেকে হজরত ঈসা এই ক্ষীণ তন্তুটি অপেক্ষা এতোটুকু বেশী ছিলেন না। অতঃপর হজরত জাফর ও তাঁর সাথীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, যাও তোমরা আমার রাজ্যে নিরাপদ। যারা তোমাদেরকে মন্দ বলবে অথবা কষ্ট দেবে, আমি তাদেরকে বিতাড়িত করবো। নির্ভয়ে ও সন্তুষ্টচিত্তে বসবাস করতে থাকো তোমরা। আমি নিশ্চিত হলাম, হজরত ইব্রাহিমের দল এখনো অবিকৃত। আমর জিজ্ঞেস করলো, সম্রাট, ইব্রাহিমের দল কোনটি? নাজ্জাশী বললেন, এই দল। মুশরিকেরা এ কথা মানে না, অথচ হজরত ইব্রাহিমের অনুসারী হওয়ার দাবী করে। অতঃপর নাজ্জাশী উপঢৌকনের সামগ্রীসমূহ ফেরত দিয়ে বললেন, তোমাদের এই হাদিয়া সুদতুল্য। এ সমস্ত তোমাদের কাছেই থাক। আল্লাহ আমাকে সুদ ছাড়াই সাম্রাজ্য দান করেছেন। আবু জাফর বর্ণনা করেছেন, আমরা ফিরে এলাম এবং উত্তম স্থানে সম্মান ও আন্তরিক আতিথেয়তার সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করলাম। ওদিকে মদীনায় রসুল পাক স. এর উপর অবতীর্ণ হলো হজরত ইব্রাহিমের দ্বীনের অনুসারী হওয়ার দাবী সম্পর্কিত এই আয়াতগুলো।

হজরত মুআজ বিন জাবাল, হজরত হোজায়ফা বিন ইয়ামান ও হজরত আম্মার বিন ইয়াসিরকে ইহুদীরা তাদের ধর্ম গ্রহন করতে আহবান জানালো, তখন নিম্নের আয়াত নাজিল হয়।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

❒ কিতাবীদের এক দল তোমাদিগকে বিপথগামী করিতে চাহিয়াছিল; অথচ তাহারা তাহাদের নিজদিগকেই বিপথগামী করে, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।

❒ হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন আল্লাহের নিদর্শনকে অস্বীকার কর, যখন তোমরাই সাক্ষ্য বহন কর?

❒ হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর, যখন তোমরা জান?

মুসলমানদেরকে আল্লাহতায়ালাই হেফাজত করেন। বিধর্মীরা তাদেরকে বিপথগামী করতে চাইলে তাদের প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়ে তাদের উপরেই। তবু তারা তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। কতোই না অবুঝ তারা। তওরাত ও ইঞ্জিলে মোহাম্মদ স. এর নবুয়ত ও বৈশিষ্ট্যাবলীর স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তারা তা গোপন করে চলেছে। তাই আল্লাহতায়ালার প্রশ্ন, তোমরাই যদি তওরাত ও ইঞ্জিল বহনকারী তবে সাক্ষ্য গোপন করো কেনো? সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করো কেনো? গোপনে স্বীকার করো, অথচ প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করো কেনো?

তোমাদের শাস্তি হবে দ্বিগুণ। প্রথমতঃ নিজেদের পথভ্রষ্টতার কারণে। দ্বিতীয়তঃ অন্যদেরকে পথচ্যুত করার অপচেষ্টার কারণে। গ্রন্থকার একথা বলেছেন। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, ইহুদী আবদুল্লাহ বিন জাইফ, আদী বিন জায়েদ এবং হারেস বিন আউফ পরামর্শ করে ঠিক করলো, আমাদের উচিত দিনের প্রথমাংশে মোহাম্মদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মেনে নেয়া এবং দিনের শেষাংশে তা অস্বীকার করা। আমরা এ রকম করলে মুসলমানেরা সন্দেহে পড়ে যাবে। হতে পারে তারাও আমাদের মতোন আচরণ করবে। তখন আল্লাহতায়ালা এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।

তাফসীরে মাযহারী/২২৫

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۚ وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۙ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

❒ কিতাবীদের একদল বলিল, 'যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে দিনের প্রারম্ভে তাহাতে বিশ্বাস কর এবং উহার শেষে তাহা প্রত্যাখ্যান কর; হয়ত তাহারা ফিরিতে পারে।'

❒ 'এবং যাহারা তোমাদের দ্বীনের অনুসরণ করে তাহাদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। বল, আল্লাহের নির্দেশিত পথই পথ।' বিশ্বাস করিও না যে তোমাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে অনুরূপ আর কাহাকেও দেওয়া হইবে অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করিবে।' বল, অনুগ্রহ আল্লাহেরই হাতে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

❒ তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাহাকে ইচ্ছা বিশেষ করিয়া বাছিয়া লন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

দিনের প্রথমাংশে স্বীকৃতি এবং শেষাংশে প্রত্যাখ্যান এই নীতিতে একমত হয়েছিলো খয়বর এবং ওরায়না গ্রামের বারোজন ইহুদী আলেম। এ রকম বর্ণনা করেছেন বাগবী, হাসান বসরী থেকে। ইবনে জারীরও সুদ্দীর বর্ণনাসূত্রে এরকম বলেছেন। মুজাহিদ, মুকাতিল এবং কালাবী বলেছেন, এ আলোচনা বারোজন ইহুদীর মধ্যে হয়েছিলো। রসুল পাক স. যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায় করতে শুরু করলেন, তখন ইহুদীরা খুব দুঃখিত হলো। কাব বিন আশারাফ এবং তার সঙ্গীরা বললো, তোমরাও দিনের প্রথম ভাগে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়ো এবং শেষ ভাগে নামাজ পড়ো

বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা করে। দোদুল্যমান চিত্তাধিকারী নামধারী মুসলমানেরা ইহুদীদের চক্রান্তে বিভ্রান্ত হলো। তখন আল্লাহতায়ালা জানালেন, হে প্রিয় নবী! আপনি কাফেরদেরকে জানিয়ে দিন, খাঁটি মুসলমানেরা যে হেদায়েত লাভ করেছে, তা আল্লাহতায়ালার দান। আল্লাহতায়ালাই এই নূরকে পূর্ণত্ব দান করবেন। এই আলো নেভাবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। মুসলমানদের কোনো ক্ষতি তারা করতে পারবে না। আল্লাহর নির্দেশ অভ্রান্ত। অতএব; মুসলমানেরা যেনো এ কথা বিশ্বাস না করে যে, তারা যা লাভ করবে তা অবিশ্বাসীদেরকে দেয়া হবে। যাতে করে কাফেরেরা কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর সম্মুখে তাদের সমর্থনে কোনো যুক্তি উত্থাপন করতে পারে। অনুগ্রহ আল্লাহতায়ালারই। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তাঁর অনুগ্রহ দান করেন। প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ তিনিই। তিনি বিশেষভাবে তাঁর আপন রহমত প্রদানার্থে যাঁকে ইচ্ছা করেন তাঁকে নবুয়ত দান করেন। তিনি এ বিষয়ে সম্যক অবহিত যে, তাঁরা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ লাভের যোগ্য।

'তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করিবে' - একথার অর্থ হলো, কিয়ামতের দিন ইমানদারেরা তোমাদের (ইহুদীদের) উপরে জয়ী হবে। কারণ, তোমরা বিভ্রান্ত আর তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৭৫, ৭৬

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَّيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ بَلٰى مَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

❒ কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে যে, বিপুল সম্পদ আমানত রাখিলেও ফেরৎ দিবে; আবার এমন লোকও আছে যাহার নিকট একটি দীনারও আমানত রাখিলে তাহার পিছনে লাগিয়া না থাকিলে সে ফেরৎ দিবে না, ইহা এই কারণে যে তাহারা বলে 'নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্য-বাধকতা নাই,' এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহের সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

❒ হ্যাঁ, কেহ তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ করিলে এবং সাবধান হইয়া চলিলে আল্লাহ্ সাবধানীকে ভালবাসেন।

এখানে দুই দল আহলে কিতাবের পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। একদল ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। অপর দল কাফেরই রয়ে গিয়েছে। মুসলমান আহলে কিতাবদের মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ বিন সালামের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এই আয়াতে। ইমাম বাগবী সূত্রপরম্পরায় জোবায়ের এবং জুহাকের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি হজরত আবদুল্লাহ বিন সালামের নিকট বারো শত উকিয়া স্বর্ণ আমানত রেখেছিলেন। যথাসময়ে তিনি তা ফেরত দিয়ে দেন। অপর দিকে কাব বিন আশরাফের মতো ইহুদীরা আমানত ফেরত দিতে অভ্যস্ত ছিলো না। নাছোড়বান্দা হয়ে জোর তাগাদা দেয়া ছাড়া অথবা মামলা রুজুর মাধ্যমে বাধ্য করা ছাড়া তারা আমানত ফেরত দিতো না। বাগবী লিখেছেন, জনৈক কোরাইশ ফাখ্খাস বিন আজরা ইহুদীর নিকট এক দিনার আমানত রেখেছিলো। কিন্তু সে তা আত্মসাৎ করে। কাফের ইহুদীরা বলতো, যারা আহলে কিতাব নয়, তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা হালাল। আল্লাহর নিকট এজন্য কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। তারা যেহেতু আমাদের ধর্মমতানুসারী নয়, তাই তাদের উপর সকল প্রকার জুলুম আমাদের জন্য বৈধ। আমাদের কিতাবে তাদের জন্য কোনো হুকুম নেই। তাদের এই মনোভাবের বিরোধিতা করে আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন, তারা জেনে বুঝে আল্লাহ্তায়ালার উপর মিথ্যারোপ করছে। সকল আমানত সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে।

কাফেরদের সম্পদ রক্ষার উপায় দুইটি। হয় মুসলমান হয়ে যাবে অথবা মুসলমানদের জিম্মি হয়ে যাবে (জিজিয়া কর প্রদানের মাধ্যমে)। ইহুদীরা বুঝেছে মুসলমানদের মাল তাদের জন্য বৈধ। অথচ প্রকৃত অবস্থা এর বিপরীত। বরং তাদের সম্পদ মুসলমানদের জন্য সকল অবস্থায় বৈধ। তাদের সম্পদ সংরক্ষণের উপায় দুইটি। মুসলমান হয়ে যেতে হবে। নতুবা জিজিয়া দিতে হবে। হজরত আবু মুসা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমাকে ওই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ বলে, সঠিকভাবে নামাজ পড়ে এবং জাকাত আদায় করে। যারা এমন করবে তারা সব দিক দিয়ে আমাদের হেফাজতে থাকবে। আর প্রকৃত হিসাব আল্লাহতায়ালার আধিকারাধীন — তারা এই স্বীকৃতি অন্তরের সঙ্গে দিচ্ছে, না প্রবঞ্চনার সঙ্গে।

সোলায়মান বিন বারীদ, হজরত বারীদ থেকে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে এই হুকুমটি, যদি তারা ইসলাম স্বীকার না করে, তবে জিজিয়া চাও। যদি দেয় তবে গ্রহণ করো, যুদ্ধ কোর না। বোখারী, মুসলিম।

মুত্তাকী বা পরহেজগারগণকে আল্লাহতায়ালা ভালোবাসেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। ফরজ হুকুম সমূহ প্রতিপালন করেন এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকেন। মুনাফিকরা এর বিপরীত। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকবে, সে প্রকৃত মুনাফিক। একটি থাকলে বুঝতে হবে তার মধ্যে একটি মুনাফিকী স্বভাব রয়েছে। যতক্ষণ না সে ওই স্বভাব পরিত্যাগ করবে ততক্ষণ খাঁটি মুমিন বলে বিবেচিত হবে না। মুনাফিকদের চারটি স্বভাব হচ্ছে — ১. তার কাছে আমানত রাখা হলে খেয়ানত করবে ২. যখন সে কথা বলবে মিথ্যা বলবে ৩. অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে ৪. কারো সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করবে। বোখারী, মুসলিম।

বোখারী, মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। কথা বললে মিথ্যা বলবে। প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করবে এবং কিছু গচ্ছিত রাখলে আত্মসাৎ করবে। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এই বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে — যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং দাবী করে, সেও একজন মুসলমান।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৭৭

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

❒ যাহারা আল্লাহের প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাহাদের কোনো অংশ নাই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদের দিকে চাহিবেন না এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবেন না; তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

বোখারী ও মুসলিমে আবু ওয়ায়েল রা. এর মাধ্যমে হজরত আবদুল্লাহ রা. এর বর্ণনা রয়েছে এ রকম, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম করে, আল্লাহতায়ালার রোষতপ্ত অবস্থায় সে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। এই আয়াতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, আসয়াস বিন কায়েস বাইরে থেকে ভিতরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আবদুর রহমান তোমার কাছে কোন হাদিস বর্ণনা

করেছে? উপস্থিত লোকেরা বললো, এই কথা বলেছেন তিনি। হজরত আসয়াস বললেন, আমার সম্বন্ধে নাজিল হয়েছে এই আয়াত। আমার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে আমার একটি কূপ নিয়ে বিবাদ ছিলো। কূপটি দখলে ছিলো তার। বিষয়টি আমি রসুল স. এর দরবারে উপস্থাপন করলে তিনি বললেন, প্রমাণ পেশ করো। অন্যথায় তার কসম দ্বারা মীমাংসা হবে। আমি বললাম, আমার কোনো প্রমাণ নেই। কসম করতে বললে সে তো তাই করবে। কূপটি হাত ছাড়া হয়ে যাবে আমার। রসুল স. বললেন, মুসলমানের সম্পদ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ভোগ করবে, সে আল্লাহতায়ালার অপ্রসন্ন অবস্থায় তাঁর সাথে মিলিত হবে। বাগবী তার নিজ সূত্রে বোখারী থেকে এ রকমই বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও অন্যান্যের বর্ণনায় হজরত আসয়াস বিন কায়েসের ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে — এক ইহুদীর সঙ্গে আমার জমি নিয়ে বিবাদ ছিলো। ইহুদী আমার হক অস্বীকার করে বসলো। তাকে নিয়ে আমি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বিবৃত করলাম। তিনি বললেন, তোমার কি কোনো প্রমাণ আছে? আমি বললাম নেই। তিনি ইহুদীকে বললেন, কসম খাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! সে তো কসম খেয়েই ফেলবে এবং আমার সম্পদ নিয়ে যাবে। অতঃপর এই আয়াত নাজিল হয়।

বোখারী, হজরত আবদুল্লাহ বিন আবী আউফা থেকে লিখেছেন, এক ব্যক্তি কিছু ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে নিয়ে গেলো। একজন মুসলমান তা কিনে নিলো। সে ওই মুসলমানকে অভিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে কসম খেয়ে বলতে লাগলো, আমি এই মালের সম্পূর্ণ মূল্য পাইনি। অথবা ঘটনাটির প্রকৃত বিবরণ এও হতে পারে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে লাগলো — আমি এই মাল এতো টাকায় কিনেছি। প্রকৃত পক্ষে তার ক্রয়মূল্য এতো টাকা ছিলো না। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

হাফেজ ইবনে হাজার বোখারীর টিকা ভাষ্যে লিখেছেন, এই হাদিস দু'টি এমন নয় যে, একটিকে মেনে নিলে অপরটিকে ভুল বলতে হয়। অর্থাৎ আয়াত নাজিলের কারণ একটি নয়, দুইটিই ছিলো।

আখেরাতের নেয়ামতের তুলনায় দুনিয়ার সম্পদরাজি নিতান্তই নগন্য। সুতরাং পৃথিবীর সম্পদ মিথ্যা কসমের বিনিময়ে লাভ করার মূল্য স্বল্পই। ইবনে জারীর, ইকরামা রা. এর উক্তি উল্লেখ করেছেন, এই আয়াত কাব বিন আশরাফ, হুয়াই বিন আখতাব এবং তাদের মতো অন্যান্য ইহুদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা তওরাতে উল্লেখিত হজরত মোহাম্মদ স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা গোপন করেছে অথবা বদলে ফেলেছে এই কারণে যেনো তাদের অনুসারীদের থেকে প্রাপ্য ঘুষ-উৎকোচ হাতছাড়া না হয়। শায়েখ ইবনে হাজার বলেছেন, এই ঘটনাটিও গ্রহণযোগ্য। তবে এ ব্যাপারে সহীহ্ হাদিসই অধিকতর গ্রাহ্য।

আমি বলি, এই আয়াত নাজিল হওয়া সম্পর্কে ইবনে জারীর ও ইকরামার বর্ণনা বিশুদ্ধ। প্রথমোক্ত হাদিস দু'টির সঙ্গে হজরত ইকরামার বর্ণনাটিকেও এই আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ হিসাবে মেনে নেয়া দরকার। অর্থাৎ আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ দু'টি নয়, তিনটি। আলকামা তাঁর পিতা ওয়ায়েলের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর খেদমতে দুই ব্যক্তি উপস্থিত হলো। প্রথমজন ছিলো হাজারে মাওতের অধিবাসী এবং দ্বিতীয়জন কান্দা'র। প্রথম জন বললো, হে আল্লাহর রসুল! সে আমার জমি দখল করে নিয়েছে। দ্বিতীয় জন বললো, ওই জমি আমারই। রসুল স. প্রথম জনকে বললেন, তোমার পক্ষে কি কোনো সাক্ষী আছে? সে বললো, না। রসুল স. বললেন, তবে তুমি কিভাবে জমি পাবে? প্রথম জন বললো, হে আল্লাহর রসুল! এই ব্যক্তি তো নিশ্চিত ফাসেক। তার কোনো কিছুরই ভয় নেই। কসম খাওয়ার পরওয়া সে করে না। রসুল স. বললেন, আমি তাকে কসম ব্যতীত অন্য কিছু করার কথা বলতে পারিনা। দ্বিতীয়জন কসম করতে উদ্যত হলো। রসুল স. বললেন, দুনিয়ার সম্পদ লাভের জন্য সে যদি মিথ্যা কসম করে, তবে যখন সে আল্লাহতায়ালার নিকট হাজির হবে তখন আল্লাহ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, কান্দার অধিবাসী ব্যক্তির নাম ছিলো ইমরুল কয়েস বিন আবেস এবং বিপক্ষজনের নাম ছিলো রবীয়া বিন আবদান।

আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্যের মাল আত্মসাৎ করবে, সে আল্লাহতায়ালার কাছে উপস্থিত হওয়ার সময় বিপদগ্রস্ত হবে। এ কথা শুনে কান্দার অধিবাসী বললো, এ জমি আমার নয়, তারই। বাগবীর এক বর্ণনায় এসেছে, যখন কান্দাবাসী কসম খেতে উদ্যত হলো, তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। অবশেষে সে কসম না করে বিপক্ষের দাবি স্বীকার করে নিলো এবং জমি ফেরত দিয়ে দিলো।

হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম খেয়ে কোনো মুসলমানের অধিকার বিনষ্ট করবে, আল্লাহ্ তার জন্য দোজখ নির্ধারিত করে দিবেন। জান্নাত হারাম করে দিবেন। এক ব্যক্তি আরজ করলো, হে আল্লাহর রসুল! যদি তা সামান্য বস্তু হয়? রসুল স. বললেন, পিলু গাছের একটি ডাল হলেও। বর্ণনা করেছেন মুসলিম। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. শেষ বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। মিথ্যা কসমকারীদের প্রতি আল্লাহ পাক এমন বাক্যালাপ করবেন না, যাতে তারা খুশী হয়। তিনি তাদেরকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না। আল্লাহ্ তাদেরকে পবিত্র করবেন না, অর্থাৎ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমলনামা তিন প্রকারের— এক প্রকারের হিসাব নেওয়া হবে সহজে, যা আল্লাহ্র হক। যেমন— নামাজ, রোজা ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারের হিসাব হবে কঠোরতার সঙ্গে। কেননা তা শিরিক। আর তৃতীয় প্রকারের আমল তিনি মার্জনা করবেন না। কারণ তা হবে বান্দার অধিকার (হক্কুল ইবাদ) সম্পর্কিত। হাকেম, আহমদ।

এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানী, হজরত সালমান এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং বায্যার বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে। রসুলে পাক স. এর নিদর্শন সমূহ গোপন করা কুফরী। এই কুফরীর কারণেই আল্লাতায়ালা ইহুদীদেরকে ক্ষমা করবেন না।

আল্লাহতায়ালার আযাব সম্পর্কে হজরত আবু জর বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তিন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আল্লাহ্পাক কিয়ামতের দিন বাক্যালাপ করবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের কঠিন শাস্তি হবে। এরপর রসুল স. এই আয়াত তিনবার পাঠ করলেন। হজরত আবু জর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! অকৃতকার্য ও হতভাগ্য ওই ব্যক্তিদের পরিচয় কী? রসুল স. বললেন, যারা অহংকারবশত টাখনুর নিচে কাপড় পরবে, দান করার পর খোঁটা দেবে এবং ওই ব্যক্তি যে কসম খেয়ে তার পণ্য উত্তম বলে বিক্রয় করবে। মুসলিম, আবু দাউদ, আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের লোকের সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের দিকে শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না এবং তাদেরকে বিশুদ্ধ করবেন না। তাদের কঠিন শাস্তি হবে। ১. ওই ব্যক্তি, যে দুর্গম পথ পরিভ্রমণকালে সঙ্গে পানি থাকা সত্ত্বেও অন্য মুসাফিরকে পিপাসার্ত রাখে। ২. ওই ব্যক্তি, যে আছর নামাজের পরে বাজারে গিয়ে তার মাল বিক্রির সময়ে আল্লাহর কসম খেয়ে বলে, আমি এই মাল এতো দিয়ে কিনেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কথা অসত্য — কিন্তু মানুষ তা সত্য বলে মেনে নেয়। ৩. ওই ব্যক্তি যে কেবল দুনিয়া লাভের জন্য ইমামের নিকট বায়াত গ্রহণ করে। ইমাম তাকে কিছু দুনিয়ার সুবিধা দিলে সে বায়াতের অঙ্গীকার পূর্ণ করে, না দিলে করে না। অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ করে। আসহাবে সিত্তা ও আহমদ।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু বর্ণনা এসেছে, তিন ধরনের লোকের সাথে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহতায়ালা বাক্য বিনিময় করবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না। ১. ওই ব্যক্তি যে পণ্য বিক্রয়কালে কসম খেয়ে প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্য ঘোষণা করে। ২. ওই ব্যক্তি যে সম্পদ আত্মসাতের

উদ্দেশ্যে আছরের পরে মিথ্যা কসম খায়। ৩. ওই ব্যক্তি, যে তার প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি তৃষ্ণার্ত মুসাফিরকে দিতে অস্বীকার করে। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, আজ আমি তোমাকে আমার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবো, যেভাবে তুমি বঞ্চিত করেছিলে তৃষ্ণার্তকে। পানি তো তুমি সৃষ্টি করোনি।

উল্লেখিত তিন শ্রেণীর মানুষের বিবরণ দিয়েছেন তিবরানী ও বায়হাকী, হজরত সালমানের বর্ণনা সূত্রে। বলেছেন, এক শ্রেণী হচ্ছে বৃদ্ধ ব্যভিচারী। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে অহংকারী ফকির। তৃতীয় শ্রেণী ওই সকল মানুষ যারা ক্রয়বিক্রয়কালে মিথ্যা কসম করে।

তিবরানী হজরত আসমা বিন মালেক থেকে এ রকম একটি মারফু বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৭৮, ৭৯, ৮০

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتٰبِ
وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ
عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ مَا كَانَ
لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ
لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُونُوا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا
كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ وَلَا يَأْمُرَكُمْ
أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ
إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

❒ তাহাদের মধ্যে একদল লোক আছেই যাহারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাহাতে তোমরা উহাকে আল্লাহের কিতাব বলিয়া মনে কর; কিন্তু উহা কিতাবের অংশ নহে এবং তাহারা বলে, উহা 'আল্লাহের নিকট হইতে;' কিন্তু উহা আল্লাহের নিকট হইতে প্রেরিত নহে। তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহের সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

❒ কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত দান করিবার পর সে মানুষকে বলিবে যে, 'আল্লাহের পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হইয়া যাও' ইহা তাহার জন্য শোভন নহে; বরং সে বলিবে, 'তোমরা রব্বানী হইয়া যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।'

❒ ফেরেশতাগণকে ও নবীগণকে প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করিতে সে তোমাদিগকে নির্দেশ দিবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদিগকে কাফের হইতে বলিবে?

ইহুদীদের এক দল নিজেদের মনগড়া কথা আল্লাহতায়ালার কিতাবের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করে বলতো, এটাই আল্লাহতায়ালার কিতাব। আল্লাহতায়ালা রসুল স. এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে তাদের সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছেন, যেনো তাদের কথা বিশ্বাস করা না হয়। জেনে শুনে এই অপকর্মে লিপ্ত ছিলো যারা তাদের নাম হচ্ছে, কাব বিন আশরাফ, হুয়াই বিন আখতাব, আবুল ইয়াসের, মালেক বিন যাইফ এবং সাফনা বিন আমর শায়ের।

ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম তাদের আপনাপন সূত্রে এবং বায়হাকী হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, যখন ইহুদী ওলামা এবং নাজরানের নাসারাগণ একত্রিত হয়ে রসুল স. এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আহবান প্রাপ্ত হয়, তখন মদীনাবাসী আবু রাফে কুরজী বললো, মোহাম্মদ তুমি কি চাও, আমরা তোমার এমন উপাসনা করি যেমন উপাসনা করে খৃষ্টানেরা হজরত ঈসার। রসুল স. বললেন, আমি আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেননি। তখন আল্লাহ্তায়ালা নাজিল করলেন ৭৯ এবং ৮০ নং আয়াত। আবদ তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, আমার নিকট এই সংবাদটি পৌঁছেছে — এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! সালাম বিনিময়ের ক্ষেত্রে আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যে আচরণ করি; আপনার সঙ্গেও করি সেই একই আচরণ। আপনাকে সালাম করার কি বিশেষ কোনো নিয়ম নেই। আমরা কি আপনাকে সেজদা করে সালাম জানাতে পারবো না! তিনি স. বললেন, না। আপন নবীর সম্মান রক্ষা কর এবং দাবীদারদের দাবী মিটিয়ে দাও। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সেজদা করার বিধান নেই। এরপর অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

মুকাতিল এবং জুহাক বর্ণনা করেছেন, নাজরানের খৃষ্টানেরা বলতো, হজরত ঈসা আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন, আমরা যেনো তাঁকেই প্রভুপ্রতিপালক বলে মেনে নেই। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁদের উপাসনার দিকে মানুষকে আহবান করতে পারেন না। একমাত্র আল্লাহ্তে সমর্পিত হওয়ার আহবান

জানানোই তাঁদের কাজ। তাঁরা বলেন, আল্লাহতায়ালার হয়ে যাও এবং আল্লাহর নির্দেশ প্রচার করো। রব্বানী অর্থ আল্লাহ্ওয়ালা, ফকীহ্ আলেমগণ। বলেছেন হজরত আলী এবং হজরত ইবনে আব্বাস। হজরত কাতাদা বলেছেন, হুকামায়ে ওলামা। সাঈদ বিন জোবায়েরের বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে এ রকম — রব্বানী অর্থ ফকীহ্, শিক্ষকবৃন্দ। আতা বলেছেন, প্রাজ্ঞ ওলামা সম্প্রদায়, যাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের হিতাকাংখী। সাঈদ বিন জোবায়ের বলেন, সৎকর্মপরায়ণ আলেম। আবু ওবায়েদ বলেছেন, আমি এক আলেম সাহাবীর নিকট শুনেছি যিনি হালাল, হারাম এবং নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা সমূহ জানেন এবং উম্মতের অতীত ও ভবিষ্যত অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তিনিই রব্বানী। কেউ কেউ বলেন, সাধারণ অসাধারণ সকল আলেমই রব্বানী বলে অভিহিত হতে পারেন। বিশেষ করে ওই শ্রেণীর আলেমই রব্বানী যাঁরা অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন।

উপরোক্ত অভিমত সমূহের সার কথা এই যে, রব্বানী ওই ব্যক্তি যিনি এলেম আমল এখলাস যথানিয়মে সম্পাদন করে আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভে পূর্ণ হয়েছেন এবং শিক্ষা ও প্রতিপালনের মাধ্যমে অন্যকেও পূর্ণ করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাসের মৃত্যু হলে মোহাম্মদ বিন হানাফিয়া বলেছিলেন, এই উম্মতের রব্বানীর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছে।

এরশাদ হয়েছে, তোমরা যারা অধ্যয়ন করো ও শিক্ষা দাও, তারা রব্বানী হয়ে যাও। যা জানো তা আমল করো এবং নিজেকে সংশোধন করো। সংশোধন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু অন্যকে সংশোধন করার পূর্বে নিজে সংশোধিত হতে হবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহতায়ালা বলেছেন, ' কেনো এমন বলো যা করো না।' আরো বলেছেন, 'কী আশ্চর্য! অন্যকে সৎকর্মের আদেশ দাও, অথচ নিজে কেমন উদাসীন।'

কোরাইশ এবং সাবেয়ীন সম্প্রদায় ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর পুত্র বলতো। ইহুদীরা উযায়ের আ. কে এবং খৃষ্টানেরা ঈসা আ.কে আল্লাহর সন্তান বলতো। নবী ও রসুলগণ এবং রব্বানীগণ এ রকম নির্দেশ দিতে পারেন না। বরং এইরূপ অংশীবাদিতার কঠোর বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁরা। যে মুসলমান সে কি কখনো কাউকে কাফের হওয়ার আহবান জানাতে পারে?

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ
جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ
ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ
فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ
ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

❐ স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীদের অঙ্গীকার লইয়াছিলেন 'কিতাব ও হিকমত যাহা কিছু দিলাম তাহার শপথ, তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে যখন একজন রসুল আসিবে তখন নিশ্চয় তোমরা তাহাকে বিশ্বাস করিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি স্বীকার করিলে? এবং আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করিলে?' তাহারা বলিল, 'আমরা স্বীকার করিলাম।' তিনি বলিলেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী রহিলাম।

❐ ইহার পর যাহারা মুখ ফিরাইবে তাহারাই সত্য — ত্যাগী।

আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক নবী থেকে এই মর্মে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের আপনাপন উম্মতকে পরবর্তী নবীদেরকে মেনে নেয়ার নির্দেশ দিবেন। অর্থাৎ বলবেন, আমার পরে যে নবী আসবেন, তোমরা অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করবে। এ কথা বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। হজরত আলী বলেছেন, হজরত আদম এবং তাঁর পরবর্তী সকল নবীর নিকট থেকে আল্লাহতায়ালা এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তোমরা এবং তোমাদের উম্মত মোহাম্মদ স. কে মেনে নিবে। জীবদ্দশায় তাঁকে পেলে তাঁর সাহায্যকারী হবে। কেউ কেউ বলেছেন, মান্য করার এই নির্দেশ কেবল আহলে কিতাবদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, তারা মনে করতো মোহাম্মদ স. অপেক্ষা তারাই নবুয়তের অধিক দাবীদার। আবার কেউ বলেছেন, এই অঙ্গীকার নিয়েছেন নবীগণ তাঁদের আপন উম্মতের কাছ থেকে। তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে তাঁরা পেশ করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত উবাই বিন কাবের ক্বেরাত (পাঠ)। যাতে 'নাবীঈন' শব্দের বদলে 'কিতাব' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধ অর্থ সেটাই যা বর্ণনা করা হয়েছে প্রথমে। এটাই প্রচলিত

ক্বেরাত সম্মত অর্থ। আল্লাহতায়ালা হজরত মুসার নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তুমি হজরত ঈসাকে স্বীকৃতি দাও এবং তোমার উম্মতকে হুকুম দাও তারা যেনো হজরত ঈসার উপর ইমান আনে। হজরত ঈসাকেও আল্লাহতায়ালা এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ করেছেন যে, তুমি মোহাম্মদ স.কে মান্য করো এবং তোমার উম্মতকে মোহাম্মদ স. এর প্রতি ইমান আনতে এবং সাহায্যকারী হতে নির্দেশ দাও। এ জন্যেই হজরত ঈসা বলেছেন, হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রসুল। আমি আমার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সত্যায়ণকারী। এবং আমার পরে যে রসুল আসবেন তাঁর সুসংবাদ প্রদানকারী। তাঁর নাম আহমদ।

প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত ক্বেরাত এবং হজরত ইবনে মাসউদের ক্বেরাতে কোনো বিরোধ নেই। কেননা নেতার প্রতিশ্রুতি অনুসারীদের প্রতিশ্রুতি হিসাবে গৃহীতব্য। যখন নেতার নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, তখন উম্মতের নিকট থেকেও প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে বুঝতে হবে।

আয়াতে বলা হয়েছে, কিতাব ও হিকমতের কথাও। অর্থাৎ কিতাব সত্যায়ণকারী নবী আবির্ভূত হলে তাঁকে মেনে নিতে হবে। হিকমত অর্থ সুন্নত বা দ্বীনের জ্ঞান।

পূর্বাপর সকল উম্মতের জন্য সকল নবীর উপর ইমান আনা ওয়াজিব এবং 'আমরা রসুলদের মধ্যে পার্থক্য করি না' বলা জরুরী। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই ধর্মই বিধিবদ্ধ করেছেন যার নির্দেশ পেয়েছিলেন নূহ এবং আমি আপনার প্রতি সেই প্রত্যাদেশই অবতীর্ণ করেছি। আমি ইব্রাহিম, মুসা এবং ঈসাকেও এই একই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, যেনো এতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি না হয়।'

হজরত আলী এবং হজরত ইবনে ওমরের অভিমতানুসারে কেবল রসুল পাক স. সম্পর্কে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে — এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু রসুল পাক স. ছাড়া অন্য নবীগণ এতে শামিল হতেই পারেন না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কেবল রসুল পাক স. এর উল্লেখ তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনেরই পরিচায়ক। আর এতে আহলে কিতাবদের প্রতি সতর্কবাণী রয়েছে যে, অন্যান্য নবীদেরকে মান্য করার বেলায় যেমন তাদের কোনো মতদ্বৈততা নেই তেমনি রসুল স. কেও মান্য করতে হবে। তাঁকে অমান্য করা পূর্ববর্তী সমস্ত নবী ও কিতাবকে অমান্য করার নামান্তর। তাই এরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয় তোমরা তাহাকে বিশ্বাস করিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে।'

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহতায়ালা হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সকল সন্তানকে প্রকাশিত করলেন। সকলের মধ্যে নবী ও রসুলগণ ছিলেন প্রজ্বলিত প্রদীপের মতো দ্যুতিময়। তখন আল্লাহতায়ালা সকলের নিকট থেকে মোহাম্মদ স.

সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। আল্লাহতায়ালা প্রশ্নাকারে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন সকলের। সবাই অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো। আল্লাহতায়ালা নির্দেশ দিলেন, যেনো তারা এই সাক্ষ্য দেয় কিয়ামতের দিবসে। বললেন, তিনিও সকলের সঙ্গে এর সাক্ষ্যদাতা হবেন। এই অঙ্গীকার থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নিবে তারা কাফের।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৮৩, ৮৪, ৮৫

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝ قُلْ اٰمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلٰٓى إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ ۝

☐ তাহারা কি চাহে আল্লাহের দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে! তাহার দিকেই তাহারা প্রত্যানীত হইবে।

☐ বল, 'আমরা আল্লাহে এবং আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়ছিল এবং যাহা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছি, আমরা তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা; এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।

☐ কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন চাহিলে তাহা কখনও কবুল করা হইবে না এবং সে হইবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্‌র ধর্মের সঙ্গে অন্য কোনো ধর্মের সহাবস্থান হতে পারেনা। বাগবী লিখেছেন, ইহুদী ও নাসারারা প্রত্যেকেই দ্বীনে ইব্রাহিমের অনুসারী হওয়ার দাবী করেছিলো। কিন্তু রসুল স. দুই দলই ইব্রাহিম আ. ধর্ম থেকে বিচ্যুত — এই অভিমত প্রকাশ করলেন। তারা অসন্তুষ্ট হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো, আমরা

আপনার সিদ্ধান্ত মানি না। আপনার ধর্মমতকেও পছন্দ করি না। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। আকাশের ফেরেশতা এবং পৃথিবীর জ্বিন ও মানুষ সকলেই ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহতায়ালার বিধান মেনে চলছে। বনী ইসরাইলদের মাথার উপর পাহাড় উঠিয়ে তাদেরকে সত্যে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করা হয়েছিলো। ফেরাউনের দলকে পানিতে ডুবে মৃত্যুর বিধানকে মেনে নিতে হয়েছিলো। এভাবে আল্লাহতায়ালার বিধানকে মেনে নিচ্ছে সকলেই। মুমিন, কাফের সবাই।

এরশাদ হচ্ছে, হে নবী আপনি আপনার মুমিন সঙ্গীগণসহ ইমানের ঘোষণা দিন। বলুন, আমরা ওই সমস্ত কিতাব ও সহীফাসমূহ বিশ্বাস করি, যা অবতীর্ণ হয়েছিলো ইব্রাহিম আ. ইসমাইল আ. ইসহাক আ. ইয়াকুব আ. মুসা আ. ঈসা আ. এবং অন্যান্য বনী ইসরাইলের নবীদের প্রতি। আয়াতে আলাদাভাবে মুসা আ. ও ঈসা আ. এর উল্লেখ তাঁদের বিশেষ মর্যাদার কারণে হয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে ইহুদী নাসারাদের প্রচন্ড বিতন্ডা ছিলো। তাদের ধারণা ছিলো, মুসলমানেরা হজরত মুসা এবং হজরত ঈসাকে মানে না। এই কারণে তাদের ধারণাকে নির্মূল করার জন্য বিশেষভাবে একত্রে হজরত মুসা ও হজরত ঈসার উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানেরা তাদের ইমানের ঘোষণায় বলবে, আমরা নবী রসুলদের মধ্যে তারতম্য করি না। কারণ, আল্লাহতায়ালার যে আদেশে তাঁরা নবী ও রসুল আমরা সেই আদেশের অধীন। আমরা মুসলমান।

দ্বীনে মোহাম্মদী পূর্ববর্তী দ্বীন সমূহকে রহিত করে দিয়েছে। সুতরাং মোহাম্মদ স. এর দ্বীন ছাড়া এখন আর অন্য কোনো দ্বীন কবুল করা হবে না। এই সিদ্ধান্ত যারা মানবে না, পরকালে তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে নিরেট বঞ্চনা ও ক্ষতি।

জ্ঞাতব্য ঃ বায়হাকী হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এরকম, ভ্রমণকালে কারো বাহন (জানোয়ার) অবাধ্য হলে তার কানের কাছে এই আয়াত পাঠ করবে। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াত বারোজন ধর্মত্যাগী ব্যক্তির জন্য নাজিল হয়েছে, যারা মদীনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিলো। তাদের দলে হারিস বিন সুয়ায়িদও ছিলেন; তিনি অবশ্য পরে খাঁটি অন্তরে তওবা করে ফিরে এসেছিলেন।

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

❒ বিশ্বাসের পর ও রসুলকে সত্য বলিয়া সাক্ষ্যদান করিবার পর এবং তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে উহাকে আল্লাহ্ কিরূপে সৎপথের নির্দেশ দিবেন? আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথের নির্দেশ দেন না।

❒ ইহারাই তাহারা যাহাদের প্রতিফল আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ, সকলেরই অভিশাপ!

❒ তাহারা ইহাতে স্থায়ী হইবে, তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং তাহাদিগকে বিরামও দেওয়া হইবে না।

যারা ধর্ম গ্রহনের পর ধর্ম পরিত্যাগ করে, তাদেরকে আল্লাহতায়ালা প্রশ্নাকারে হেদায়েত প্রদানে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। এমন ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্ জান্নাতের পথ প্রদর্শন করবেন না। তাদের উপর আল্লাহতায়ালার অভিসম্পাত। তারা আল্লাহতায়ালার সন্তোষ ও রহমত থেকে দূরবর্তী। এই দূরবর্তীতাই আল্লাহতায়ালার অভিসম্পাত। ফেরেশতাদের অভিসম্পাতের অর্থ তাদের বদদোয়া। মানুষের অভিসম্পাত অর্থ কেবল মুমিনদের অথবা মুমিন, বেঈমান নির্বিশেষে সকলের অভিসম্পাত। কাফেরেরাও সত্য অস্বীকারকারীদের প্রতি অভিসম্পাত করে থাকে। কিয়ামতের দিন কাফেরেরা একে অপরের প্রতি লানত দিবে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, তারা একে অপরের প্রতি কুফরী করবে এবং একে অপরের প্রতি লানত করবে।

কাফেরদের উপর আল্লাহতায়ালার এই অভিসম্পাত হবে চিরস্থায়ী। যদিও আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ নেই, তবুও বোঝা যায় চিরস্থায়ী অগ্নিবাসই তাদের পরিণাম। তাদের শাস্তি কখনো লঘু হবে না। আর তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি তাদের জন্যই নির্ধারিত।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

❒ তবে ইহার পর যাহারা তওবা করে, ও নিজদিগকে সংশোধন করে তাহারা ব্যতিরেকে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❒ বিশ্বাস করার পর যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং যাহাদের সত্য — প্রত্যাখ্যান প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহাদের তওবা কখনও কবুল করা হইবে না। ইহারাই তাহারা যাহারা পথভ্রষ্ট।

❒ 'যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে যাহাদের মৃত্যু ঘটে তাহাদের পক্ষে পৃথিবী — পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করিলেও কখনও কবুল করা হইবে না। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে; ইহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

তওবার অর্থ পুনরায় ফিরে আসা। ইমানবিচ্যুত হওয়ার পর পুনরায় ইমানকে আশ্রয় করে সংশোধিত হওয়া। কুফরীর অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়ার পর পুনরায় ইমানের আলোয় স্থির হওয়া। আল্লাহতায়ালা অভয় দিয়েছেন, তিনি তওবাকারীর তওবা কবুল করবেন। ইতোপূর্বের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। কারণ তিনি ক্ষমাপরবশ এবং দয়ার্দ্র। তওবাকারীকে দয়াবৃত করে তিনি তার জন্য নির্ধারণ করবেন জান্নাত।

নাসাঈ, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, এক আনসারী মুসলমান হওয়ার কিছুদিন পর মুরতাদ হয়ে গেলো। কিছুদিন পর তার অন্তরে ইমান গ্রহণেচ্ছা প্রবল হলে তার বংশের একজনের মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. দরবারে সংবাদ পাঠালো যে, আমার জন্য কোনো তওবার সুযোগ রয়েছে কি না? তখন কাইফা ইয়াহদি থেকে গফুরুর রহীম (আয়াত —

৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯) পর্যন্ত নাজিল হলো। তার বংশের লোকেরা তওবা কবুল হওয়ার এই সংবাদ পাঠালে তিনি পুনরায় মুসলমান হয়ে গেলেন।

ইবনে মুনজির এবং আবদুর রাজ্জাক, মুজাহিদের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, হারিস বিন সুয়ায়িদ মুসলমান হওয়ার কিছুদিন পর কাফের হয়ে তার আপন সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট ফিরে গেলো। আল্লাহ্ তার সম্পর্কে কাইফা ইয়াহদি থেকে গফুরুর রহীম পর্যন্ত নাজিল করলেন। তার বংশের লোকেরা যখন এই সংবাদ তাকে শুনিয়ে দিলো তখন তিনি সংবাদদাতাকে বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি সত্যাশ্রয়ী। আর রসুলুল্লাহ স. তোমার চেয়ে অধিক সত্যাশ্রয়ী এবং আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সত্যবাদী। এরপর হারিস মদীনায় ফিরে এলেন এবং খাঁটি মুসলমান হয়ে গেলেন।

হজরত কাতাদা এবং হাসান বসরী বলেছেন, পরবর্তী আয়াতটি ইহুদীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা হজরত মুসা এবং তওরাতের প্রতি ইমান আনার পর হজরত ঈসা এবং ইঞ্জিলকে অস্বীকার করলো। তারপর অতিরিক্ত কুফরী করলো রসুল পাক স. ও কোরআনকে না মেনে। আবুল আলীয়া বলেছেন, এই আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় দল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। দুই দলই তাদের কিতাবে রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী ও অবস্থা সম্পর্কে জেনেছে। কিন্তু রসুল স. এর আবির্ভাবের পরে তাঁর প্রতি ইমান আনেনি। মুজাহিদ বলেছেন, সকল কাফেরের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এই আয়াত। তারা আল্লাহকে খালেক (স্রষ্টা) বলে মেনে নেয়ার পরও শিরিকে লিপ্ত এবং মৃত্যু পর্যন্ত কুফরীর উপরে দন্ডায়মান। হাসান বলেছেন, সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ অবতীর্ণ আয়াত অস্বীকার করা। কালাবী বলেছেন, আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হারিস বিন সুয়ায়িদ এবং তার সঙ্গী সাথীরা। হারিস দুইবার মুসলমান হওয়ার পরও কুফরীর উপরেই দন্ডায়মান ছিলো এবং মক্কায় চলে গিয়েছিলো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আয়াতে আল্লাযিনা কাফারু বলে মুনাফিকদেরকে বোঝানো হয়েছে। সরাসরি কুফরীর চেয়ে মুনাফিকদের কুফরী অধিক মারাত্মক। তারা কুফরীকে গোপন রেখে প্রকাশ্যে নামাজ, রোজা ইত্যাদি আদায় করে। কুফরীর প্রতি তাদের আকর্ষণ সর্বোচ্চ।

যারা কুফরীর অনুবর্তনে বিরামহীন তাদের তওবা কখনো গৃহীত হবে না। ইহুদী, খৃষ্টান এবং সাধারণ কাফেরের কুফরীর উপরে নিরবচ্ছিন্ন অবস্থানই তওবা গৃহীত হওয়ার অন্তরায়। তবে হ্যাঁ, খাঁটি তওবা মৃত্যুকষ্ট সন্নিকটবর্তীকালেও গৃহীত হয়। মক্কা বিজয়ের পর হারিস বিন সুয়ায়িদের সাথীদের মধ্যেও যারা তওবা করেছিলেন, তাদের তওবা কবুল করেছিলেন রসুলে পাক স.। মুনাফিকদের

সম্পর্কেও একই কথা। যতোক্ষণ তাদের অন্তর অবিশ্বাসাচ্ছন্ন থাকবে, ততোক্ষণ কেবল মুখের তওবায় কাজ হবে না।

ইমান সকল প্রকার দান ও ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত। ইমানের সঙ্গে বিশুদ্ধ নিয়তে ইবাদত না করলে তা কবুল হয় না। পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দান করলেও না। আলেমগণ বলেছেন, বিশুদ্ধ নিয়ত ব্যতিরেকে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ অথবা তদপেক্ষা কম কোনো দানই গ্রহণযোগ্য হবে না। কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। চিরদিনের জন্য তারা ক্ষমার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আযাব বন্ধ করে দিতে পারে অথবা কমিয়ে দিতে পারে এ রকম কোনো সাহায্যকারী তাদের নেই।

হজরত আনাস বিন মালেক বলেছেন, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন লঘু শাস্তিপ্রাপ্ত এক দোজখীকে আল্লাহ্ বলবেন, যদি তোমার নিকট পৃথিবীর সমস্ত সামগ্রী থাকতো তবে কি তুমি আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবকিছু দিয়ে দিতে? দোজখী বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে, তখন আমি চেয়েছিলাম এর চেয়ে অনেক সহজ বস্তু — পৃথিবীতে গিয়ে তুমি যেনো আমার সাথে কাউকে শরীক কোর না, তখন তুমি শিরিকমুক্ত ছিলে না কেনো? বোখারী ও মুসলিম।

চতুর্থ পারা

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯২

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

❐ তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করিবে না। তোমরা যাহা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

বির্‌রা শব্দের অর্থ অনেক কয়টি। যেমন, পুরস্কার, জান্নাত, কল্যাণ, প্রচুর বিনিময়, সততা, অনুসরণ ইত্যাদি। 'কামুস' অভিধানের রচয়িতা বলেছেন, বির্‌রা শব্দের সম্পর্ক বান্দার সঙ্গে করা হলে অর্থ হবে সত্যানুসরণ অথবা প্রচুর প্রতিদান। তখন এর বিপরীত শব্দ হিসাবে আসবে পাপ অথবা অবাধ্যতা। আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে শব্দটির সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হবে সন্তুষ্টি, রহমত অথবা জান্নাত। তখন বিপরীত শব্দ হিসাবে আসবে অসন্তোষ, শাস্তি অথবা গজব।

হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ এর অর্থ নিয়েছেন, বেহেশত। মুকাতিল বিন হাব্বান অর্থ করেছেন, তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, অনুসরণ। কেউ কেউ বলেছেন, কল্যাণ। হাসান বসরী এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন, তোমরা পুণ্যবান হতে পারবে না অর্থাৎ অধিক কল্যাণ, প্রচুর বিনিময় লাভ করতে পারবে না এবং অনুসরণকারী হতে পারবে না। বায়যাবী লিখেছেন, তোমরা কল্যাণের পূর্ণতায় পৌছতে পারবে না, আল্লাহ্‌র পুরস্কার অর্থাৎ রহমত, সন্তোষ এবং বেহেশত পাবে না।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমাদের জন্য উচিত যে, তোমরা সত্যানুসারী হবে। সত্যানুসরণ পূণ্যপথপ্রদর্শনকারী। আর পূণ্য বেহেশতের পথপ্রদর্শক। যে সব সময় সত্য কথা বলে অথবা বলতে চেষ্টা করে আল্লাহতায়ালার দরবারে সে সত্যবাদী বলে গণ্য। তোমাদের আরো উচিত, মিথ্যাচার থেকে মুক্ত থাকা। মিথ্যা পাপাচারের পথপ্রদর্শক এবং পাপ দোজখের

পথপ্রদর্শনকারী। যে মিথ্যা বলে বা বলতে সচেষ্ট থাকে আল্লাহতায়ালার দপ্তরে সে মিথ্যুক হিসাবে লিপিবদ্ধ। মুসলিম, আহমদ, তিরমিজি।

হজরত আবু বকরের মারফু বর্ণনায় রয়েছে, সত্যকে গ্রহণ করো। সত্য পূণ্যের সঙ্গী। পূণ্য ও সত্য বেহেশতে নিয়ে যায়। মিথ্যামুক্ত থাকো। মিথ্যা পাপের সঙ্গী। মিথ্যা ও পাপ দোজখে প্রবেশ করায়। আহমদ, ইবনে মাজা, বোখারী।

পুণ্য লাভ করতে পারবে না আল্লাহর রাস্তায় প্রিয় বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত — এতে বোঝা যায়, সকল প্রকার সম্পদই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা উচিত। কারণ, অন্তরের মহব্বত সকল প্রকার মালের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। সুতরাং কেউ যদি দান না করে, এমন কি জাকাত দিতে অনীহ হয়, তবে সে পূণ্যবঞ্চিত ও পাপী হবে। হালাল ও হারাম সম্পদ একত্রিত হয়ে গেলে, অবশ্যই হালাল থেকে হারামকে পৃথক করে কেবল হালাল সম্পদ থেকে দান করতে হবে। হারাম অগ্রহণীয়। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'হে ইমানদারগণ! আপন উপার্জন থেকে উত্তম বস্তু ব্যয় করো। আর ওই সমস্ত বস্তু হতেও ব্যয় করো, যা আমি তোমাদেরকে ভূমি থেকে উৎপন্ন করে দিয়েছি। আর নিকৃষ্ট বস্তু থেকে দান করতে চেয়ো না।'

সম্পদের কতোটুকু ব্যয় করা আবশ্যক, সে সম্পর্কে এ আয়াতে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। জাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ হাদিস সমূহের মাধ্যমে জানা যায়। প্রত্যেক সম্পদের জাকাত ওয়াজিব — এই আয়াতের মাধ্যমে এ রকম ধারণা লাভ করার সুযোগ থাকলেও অন্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিশেষ ধরণ ও অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জানা যায়। এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে নবী! মানুষ আপনাকে প্রশ্ন করে, তারা কোন বস্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, যা কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত।'

এক হাদিসে এসেছে, গৃহকর্মের জন্য নিয়োজিত এবং বোঝা বহনে ব্যবহৃত পশুর জাকাত নেই। অন্য হাদিসে এসেছে, এক ব্যক্তির প্রশ্নোত্তরে রসুল স. বলেছেন, ইহা (জাকাত) ব্যতীত তোমার উপর অন্য কিছু ফরজ নয়। তবে তুমি আপন ইচ্ছায় যদি অতিরিক্ত (নফল) দান করো, তবে উত্তম। আরেকটি হাদিসে এসেছে, সম্পদশালী ব্যতীত অন্যের উপর জাকাত ওয়াজিব নয়।

এ সমস্ত হাদিস ও আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, জঙ্গলে বিচরণরত পশু, যাদের জন্য আলাদা আহার যোগাতে হয় না সেগুলোর উপরে জাকাত ওয়াজিব নয়। নেসাব পরিমাণ সোনা ও রূপা এবং নেসাব পরিমাণ বাণিজ্য সামগ্রী এক বৎসর মালিকানাধীনে থাকলে জাকাত ওয়াজিব হবে। ফল ও ফসলের উপরও জাকাত ওয়াজিব। এই আয়াতটি জাকাত সম্পর্কিত হলেও, হুকুমটি সাধারণ। জাকাতের বিভিন্ন প্রকার এতে উল্লেখিত না হওয়ায়, জাকাত সম্পর্কিত অন্য স্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে এই সাধারণ হুকুমটি রহিত হয়েছে — এ কথা বলেছেন মুজাহিদ ও কালাবী। আর ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করে জুহাক বলেছেন, বিভিন্ন

প্রকারের উল্লেখ না থাকলেও এই আয়াতটি জাকাত সম্পর্কিত বটে। তবে হুকুমটি রহিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বিশেষ হুকুম দ্বারা সাধারণ হুকুম অথবা সাধারণ হুকুম দ্বারা বিশেষ হুকুম রহিত হয় না। হুকুম পরস্পর দ্বন্দ্বশীল হলেই কেবল একটি দ্বারা অপরটি রহিত হয়। বরং অধিক প্রিয় বস্তু আল্লাহর পথে দান করা উত্তম — এ কথাটুকু জানানোই আয়াতের উদ্দেশ্য। এখানে বোঝা যায়, সম্পদের কিছু অংশ দান করা ওয়াজিব। কিন্তু সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করা সর্বাপেক্ষা উত্তম। হাসান বসরী র. বলেছেন, আল্লাহর সন্তোষ লাভার্থে যা কিছু ব্যয় করা হোক না কেনো, এমন কি যে একটি খেজুরও দান করবে সেও পূণ্যাধিকারী হবে - এ কথাই আয়াতে বলা হয়েছে। এই আয়াতে ওয়াজিব ও মোস্তাহাব দুই ধরনের দানের কথাই বিদ্যমান। হজরত আতা এই আয়াতের তাফসীর করেছেন এভাবে, তোমরা দ্বীনের ফযীলত ওই সময় পর্যন্ত পাবে না যতক্ষণ না যথাসময়ে অথবা প্রয়োজনকালে দান করো।

হজরত আনাস বিন মালেক বলেছেন, হজরত আবু তালহা ছিলেন আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী। মসজিদে নববীর সম্মুখস্থ বিরহা নামক বাগানটি ছিলো তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়। রসুল স. সেখানে মাঝে মাঝে যেতেন এবং সেখানকার কূপের স্বচ্ছ সুপেয় পানি পান করতেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত আবু তালহা, রসুল স. এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ এই বাগানটি। পরম কল্যান অর্জনার্থে আমি এই বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। আপনি যেভাবে ইচ্ছা বাগানটি বণ্টন করে দিন। রসুল স. আনন্দিত হলেন। বললেন, বেশ! সম্পদটি উত্তম। এর দ্বারা মানুষের অনেক উপকার হবে। তবে আমি বলি, তুমি তোমার এ বাগানটি তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দাও। তালহা বললেন, ঠিক আছে। এরপর তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বাগানটি বণ্টন করে দিলেন।

হজরত জায়েদ ইবনে হারিসা উপস্থিত হলেন তাঁর প্রিয় ঘোড়াটিকে নিয়ে। নিবেদন করলেন, এই ঘোড়াটি আমার প্রিয়। আমি এটিকে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করতে চাই। মহানবী স. ঘোড়াটি নিয়ে তাঁরই পুত্র ওসামাকে দিলেন। দানকৃত বস্তু স্বগৃহে ফিরতে দেখে জায়েদ ইবনে হারিসা কিঞ্চিত মনক্ষুণ্ন হলে রসুল স. বললেন, তোমার দান গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এ দানের বিনিময় তুমি পাবে। ইবনে মুনজির এই হাদিসকে মোহাম্মদ বিন মুনকাদেরের বর্ণনাসূত্রে মুরসাল হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। এতে অতিরিক্ত উল্লেখ রয়েছে ঘোড়াটির নাম ছিলো সাবিলসিল। ইবনে জারীর হজরত আমর বিন দিনার থেকে মুরসাল হিসেবে এবং আউয়ুব সেজেস্তানী থেকে মু'দাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বাগবী মুজাহিদের বর্ণনাসূত্রে লিখেছেন, জালওয়ালার যুদ্ধের দিন হজরত ওমর হজরত আবু মুসা আশআরীকে লিখেছিলেন — যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে একটি বাঁদী কিনে নাও। নির্দেশানুসারে হজরত আবু মুসা একটি বাঁদী ক্রয় করে হজরত ওমরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হজরত ওমর বাঁদীকে খুব পছন্দ করলেন, কিন্তু এই আয়াতটি পড়ে তাকে মুক্তি দিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের পুত্র হজরত হামজা

বলেন, এই আয়াত পাঠের পর আমার সম্মানিত পিতা চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করলেন, তাঁর প্রিয় বস্তু তাঁর এক বাঁদী। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বাঁদীকে ডেকে বললেন, যাও। তুমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুক্ত। তিনি বলেছেন, দানের পর ফিরিয়ে নেয়া গেলে আমি তাকে বিয়ে করতাম।

এই সমস্ত হাদিস এবং সাহাবীগণের কার্যাবলীর মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করাটা সাধারন হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। আর নিকটতম স্বজনকে দান করা সর্বাপেক্ষা উত্তম।

এই ব্যয় সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা সম্যক অবগত। তিনি নিয়ত অনুসারে এর বিনিময় দিবেন। দানের পরিমান কম হোক অথবা বেশী। অতীতে হোক বা এখন অথবা আগামীতে। ইঙ্গিতে এ কথাও বোঝা যায় যে, যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা প্রকাশ্য, গোপন সকল বিষয়ই জানেন তাই কেবল প্রকাশ্যে দান করা জরুরী নয়। বরং গোপন দানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, ইহুদীরা রসুল স. কে বললো, আপনি ইব্রাহিমী মিল্লাতের দাবী করেন অথচ উটের গোস্ত খান। হজরত ইব্রাহিম উটের গোস্ত খেতেন না উটের দুধও পান করতেন না। রসুলে পাক স. এরশাদ করলেন, হজরত ইব্রাহিমের জন্য এ সমস্ত বস্তু হালাল ছিলো। তারা বললো, যে সমস্ত বস্তুকে আমরা হারাম বলছি তা নূহ আ. এর জন্যও হারাম ছিলো। তখন থেকে এ বিধান চলে এসেছে। ইহুদীদের মিথ্যাবাদীতাকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯৩, ৯৪, ৯৫

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَىٰةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَىٰةِ فَاتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۝ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ ۝ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

❒ তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইস্রাইল নিজের জন্য যাহা অবৈধ করিয়াছিল তাহা ব্যতীত বনি-ইসরাইলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই বৈধ ছিল। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তওরাত আন এবং পাঠ কর।'

❒ ইহার পরও যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টি করে তাহারাই সীমালংঘনকারী।

❒ বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলিয়াছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নহে।'

খাদ্য বস্তু হালাল, হারাম প্রসঙ্গে এই আয়াতে বলা হয়েছে। সুতরাং যা খাদ্য পদবাচ্য নয় তা এই আয়াতের হুকুম বহির্ভূত। সেগুলো সকল সময়ের জন্যই হারাম। যেমন, মৃত পশু, রক্ত, শূকর এবং হিংস্র প্রাণীর গোশত্।

তওরাতে যে সমস্ত খাদ্যবস্তু হারাম করা হয়েছে, তা প্রথম আরোপিত হয়েছিলো হজরত ইয়াকুব আ. এর বংশধরদের জন্য। কিন্তু তাঁর পিতা ও পিতামহ হজরত ইসহাক ও ইব্রাহিমের জন্য সেগুলো হারাম ছিলো না। উটের গোশ্ত ও দুধ হজরত ইয়াকুব আ. এর প্রিয় খাদ্য ছিলো। তিনি একবার উরুর ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন মানত করেছিলেন, নিরাময় লাভ করলে তিনি তাঁর এই প্রিয় খাদ্য দু'টি পরিত্যাগ করবেন। এ সম্পর্কিত হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমদ এবং হাকেম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। বাগবী বর্ণনা করেছেন আবুল আলীয়া, আতা, মুকাতিল এবং কালাবী থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জোবায়েরের বর্ণনায় রয়েছে, উরুসন্ধির ব্যথায় আক্রান্ত হলে চিকিৎসকগণ হজরত ইয়াকুব আ.কে উটের গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি এই নিষেধাজ্ঞা মেনে নিয়েছিলেন। বাগবী লিখেছেন, হাসান বসরী এ কথা বলেছেন যে, আল্লাহ্তায়ালার ইবাদতের অত্যাধিক আকর্ষণ হেতু হজরত ইয়াকুব নিজের জন্য উটের গোশ্ত হারাম করে নিয়েছিলেন এবং প্রার্থনা করেছিলেন, এই বিধান যেনো বলবৎ থাকে। তাঁর প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক তাঁর সন্তানদের জন্য উটের গোশ্ত হারাম করেছিলেন। ইবনে আতিয়া বলেছেন, ইসরাইলের (হজরত ইয়াকুব আ. এর) সন্তানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে উটের গোশ্ত হারাম করা হয়নি। বরং হজরত ইয়াকুব নিজের এবং সন্তানদের জন্য হারামের এই বিধান চেয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর মানত ছিলো, আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করলে আমি ও আমার সন্তানেরা উটের গোশ্ত খাবো না।

ইহুদীদের অবাধ্যতার কারনে তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার আগেই আল্লাহ্তায়ালা তাদের জন্য অনেক কিছু হারাম করে দেন। যেমন আল্লাহ্তায়ালা অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'অতঃপর ইহুদীদের এ সমস্ত বড় বড় অপরাধের কারনে বহু পবিত্র বস্তু হারাম করে দিয়েছি, যা ছিলো তাদের জন্য হালাল।' অন্য একস্থানে বলেছেন, 'আর আমি ইহুদীদের জন্য সকল নখর বিশিষ্ট প্রাণী হারাম করে দিয়েছি। গরু ও ছাগলের চর্বি, সেগুলোর পিঠের উপর অথবা অন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত অথবা হাড়ের সঙ্গে মিলিত অংশ হারাম করে দিয়েছি। এই শাস্তি ছিলো তাদের দুষ্টাচরণের জন্য।'

কালাবী লিখেছেন, বনি ইসরাইলেরা যখন সম্মিলিতভাবে বড় বড় গোনাহ্ করতে উদ্যত হলো, তখন আল্লাহ্ শাস্তি স্বরূপ তাদের জন্য এই সমস্ত পবিত্র বস্তু হারাম করে দিয়েছেন।

জুহাক বলেছেন, বনি ইসরাইলের জন্য কোনো খাদ্যই হারাম ছিলো না। তওরাতেও এ সমস্ত বিষয়ে হারামের নির্দেশ আসেনি। বরং তারা তাদের পিতা ইসরাইলের (ইয়াকুব আ. এর) অনুসরন করতে গিয়ে বিভিন্ন খাদ্য হারাম করে নিয়েছিলো। পরে তারা হারামের বিধান আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কিত করে দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের মিথ্যাকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। জুহাকের এই বর্ণনাটি ভুল। ইতোপূর্বে আল্লাহ্‌ আয়ালার এরশাদ থেকে আল্লাহ্‌ কর্তৃক তাদের জন্য বিভিন্ন খাদ্য বস্তুর হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বোখারী, মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ইহুদীদের উপর আল্লাহ্‌তায়ালার অভিসম্পাত। চর্বি হারাম ছিলো বলে তারা চর্বি খেতো না বটে কিন্তু চর্বির বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্ষণ করতো।

আল্লাহ্‌তায়ালা ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন, তোমরা সত্যবাদী হলে তওরাত আনো এবং পড়ে দেখো যে, তওরাতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, তাদের জন্য সমস্ত খাদ্যই হালাল ছিলো। তারা নিজেরা ইচ্ছা করেই কোনো কোনো খাদ্যকে হারাম করে নিয়েছিলো। এই ঘোষণা শুনে নির্বাক হয়ে গেলো ইহুদীরা। প্রতিষ্ঠিত হলো হজরত রসুলুল্লাহ স. এর নবুয়তের সত্যতা এবং মিল্লাতে ইব্রাহিমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রমান। যারা প্রতিষ্ঠিত সত্যকে প্রশ্নাকীর্ণ করতে চায়, তারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী, জালেম।

আল্লাহ্‌তায়ালার কথা স্বতঃসিদ্ধ, সত্য। তাই সত্য এরশাদ হচ্ছে, একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো। এই ধর্মাদর্শ যেমন হজরত ইব্রাহিমের, তেমনি হজরত মোহাম্মদ স. এরও। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ধর্মাদর্শ সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ বরং এক।

তিনি স. ইসরাইলী নবীদের মতো নন। হজরত মুসা আ. এর শরিয়ত প্রচার ব্যপদেশেই প্রেরিত হয়েছিলেন বনি ইসরাইলের নবীগন। কিন্তু হজরত মোহাম্মদ স. নিজেই সাহেবে শরিয়ত। হজরত ইব্রাহিমের নয়, বরং হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শের অনুসরন করার নির্দেশ এসেছে এজন্য যে, হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ মূলতঃ রসুল স. এর ধর্মাদর্শ। এই ধর্মাদর্শের নাম ইসলাম।

মিল্লাত (ধর্মাদর্শ) শব্দটি এসেছে আমলাত শব্দ থেকে। নবীগণ এই ধর্মাদর্শ পেয়ে থাকেন আল্লাহতায়ালার নিকট থেকে। কিন্তু ধর্মাদর্শ তাঁদের। যেমন, মিল্লাতে ইব্রাহিম, মিল্লাতে মুসা, মিল্লাতে মোহাম্মদ স.। নামাজ, জাকাত অথবা রোজাকে মিল্লাত বলা যায়না। মিল্লাত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ শরিয়ত। মিল্লাতের পরিচিতি আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তাই মিল্লাতে আল্লাহ বলা বৈধ নয়। অপরদিকে, এই পরিচয় বান্দাদের সঙ্গেও সম্পৃক্ত নয়। যেমন, মিল্লাতে জায়েদ, মিল্লাতে ওমর — এরকমও বলা যায় না। নবীগণের মিল্লাত বা ধর্মাদর্শের মাধ্যমে মানুষ

আল্লাহতায়ালার নৈকট্যশীল হতে পারে। ইহ, পরকাল দুই জগতের সফলতা লাভ করতে পারে। নবীদের মিল্লাতের অনুসরণ তাই সাধারন মানুষের জন্য অপরিহার্য।

মিল্লাতে ইব্রাহিমী শব্দটির সঙ্গে হানীফা শব্দটি যুক্ত হয়েছে। হজরত ইব্রাহিমের মতাদর্শ ছিলো হানীফ। অর্থাৎ মধ্যবর্তীতার সৌন্দর্যমন্ডিত। কম নয় বেশীও নয়। ইহুদীদের মতো অতি কঠোর নয়। খৃষ্টানদের মতো অতি কোমলও নয়। ওই দুই অতিরিক্ততা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন প্রকৃত মধ্যবর্তীতার উপর, সত্যের উপর। ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো অংশীবাদিতা থেকেও তিনি ছিলেন পূর্ণ মুক্ত।

বাগবী লিখেছেন, ইহুদীরা মুসলমানদের নিকট বলে বেড়াতো, আমাদের কেবলা প্রাচীন এবং নবীগণের হিজরতের স্থান। তাই আমাদের কেবলা কাবার চেয়ে উত্তম। মুসলমানগণ উত্তর দিতেন, তোমাদের কেবলা অপেক্ষা আমাদের কেবলাই উত্তম। এ রকম বিতর্ক ব্যপদেশেই অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯৬

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَٰرَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ ○

❒ মানব জাতির জন্য সর্ব প্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তো বাক্কায়, উহা আশীস-প্রাপ্ত ও বিশ্ব-জগতের দিশারী।

সর্বপ্রথম গৃহ অর্থ সর্বপ্রথম ইবাদতের গৃহ। মানুষের হজ সম্পাদনের জন্য আল্লাহ্ যে গৃহ নির্মাণ করেছিলেন, সেই গৃহ। হাসান ও কালাবী বলেছেন, এর অর্থ সর্বপ্রথম মসজিদ যা আল্লাহ্তায়ালার ইবাদতের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। সেই প্রথম ইবাদতের গৃহের অবস্থানস্থল মক্কা। এই আয়াতে অবশ্য মক্কার স্থলে বাক্কা শব্দটি এসেছে। বাক্কা ও মক্কা মূলতঃ একই অর্থবোধক শব্দ। আরববাসীরা মিম এর স্থলে বা উচ্চারন করতে অভ্যস্ত। তাই মক্কা হয়েছে বাক্কা। কেউ কেউ বলেছেন, পুরো শহরের নাম মক্কা আর বাক্কা শুধু ওই স্থানটুকু যেখানে রয়েছে কাবা শরীফ। অথবা আয়তাকার তাওয়াফের স্থান সহ কাবা শরীফ। বাক্কা এর আরেক অর্থ ভীড়। হজের সময় মক্কায় মানুষের ভীড় হয় অত্যধিক — এজন্য মক্কাকে বাক্কা বলা হয়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের বর্ণনা করেন, শ্রেষ্ঠ অত্যাচারীরা এখানে পর্যুদস্ত হয়েছে যেমন, আবরাহা তার সৈন্যসামন্ত সহ কাবা শরীফ ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিলো – আল্লাহ্ তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। মক্কায় ছিলো পানির প্রচন্ড সংকট। তাই এই শহরের নাম হয়েছে মক্কা। কারণ, মক্কা অর্থ — পানিসংকট।

'সর্বপ্রথম গৃহ' সম্পর্কে আলেমদের মত রয়েছে বিভিন্ন রকমের। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, মুজাহিদ, কাতাদা এবং সুদ্দী বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির সময় পানির উপর সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছে কাবার স্থানটুকু। প্রথমে ওই স্থানটুকু শাদা হয়ে জমাট বেঁধেছিলো। পৃথিবী সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে ঘটেছিলো এই ঘটনা। তারপর এর নিচ থেকে উদ্ভাসিত হয়েছিলো পৃথিবী।

হজরত আলী বিন হোসেইন এবং জয়নাল আবেদীন বলেছেন, আল্লাহ্ আরশের নিচে একটি ঘর নির্মাণ করেছিলেন এবং আকাশের ফেরেশতাদেরকে সেই ঘর তাওয়াফ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে ঘরের নাম বায়তুল মামুর। এরপর পৃথিবীর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেনো পৃথিবীতে বায়তুল মামুরের অনুরূপ একটি ঘর বানায়। এই নির্দেশানুসারে নির্মিত হলো কাবা। এর নাম রাখলেন, সুরাহ্। পৃথিবীবাসীকে পুনঃনির্দেশ দিলেন, আকাশবাসীদের বায়তুল মামুর তাওয়াফের মতো তোমরাও সুরাহ্ তাওয়াফ করো। বিভিন্ন আলেম বলেছেন, হজরত আদম আ. এর জন্মের দুই হাজার বছর আগে ফেরেশতারা কাবা শরীফ নির্মান করেছেন এবং হজ করেছেন। হজরত আদম আ. এর হজ সমাধার পর ফেরেশতারা বলেছিলেন, আপনার হজ কবুল হয়েছে। আমরা আপনার দুই হাজার বছর আগে হজ করেছি।

এক বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাসের মত উল্লেখ রয়েছে এরকম, সর্বপ্রথম পৃথিবীতে কাবা নির্মান করেছিলেন হজরত আদম আ.। আজরুকী তার মক্কার ইতিহাসে একথা লিখেছেন।

হজরত আবু জরের বর্ণনায় এসেছে, হে আল্লাহ্র রসুল! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি স. বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, তারপর? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি বললাম, এ দুই মসজিদ নির্মানকালের ব্যবধান কতোটুকু? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। অতঃপর যেখানে নামাজের সময় হয়ে যায় পড়ে নিও। এতেই রয়েছে ফযীলত। বোখারী, মুসলিম। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, সর্বপ্রথম কাবা নির্মাণ করেছিলেন হজরত আদম আ.। নূহ আ. এর মহাপ্লাবনের সময় কাবাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো কাবা শরীফ। পরবর্তীতে ইব্রাহিম আ. কাবা পুনঃনির্মাণ করেন। তারপর করেন যুরহাম গোত্র। তারপর আমালেকা সম্প্রদায়। তারপর কোরাইশগণ।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকী বলেছেন, মহাপ্লাবনের সময় আল্লাহ্ কাবা ঘরটি উঠিয়ে নিয়েছিলেন। পরে হজরত ইব্রাহিম আ. পুনঃনির্মাণ করতে চাইলে আল্লাহ্ তাঁকে কাবার স্থান দেখিয়ে দেন এভাবে — হিজুজ নামে এক পশু পাঠালেন আল্লাহ্ । সেই পশুটি মাটি উঠিয়ে কাবা শরীফের

ভিত্তি চিহ্নিত করে দেয়। ওই ভিত্তির উপরেই হজরত ইব্রাহিম কাবা পুনঃনির্মাণ করেন। হিজুজ পশু, কিন্তু তার পাখির মত দু'টি ডানা ছিলো; আর আকৃতি ছিলো সাপের মতো।

হজরত আলী বলেছেন, সময়ের দিক থেকে নয়, কাবা শরীফ সর্বপ্রথম অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট ইমারত সম্মানের দিক থেকে। জুহাক বলেছেন, কাবা শরীফই সর্বপ্রথম ঘর যাকে বরকত দান করা হয়েছে। কাবা দর্শনের বিনিময় ও সওয়াব অত্যধিক। বিভিন্ন ইবাদত কাবার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন, হজ, হজের কোরবানী, ওমরাহ, তাওয়াফ ইত্যাদি।

কতিপয় ইবাদত এমন যা অন্য স্থানে সম্পাদনের তুলনায় কাবা শরীফে সম্পাদনে সওয়াব তুলানমূলকভাবে বেশী। যেমন, নামাজ, রোজা, ইতেকাফ। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, মসজিদে হারামে মানতকৃত দু'রাকাত নামাজ সেখানেই পড়তে হবে। অন্য স্থানে পড়লে হবে না। হজরত আনাস ইবনে মালেকের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, বাসগৃহে নামাজ পড়লে একগুন, মহল্লার মসজিদে পঁচিশগুন, জামে মসজিদে পাঁচশতগুন, মসজিদে আকসায় এক হাজার, আমার মসজিদে (মদীনায়) পঞ্চাশ হাজার এবং মসজিদে হারামে একলক্ষ গুন সওয়াব পাওয়া যায়। ইবনে মাজা, তাহাবী।

হজরত আতা বিন জোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার এই মসজিদের এক নামাজ মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদের হাজার নামাজ অপেক্ষা উত্তম এবং মসজিদে হারামের এক নামাজ আমার এই মসজিদের শত নামাজ অপেক্ষা উত্তম। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জোবায়ের, হজরত ওমর থেকেও এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে গায়ের মারফু হিসেবে। হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে মারফু হিসেবে ইবনে জাওজীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, মসজিদে হারামের এক নামাজ এক লক্ষ নামাজ থেকে উত্তম। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, নামাজের এই ফযীলত কেবল ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নফলের ক্ষেত্রে নয়। কেননা হজরত জায়েদ বিন সাবেতের বর্ণনা সূত্রে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ফরজ নামাজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজ নিজ গৃহে পাঠ করাই উত্তম। বোখারী, মুসলিম।

আমি বলি, ইতেকাফের হুকুমও ফরজ নামাজের মতো। কেননা ইতেকাফকারী এমন অবস্থায় ফরজ নামাজের অপেক্ষা করতে থাকে, যেমন সে যেনো নামাজের মধ্যেই রয়েছে।

ইবনে জাওজী তাঁর ফাজায়েলে মক্কা কিতাবে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আদী বিন আল হামরা থেকে লিখেছেন, রসুল স. মক্কার বাজারের হারুরা নামক স্থানে দাঁড়িয়ে এরশাদ করলেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র পৃথিবীতে তুমি সর্বাপেক্ষা

উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট তুমি সবচেয়ে বেশী প্রিয়। যদি আমাকে তোমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া না হতো, তবে আমি স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হতাম না । হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে জাওজী এই হাদিসটি মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে — এই গৃহ বিশ্বজগতের দিশারী, হেদায়েতের প্রাণ কেন্দ্র এবং সকলের কেবলা (লক্ষ্যস্থল)। এতে করে আল্লাহ্ এবং রসুল স. এর উপর ইমান আনয়নের দিশা দেয়া হয়েছে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯৭

فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ○

❐ উহাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন ইব্রাহীমের দাঁড়াইবার স্থান; এবং যে কেহ সেথায় প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যাহার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে আল্লাহের উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্ব করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। এবং কেহ প্রত্যাখ্যান করিলে সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ্ জগতের উপর নির্ভরশীল নহেন।

কাবা শরীফের সীমানায় অনেক প্রকার নিদর্শন রয়েছে। যেমন, পাখি কাবা গৃহের উপর দিয়ে উড়েনা। শিকারযোগ্য কোনো প্রাণী তাড়া খেয়ে কাবার সীমানায় প্রবেশ করলে শিকারী প্রাণী সেখানে প্রবেশ করে না। হজরত ইব্রাহিমের দাঁড়াবার স্থান (মাকামে ইব্রাহিম) আরেকটি বিস্ময়কর নিদর্শন। মাকামে ইব্রাহিম ওই পাথরের নাম যার উপর দাঁড়িয়ে হজরত ইব্রাহিম আ. বায়তুল্লাহ্র দেয়াল গেঁথেছিলেন। ওই পাথরে রয়েছে তাঁর পদচিহ্ন। হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও সেই পবিত্র চিহ্ন এখনো স্পষ্ট। অসংখ্য শত্রু থাকা সত্ত্বেও সেই চিহ্ন এখনো সুসংরক্ষিত। এখনো কাবা সকল কিছুর কেবলা, লক্ষ্যস্থল। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হেরেম শরীফের পুরো সীমানাই মাকামে ইব্রাহিম। এই সীমানায় যে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। ইসলাম পূর্ব সময়েও হেরেমে প্রবেশকারী ব্যক্তির উপর কোনো অত্যাচার করা হতো না, যদিও তখন আরববাসীরা হত্যাকান্ড, লুটতরাজ ইত্যাকার কর্মে লিপ্ত ছিলো। হাসান, কাতাদা এবং অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে এই আয়াতের মতো অন্য আরেকটি আয়াত রয়েছে সুরা

আনকাবুত পারা ২১ আয়াত নং ৬৭। যেমন, 'এবং তারা কি দেখেনি যে আমি মক্কাকে নিরাপদ হরম বানিয়েছি এবং তার পাশ্ববর্তী লোকদের বহিষ্কার করা হচ্ছে।'

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হেরেমের অভ্যন্তরে আগত ব্যক্তি নিরাপদ, তাকে হত্যা করা অবৈধ। কেউ হেরেমের বাইরে অপরাধ করার পর হেরেম শরীফে আশ্রয় নিলে, যতোক্ষণ সে সেখানে থাকবে ততোক্ষণ কেসাস অথবা হদ কার্যকর করা যাবে না (খুনের বদলে খুনকে কেসাস এবং শরিয়ত নির্ধারিত সকল শাস্তিকে হদ বলে)। এরকম ব্যক্তির পানাহার বন্ধ করে দিতে হবে। লেনদেনও স্থগিত রাখতে হবে, যেনো অপারগ হয়ে সে হেরেম শরীফ থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য হয়। তখনই কেবল তার প্রতি শাস্তি কার্যকর করা যাবে। হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বাইরে অপরাধ করে হেরেমে প্রবেশ করলে সেখানে তার কেসাস নেয়া যাবে। তবে এ ব্যাপারে ওলামাদের ঐকমত্য রয়েছে যে, হেরেমের অভ্যন্তরে অপরাধ সংঘটনকারীকে সেখানেই শাস্তি দেয়া যাবে। কোনো কাফের পরাজিত হয়ে হেরেমে আশ্রয় নিলে, তাকে ধাক্কা দিয়ে অথবা তলোয়ার উঁচিয়ে অথবা চাবুক মেরে সেখান থেকে বের করে দিতে হবে অথবা সেখানেই তাদেরকে বন্দী রেখে তাদের পানাহার ও প্রয়োজনীয় রসদপত্র বন্ধ করে দিতে হবে। যেনো তারা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বেরিয়ে আসার পর তাদেরকে হত্যা করা যাবে। আর যদি কোনো কাফের হেরেমের ভিতরে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে, তবে মুসলমানদের জন্য হেরেমের ভিতরেই যুদ্ধ করা বৈধ।

হেরেমে প্রবেশকারী নিরাপদ — এ কথাটি বিজ্ঞপ্তিমূলক হলেও এতে রয়েছে এরকম হুকুম, যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করে তাকে নিরাপত্তা দাও। কোনো কোনো আলেম অর্থ করেছেন, যে ব্যক্তি হেরেমের সম্মান বজায় রেখে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য অর্জনার্থে সেখানে প্রবেশ করবে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্তায়ালার আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। আবু দাউদ, তায়ালুসি মসনদে এবং বায়হাকী শোয়াবুল ইমানে হজরত আনাসের বর্ণনাসূত্রে এবং তিবরানী কবীরের মধ্যে, বায়হাকী শোয়াবুল ইমানে হজরত সুলায়মানের বর্ণনাক্রমে এবং তিবরানী আওসাতের মধ্যে হজরত জাবেরের বর্ণনা থেকে এবং দারাকুতনী সুনানের মধ্যে হজরত হাতেবের বর্ণনাসুত্রে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুই হেরেমের যে কোনো একটিতে মৃত্যুবরণ করবে কিয়ামতের দিন সে হবে দোজখ থেকে নির্ভয়।

হারেস বিন আবু উসামা মসনদের মধ্যে সালেম বিন আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আমাকে আবুবকর ও

ওমরের সাথে উঠানো হলে আমরা জান্নাতুল বাকীতে যাবো। জান্নাতুল বাকীর অধিবাসীরাও উঠে আমাদের সঙ্গে যোগ দিবেন। অতঃপর আমরা মক্কাবাসীদের প্রতীক্ষায় থাকবো। তারা এসে গেলে আমাকে রাখা হবে দুই হেরেমের অধিবাসীদের মধ্যবর্তী স্থানে। আবু নাঈম তাঁর দালায়েলে নবুয়ত পুস্তকে সালেম বিন আবদুল্লাহ্র মাধ্যমে হজরত আবদুল্লাহ্র মিলিত বর্ণনায় এবং খতিব, নাফে এর মাধ্যমে হজরত ওমরের বর্ণনায় বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আমাকে উঠানো হবে আবুবকর ও ওমরের মধ্য থেকে। আমি তখন হারামাঈনের (মক্কা ও মদীনার) মধ্যস্থলে গিয়ে দাঁড়াবো। মক্কা ও মদীনাবাসীরা সেখানে আমার সাথে মিলিত হবে।

কাবা গৃহে উপস্থিত হয়ে হজ সম্পাদন করা সামর্থবান ব্যক্তির জন্য ফরজ। তদেরকে হতে হবে স্বাধীন, জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও উন্মাদের জন্য হজ ফরজ নয়। গোলামের উপরও ফরজ নয়। এই সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যনির্ভর।

কাফের, বুদ্ধিমান বালক ও গোলাম হজ্ব করলে কাফেরের জন্য মুসলমান হওয়ার পর, বালকের জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর এবং গোলামের জন্য আজাদ হওয়ার পর হজ ওয়াজিব হবে। আগের হজ ধর্তব্য নয়। এ মতের সমর্থনে রয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিস। এই হাদিস বর্ণনা করেছেন হাকেম। ইসলামপূর্ব সময়ে দূরবর্তী গ্রামের অমুসলমানেরা ও আরবের অন্যান্য মুশরিকেরাও হজ করতো। শায়েখাইনের শর্ত মোতাবেক হাকেম বর্ণিত এই হাদিসটি ইবনে আবী শাইবা তাঁর মোসান্নাফের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। মোহাম্মদ ইবনে ক্বাব কুরজী থেকে বর্ণনা করেছেন৷ আবু দাউদ । তাঁর বর্ণনা মুরসাল । হজরত জাবের থেকেও এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার সুত্রশৃঙ্খল দুর্বল। উম্মতেরা এই সমস্ত হাদিস কবুল করেছেন। এগুলোর বিষয়বস্তুর উপর উম্মতেরা একমত হয়েছেন । কারন, একজন বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হলেও বর্ণনাগুলো সর্বজনবিদিত (মোতাওয়াতির)। তাই আয়াতে কেবল সামর্থবান মানুষের কথা উল্লেখ থাকলেও বালক, পাগল ও গোলাম হজের হুকুমবহির্ভূত হবে।

হজ অর্থ ইচ্ছা করা। এ স্থানে এর অর্থ হবে এক বিশেষ ইবাদতের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা। ব্যাপারটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। রসুল স. এর জীবনযাপনে যেমন এর ব্যাখ্যা রয়েছে, তেমনি ব্যাখ্যা রয়েছে কোরআনের অন্যান্য আয়াতেও। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'অতঃপর তোমরা সেই স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করো যেস্থান থেকে অন্য লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে।' অন্য স্থানে বলেছেন, 'এবং তারা ওই সম্মানিত গৃহের তাওয়াফ করে।' প্রথম আয়াতে রয়েছে আরাফাতে রওয়ানা হওয়ার বর্ণনা। পরের আয়াতে রয়েছে কাবা শরীফ তাওয়াফের নির্দেশ।

হজ শব্দটির হা এর নিচে যের দিয়ে পাঠ করেছেন আবু জাফর, হামজা, কুসায়ী এবং হাফ্স। এরকম পাঠ নজদবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। অন্যান্য ক্বারীগণ হজকে হা এর উপর জবর দিয়ে পড়েছেন। হেজাজবাসীগণ এরকম পাঠে অভ্যস্ত। দু'টি পাঠই একার্থবোধক। মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, হা এ যের দিলে বিশেষ্য এবং জবর দিলে কৃদন্ত পদ হয়।

মাসআলা ঃ উম্মতের ঐকমত্য এই যে, হজ ইসলামের একটি স্তম্ভ — ফরজে আইন। হজরত ইবনে ওমর রা. বলেছেন, রসুল স. এর এরশাদ রয়েছে, পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি — লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স্বীকার করা, নামাজ আদায় করা, জাকাত দেয়া, হজ করা এবং রমজান শরীফে রোজা রাখা। বোখারী, মুসলিম। হজ ফরজ হওয়া সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হজরত ওমর বলেছেন, যে হজ ছেড়ে দেবে তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করবো; যেমন যুদ্ধ করবো নামাজ রোজা ছেড়ে দিলে।

হজরত কাতাদার অনুকূলে ঐকমত্য পোষন করে ইমাম আবু হানিফার মত সহ কাজীখান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, সমুদ্র প্রতিবন্ধক হলে হজ ফরজ নয়। স্মর্তব্য যে, জিহুন, সিহুন, দজলা ও ফোরাত কিন্তু সমুদ্র নয়। আলেমদের ঐকমত্য এই যে, হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য পথের নিরাপত্তা জরুরী। পথ পরিক্রমণকালে পানাহারের ব্যবস্থা থাকাও জরুরী। পথের শংকাকুলতা হজ ফরজ হওয়ার প্রতিবন্ধক। পথে সমুদ্র পড়লে শান্তিপূর্ণভাবে সমুদ্র পাড়ি দেয়া সম্ভব হলে হজ ওয়াজিব হবে। পাড়ি দেয়া সম্ভব না হলে ওয়াজিব হবেনা। কেবল সমুদ্র থাকলেই হজ বন্ধ করা যাবেনা। ইমাম শাফেয়ীর মত অবশ্য অন্যরকম। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, হজ্বের জন্য শারীরিক সুস্থতাও শর্ত। অত্যধিক দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তির উপর হজ ওয়াজিব নয়। এরকম ব্যক্তি অন্য কাউকে প্রতিনিধি করে হজ্বে পাঠাতে পারে। হজ শারীরিক ইবাদত। এই ইবাদতে শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে হয়। অন্য কাউকে পাঠালে অবশ্য ইবাদতের আসল উদ্দেশ্যটি অনর্জিত থেকে যায়।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, শারীরিক সুস্থতা শর্ত নয়। তাঁদের মতে অক্ষম, পঙ্গু এবং দুর্বল ব্যক্তিও সামর্থবান। কেননা তারা সম্পদশালী। বাগবী এই মতের সমর্থনে লিখেছেন, ওই সম্পদশালী ব্যক্তি অবশ্যই গৃহ প্রস্তুত করতে সক্ষম, যে সম্পদ খরচ করতে পারে। নিজে শ্রম দিতে সক্ষম না হলেও সে যে গৃহ প্রস্তুত করার সামর্থ রাখে একথা বলতেই হবে।

আমরা বলি, শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিকে হজ করতে সামর্থবান বলা যায় না। তবে অন্যের দ্বারা সে বদলী হজ করাতে পারবে। গৃহনির্মাণের সঙ্গে হজ সম্পাদন তুলনীয় হতে পারেনা। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মোহাম্মদ হজরত

ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসূত্রে উপস্থাপিত করেছেন যে, ফজল বিন আব্বাস রসুল স. এর পশ্চাতে ছিলেন, এমন সময় খায়সাম গোত্রের এক মহিলা এলেন। ফজল তার দিকে তাকালেন, তিনিও ফজলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রসুল স. ফজলের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। মহিলা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার পিতার উপর যখন হজ ফরজ হলো, তখন তিনি অতিশয় বৃদ্ধ। উটের পিঠে তিনি হেলান দিয়ে বসতেও সমর্থ নন। আমি কি তার বদলে হজ করতে পারবো? দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, তিনি ঠিকমতো উটের পিঠে বসতেই পারেন না। আমি তার পরিবর্তে হজ করলে কি তা আদায় হবে? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। এই ঘটনা বিদায় হজ্বের সময়ের। বোখারী, মুসলিম।

এই হাদিসটি আহাদ (একজন বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত)। ক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে কোরআন দ্বারা। হাদিসে আহাদ দ্বারা কোরআন রহিত করা যায় না। কোরআনে রয়েছে সামর্থবান হওয়ার শর্ত। এমতাবস্থায় মহিলার প্রশ্নটি হবে এ রকম, আমার পিতা তো সামর্থই রাখেন না। আমি কি তার পরিবর্তে হজ করবো? অর্থাৎ আমি তার পক্ষে হজ করলে বৈধ হবে কি? অথবা এ রকম অর্থ হতে পারে, আমি হজ করলে তাঁর সওয়াব লাভ হবে কি? হুজুর স. এর এরশাদের অর্থ হবে এ রকম, তার উপর হজ ফরজ না হলেও তার পক্ষে তুমি হজ আদায় করলে অবশ্যই তার উপকার হবে।

ওই বৃদ্ধ ব্যক্তির উপরে হজ ফরজ ছিলো কি না, এ কথা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও মহিলার কথায় বোঝা যায়, তিনি বুঝেছিলেন যে, তার পিতার উপরে হজ ফরজ হয়েছিলো। মহিলার এ ধারণা সঠিক না হলে রসুল স. বলে দিতেন, তোমার ধারণা ভুল। বৃদ্ধ পিতার পক্ষে হজ করতে পারবে কি না জিজ্ঞেস করায় রসুল স. অনুভব করেছিলেন, ওই মহিলার অন্তরে বৃদ্ধ পিতাকে সওয়াব পৌছানোর আকাংখা প্রবল। এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে। আবদুর রাজ্জাক ওই বর্ণনাটি উপস্থাপিত করেছেন এইভাবে, রসুল স. বলেছেন, পিতার পক্ষ থেকে হজ করে নিও। এতে তার কল্যাণ না হলেও অকল্যাণ তো আর হবে না। হাদিসবেত্তাগণ বর্ণনাটিকে শাজ বলেছেন (ন্যায়ানুগতাবিহীন ও স্মৃতিবিশৃঙ্খলাহীন বর্ণনাকে শাজ বলে)। প্রমাণ হিসাবে শাজ গ্রহণীয় নয়।

এই আলোচনাটির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসাই শোভনীয় যে, সুস্থাবস্থায় হজ ফরজ হলে ফরজ আদায়ের পূর্বেই যদি কেউ দৈহিকভাবে সামর্থহীন হয়ে পড়ে তবে ফরজ রহিত হবে না। জীবিত অবস্থায় তাকে আপন সম্পদ ব্যয় করে কাউকে দিয়ে হজ করাতে হবে। মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে হজ্বের অসিয়ত করে যেতে হবে।

হজ ব্যতীত মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেউ তার পক্ষ থেকে হজ করবে। অথবা তার সম্পদ খরচ করে অন্য কাউকে দিয়ে হজ করাতে হবে। তার হজের কাজা আদায় করা জরুরী। তবে এই মতটি কিয়াস বহির্ভুত। বিষয়টি বুদ্ধিবাদিতাবিরোধী হলেও এই হাদিসে এর হুকুম পরিদৃষ্ট হয়। বুদ্ধি-বিরুদ্ধ বিষয়ও মান্য করতে হয়। যেমন, রোজা রাখতে অসমর্থ অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি রোজার ফিদিয়া প্রদান কিতাবুল্লাহর ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে (বুদ্ধিবিরুদ্ধ হলেও বিষয়টিকে মেনে নেয়া ওয়াজিব)।

হুদাইবিয়ার সন্ধির বছরে অর্থাৎ ষষ্ঠ হিজরীতে হজ ফরজ হয়েছে। তখন আল্লাহতায়ালা জানিয়েছেন, 'তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরাহকে পূর্ণ করো।' হুদাইবিয়ার প্রসঙ্গ এ কারণে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্ভবত ওই মহিলার পিতা ষষ্ঠ হিজরীর পরে বিদায় হজ্বের পূর্বে অসমর্থ হয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহ্তায়ালাই ভালো জানেন।

ইমাম সাহেবের নিকট হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য দৃষ্টিশক্তি থাকা শর্ত। দৃষ্টিহীন ব্যক্তির উপর হজ ওয়াজিব নয় যদিও তার পথপ্রদর্শনকারী থাকে। নিজে সমর্থ হওয়া এবং অন্যের সাহায্যে সমর্থশীল হওয়া এক কথা নয়। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ এবং অন্য অনেকের মতে দৃষ্টিহীন ব্যক্তির উপরও হজ ফরজ। তবে শর্ত হলো, তার নিকট পথপ্রদর্শক থাকতে হবে। এই ধরনের মতবিরোধ রয়েছে জুমআ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রেও।

ইমাম আবু হানিফার মতে ওই মহিলার হজ আদায় করা ওয়াজিব, যার সাথে তার স্বামী অথবা অন্য কোনো মাহরাম (যে পুরুষের সঙ্গে বিবাহ অসিদ্ধ) থাকে এবং মক্কার দূরত্ব হয় তিন মঞ্জিল। ইমাম আহমদের মতে, দূরত্ব কমবেশী ধর্তব্য নয়। সকল অবস্থায় মাহরাম ব্যতীত মহিলার উপর হজ ওয়াজিব হবে না। মাহরাম না থাকলে অথবা থাকা সত্ত্বেও সাথে যেতে না চাইলে অথবা মহিলার পক্ষে আদায় করা সম্ভব নয় এমন বিনিময় চাইলে হজ ওয়াজিব হবে না। কেননা শরিয়তে স্বামী অথবা মাহরাম ব্যতীত সফর করা মেয়েদের জন্য নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। কাজেই মাহরাম ব্যতীত মেয়েদেরকে সামর্থশালিনী মনে করা যাবে না।

ইমাম সাহেবের মতের সমর্থনে রয়েছে ওই হাদিসটি যা বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর। তিনি বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কোনো নারী যেনো মাহরাম ব্যতীত তিন মঞ্জিলের অধিক দুরত্বের সফর না করে (এক মঞ্জিলের দূরত্ব এক দিনে অতিক্রমযোগ্য পথ) বোখারী, মুসলিম।

মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসবতী রমনীর জন্য মাহরাম ব্যতীত তিন রাতের সমদূরত্বের পথ সফর করা বৈধ নয়। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিন রাতের বেশী দূরত্বের পথ। এই বর্ণনাটি

হজরত আবু হোরায়রা থেকে উদ্ধৃত করেছেন তাহাবী। তিনি আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন আমর বিন শোয়ায়েবের পিতামহ থেকে। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় রয়েছে, তিন দিন অথবা তদপেক্ষা বেশী দূরত্বের কথা। বর্ণনাকারী মুসলিম ও তাহাবী। তিন রাতের উপর অথবা তদপেক্ষা বেশীর উল্লেখ রয়েছে মুসলিমের বর্ণনায়।

ইমাম আহমদ বলেন, ঘটনাক্রমে তিন রাত অথবা বেশী শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সময় নির্দিষ্ট করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে মহিলাদের জন্য মাহরাম ব্যতীতই তিন দিনের কম দূরত্বের সফর জায়েয। ইমাম আহমদ বলেছেন, নাজায়েয। তাঁর কথার সমর্থনে রয়েছে হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত এবং বোখারী ও মুসলিম পরিবেশিত একটি হাদিস। সেখানে একদিন ও এক রাতের কথা বলা হয়েছে। মুসলিমের এক বর্ণনায় একদিনের এবং অন্য বর্ণনায় এক রাতের দুরত্বের কথা বলা হয়েছে। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনা রয়েছে দুই দিনের এবং তাহাবীর বর্ণনায় রয়েছে দুই রাতের কথা।

আবু দাউদ এবং তাহাবী, হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, স্বামী অথবা মাহরাম ব্যতীত কোনো নারী যেনো এক মঞ্জিলও সফর না করে। ইবনে হাব্বান বলেছেন হাদিসটি বিশুদ্ধ। হাকেম বলেছেন, এই শর্তটি মুসলিমের অনুরূপ। তিবরানী বলেছেন তিন মাইলের কথা। বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা এ কথাই বোঝা যায় যে, একদিন, দুই দিন, তিন দিনের শর্ত কেবলই দৃষ্টান্ত — এ ক্ষেত্রে সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়। নিম্নতম সংখ্যা এক। আধিক্য শুরু হয় দুই থেকে এবং বহুবচনের প্রথম স্তর হলো তিন। কোনো কোনো হাদিসে মহিলাদের সফর শর্ত ব্যতিরেকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, কোনো রমনী যেনো মাহরাম ব্যতীত সফর না করে এবং মাহরামের অনুপস্থিতিতে তার নিকট কোনো অপরিচিত ব্যক্তি না আসে। এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি অমুক যুদ্ধে যেতে চাই। আর আমার স্ত্রী যেতে চায় হজ্বে। রসুল স. বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে যাও। বোখারী, মুসলিম। এ ধরনের হাদিস রয়েছে হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনাতেও।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মহিলারা কোনো বিশ্বস্ত মহিলার সাথে হজ্বে যেতে পারে। কিন্তু ওই সমস্ত বিশ্বস্ত মহিলাদের কোনো একজনের সঙ্গে মাহরাম পুরুষ থাকতে হবে। মিনহাজ কিতাবে কিন্তু এ শর্তের উল্লেখ নেই। এক বর্ণনায় ইমাম শাফেয়ীর মত হিসাবে এ রকম এসেছে যে, মহিলারা বিশ্বস্ত মহিলা ছাড়াই হজ করতে পারবে। ইমাম মালেক বলেছেন, পথ ভয়ভাবনা মুক্ত হলে পুরুষ ব্যতীতই মহিলারা দলবদ্ধভাবে হজ্বে যেতে পারবে। এই দুই ইমামের প্রতিকূলে আমাদের

হাতে প্রমাণ হিসাবে রয়েছে ওই হাদিস, যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। সক্ষমতা অর্থ এমন সক্ষমতা যাতে হজ্বে যেতে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। এ জন্য জমহুরের মতে সফরের বিবিধ প্রয়োজন ব্যতীত পাথেয় ও বাহন সমর্থশীল হওয়ার জন্য জরুরী। ঋণগ্রস্ত না হওয়াও জরুরী। পরিবার পরিজনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করে যাওয়াও জরুরী। পাথেয় ও বাহন না থাকলে সাধারণভাবে সে সফর করার অযোগ্য। শরিয়ত সকল প্রকার অসুবিধা থেকে মুক্ত থাকা শর্ত করে দিয়েছে, বল প্রয়োগ করেনি।

মক্কাবাসী নয় এমন ব্যক্তিকে তার সন্তানেরা পাথেয় ও বাহনের ব্যবস্থা করে দিলেও তাকে সক্ষম মনে করা যাবে না। ইমাম শাফেয়ীর মত এই মতের বিরুদ্ধে। পাথেয় ও বাহনের ব্যবস্থাকারী যদি অন্য ব্যক্তি হয়, তবে এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী থেকে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি হাঁ বাচক, অন্যটি না বাচক। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, এ রকম ব্যক্তিকে ইমাম শাফেয়ী ক্ষমতাহীন বলেই মনে করেন।

দাউদ জাহেরী বলেছেন, হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য পথখরচ ও বাহনের প্রয়োজন নেই। ইমাম মালেক বলেছেন, যদি কেউ ভিক্ষা করে অথবা পথে রোজগার করতে পারে তবে তার জন্য পথ খরচের শর্ত নেই। আর পায়ে হাঁটতে সক্ষম হলে বাহনেরও শর্ত নেই। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন, 'মানুষের নিকট ঘোষনা করে দাও। তারা তোমার নিকট পদব্রজে এবং দুর্বল উট সমূহে আরোহন করে চলে আসবে সেগুলো পৌছবে দূর পথ অতিক্রম করে।' আমরা বলি, এখানে পায়ে হেঁটে এবং উটে চড়ে আসার সংবাদ দেয়া হয়েছে, এটি সরাসরি কোনো হুকুম নয়। তাই বাহন ব্যতীত এখানে হজের ওয়াজিব প্রমাণিত হয়নি। আর পায়ে হাঁটার ক্ষমতা সব সময় এক রকম থাকে না। পথে চলৎশক্তিহীন হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণেই হজের সফরের শুরুতেই পথখরচ ও বাহন থাকা আবশ্যক, যেনো পেরেশানীর সম্মুখীন হতে না হয়। শরিয়তের হুকুম সকলের জন্য একই রকম। বিশেষ লোকের জন্য বিশেষ নিয়ম নেই। সফরে বাদশাহর কোনো কষ্ট হয় না, তবুও সকলের মতো বাদশাহও কসরের নামাজ পড়তে পারবে এবং ইচ্ছা করলে রোজা রাখতে অথবা ভাঙতে পারবে। আবার স্বগৃহবাসী অবস্থায় কষ্ট হলেও সর্বসাধারণের মতো বাদশাহকেও অবশ্যই রোজা রাখতে হবে।

জমহুরের অভিমতের প্রমাণ রয়েছে হজরত আনাস বর্ণিত হাদিসে, যেখানে রসুলে পাক স. "মানিস্ তাতাআ 'ইলাইহি সাবীলা" — এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, সাবীলা অর্থ পথখরচ ও বাহন। হজরত আনাস থেকে দারাকুতনী, বায়হাকী এবং হাকেমও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বোখারী ও মুসলিমের মতোই সহীহ্। হাকেম এ রকম হাদিস হজরত হাম্মাদ বিন

সালমা থেকে বর্ণনা করে সেটিকে মুসলিমের মতো সহীহ্ বলেছেন। হজরত সাঈদ বিন মনসুর, হজরত হাসান বসরী থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে ওমর থেকে আরেকটি বর্ণনা ইমাম শাফেয়ী, তিরমিজি, ইবনে মাজা এবং দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন এ রকম, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! কোন বস্তু হজকে ওয়াজিব করে? তিনি স. বললেন, সম্পদ ও সওয়ারী। এই সিলসিলাকে তিরমিজি বলেছেন হাসান। কিন্তু ইব্রাহিম বিন জাওজী, আহমদ এবং নাসাঈ একে বলেছেন মাতরুকুল হাদিস। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা এবং দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সম্পদ ও সওয়ারী। অর্থাৎ এই আয়াতের তাফসীরে পথ খরচের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সম্পদ ও সওয়ারীর কথা বলেছেন। এই সনদটি দুর্বল।

দারা কুতনী এই বর্ণনাটির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন হজরত জাবের, হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আয়েশা এবং হজরত আমর বিন শোয়ায়েবের দাদার সঙ্গে। কিন্তু এই সনদটিও দুর্বল।

হজের সফরে প্রয়োজনীয় সম্পদ সঙ্গে নেয়া ওয়াজিব। কেননা আল্লাহতায়ালা বলেছেন, "ওয়া তাজাউয়াদু ফা ইন্না খইরযাদিত্ তাক্বওয়া।"

পাথেয় অবশ্যই সঙ্গে নিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, ভিক্ষাবৃত্তি থেকে তো বেঁচে থাকতে হবে।

বোখারী ও অন্যান্যরা হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, ইয়েমেনবাসীরা পাথেয় ছাড়াই হজে বেরুতো এবং বলতো, আমরা তাওয়াক্কুল (আল্লাহর প্রতি নির্ভর) করি। পরে মক্কায় পৌঁছে তারা মানুষের নিকট ভিক্ষা চাইতো। তখন নাজিল হয়েছে এই আয়াত।

জ্ঞাতব্য ঃ ফতোয়ায়ে কাজীখানে রয়েছে, বিভিন্ন আলেম বলেন, ব্যবসার মাধ্যমে যার জীবিকা নির্বাহ হয়, সেই ব্যক্তি পাথেয় ও বাহনসহ হজ করে ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণের খরচ ছাড়াও যদি এমন সম্পদ অতিরিক্ত থাকে যদ্বারা পুনরায় ব্যবসা করা যায়, তবে সেই ব্যক্তির উপর হজ ফরজ হবে। অন্যথায় হবে না। পথখরচ, সওয়ারী, পরিবার পরিজনের প্রয়োজন — এ সমস্ত বাদে কোনো ব্যক্তির যদি এমন সম্পদ থাকে যার আয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ সম্ভব, তবে সেই ব্যক্তির উপর হজ ফরজ হবে। পাথেয়, বাহন এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতির প্রয়োজন পূরণের পর কোনো কৃষকের যদি হাল, গরু ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ প্রস্তুত থাকে যার মাধ্যমে হজ থেকে ফিরে এসে চাষাবাদ শুরু করতে পারে তবে তার উপর হজ ফরজ।

আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত, 'কেহ প্রত্যাখ্যান করিলে' — এ কথার অর্থ হবে, কেউ হজ্বের ফরজ অস্বীকার করলে। হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী এবং

আতা খোরাসানী এ রকমই ব্যাখ্যা করেছেন। আবদ বিন হুমাইদ তাঁর তাফসীরে নাকীয় এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এই আয়াতটি পাঠকালে হুজাইল গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরজ করলো, হে আল্লাহর রসুল! যে হজ তরক করেছে, সে কি কাফের? তিনি স. বললেন, যদি এই মনোভাবের সঙ্গে সে হজ তরক করে যে, আল্লাহর আজাবের ভয় এবং হজ পালনের সওয়াব প্রাপ্তির ইচ্ছা তার না থাকে (তবে কাফের হয়ে যাবে)। আবদ বিন হুমাইদ নাকীয় ছিলেন তাবেয়ী। তাই এই হাদিসটি মুরসাল। সাঈদ বিন মুসাইয়েব বলেছেন, এই আয়াতটি ইহুদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলতো, মক্কার হজ ওয়াজিব নয়। সাঈদ বিন মনসুর এবং ইবনে জারীর, জুহাকের কথা বর্ণনা করে বলেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদেরকে একত্রিত করে এক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি স. বলেন, আল্লাহ তোমাদের উপর হজ ফরজ করেছেন, অতএব তোমরা হজ করো। মুসলমানেরা এই হুকুম মেনে নিলেন। কিন্তু ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক, সাবেইন এবং অগ্নিপূজক — এই পাঁচটি দল মানলো না। তখন আল্লাহতায়ালা নাজিল করলেন, 'কেহ প্রত্যাখ্যান করিলে সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ জগতের উপর নির্ভরশীল নহেন'। সাঈদ বিন মনসুর, ইকরামা থেকে বর্ণনা করেন, যখন এই আয়াত নাজিল হলো, 'সে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম তালাশ করে।' তখন ইহুদীরা বললো, আমরা তো মুসলমান। রসুল স. বললেন, আল্লাহ মুসলমানদের উপর হজ ফরজ করেছেন। ইহুদীরা স্বীকার করলো না। বললো, আমাদের উপর হজ ফরজ করা হয়নি। অতঃপর আল্লাহ, 'কেহ প্রত্যাখ্যান করিলে.........।' এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

হজ প্রকৃতপক্ষে সম্পদের প্রাচুর্য এবং শারিরীক সুস্থতার কর্মরূপী কৃতজ্ঞতা। হজ না করা এই নেয়ামতের প্রতি কুফরী। রসুল স. বলেছেন, শরিয়তসম্মত প্রয়োজন, ব্যাধি অথবা অত্যাচারী শাসক কর্তৃক বাধাগ্রস্ত না হয়েও যে হজ তরক করে, সে ইহুদী অথবা খৃষ্টান যেভাবে খুশী মৃত্যুবরণ করতে পারে (আল্লাহ তার কোনো পরওয়া করেন না)। দারেমী মসনদের মধ্যে এবং বাগবী ও ইবনে জাওজী মউজু এর মধ্যে এই হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিসবেত্তাগণ অবশ্য এতে আপত্তি তুলেছেন। হজরত আলীর বর্ণনায় রয়েছে, বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য পাথেয় এবং সওয়ারী যার রয়েছে সে হজ না করলে ইহুদী বা খৃষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে সে দূরে নয়। তিরমিজি।

আল্লাহ্ পৃথিবীবাসীর মুখাপেক্ষী নন। মানুষের ইবাদতের প্রয়োজন থেকে তিনি মুক্ত। যে ইবাদত করবে সে তার আপন কল্যাণের জন্যই করবে। 'মানুষের মধ্যে যাহার............নির্ভরশীল নহেন' পর্যন্ত হজের হুকুমকে যে সমস্ত প্রমাণের

মাধ্যমে গুরুত্ববহরূপে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে — ১. ওয়াজিবের হুকুম বিজ্ঞপ্তিরূপে জানিয়ে দেয়া হয়েছে ২. হুকুম এসেছে নামবাচক বাক্যরূপে ৩. আল্লাহর অবশ্যম্ভাবী অধিকার প্রকাশ করা হয়েছে ৪. প্রথমে হুকুম দেয়া হয়েছে সাধারণভাবে (ওয়া লিল্লাহি আলান্নাস হিজ্জুল বাইত) এবং পরে শর্ত সহযোগে বিশেষ করে দেয়া হয়েছে (মানিস্ তাতাআ ইলাইহি সাবিলা)। দুই হুকুমের একটি পরোক্ষ অন্যটি প্রত্যক্ষ ৫. হজ তরককে কুফর বলা হয়েছে। কারণ কাফেররা হজ করে না ৬. আল্লাহতায়ালার ক্ষমতা ও অমুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করে হজ তরককারীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে ৭. আল্লাহ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে দু'বার, সর্বনাম ব্যবহার করা হয়নি। এতে তাঁর শর্তবিহীন অভাবশূন্যতা সাধারণভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যাতে আল্লাহর সর্বোচ্চ শাস্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

'হিজ্জুল বাইত' অর্থাৎ ওই গৃহের হজ, এর অর্থ ওই একটি গৃহই অর্থাৎ কাবাশরীফ। এ জন্য জীবনে একটিবার মাত্র হজ করা ফরজ হয়েছে। গৃহ একটি, হজও একটি। রসুল স. এরশাদ করেছেন, হজ একবার ফরজ, বেশী করলে তা হবে নফল (অতিরিক্ত)। আহমদ ও নাসাঈ।

কাবা কোনো শামিয়ানা, গেলাফ অথবা মাটি ও পাথরের দেয়ালের নাম নয়। অন্য কোনো স্থানে কাবার আকৃতিতে কোনো গৃহ নির্মাণ করা হলেও তা কেবলা হবে না। বরং কাবা আল্লাহ প্রদত্ত এক আস্বাদ — ধারণাতীত এক অবতরণ, সেখানে আল্লাহতায়ালার জাতী নূরের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। প্রকাশ্যতঃ কাবা সৃষ্ট বস্তু এবং জড়জগতে দৃশ্যমান। কিন্তু কাবার হকীকতের রয়েছে অন্য এক আধ্যাত্মিক সংশ্লিষ্টতা, যা জ্ঞান, বুদ্ধি ও ধারণা দ্বারা অননুভব্য। বরং প্রকাশ্যতই কাবাকে অনুভব করা দুরূহ। কাবার নির্দিষ্ট কোনো দিক নেই, এটাও কাবার এক অনন্য মর্যাদা।

কাবার হকীকত বোঝে কার সাধ্য! পবিত্র ওই জাত যিনি সম্ভাব্য জগতকে অবশ্যম্ভাবীতার দর্পণ বানিয়েছেন এবং অনস্তিত্বতাকে অস্তিত্বময়তা দিয়েছেন। হকীকতে কাবার সঙ্গে রয়েছে হকীকতে কোরআন এবং হকীকতে কোরআনের সম্পৃক্তি রয়েছে হকীকতে সালাতের সঙ্গে। নবী রসুলদের মাধ্যমে এই মাকামে পৌঁছে সালেকের (আধ্যাত্মিক পথিকের) পথযাত্রা থেমে যায় এবং ফানা ও বাকা (বিলীনতা ও স্থায়ীত্ব) পরিণতি লাভ করে। এর পরে রয়েছে খালেছ মাবুদিয়াতের মাকাম (মাবুদিয়াতে ছেরফা)। এ মাকামের পথ পরিক্রমণ আত্মিক দৃষ্টিনিক্ষেপের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। পদযাত্রা (আত্মিক) এখানে অচল। ওয়াল্লাহু আলাম।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ○ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

❐ বল, 'হে কিতাবীগণ! তোমরা যাহা কর আল্লাহ যখন উহার সাক্ষী তখন তোমরা আল্লাহের নিদর্শনকে কেন প্রত্যাখ্যান কর?'

❐ বল, 'হে কিতাবীগণ! যখন তোমরাই সাক্ষী তখন যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহের পথকে বাঁকা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে কেন উহা হইতে ফিরাইয়া দাও? তোমরা যাহা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।'

জেনে অস্বীকার করা সর্বাপেক্ষা গর্হিত কাজ। তাই বলা হচ্ছে, মোহাম্মদ স. যখন হজ ফরজ হওয়ার দাবীকে সত্য বলে প্রচার করছেন, তখন হে আহলে কিতাবগণ। কেনো তোমরা সত্য গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছো।

আল্লাহ্ তোমাদের অবিশ্বাস এবং কিতাব পরিবর্তনের গর্হিত কাজের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। সত্য গোপন করার অপরাধে তোমরা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য। হে নবী! আপনি বলে দিন, যে পথ আল্লাহর সন্নিকটবর্তী করে, সেই ইসলামের পথ গ্রহণ করতে তোমরা বাঁধার সৃষ্টি করছো কেনো? তোমরা চাও আল্লাহতায়ালার পথ বঙ্কিম হোক। তোমাদের এই অভিপ্রায় আযাবকে অপরিহার্য করেছে।

ইহুদীরা বলতো, তাদের ধর্মমত চিরস্থায়ী। মুমিনদের মধ্যে তারা অনৈক্য সৃষ্টি করতে সচেষ্ট থাকতো। তওরাতে উল্লেখিত রসুলে পাক স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীকে বিকৃতরূপে উপস্থাপিত করতো। আউস ও খাজরাজ গোত্রের অতীতের শত্রুতাকে টেনে এনে তাদেরকে গোত্রীয় দ্বন্দ্বে লিপ্ত করার চেষ্টা করতো। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, মুখে স্বীকার না করলেও তোমরা অবশ্যই জানো, ইসলামই আল্লাহতায়ালার প্রকৃত দ্বীন এবং রসুল পাক স.ই সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর — একথা লিখিত রয়েছে তোমাদেরই তওরাতে।

ইবনে ইসহাক, আবু শাইখ এবং ইবনে জারীর জায়েদ র. থেকে মুরসাল হাদিস বর্ণনা করেছেন — বাগবী বলেছেন, সাম্মাস বিন কায়েস ইহুদীদের মধ্যে শক্ত কাফের ছিলো। সে মুসলমানদেরকে অপবাদ দিতো। সে একদিন এক মজলিশে আউস এবং খাজরাজ গোত্রের কিছু লোককে সহৃদয় কপোকথনে লিপ্ত দেখে হিংসায় জ্বলতে শুরু করলো। ইসলাম পূর্ব যুগে আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা বিবাদ বিসংবাদে লিপ্ত ছিলো। ইসলাম তাদেরকে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছে। সাম্মাস প্রচন্ড রাগান্বিত হয়ে তার গোত্রের লোকের কাছে বলতে লাগলো এ সমস্ত লোক তো কখনো একত্রিত হয়নি। তাদের একত্রিত সভায়

আমাদের উপস্থিতির সুযোগ কোথায়? সাম্মাসের এক সাথী বললো, উভয় সম্প্রদায়ের গোত্র-গৌরবের উত্তেজনাবর্ধক পরস্পরবিরুদ্ধ অনেক কবিতা রয়েছে, যাও ওই সভায় গিয়ে তুমি ওই কবিতাগুলো শুনিয়ে এসো। সাম্মাস তার কথামত তাঁদের কাছে গিয়ে বুয়াস যুদ্ধের সময়ের চরম উত্তেজক কবিতাগুলো আবৃত্তি করতে লাগলো। জ্বলে উঠলো দ্বন্দ্বমুখরতার আগুন। শুরু হলো রোষতপ্ত বাদানুবাদ। সকলেই লিপ্ত হয়ে পড়লো গোত্রগৌরব প্রকাশে।

আউস গোত্রের এক ব্যক্তির নাম আউস বিন কিবতী। তিনি ছিলেন হারেসার বংশোদ্ভূত। অপরদিকে খাজরাজ গোত্রভূত বনী সালমার বংশের একজন ছিলেন জব্বার বিন সাখার। মুখোমুখী দাঁড়ালেন দু'জন। একজন অপরজনকে বলতে লাগলেন, আমরা জঙ্গে বুয়াসের ঘটনা পুনর্জীবিত করতে প্রস্তুত। পুনরায় শক্তি পরীক্ষা হোক। মদীনার বাইরে হেরা নামক স্থানে যুদ্ধ হবে। উভয় গোত্রই তখন রণধ্বনি দিতে দিতে হেরার দিকে চললো। সংবাদ পেয়ে মোহাজিরদের একটি দল নিয়ে সেখানে হাজির হলেন রসুলে পাক স.।বললেন, হে ইসলামী দল! আমি তো এখনো বর্তমান। আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। অতীত মূর্খতাকে নিভিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের পরস্পরকে করে দিয়েছেন পরস্পরের বন্ধু। মূর্খতার উচ্চারণকে প্রশ্রয় দিয়ে তোমরা কি আগের মতো কাফের হয়ে যাবে? আল্লাহকে ভয় করো! আল্লাহর ভয়ে ভীত হও! রসুল পাক স. এর কথা শুনে সংবিত ফিরে পেলো সকলে। বুঝতে পারলো শয়তানই তাঁদেরকে প্ররোচিত করেছে। তখন তাঁরা একে অপরকে জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলেন, তওবা করলেন এবং রসুল স. কে অনুসরণ করে ফিরে এলেন মদীনায়।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০০, ১০১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ۝ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

❒ হে বিশ্বাসিগণ! যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তোমরা যদি তাহাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর তবে তাহারা তোমাদিগকে বিশ্বাসের পর আবার সত্য প্রত্যাখ্যানকারীতে পরিণত করিবে।

তাফসীরে মাযহারী/২৬৬

❒ আল্লাহের আয়াত তোমাদের নিকট পাঠ করা হয় এবং তোমাদের মধ্যেই তাঁহার রসুল রহিয়াছে; তবে কিরূপে তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করিবে? কেহ আল্লাহকে অবলম্বন করিলে সে সরল পথে পরিচালিত হইবে।

ইমানদাদের প্রতি হেদায়েত হচ্ছে, তাঁরা যেনো ইহুদী সাম্মাস ও তার সঙ্গীদের প্ররোচনায় প্রভাবান্বিত না হয়। এ রকম করলে বিশ্বাসী উত্থানের পর অবিশ্বাসী পতন অনিবার্য।

জায়েদ বলেন, হজরত জাবের বলতেন, আমি ওই দিনের পূর্বে কোনোদিন এতো শংকা ও আনন্দ অনুভব করিনি।

পূর্বের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদী সাম্মাস বিন কায়েস সম্পর্কে। বলা হয়েছে, হে নবী! আপনি আহলে কিতাবদেরকে জিজ্ঞেস করুন (কুল ইয়া আহলাল কিতাব)। সরাসরি আল্লাহপাক আহলে কিতাবদেরকে সম্বোধন করেননি। তারা এর উপযুক্তও ছিলো না। তবে উদ্দেশ্য ছিলো তারাই। এভাবে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্য যেমন সফল হয়েছে তেমনি ইমানদারদের মহত্ব ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ফারইয়ানী ও ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, মূর্খতার যুগে আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। ইসলাম গ্রহনের পর তাঁরা হয়ে গিয়েছিলেন এক। কিন্তু পূর্বস্মৃতি তখনও অবশিষ্ট ছিলো। একদিন তারা সকলে মিলে বসেছিলেন এক সভায়। হঠাৎ শুরু হলো পূর্বশত্রুতার আলোচনা। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তাঁরা। অস্ত্র ধারণ করলেন একদল অপরদলের বিরুদ্ধে। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। এখানে বিস্ময়বোধক প্রশ্নের মাধ্যমে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী পাঠ করা হচ্ছে। রসুল স.ও স্বয়ং উপস্থিত। তিনি সদুপোদেশ দিচ্ছেন। দ্বিধা সন্দেহের অপনোদন করছেন। তবুও হে ইমানদারেরা তোমরা কি সতর্ক হবে না!

হজরত কাতাদা বলেছেন, এই আয়াতে হেদায়েতের অবলম্বন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে দু'টি বিষয় - আল্লাহ্‌র কিতাব ও আল্লাহ্‌র রসুল। রসুল স. অন্তরাল গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র কিতাব এখনো বিদ্যমান।

আমি বলি, কিয়ামত পর্যন্ত যে সমস্ত নায়েবে নবী (নবীর প্রতিনিধি) আসবেন তাঁরা তো সকল যুগেই বিদ্যমান। তাঁরাই রসুল স. এর স্থলাভিষিক্ত। হজরত জায়েদ বিন আরকাম্‌ বলেছেন, একবার রসুল স. বললেন, হে মানবমন্ডলী! শোনো। আমি মানুষ, অতিসত্ত্বর আমার প্রতিপালকের দূত এসে পড়বে। আমি তাঁর আমন্ত্রন গ্রহণ করবো। রেখে যাবো দু'টি মহৎ বস্তু। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব, যা হেদায়েত ও নূর। তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কোর। দ্বিতীয় বস্তু আমার আহলে বাইত। আমি আমার আহলে বাইত সম্পর্কে তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্র কিতাবই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছানোর কারণ। কিতাবে উল্লেখিত নির্দেশানুসারে যে চলবে সে হেদায়েত পাবে। যে চলবেনা সে হবে পথভ্রষ্ট। মুসলিম।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, এমন দু'টি বস্তু আমি তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। ওই দু'টি বস্তু একটি অন্যটি অপেক্ষা অধিক সম্মানিত। একটি হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব। যা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত একটি ঝুলন্ত রশি, যা ধারণ করে আসমানে পৌছানো যায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার আহলে বাইত। হাউজে কাউসার পর্যন্ত পৌছানোর আগে একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। একারনেই তোমাদের অনুধাবন করা উচিত যে, কিভাবে এ দু'টির প্রতিনিধিত্ব করছো।

তিরমিজির অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, আমি আরাফার দিন রসুল স. কে তাঁর উটনীর উপর উপবিষ্ট অবস্থায় ভাষণ দিতে দেখেছি। তিনি বলছিলেন, হে মানুষেরা। আমি এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা ধারণ করলে তোমরা কখনো পথবিচ্যুত হবেনা। আল্লাহ্র কিতাব ও আমার আহলে বাইত।

আমি বলতে চাই, আহলে বাইতকে ধারণের আদেশ দানের উদ্দেশ্য এই যে, আহলে বাইতই বেলায়েতের সিলসিলার পথ প্রদর্শকগণের নেতা। পূর্বাপর কেউই তাঁদের অসীলা ব্যতীত বেলায়েতের স্তরে উন্নীত হতে পারবেনা। প্রথমে হজরত আলী এবং পরে তাঁর দুই সন্তান (ইমাম হাসান, ইমাম হোসেইন) এরপরে ইমাম হাসান আসকরী পর্যন্ত। শেষে গউসুস্ সাকালাইন মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জীলানী পর্যন্ত এই সিলসিলা প্রবহমান। এরকম বর্ণনা করেছেন ইমাম মোজাদ্দেদে আলফেসানী র.। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন আউলিয়া এবং ওলামায়ে উম্মতগণ। তাঁরা সকলেই আহলে বাইতের স্থলবর্তী। রসুল স. এরশাদ করেছেন, ওলামাগণ নবীগণের প্রতিনিধি।

আল্লাহ্র নির্দেশিত এই পথই সরল পথ। এই পথ যে ধারণ করবে, সে নিশ্চয়ই হেদায়েত পাবে।

বাগবী মুকাতিল বিন হাব্বান এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন, অজ্ঞতার যুগে আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় যুদ্ধরত ছিলো। হিজরতের পর রসুল স. তাঁদের মধ্যে সন্ধি করে দিলেন। দুই দলই মুসলমান হয়ে গেলো এবং সন্ধির সম্মান মেনে চললো। ঘটনাক্রমে কিছুদিন পর শায়লাবা বিন গানাম আওসী এবং আসাদ বিন জুরারাহ্ খাজরাজী নিজ নিজ দলের আভিজাত্য বর্ণনায় লিপ্ত হয়ে পড়লো। আওসী ব্যক্তি বললেন, আমাদের রয়েছে এমন চার ব্যক্তি যাদের মতো কেউ তোমাদের দলে নেই — ১. খাজিমা ইবনে সাবিত যিনি একাই দুই সাক্ষীর সমান ২. হানযালা

— শাহাদতের পর যাঁকে ফেরেশতারা গোসল করিয়েছেন ৩. আসিম ইবনে সাবিত যিনি ছিলেন দ্বীনের পূর্ণ সাহায্যকারী এবং ৪. সা'দ বিন মুআজ যাঁর মৃত্যুতে প্রকম্পিত হয়েছিলো আল্লাহ্‌র আরশ। বনু কোরাইজাদের সম্পর্কে দেয়া তাঁর সিদ্ধান্ত ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার পছন্দনীয়। এরপর খাজরাজী বলতে শুরু করলেন, আমাদের মধ্যেও এমনি চার মহাজন রয়েছেন যাঁদের মতোন তোমাদের দলে কেউ নেই। তাঁরা কোরআন শরীফকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন। তাঁরা বিশুদ্ধ ক্বারী এবং বিজ্ঞ, জ্ঞানী। এই চারজন হচ্ছেন — ১. উবাই ইবনে ক্বাব ২. মুআজ ইবনে জাবাল ৩. সাঈদ বিন সাবিত ৪. আবু জায়েদ। এ ছাড়া আমাদের মধ্যে রয়েছেন আনসারদের খতীব ও নেতা সা'দ বিন ওবাদা। ক্রমেই বিতর্ক উঠলো তুঙ্গে। শুরু হলো যুদ্ধোন্মাদনা। রণসজ্জায় প্রবৃত্ত হলেন সকলে। সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন রসুলে পাক স. তখন এই আয়াত অবতীর্ন হলো।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০২

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং দেখিও তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হইয়া মরিও না।

আবদুর রাজ্জাক, ফারইয়ানী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া তাঁদের তাফসীরে, তিবরানী তাঁর মো'জামে, হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে এবং আবু নাঈম তাঁর হুলিয়ায় হজরত ইবনে মাসউদ থেকে মওকুফ বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, হক ও তাকওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহর আহকামের অনুসরণ করা। অবাধ্য না হওয়া। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অকৃতজ্ঞ না হওয়া। স্মরণ রাখা। বিস্মৃত না হওয়া। বাগবী হজরত ইবনে মাসউদ থেকে কেবল প্রথম অংশটুকু বর্ণনা করেছেন (আহকামের অনুসরণ করা। অবাধ্য না হওয়া)। আবু নাঈম এই হাদিসটিকে বলেছেন মারফু। আমি বলি, স্মরণ করা ও বিস্মৃত হওয়া কলবের ফানা হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অনুসরণ করা, অবাধ্য হওয়া, কৃতজ্ঞচিত্ত হওয়া, অকৃতজ্ঞ থাকা – এ সমস্তের ভিত্তিও নফসের ফানা হওয়া না হওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত ইমান এবং অন্তরের প্রশান্তির উপরই পূর্ণ অনুসরণ এবং স্থায়ী কৃতজ্ঞতার ভিত্তি। অতএব এই আয়াতের অভিপ্রায়ানুসারে কামালতে বেলায়েত অর্জন করা ওয়াজিব। আয়াত নাজিলের উদ্দেশ্য এটাই। আউস ও খাজরাজদের গোত্র গৌরব অসুস্থ প্রবৃত্তির পরিচায়ক। এই কারণেই অভ্যন্তরীন ব্যাধি থেকে প্রবৃত্তিকে পবিত্র করে চরিত্রের পূর্ণতা সাধন করতে, আল্লাহর ভয় অন্তরে প্রতিষ্ঠিত

করতে এবং সার্বক্ষণিক জিকির দ্বারা কলব ও নফসকে পবিত্র করতে হুকুম দেয়া হয়েছে।

মুজাহিদ ব্যাখ্যা করেছেন এরকম, আল্লাহর পথে জেহাদ করার হক আদায় করো। আল্লাহর হুকুম মান্য করো। এ সমস্ত করতে কেনো দোষারোপকারী যেন বাধা সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়। আল্লাহর জন্যে ন্যায়ানুগতা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হও, যদিও তা তোমাদের পিতামাতা ও সন্তানদের বিরুদ্ধে যায়। হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে, বান্দা ওই সময় পর্যন্ত তাকওয়ার হক আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জবানকে হেফাজত করবে।

আমি বলি, মুজাহিদ এবং হজরত আনাস ওই পথেরই বর্ণনা করেছেন, যার গতি কামালতে বেলায়েতের দিকে। স্বল্পাহার, স্বল্পনিদ্রা, নিরবচ্ছিন্ন জিকির, অনর্থক কথপোকথন থেকে জিহবাকে সংযত রাখা, সাধারণ মানুষের সাথে প্রয়োজনাতিরিক্ত সঙ্গ দান না করা এবং আল্লাহর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেপরোয়া হওয়াই কামালতে বেলায়েত লাভের উদ্দেশ্য।

বাগবী লিখেছেন, তাফসীরকারগণের বর্ণনা, এই আয়াত নাজিল হলে সাহাবীগণ চিন্তিত হলেন। আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! এই হুকুম পালন করার যোগ্যতা কার রয়েছে? এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা নাজিল করলেন, 'আল্লাহকে ভয় করো তোমাদের সাধ্যানুসারে।' এই আয়াত দ্বারা আগের আয়াতটি রহিত করে দেয়া হয়েছে। মুকাতিল বলেছেন, আলে ইমরানের এই আয়াত ব্যতীত অন্য কোনো আয়াত রহিত হয়নি।

আমি বলি, এ কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাকওয়ার হক রহিত হয়ে গিয়েছে। কেননা অহংকার, রোষ, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, দুশ্চরিত্রতা, পৃথিবী-আসক্তি, জিকির বিমুখতা, সৃষ্টির প্রতি অতিআকর্ষণ — এগুলো সর্বাবস্থায়ই হারাম। এই সমস্তের হুকুম রহিত হওয়ার ধারণা অসম্ভব। তাই এ সমস্ত বুজুর্গবৃন্দের উক্তি সমূহের উদ্দেশ্য এই যে, রাতারাতি সকল প্রবৃত্তির পীড়া থেকে মুক্ত হওয়া মানুষের সাধ্যভূত নয়। তাই এমনভাবে আল্লাহর পথে সাধনায় লিপ্ত থাকতে হবে যেনো বিশুদ্ধ অন্তর ও পরিশুদ্ধ প্রবৃত্তির অধিকারী মহাজনদের সংসর্গের মাধ্যমে ক্রমাগত উন্নত হওয়া যায়। পূর্ণত্ব লাভ একদিনেই সম্ভব নয় বলে 'সাধ্যানুসারে' এ কথা বলা হয়েছে এবং চেষ্টা সাধনাকে ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি সাধনাবিমুখ এবং প্রবৃত্তির অনুসারী, সে অবাধ্য। অন্তরের অসৎ কামনা বাসনা প্রকাশ করা হোক অথবা নাই হোক, আল্লাহতায়ালা সকল কিছুর হিসাব গ্রহণ করবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। নফসের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পীড়া দূর করতে যাঁরা সচেষ্ট, তাঁরা পূর্ণতার প্রান্তে পৌছান অথবা নাই পৌছান তাঁরা আল্লাহতায়ালার ফরজ হুকুম

পালনে রত আছেন। আশা করা যায় পূর্ণতায় না পৌঁছতে পারেলেও তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমা লাভ করবেন।

এরশাদ হচ্ছে, মৃত্যুর আগেই পূর্ণ মুসলমান হও। আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ো না। সমর্পিত হও, আল্লাহতায়ালার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকো — এমতাবস্থায় যেনো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারো। এখানে মরতে নিষেধ করা হয়নি। মৃত্যুর পূর্বে ইসলামের সাজে পূর্ণসজ্জিত হতে বলা হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, হে মানুষ! আল্লাহ্কে প্রকৃত অর্থে ভয় করো। অতঃপর 'হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, যেমন ভয় করা উচিত' এই আয়াত পাঠ করে পুনরায় বললেন, এক টুকরা জাক্কুম (দোজখীদের খাদ্য) পৃথিবীতে পতিত হলে পৃথিবীর অধিবাসীদের জীবন চিরতরে তিক্ত হয়ে যেতো। অতএব ওই ব্যক্তির কি অবস্থা হবে যার খাদ্য হবে জাক্কুম। বর্ণনাকারী তিরমিজি হাসিদটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০৩

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ۖ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ
وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

❐ এবং তোমরা সকলে আল্লাহের রশি দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা। তোমাদের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহকে স্মরণ কর ঃ তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেন। ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তোমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই রূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা সৎপথ পাইতে পার।

আল্লাহের রশি অর্থ ইসলাম। অন্যত্র আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শয়তানকে অমান্য ক'রে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে ধারণ করে সুদৃঢ় শৃংখল – যা অবিচ্ছিন্ন।' আল্লাহের রশি অর্থ কিতাবুল্লাহও হতে পারে। কেননা রসুল স. বলেছেন, আল্লাহর কিতাব এমন এক রশি যা বিস্তৃত হয়ে রয়েছে আকাশ

ও পৃথিবীতে। ওই রশি ধারণ করে মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারে। এই রশি সকলে সম্মিলিতভাবে যেনো ধারণ করে, সেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সম্মিলিতভাবে অর্থ আল্লাহর কালামের বিস্তৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে অথবা উম্মতের ঐকমত্যের মাধ্যমে। ঐকমত্যবিরোধী অভিমতসমূহ অভিপ্রেত নয়। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তিনটি বিষয় আল্লাহতায়ালার পছন্দ এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ। তোমরা আল্লাহতায়ালার ইবাদত করো, তাঁর সমকক্ষ বানিয়ো না। সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। আর তোমাদের শাসকবৃন্দের কল্যাণ কামনা করো। এ তিনটি বিষয়কে আল্লাহ পছন্দ করেন এবং অপছন্দ করেন বাচালতা, সম্পদের অপচয় এবং অধিক যাচ্ঞাপ্রবণতাকে। মুসলিম, আহমদ।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত হবে না। আল্লাহর হাত রয়েছে যুথবদ্ধতার উপর। যে এই যুথবদ্ধতা (জামাত) থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, সে দোজখে পতিত হবে। তিরমিজি। হজরত ইবনে ওমর আরো বর্ণনা করেন, সবচেয়ে বড় জামাতের অনুসারী হও। দলবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি দোজখী। ইবনে মাজা।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত মুফাসসির কুঃ এর বিবরণ থেকে মনে হতে পারে, যে দলের লোকসংখ্যা বেশী সে রকম দলই বড় দল, এরকম অর্থ ভুল। কেননা সত্য সংখ্যাধিক্যনির্ভর নয়। সংখ্যাধিক্য বোঝানো উদ্দেশ্য হলে হাদিস শরীফে আজিম শব্দের স্থলে আকবর শব্দটি উল্লেখিত হতো। আজিম অর্থ আজমতওয়ালা অর্থাৎ মর্যাদামন্ডিত। ওয়াল্লাহু আলাম।

হজরত মুআজ বিন জাবাল বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ছাগ শিশুই বাঘের আক্রমণস্থল হয়, যে হয়ে পড়ে দলবিচ্ছিন্ন। দলবিচ্ছিন্ন মানুষও তেমনই বাঘরূপী শয়তানের শিকার হয়। সুতরাং দলবদ্ধ থাকো। বেঁচে থাকো এদিক ওদিক ছোটাছুটি থেকে। আহমদ।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে যুথবিচ্ছিন্ন, তার স্কন্ধদেশ ইসলামের রশি থেকে মুক্ত। আহমদ, আবু দাউদ।

সম্মিলিতভাবে আল্লাহর কিতাবকে ধারণ করার নির্দেশ এসেছে। আর ধারণ করতে হবে সুদৃঢ়ভাবে। সম্পূর্ণ কিতাবকেই ধারণ করতে হবে। কিছু অংশ মান্য করা এবং কিছু অংশ অমান্য করা দৃঢ়তাবিরোধী। কেউ মানবে কেউ মানবে না, এরকমও নয়। দৃঢ়ভাবে সম্পূর্ণ কিতাবকে সবাই মিলে ধারণ করতে হবে। আহলে কিতাবদের মতো মতবিরোধজাত দ্বন্দ্ব থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বনী ইসরাইলের যে অবস্থা হয়েছে, আমার উম্মতের সে অবস্থাই হবে, যেমন দুই পায়ের

জুতা সমমাপের হয়। তারা যদি মায়ের সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, তবে এরাও হবে। বিশ্বাসগত দিক থেকে তারা ছিলো বাহাত্তরটি দল। আর আমার উম্মতের দল হবে তিয়াত্তরটি। তিয়াত্তরের মধ্যে একটি দল ছাড়া অন্য দলগুলো দোজখী। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল। সত্য দল কোনটি? রসুল স. বললেন, যারা আমার ও আমার সাহাবীদের দলভুক্ত। তিরমিজি। আহমদ ও আবু দাউদ, হজরত মুয়াবিয়া রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিয়াত্তর দলের মধ্যে বাহাত্তরটি দোজখী এবং একটি জান্নাতী। ওই একটি দলই মুক্তিপ্রাপ্ত। অতিসত্ত্বর আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতিপয় দলের আবির্ভাব হবে, যারা প্রবৃত্তিপীড়িত এবং ধ্বংসাভিমুখী। যেমন, কোনো বিশেষ রোগগ্রস্ত কুকুর যাদের শরীরের রগ ও সকল গ্রন্থি ব্যাধি জর্জরিত।

আমি বলি, রসুল স. ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে ভ্রষ্ট দলগুলোর অস্তিত্ব ছিল না। প্রথম খলিফাত্রয় হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানের যুগেও ছিলো না। হজরত ওসমানের খেলাফতের শেষ দিকে মিশরবাসীদের মধ্য থেকে শত্রুতা শুরু হয়। হজরত মুয়াবিয়ার সময় থেকে খেলাফত প্রসঙ্গে প্রথম মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। প্রথম বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হারুরীয়া গোত্র অর্থাৎ খারেজী সম্প্রদায়। হজরত আলীর বিরুদ্ধাচরণকারী ছিলো তারা। এর পরের বিরুদ্ধাচরণকারী রাফেজী আবদুল্লাহ বিন সাবাহ ও তার দল। তাবেইনদের যুগে উদ্ভুত হয় মোতাজিলা মতবাদ। তারা দর্শন শাস্ত্রে অনুরাগী হয়ে প্রতর্কপ্রবণতায় প্রবিষ্ট হয়েছিলো। ছেড়ে দিয়েছিলো কিতাবুল্লাহর প্রকাশ্য আয়াত, রসুল স. এর সুন্নত এবং সলফে সালেহীনের আদর্শ। তারা ছিলো ভ্রষ্টতানুসারী এবং অসৎ প্রবৃত্তির অনুকারক।

আয়াতে আনসারদের উদ্দেশ্য করে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহরাজী স্মরণ করো। ভেবে দেখো, তোমাদের পারস্পরিক শত্রুতা কিভাবে বিদুরিত করে দিয়েছেন তিনি। তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সম্প্রীতি। তাই পরিদৃষ্ট হচ্ছে তোমাদের এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় ছিলো একই বংশভূত। একটি হত্যাকান্ডের কারণে তাদের মধ্যে শুরু হয় বিসংবাদ। যুদ্ধ চলতে থাকে এক'শ বিশ বছর ধরে। ইসলাম তাদের শত্রুতার আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। রসুল স. এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রেমময় ভ্রাতৃত্ববন্ধন। এই প্রেমবন্ধনের স্বরূপ বোঝা যাবে একটি ঘটনায়। ঘটনাটি হচ্ছে—

কবিলায়ে বনী আমর বিন আউফ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিলো সুয়ায়িদ বিন সামেত। প্রতাপ ও আভিজাত্যের কারণে মানুষ তাকে সাধুপুরুষ বলতো। হজ অথবা ওমরাহ উপলক্ষে তিনি মক্কায় গিয়ে রসুল স. এর সাক্ষাত পেলেন। রসুল স.

তাঁকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন। সুয়ায়িদ বললেন, আমার কাছে যা আছে তোমার নিকটও তা আছে কি? রসুল স. বললেন, কি আছে তোমার কাছে? সুয়ায়িদ বললেন, লোকমানের পুস্তিকা। রসুল স. বললেন, পাঠ করো দেখি। সুয়ায়িদ পাঠ করলেন। রসুল স. বললেন, বেশ! কিন্তু আমার কাছে যা আছে তা এর চেয়ে অনেক উত্তম। আমার রয়েছে কোরআন, যা নূর ও হেদায়েত। তিনি স. কোরআন পাঠ করলেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সুয়ায়িদ বললেন, হ্যাঁ। উত্তমই বটে! এরপর তিনি মদীনায় ফিরে গেলেন এবং কিছু দিন পর যুদ্ধ শুরু হলে খাজরাজ গোত্রের লোক তাঁকে হত্যা করে ফেললো। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, মুসলমান অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়েছে। তখন আবুল হাসির আনাস বিন রাফে, বনী আশহালের একটি দল নিয়ে কোরাইশদের সাহায্য অর্জনার্থে মক্কায় উপস্থিত হলো। সেই দলে ছিলেন আয়াছ বিন মুআজও। রসুল স. তাদেরকে বললেন, তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছো, তার চেয়ে উত্তম বস্তুর সংবাদ তোমরা জানতে চাও কি? তারা বললো, কী সেই সংবাদ? তিনি স. বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রসুল। আমি এই আহবানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি যে, হে মানুষ আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক কোর না। আল্লাহ আমার উপর কিতাব নাজিল করেছেন। রসুল স. কোরআন থেকে পাঠ করে শোনালেন। যুবক আয়াছ বিন মুআজ বলে উঠলেন, হে আমার সম্প্রদায়! যে উদ্দেশ্যে তোমরা এসেছো, আল্লাহর কসম! এই বানী তদপেক্ষা উত্তম। একথা শুনে আবুল হাসির এক মুষ্টি কংকর ছুঁড়ে মারলো আয়াছের মুখে। বললো, রাখো তোমার কথা। আমরা অন্য উদ্দেশ্যে এসেছি। আয়াছ নির্বাক হয়ে গেলেন। রসুল স. উঠে দাঁড়ালেন। তারা সকলে ফিরে গেলো মদীনায়। সেখানে শুরু হলো ভয়াবহ যুদ্ধ — জঙ্গে বুয়াস। এর কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করলেন আয়াছ। অন্য অনেক স্থানের লোকের মতো মদীনাবাসীরাও প্রতি বছর মক্কায় যেতো। এক হজ্বের সময় আনসারদের একটি দল বনী তাই এবং খাজরাজী গোত্রের সঙ্গে মিলিত হলো আকাবা নামক স্থানে। খাজরাজীদের দলে ছিলেন ছয়জন, আসাদ বিন জুরারাহ, আউফ বিন হারেস, রাফে বিন মালেক,আমর বিন সাওয়াদ, উকবা বিন আমের এবং জাবের বিন আবদুল্লাহ। আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা ছিলো তাঁদের কল্যাণ হোক।

রসুল স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের? তাঁরা উত্তর দিলেন, খাজরাজ গোত্রের। তিনি স. বললেন, ইহুদীরা কি তোমাদের বন্ধু? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা কি আমার কথা শুনবে? তাঁরা বললেন, কেনো শুনবো না? সবাই বসে পড়লেন। রসুল স. তাদেরকে আল্লাহর প্রতি এবং ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন। কোরআন পাঠ করে শোনালেন। তাঁরা মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কারণটি ছিলো এই —

ইহুদীরা ছিলো আহলে কিতাব এবং জ্ঞানী। আর তাঁরা ছিলেন মূর্তিপূজক। একবার ইহুদীদের সঙ্গে বচসা হলো তাঁদের। তখন ইহুদীরা বললো, অতিসত্বর একজন নবী আবির্ভূত হবেন। আমরা তাঁর অনুসারী হবো এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদেরকে আদ সম্প্রদায়ের মতো ধ্বংস করবো। রসুল স. এর কথা শুনে খাজরাজীদের মনে পড়ে গেলো সেই ঘটনা। পরস্পর তাঁরা বালাবলি করতে লাগলেন, দেখো দেখো ইনিই সেই নবী যাঁর প্রসঙ্গ তুলে ইহুদীরা আমাদেরকে ভয় দেখাতো। আমাদের উচিত ইহুদীদের আগেই তাঁর অনুসারী হওয়া। তারা মুসলমান হয়ে গেলেন এবং আরজ করলেন, আমরা খাজরাজ ও আউস সম্প্রদায় চরম শত্রুমনোভাবাপন্ন এবং প্রায়শই যুদ্ধরত থাকি। এতো শত্রুতা আর কোনো গোত্রের মধ্যে নেই। আমরা আশা করি, আল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে একতাবদ্ধ করবেন। আমরা সত্বর তাঁদের কাছে ফিরে গিয়ে ইসলামের প্রতি আহবান জানাবো। আল্লাহপাক যদি আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে মিলিয়ে দেন তবে আমাদের নিকট সর্বাধিক সম্মানীয় আপনি ছাড়া আর কেউ হবেন না। তাঁরা ফিরে গেলেন মদীনায়। মদীনাবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আহবানের অনুরনণ স্পন্দিত হতে লাগলো মদীনার গৃহে গৃহে। প্রতি গৃহে তাঁর স. এর প্রসঙ্গ ও প্রশংসা নিরন্তর ধ্বনিত হয়ে চললো।

পরের বছর হজ্বের মওসুমে মক্কায় উপস্থিত হলেন বারোজন আনসার। খাজরাজ গোত্রের দশজন – আসাদ বিন জুররাহ্, আউফ বিন আফরাহ্, মুআজ বিন আদরাহ্, রাফে বিন মালেক আজলানী, জাকওয়ান বিন আবদে কায়েস, উবাদা বিন সামেত, জায়েদ বিন সা'লাবা, আব্বাস বিন উবাদা, উকবা বিন আমের, আতিয়া বিন আমের। বাকি দু'জন আউস গোত্রের, আবুল হাইসাম বিন তাইহান এবং আউস আমের বিন সায়দা। প্রথম আকাবা প্রান্তরে তাঁরা রসুল স. এর সঙ্গে মিলিত হলেন। সেখানে তারা বায়াত গ্রহণ করলেন। মহিলাদের বায়াতও সংঘটিত হলো। তাঁরা এ মর্মে বায়াত গ্রহণ করলেন যে, তাঁরা শিরিক ও ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন না। রসুল স. বললেন, যদি তোমরা এর অঙ্গীকার পূর্ণ করো তবে জান্নাত লাভ করবে। যদি ত্রুটি করো তবে গোনাহের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) স্বরূপ শাস্তি হবে পৃথিবীতেই। পাপের পর্দা যদি পড়ে যায়, তবে তা আল্লাহতায়ালার বিবেচনাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন, ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো যুদ্ধের আগে। প্রত্যাবর্তনের সময় রসুল স. মুসয়াব বিন উমায়ের বিন হাশেম বিন আবদে মনাফকে তাঁদের সঙ্গী করে দিলেন। তাঁকে দায়িত্ব দিলেন — তিনি কোরআন শিক্ষা দিবেন ও ইসলামের হুকুম আহকাম বোঝাবেন। মদীনায় তিনি গিয়ে উঠলেন আসাদ বিন জাররাহ এর গৃহে। সেখানে তিনি খ্যাত হলেন মাক্বরী (কোরআন পাঠ দানকারী) নামে।

কিছুদিন পরের ঘটনা। আসাদ বিন জাররাহ্ মুসআবকে সঙ্গে নিয়ে বনী জুফারের এক বাগানে প্রবেশ করে বসে পড়লেন। অন্যান্য মুসলমানরাও সমবেত হলেন। অন্য দিকে সা'দ বিন মুআজ আসাদ বিন হুদায়েরকে বললো, এই দুইজন আমাদের এখানে এসে আমাদের নিরীহ লোকদেরকে দলে ভেড়াতে চায়। তুমি ওই দুইজনকে বকাবকি করে বের করে দাও। আসাদ আমার মামাতো ভাই। নয়তো আমি নিজেই বলতাম, তোমার প্রয়োজন হতো না।

সা'দ এবং উসাইয়েদ বনী আশহালের সর্দার ছিলো। তারা ছিলো মুশরিক। উসায়েদ একটি ছোট বল্লম নিয়ে মুসআব ও আসআদের নিকট গেলো। বাগানে পাশাপাশি বসে ছিলেন আসাদ এবং মুসআব। আসাদ বললেন, আগমণকারী ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের নেতা। তাকে মুসলমান করুন। মুসআব বললেন, তিনি আগে এসে বসুন, তারপর আমি কথা বলবো। উসায়েদ সামনে এলো কিন্তু বসলো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গালি দিতে লাগলো। বললো, কেনো এসেছো তোমরা? আমাদের নিরীহ লোকদেরকে ধোঁকা দিচ্ছো কেনো? বাঁচতে চাইলে সরে যাও এস্থান থেকে। মুসআব বললেন, বসুন। আমাদের কথা শুনুন। ভালো লাগলে মেনে নিবেন, না হলে মানবেন না। উসায়েদ বললো, ঠিক আছে। বল্লম মাটিতে গেড়ে বসে পড়লো সে।

মুসআব ইসলামের কথা বললেন। কোরআন পাঠ করে শোনালেন। আনন্দের আভাস ফুটে উঠলো উসায়েদের মুখমন্ডলে। ইসলামের অপার্থিব নূরের ঝলক ফুটে উঠলো তাঁর চেহারায়। বললেন তিনি, সুন্দর তো! এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে হলে কী করতে হবে? তাঁরা বললেন, গোসল করো। পবিত্র বস্ত্র পরিধান করো। তারপর কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে নাও। উসাইয়েদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে গোসল করে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে এলেন। তারপর কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করলেন। তারপর বললেন, আমার সঙ্গে রয়েছে আরেকজন — সা'দ বিন মুআজ। তাকে যদি এপথে আনা যায় তবে তার সম্প্রদায়ের সবাই এসে পড়বে। আমি এখনই গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি — একথা বলে তাঁর বল্লমটি উঠিয়ে নিয়ে উসাইয়েদ সা'দ বিন মুআজের নিকট চলে গেলেন। সা'দ বললেন, কী খবর? উসাইয়েদ বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের মধ্যে মন্দ কিছু পাইনি। আমি প্রতিবাদ করলাম, তারা বললো — আগে শুনুন আমাদের কথা। তারপর যা পছন্দ তাই করবেন। ইতোমধ্যে আমি সংবাদ পেলাম, বণি হারেসা আসাদকে হত্যা করার জন্য বের হয়েছে। আসাদ তোমার মামাতো ভাই। তাকে মেরে তারা চুক্তি ভঙ্গ করতে চায়।

সা'দ রাগান্বিত হলেন। বল্লম হাতে নিয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে দাড়িয়ে বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি কিছুই করোনি। দেখলাম তারা বাগানে আরামে বসে আছে। এখন বুঝলাম আসাদই তোমাকে পাঠিয়েছে। ঠিক আছে আমি নিজেই যাচ্ছি। বাগানে গিয়ে সা'দ, মুসআব এবং আসআদের প্রতি গালি বর্ষণ করতে লাগলো। আর উসাইয়েদকে বললো, আমাকে অপবাদ দিওনা। তুমি এমন কথা বলেছো যা আমরা পছন্দ করি না। মুসআব বললেন, বসুন। আমাদের কথা শুনুন। আমাদের কথা ভালো লাগলে মেনে নিবেন, না হলে আমরাই আপনার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবো। সা'দ বললো, ঠিক আছে। বল্লম মাটিতে গেঁড়ে বসে পড়লো সে। মুসআব ইসলামের কথা বললেন এবং কোরআন থেকে আবৃত্তি করলেন। কোরআনের বাণী হৃদয় স্পর্শ করলো তাঁর। চেহারায় ফুটে উঠলো অপার্থিব জ্যোতি। তিনি বললেন, এধর্মে কিভাবে দাখিল হতে হয়? মুসআব বললেন, গোসল করে পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদাবৃত হয়ে কলেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে দু'রাকাত নামাজ পড়তে হয়। সা'দ উঠে গিয়ে গোসল করে পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে এলেন, কলেমায়ে শাহাদাতের ঘোষনা দিলেন এবং দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। এরপর তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের দিকে রওয়ানা দিলেন। সঙ্গী হলেন উসাইয়েদ বিন হুদায়ের। গোত্রের লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, আল্লাহ্র কসম! সা'দের তো আগের চেহারা আর নেই। সা'দ বললেন, হে বনী আবদে আশহাল! আমার সম্পর্কে তোমাদের ধারনা কী? লোকেরা বললো, আপনি আমাদের অগ্রনী। আপনার অভিমত সম্মানার্হ। আপনার কথা ও কাজ কল্যাণমন্ডিত। সা'দ বললেন, তবে শোনো। তোমাদের সকল পুরুষ ও নারীদের সঙ্গে আমার কথা বলা নিষিদ্ধ যতক্ষন না তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। সা'দের কথা শুনে তাঁর সম্প্রদায়ের সকল নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করলো।

আসাদ রা. এর গৃহে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন হজরত মুসআব রা.। ইসলামের প্রতি আহবান অব্যাহত রাখলেন তিনি। আনসারদের সকল এলাকার নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করলেন। কেবল বনী উমাইয়া বিন জায়েদ, হাতামা, ওয়ায়েল এবং ওয়াকেব গোত্রের লোকেরা মুসলমান হলো না। কবি আবুল কায়েস বিন আসলতের কথা শুনতো তারা। সে ছিলো ইসলামবিরোধী। রসুল স. এর মদীনায় আগমণের পর বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধ শেষ হলে এই গোত্রগুলো মুসলমান হয়েছিলো।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হজ সম্পাদনার্থে সত্তরজন মুসলমান আনসার এবং কতিপয় মুশরিকসহ হজরত মুসআব বিন উমায়ের মক্কায় পৌছলেন। আইয়ামে তাশরিকের সময় দ্বিতীয় আকাবায় রসুল স. এর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাত হয়। তাঁরা সেখানে বায়াত গ্রহণ করেন। এই বায়াতকে দ্বিতীয় আকাবার বায়াত বলা হয়।

ক্বাব বিন মালেক রা. বলেছেন, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হজ তখন শেষ। প্রতিশ্রুত রাত এলো। আমরা আমাদের মুশরিক সাথীদেরকে এ প্রতিশ্রুতির কথা জানাইনি। কেবল একজনকে জানিয়েছিলাম। তার নাম আবু জাবের আবদুল্লাহ বিন আমর। আমরা তাকে বললাম, আপনি সম্মানিত জন। আমাদের নেতাদের মধ্যে একজন নেতা। আমরা চাইনা আপনি আগুনের ইন্ধন হোন। আমরা আপনার এই অবস্থা (মুশরিক অবস্থা) পছন্দ করি না। ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করুন। তিনি গ্রহণ করলেন এবং মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁকে নিয়ে আমরা গভীর রাতে অঙ্গীকার গ্রহণের স্থানে পৌঁছলাম। এক তৃতীয়াংশ রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা চুপিসারে উপস্থিত হলাম আকাবায়। আমরা ছিলাম সত্তর জন পুরুষ, দু'জন নারী — একজন বনী নাজ্জারের উম্মে আম্মারা নুসাইবা বিনতে ক্বাব এবং অন্যজন সালমা গোত্রের উম্মে মানীয় আসমা বিনতে আমর বিন আদ্দীর।

আমরা অপেক্ষা করছিলাম। এক সময় রসুল স. হজরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। হজরত আব্বাস বললেন, হে খাজরাজ গোত্র! তোমরা জানো মোহাম্মদ স. আমাদের সঙ্গে আছেন। এখানে আমরা যারা তাঁর অনুসারী, তাঁকে স. হেফাজত করার দায়িত্ব তাদেরই। তিনি এখানে সম্মানিত এবং সুরক্ষিত। তোমরা যদি তাঁকে নিয়ে যেতে চাও, তবে মক্কাবাসীদের কোপানলে পড়বে। সুতরাং ব্যাপারটি ভেবে দেখো। আমরা বললাম, আপনার কথাতো শুনলাম। এখন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি নিজে কিছু বলুন। আপনার পক্ষ থেকে এবং আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমাদের অঙ্গীকার নিতে চাইলে নিন।

রসুল স. পবিত্র কোরআন পাঠ করলেন। ইসলামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, আমি তোমাদের নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করছি যে, আমরা মদীনায় গেলে তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনকে যেভাবে রক্ষা করে থাকো আমাদেরকেও সেভাবে রক্ষা করবে। এগিয়ে গেলেন বারাহ বিন মারুর। তিনি রসুল স. এর পবিত্র হস্ত ধারণ করে নিবেদন করলেন, আমাদের পরিবার পরিজন অপেক্ষা আপনার হেফাজত অধিক কাম্য। হে আল্লাহর রসুল! আমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করুন। আপনার সঙ্গীদের রক্ষা করার জন্য আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছি—একথা বলতে না বলতেই আবুল হাইসাম বলে উঠলেন, কতিপয় মানুষের নিকট আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। হে আল্লাহর রসুল! এমন তো হবে না যে, সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের পর আল্লাহ আপনাকে বিজয়ী করলে আপনি আমাদেরকে ছেড়ে আপনার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসবেন। রসুল স. মৃদু হাসলেন। বললেন, না। তোমরা আমার। আমিও তোমাদের। তোমরা যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। যাদের সঙ্গে সন্ধি করবে, আমিও সন্ধিবদ্ধ

হবো তাদের সঙ্গে। বারোজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করো তোমরা, যারা হবেন তোমাদের নেতা। হজরত ঈসার হাওয়ারীদের মতো তাঁরা তাদের আপন সম্প্রদায়ের সংরক্ষক হবে। মনোনীত করা হলো বারোজনকে। নয়জনকে খাজরাজদের মধ্যে থেকে এবং তিনজনকে আউসদের মধ্য থেকে।

আসেম বিন আমর বিন কাতাদা বর্ণনা করেন, যখন সকলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে উদ্যত হলেন, তখন আব্বাস বিন উবাদা বিন নাদেলা আনসারী বললেন, হে খাজরাজ সম্প্রদায়! অনুধাবন করো, কোন বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছো তোমরা। অশ্বারোহী হয়ে যুদ্ধ করতে হবে। যদি তোমাদের সম্পদ বিধ্বংস হয়, নেতারা মৃত্যুবরণ করে, তখন যদি পিছিয়ে যাও; তবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকো। আল্লাহর কসম! অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে দুনিয়া ও আখেরাতে অসম্মান নেমে আসবে। সম্পদ ধ্বংসের পর এবং নেতৃবৃন্দের মৃত্যুর পরও যদি তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করতে পারো, তবেই কেবল দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভের অধিকারী হবে তোমরা। আনসারগণ উত্তর দিলেন, আমাদের সম্পদ ধ্বংস হলে এবং নেতৃবৃন্দ নিহত হলেও অঙ্গীকার পূর্ণ করবো আমরা। কিন্তু হে আল্লাহর রসুল! আপনি আমাদরকে জানিয়ে দিন, অঙ্গীকার পালনের বিনিময় কী? রসুল স. বললেন, জান্নাত। আনসারগণ বললেন, তবে হস্ত প্রসারিত করুন। রসুল স. হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে একে একে সকলে বায়াত গ্রহণ করলেন। প্রথমে বারাহ্ বিন মারুর। তৎপর অন্যান্যরা।

সকলের বায়াত গ্রহণ শেষ হলে আকাবার শৃঙ্গ থেকে শয়তান অতি উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বললো, বন্ধুগণ! তোমাদের সর্বনাশ! রসুল স. শুনলেন এ কথা। শয়তান বললো, অমুসলমানেরা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করতে একতাবদ্ধ। রসুল স. জবাব দিলেন, হে আল্লাহর দুশমন! হে আজীব (শয়তানটির নাম আজীব, আজীবের আভিধানিক অর্থ সাপ) আমি তোমাকে প্রতিহত করতে প্রস্তুত।

রাত্রি তখন অনেক। রসুল স. বললেন, আপন আবাসে ফিরে যাও সকলে। আব্বাস বিন উবাদা বিন নাদেলা আরজ করলেন, কসম ওই জাতের যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কাল সকালেই মিনা প্রান্তরে আমরা তলোয়ার নিয়ে হাজির হবো। রসুল স. বললেন, এ রকম নির্দেশ নেই। তোমরা এখন নিজ আবাসে ফিরে যাও।

আমরা ফিরে এলাম। সকালে কোরাইশদের শ্রেষ্ঠ নেতারা এসে আমাদেরকে বলতে লাগলো, হে খাজরাজ দল! আমরা সংবাদ পেয়েছি তোমরা আমাদের সাথীকে নিয়ে যেতে চাও। তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বায়াতও গ্রহণ করেছো। আল্লাহ্র কসম! আরবের অন্য গোত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমরা মোটেও অনীহ নই। কিন্তু তোমরা দুর্বল — তাই ঘৃণার পাত্র। এ কথা শুনে

খাজরাজ ও আউস গোত্রের মুশরিকেরা দাঁড়িয়ে গেলো এবং বললো, আল্লাহর কসম! এ রকম ঘটনা তো ঘটেনি। আমরা তো কিছুই জানি না। মুসলমানেরা কিছু বললেন না। নীরবে একে অপরকে দেখতে লাগলেন।

আনসারগণ মদীনায় ফিরে গেলেন। মক্কার মুসলমানেরা একে একে গিয়ে উপস্থিত হতে লাগলেন মদীনায়। হুজুর স. তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে কল্যাণ দান করেছেন। শান্তিতে বসবাসের জন্য একটি স্থানও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তোমরা মদীনায় চলে যাও এবং তোমাদের আনসার ভাইদের সাথে নিরাপদে বসবাস করতে থাকো। প্রথমে সালমা বিন আবদুল্লাহ মাখজুমীর ভাই মদীনায় হিজরত করলেন। তারপর গেলেন আমের বিন রবীয়া। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ। তারপর অন্যান্যরা। এমনিভাবে ইসলামের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন মদীনার মুসলমানেরা। আউস ও খাজরাজ গোত্রের শত্রুতা দূর হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো শান্তিময় একতা।

তাই এরশাদ হচ্ছে, শত্রুতা ও অবিশ্বাসের কারণে তোমরা ছিলে অগ্নিকুন্ডের প্রান্তবর্তী। সত্বরই সেই হুতাশনে পতিত হতে তোমরা। কিন্তু আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে তোমাদেরকে সেই পতন থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহতায়ালা তাঁর নিদর্শন সুস্পষ্ট করে তোলেন, যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০৪

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

❐ তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা কল্যাণের দিকে আহবান করিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্য নিষেধ করিবে; ইহারাই সফলকাম।

সৎ কাজের আদেশ প্রদান এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা ফরজে কেফায়া। এই কাজ সকলের উপরে ফরজ নয়। কেননা আদেশ ও নিষেধ জারী করার জন্য এলমে শরিয়তের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয় যাচাই বাছাই করার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। সবাই এই যোগ্যতাধারী নয়। এই আয়াত সকল মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বিবৃত হয়েছে, এবং তোমাদের মধ্যে একটি দল—একথা বলে কতিপয় ব্যক্তিকে আহবান কার্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যদি এই আহবান কার্যে কেউই নিয়োজিত না থাকে তবে সবাইকে অভিযুক্ত করা হবে। আর যদি কেউ কেউ এ কাজে নিয়োজিত থাকে, তবে সবার পক্ষ থেকে ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

কল্যাণের দিকে আহবান অর্থ দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের দিকে আহবান। ইবনে মারদুবিয়া হজরত ইমাম বাকের র. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, কোরআন ও আমার সুন্নতের উপর চলাই কল্যাণ। আল্লামা সুয়ুতী এ হাদিসটিকে মু'দাল বলেছেন। হজরত ওসমান এই আয়াত বিশেষ গুরুত্বসহ খুব বেশী তেলাওয়াত করতেন।

সৎকার্য ওগুলোই যেগুলোকে শরিয়ত উত্তম বলে নির্ধারিত করেছে। আর শরিয়ত নির্ধারিত মন্দ কাজগুলোই অসৎকার্য। যাঁরা সৎ কাজের আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখেন, তাঁরাই সফলকাম। যারা এ কাজ করে না, তারা অসফল এবং ক্ষতিগ্রস্ত।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, শরিয়তবিরোধী কার্যকলাপ দেখলে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বন্ধ করে দিও। না পারলে মুখের কথায় প্রতিবাদ কোর। তাও না পারলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা কোর। এমতো ঘৃণা দুর্বল ইমানের পরিচয়বাহী। মুসলিম।

হজরত নোমান ইবনে বশীর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, অসৎকাজে বাধা সৃষ্টি না করার বিষয়টি এ রকম, যেমন কোনো দ্বিতল নৌকার আরোহীবৃন্দ লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করলো, কেউ কেউ উপরে এবং কেউ কেউ নিচে অবস্থান করবে। নিচের লোকদের পানি আনতে যেতে হতো উপরে। উপরের লোকেরা এতে বিরক্ত হয়ে নিচের লোকদেরকে এভাবে আসা যাওয়া করতে নিষেধ করে দিলো। নিচের লোকেরা ভাবলো, নৌকা ফুটো করলেই তো পানি পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি তখন নৌকার তলায় কুঠারাঘাত করতে লাগলো। উপরের লোকেরা এসে জিজ্ঞেস করলো, সর্বনাশ! তুমি করছো কী? লোকটি বললো, আমাদের কারণে তোমরা কষ্ট পাচ্ছো। আবার আমাদের পানিরও একান্ত প্রয়োজন। নৌকা ফুটো করছি এজন্যই। এমতাবস্থায় যদি উপরের লোকেরা লোকটিকে নিবৃত্ত করে তবে সেই ব্যক্তি এবং অন্য সবাই রক্ষা পাবে। নিবৃত্ত না করলে সেও যেমন ধ্বংস হবে, তেমনি অন্য সকলেও ধ্বংস হবে। বোখারী।

হজরত হোজায়ফা থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবীয়ে করীম স. এরশাদ করেছেন, ওই পবিত্র সত্তার শপথ! যিনি আমার জীবনাধিপতি। দু'টি বিষয় অবশ্যম্ভাবী। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ জারী রাখবে। নতুবা অনতিবিলম্বে আল্লাহতায়ালা তোমাদের উপর আযাব নাজিল করবেন। তখন তোমরা প্রার্থনা করবে কিন্তু প্রার্থনা কবুল করা হবে না। তিরমিজি।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক এক জনসমাবেশে এই মর্মে ভাষণ দিয়েছিলেন, হে জনতা। তোমরা নিশ্চয়ই এই আয়াত পাঠ করো, 'হে বিশ্বাসীবৃন্দ! তোমরা

নিজেদের উপর একথা অপরিহার্য করে নাও-'পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তোমাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। যদি তোমরা হেদায়েতের উপর সুস্থির থাকো।' সতর্ক হও হে জনতা। মন্দ কাজ কখনোই আমাদের জন্য ক্ষতিকারক হবে না যদি আমরা তার প্রতিবন্ধক হই। আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, অসৎ কাজ দেখলে বলপ্রয়োগ, মৌখিক প্রতিবাদ অথবা অন্তর দ্বারা ঘৃণা না করলে সকলের উপরে নেমে আসবে শাস্তি। ইবনে মাজা। তিরমিজি হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, জারীর বিন আবদুল্লাহ থেকে।

হজরত আদী বিন আদী কুন্দি থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমাদের মুক্তিপ্রাপ্ত এক গোলাম আমাদেরকে বলেছেন, আমি আমার দাদার নিকট থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়কে তাদের বিশেষ কোনো লোকের পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করেন না, যতক্ষণ তাদের অধিকাংশ লোক পাপের কথা জানতে পেরে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিরোধ না করে নীরব থাকে। প্রতিরোধ না করলে আল্লাহতায়ালা সকলকেই শাস্তি দান করেন। বাগবী।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, বনী ইসরাইলগণ পাপাসক্ত হয়ে পড়লে তাদের আলেমগণ তাদেরকে সর্তক করলেন। কিন্তু তারা বিরত হলো না। এরপর আলেমগণ নিজেরাই তাদের সভায় ওঠা বসা করতে লাগলো। ক্রমশঃ তাদের সাথে একত্রাহার ও মদ্যপান সবই চললো। তাদের তমসাচ্ছন্ন অন্তরের প্রভাবে আলেমদের অন্তরও তমসাচ্ছাদিত হয়ে পড়লো। তাই হজরত দাউদ এবং হজরত ঈসা তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। এই অভিসম্পাত তাদের অপরাধাসক্তি ও সীমালংঘনের কারণে হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেছেন, রসুল স. শায়িত ছিলেন, একথা বলেই উঠে পড়লেন তিনি এবং বললেন, আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা অত্যাচারী ও পাপীদের পাপকার্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াও। তিরমিজি, আবু দাউদ।

একটি প্রশ্ন ঃ যদি কেউ নিজে সৎকর্মশীল না হয় এবং মন্দ থেকে মুক্ত না থাকে, তবে অন্যকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার হুকুমটি কি তারও উপরে ওয়াজিব?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। আয়াতের মর্ম একথাই প্রমাণ করে। কিন্তু তার জন্য আত্মসংশোধিত হওয়াও জরুরী। এ মর্মে অন্য আয়াতে এসেছে, 'আশ্চর্য! অন্যকে সৎকর্মশীল হতে বলো আর নিজে থাকো উদাসীন।' অন্য আরেক আয়াতে বলা হয়েছে, 'কেনো এমন কথা বলো, যা নিজে করো না। এ রকম আচরণ আল্লাহতায়ালার অসন্তুষ্টির কারণ।'

হজরত উসামা বিন জায়েদ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে ফেলে দেয়ার সাথে সাথে তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। গাধা যেমন আটার চাক্কিকে কেন্দ্র করে ঘোরে, তেমনি সে তার নাড়িভুঁড়িকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকবে। তখন দোজখবাসীরা তার পাশে সমবেত হয়ে বলবে, কী খবর তোমার? পৃথিবীবাসের সময় তুমি না আমাদেরকে ভালো কাজ করতে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতে। লোকটি বলবে, আমি তোমাদেরকে ভালো কাজ করতে বলতাম। কিন্তু নিজে করতাম না। খারাপ কাজ করতে নিষেধ করতাম। অথচ নিজে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতাম না। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মেরাজ রজনীতে আমি দেখেছি, আগুনের কাঁচি দ্বারা অনেক লোকের ঠোঁট কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্‌রাইল! এরা কারা? হজরত জিব্‌রাইল বললেন, এরা আপনার উম্মতের ওয়াজকারী (বক্তা)। এরা মানুষকে ভালো কাজ করতে বলতো। কিন্তু নিজেরা করতো না। শরহে সুন্নায় ইমাম বাগবী এবং শোয়াবুল ইমানে ইমাম বায়হাকী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০৫

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

❒ তোমরা তাহাদের মত হইওনা যাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের জন্য মহা শাস্তি রহিয়াছে।

তাদের মত হয়ো না অর্থাৎ ইহুদীদের মতো হয়ো না, যারা উত্তম দল থেকে বিচ্ছিন্ন। আর মতান্তর বলতে এখানে বুঝতে হবে আল্লাহতায়ালার স্পষ্ট অর্থ বোধক আয়াত এবং সর্ববিদিত (মুতাওয়াতির) হাদিসসমূহ। ইজমায়ে উম্মত (উম্মতের ঐকমত্য)ও এর অন্তর্ভুত। ইখতিলাফ (মতান্তর) ব্যাপক অর্থ বোধক শব্দ। যেমন, আহলে সুন্নত ও আহলে বিদাত (মোতাজিলা, খারেজী ইত্যাদি) এর মত বিরোধ। শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রেও এ শব্দটি প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন, অজুর মধ্যে পা ধোয়া এবং মোজার উপরে মসেহ, চার খলিফার খেলাফত। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মতভেদ নিষিদ্ধ। অবশ্য যে সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয় — সে সমস্ত

বিষয়ে মতানৈক্য বৈধ। এই বিষয়টি ইজতেহাদী বিষয়। যাঁরা বিষয়গুলোকে সুগভীর অভিনিবেশ সহ বুঝতে চেষ্টা করেন তাঁরা মুজতাহিদ। এই বুঝতে চেষ্টা করার নাম ইজতেহাদ। ইজতেহাদ সঠিকও হতে পারে ভুলও হতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ থাকার কারণে ভুল ইজতেহাদকারীগণ ক্ষমাপ্রাপ্ত। বরং তাঁদের এই সৎ প্রচেষ্টার কারণে সওয়াব রয়েছে। আর মানুষের জন্য এই জাতীয় মতানৈক্য রহমত স্বরূপ।

আব্দ বিন হুমাইদী, দারেমী এবং ইবনে মাজা, বোখারী ও মুসলিমের মধ্যে এবং ইবনে আসাকের ও হাকেম হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আমার অন্তর্ধানের পর আমার সহচরবৃন্দের মতানৈক্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আল্লাহতায়ালা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছেন, তোমার সহচরবৃন্দ আমার নিকট নক্ষত্র তুল্য। তারা একজন অপেক্ষা অন্যজন অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন ও আলোকিত।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তারা একজন অপেক্ষা অন্য জন উজ্জ্বলতর কিন্তু সকলেই উজ্জ্বল। তাদের মত সমূহ থেকে কোনো একটি যদি কেউ গ্রহণ করে, তবে সে পথপ্রাপ্ত হবে। দারা কুতনী, ফাজায়েলে সাহাবা এবং ইবনে আবদুল বার হজরত জাবের থেকে। আরো বর্ণনা করেছেন বায়হাকী তাঁর মাদখাল গ্রন্থে।

শিথিল সনদের সঙ্গে বায়হাকী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহর কিতাবে উল্লেখিত নির্দেশানুসারে আমল করো। কিতাব তরক করার কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো বিষয় আল্লাহতায়ালার কিতাবে স্পষ্ট না দেখতে পেলে নবী করীম স. এর সুন্নত অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সুন্নতে স্পষ্ট না পেলে সাহাবীগণের মত অনুযায়ী আমল করতে হবে। আমার সাহাবীগণ আকাশের নক্ষত্ররাজি তুল্য। তাঁদের যে কোনো একজনের অনুসরণ করলেই তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। সাহাবীগণের মতবিরোধ তোমাদের জন্য রহমত।

মাদখাল গ্রন্থে বায়হাকী এবং তবকাত পুস্তকে ইবনে সা'দ, কাসেম বিন মোহাম্মদের উক্তি উল্লেখ করেছেন এইভাবে, মোহাম্মদ স. এর সহচরবৃন্দের মতানৈক্য আল্লাহর বান্দাদের জন্য রহমত। ওমর বিন আবদুল আজীজ র. থেকে বায়হাকী এরকম উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন।

অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপনের পর অর্থাৎ কোরআন, হাদিস ও ইজমার ক্ষেত্রে মতবিরোধ ক্ষমার্হ নয়। এ রকম ক্ষেত্রে মতবিরোধ শাস্তিযোগ্য।

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ قف اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

❒ সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হইয়া যাইবে এবং কতক মুখ কাল হইয়া যাইবে; যাহাদের মুখ কাল হইবে তাহাদিগকে বলা হইবে, 'বিশ্বাসের পর কি তোমরা সত্য প্রত্যাখান করিয়াছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা সত্য প্রত্যাখান করিতে।'

❒ যাহাদের মুখ উজ্জ্বল হইবে তাহারা আল্লাহের অনুগ্রহে থাকিবে, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

❒ এইগুলি আল্লাহের আয়াত, তোমার নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করিতেছি। আল্লাহ্ বিশ্ব-জগতের প্রতি জুলুম করিতে চাহেন না।

❒ আসমান ও জমিনে যাহাকিছু আছে সব আল্লাহেরই ; আল্লাহের নিকটই সব কিছু প্রত্যানীত হইবে।

কিয়ামতের দিন বিশ্বাসীদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। আর অবিশ্বাসীদের মুখমন্ডল হবে কৃষ্ণকায়। সাঈদ বিন জোবায়ের, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম, আহলে সুন্নতের চেহারা হবে উজ্জ্বল এবং আহলে বেদাতের চেহারা হবে কালো। মসনদে ফেরদাউস গ্রন্থে দায়লামী অশক্ত সূত্রের মাধ্যমে হজরত ইবনে ওমরের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এভাবে — রসুল স. বলেছেন, আহলে সুন্নতের মুখাবয়ব হবে জ্যোর্তিময় এবং আহলে বেদাতের মুখাবয়ব হবে তমাসাচ্ছাদিত। কৃষ্ণ মুখাবয়বধারীদেরকে বলা হবে, তোমরা নবী ও কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করার পর সুস্পষ্ট প্রমাণকে অস্বীকার করেছো, দ্বীনকে করেছো দ্বিধাদীর্ন এবং মোতাশাবেহাতের (অস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াতের) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছো। তাই তোমাদের অবিশ্বাস ও অকৃতজ্ঞতার শাস্তি আস্বাদন করো এখন। হজরত আবু উমামা এবং হজরত কাতাদা বর্ণনা করেছেন, এই উম্মত এবং পূর্ববর্তী উম্মতের বেদাতপন্থীদেরকে লক্ষ্য করে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম আহমদ ও অন্যান্যরা হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তারা খারেজী। হজরত আসমা বর্ণিত হাদিসে এসেছে, এই আয়াতের লক্ষ্য আহলে রায় (ব্যক্তিগত অভিমত পোষণকারীগণ)। রসুল স. এরশাদ করেন, আমি যখন হাউজে কাউসারের সন্নিকটে উপস্থিত থাকবো, তখন দেখতে পাবো কেউ কেউ আমার নিকটে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাদেরকে হাউজের নিকট আসতে দেয়া হবে না। আমি বলবো, হে আমার আল্লাহ! এরা তো আমারই উম্মত। উত্তর আসবে, তুমি কি জানো তারা কি কি কুকর্ম করেছে? এরা সব সময় ছিলো পশ্চাদাপসরণকারী (হেদায়েত বিমুখ)।বোখারী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ফেতনা আগমনের আগেই সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করো। অন্ধকার রাতের মতো এগিয়ে আসছে ফেতনা। ওই সময় মানুষ সকালে হবে বিশ্বাসী সন্ধ্যায় অবিশ্বাসী। অপরাহ্নে অবিশ্বাসী, প্রত্যুষে বিশ্বাসী। তারা দ্বীনকে দুনিয়ার নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে। আহমদ, মুসলিম, তিরমিজি।

অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াত মুরতাদদের (ধর্মত্যাগীদের) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা ইসলামে আগমণের পর পুনরায় প্রত্যানীত হয়েছে কুফরীতে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সকল আহলে কিতাবদেরকে লক্ষ্য করে, যারা হজরত মুসা এবং তওরাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু রসুল স.কে মেনে নেয়নি। অথবা তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করতো কিন্তু আবির্ভাবের পর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সমস্ত কাফের এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল। কেননা রূহের জগতে আল্লাহ পাক সকলের নিকট তিনি প্রতিপালক কি না এই মর্মে সাক্ষ্য নিয়েছেন। সবাই তখন তাঁকে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু পৃথিবীতে এসে হয়ে গিয়েছে অবিশ্বাসী। এমনও বলা যায় যে, দলিল প্রমাণাদি এবং বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে ইমান গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যারা ইমান গ্রহণ করেনি, তারাই এই আয়াতের লক্ষ্য।

উজ্জ্বল মুখাবয়ববিশিষ্ট দল হবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। জান্নাত এবং চিরস্থায়ী সওয়াবের অধিকারী হবেন তাঁরা। আয়াতে 'রহমত' শব্দ দ্বারা জান্নাতকে বোঝানো হয়েছে। বিশ্বাসীরা তাঁদের জীবন অতিবাহিত করবেন আল্লাহতায়ালার নির্দেশ অনুসারে। কিন্তু জান্নাতে প্রবিষ্ট হওয়া সম্পূর্ণতই আল্লাহপাকের অনুগ্রহের কারণেই হবে।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, হেদায়েত অবলম্বন করো। মধ্যবর্তী পন্থায় জীবন যাপন করো এবং প্রসন্নচিত্ত থাকো। মনে রেখো, বেহেশতপ্রাপ্তি আমলনির্ভর নয়। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! এ অবস্থা কি আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (আপনার জান্নাত প্রাপ্তিও কি আমলনির্ভর

নয়)? তিনি স. বললেন, না। তবে আল্লাহ্তো আমাকে তাঁর মাগফেরাত ও রহমতের দ্বারা আবৃত করেছেন (তাই আমার জান্নাত প্রাাপ্তি নিশ্চিত)। বোখারী, মালেক। এই হাদিসটি হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম, হজরত জাবেরের মাধ্যমে এ রকম উল্লেখ করেছেন যে, তোমাদের আমল তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না, দোজখ থেকেও রক্ষা করবে না। আল্লাহর রহমত ব্যতীত আমাকেও না।

এরকম হাদিস আরো বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম আহমদ, আবু মুসা আশআরী এবং হজরত শারীক বিন তারিক থেকে বায্যার এবং হজরত উসামা বিন শারীক এবং হজরত আসাদ বিন কারজী থেকে তিবরানী। বাহ্যত এই হাদিসগুলো আল্লাহতায়ালার ওই আয়াতের বিপরীত মনে হয় — যাতে বলা হয়েছে, 'উদখুলুল জান্নাতা বিমা কুংতুম তা'মালূন।' এ প্রসঙ্গের উত্তর এই হতে পারে যে, জান্নাতে রয়েছে বিভিন্ন স্তর। তাই উন্নততর স্তর প্রাপ্তি আমলের উপরে নির্ভরশীল। প্রবেশ ও স্থায়ী বসবাস আল্লাহতায়ালার ফজল ও রহমতের কারণেই হবে।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, পুলসিরাত অতিক্রম আল্লাহর মাগফেরাতের মাধ্যমে, জান্নাতে প্রবেশ রহমতের মাধ্যমে এবং জান্নাতের বিভিন্ন স্তর প্রাপ্তি আমলের কারণে হবে। বর্ণনা করেছেন হান্নাদ তাঁর জুহুদ গ্রন্থে আর আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন, আউন বিন আবদুল্লাহ্র সূত্রপরম্পরায়।

বেহেশতবাস স্থায়ী। বেহেশতের সুখ ও দোজখের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার অঙ্গীকার সত্য। জগৎবাসীদের প্রতি জুলুম করা তাঁর অভিপ্রায় নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তিনিই তো সকলকিছুর নিরঙ্কুশ প্রভু। ঔচিত্য ও বাধ্যতা থেকে তিনি পবিত্র। তিনি যা ইচ্ছা তাই করার ক্ষমতাধারী। তবে জুলুমের কথা এলো কেনো।

আমি বলি, আয়াতের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মশীলদের পূণ্য কমিয়ে দেয়া অথবা পাপিষ্ঠদের প্রাপ্য শাস্তি বাড়িয়ে দেয়া, এ সমস্ত জুলুম থেকে তিনি পবিত্র। অবিশ্বাস-ই সবচেয়ে বড় পাপ। তাই কুফরীর জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আজাব। আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর অধিকর্তা আল্লাহতায়ালা। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর সাম্রাজ্যাধীন। সকলকিছুই প্রত্যানীত হবে তাঁর নিকটেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকারানুযায়ী সকলের জন্য নির্ধারণ করবেন স্বস্তি অথবা শাস্তি।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

❐ তোমরাই শ্রেষ্ঠদল, মানবজাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হইয়াছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্য নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর। কিতাবীগণ যদি বিশ্বাস করিত তবে উহা তাহাদের জন্য ভাল হইত। তাহাদের মধ্যে বিশ্বাসী আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

ইমাম বাগবী, হজরত ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, মালেক বিন জঈফ এবং ওহাব বিন ইহুদ এই দুইজন ইহুদী — হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত মুআজ বিন জাবাল, হজরত সালেম বিন মাওলা এবং আবী হুজায়েফাকে বললো, আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম। আর আমাদের ধর্মমত তোমাদের ধর্মমত অপেক্ষা উত্তম। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 'খইরা উম্মাতি' শব্দ দু'টির মধ্যে অর্থের দিক থেকে 'খইর' শব্দটি বিশেষ্য এবং 'উম্মাতুন' শব্দটি বিশেষণ।

একটি ধারণা ঃ 'কুংতুম' অতীতকাল বোধক। এতে বোঝা যায় অতীতে তোমরা উত্তম উম্মত ছিলে, এখন নেই। আগামীতেও থাকবে না।

উত্তর ঃ 'কানা' শব্দটি অতীতকাল বোধক। তবে অতীতকালের এই সম্বোধন এখন রহিত হয়ে গিয়েছে অথবা আগামীতে রহিতাবস্থা বলবত থাকবে। এতে এ কথা বোঝা যায় না 'এখন নেই' অথবা 'আগামীতে হবে না' - এ কথা স্পষ্ট। যেমন আল্লাহ্ বলেন, 'কানাল্লাহু গফুরার রহীমা।' এখানে আল্লাহ্র ক্ষমাশীল হওয়াটা কোনো বিশেষকালের জন্য নির্দিষ্ট নয়, যদিও এখানে 'কানা' শব্দটি অতীতকালবোধক। অতএব 'কুংতুম খইরা উম্মাতি' অর্থ হবে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সকল কালেই উত্তম। তাই এর পরেই উল্লেখ করা হয়েছে তা'মুরুনা বিল মারুফ (সৎকাজের নির্দেশ দান করো) একথায় বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে সৎকাজের নির্দেশ দান করো বোঝা যায়। উম্মতে ইসলামকে উত্তম উম্মত বলে এ কথা বোঝানো হতে পারে যে, তোমরা আল্লাহর জ্ঞানে বরাবরই উত্তম উম্মত ছিলে অথবা স্মৃতিচারণের মাধ্যমে অতীত উম্মতদের মধ্যেও উত্তম উম্মত বলে বিবেচিত ছিলে।

'উখরিজাত লিন্নাস' — অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে প্রকাশিত বা বিকশিত বলতে উত্তম উম্মতের বর্তমান বিদ্যমানতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কুংতুম অর্থাৎ 'তোমরা' বলতে সাহাবায়ে কেরামদের জামাত সরাসরি সম্বোধিত হয়েছে। জুহাক, জোবায়ের থেকে বর্ণনা করেন, হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন, উত্তম উম্মত বলতে আমাদেরকে অর্থাৎ প্রথম যুগের মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে, পরবর্তীদেরকে নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উত্তম উম্মত তাঁরাই যাঁরা রসুল স. এর সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। হজরত ওমর বলেছেন, আল্লাহতায়ালা কুংতুম এর পরিবর্তে আংতুম ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কুংতুম শব্দটি নির্দিষ্ট করেছেন কেবল সাহাবীদের জন্য এবং ওই সমস্ত মানুষের জন্য যাঁরা সাহাবীদের মতো। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমস্ত উম্মতই অন্তর্ভুত হতে পারেন। উম্মতের ঐকমত্য এ রকমই — উম্মতে ইসলামী অন্য সমস্ত উম্মত অপেক্ষা উত্তম এবং উম্মতে ইসলামীর মধ্যে সাহাবীদের যুগ উত্তম।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত কাতাদা বলেছেন, হজরত ওমর কুংতুম খইরা উম্মাতিন — এই আয়াত পাঠ করার পর বলতেন, যাঁরা এই উম্মতের অন্তর্ভুত হতে অভিলাষী হয়, তাদেরকে সমস্ত মানুষের হেদায়েতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে তাদেরকে অবশ্যই এই উম্মতের জন্য নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যসমূহ আত্মস্থ করতে হবে।

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আর আমি (আসমানী) কিতাবসমূহে একথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছি (বেহেশত) ভূমির অধিকারী আমার সৎকর্মশীল বান্দাগণ।' অন্যত্র বলেছেন, 'অতপর এই কিতাবটি ওই সমস্ত লোকের হাতে অর্পণ করেছি, যারা আমার বান্দাগণের মধ্যে পছন্দনীয়।' রসুলে পাক স. এরশাদ করেন, আমার বেহেশতে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে অন্য নবীগণের বেহেশতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর আমার উম্মতের বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে অন্যান্য উম্মতের বেহেশতে প্রবেশও নিষিদ্ধ। উত্তম সনদে হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী। হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে তিনি মারফু সূত্রে আরো বর্ণনা করেছেন, অন্যান্য উম্মতের বেহেশতে প্রবেশ হারাম যতক্ষণ না আমার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করবে।

আহমদ, বায্যার এবং তিবরানী বিশুদ্ধ সনদে হজরত জাবের থেকে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, বেহেশতবাসীদের মধ্যে আমার উম্মতের সংখ্যা হবে এক চতুর্থাংশ। আমার ইচ্ছা তাঁরা এক তৃতীয়াংশ হোক। বরং অর্ধেক হোক। উত্তম সনদে তিরমিজি এবং বিশুদ্ধ সনদে হাকেম বলেন, একশ' বিশটি কাতার হবে জান্নাতবাসীদের। আশি কাতার উম্মতে মোহাম্মদীর। বাকিগুলো অন্যান্য উম্মতের। ওই হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত আবু মুসা, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত মুয়াবিয়া বিন জুনদাহ্ এবং হজরত ইবনে মাসউদ। রসুল স. এরশাদ

করেন, তোমরা সত্তর অংশের এক অংশ হবে এবং সকলের চেয়ে উত্তম হবে। আল্লাহর নিকট হবে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদামন্ডিত। এই হাদিস বায ইবনে হাকিমের দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা এবং দারেমী। তিরমিজি একে উত্তম বলেছেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম বাগবীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

রসুলুল্লাহ স. বলেন, আমার উম্মত বৃষ্টিপাতের মতো। বোঝা যায় না এর প্রথম অংশ উত্তম না শেষ অংশ। বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, হজরত আনাস এবং হজরত আবু জাফর বিন মোহাম্মদ থেকে। বায়হাকী এবং ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, আমার উম্মতের ভুলক্রটি ক্ষমার্হ। তাদের ওই সমস্ত ভুলক্রটিও ক্ষমাপ্রাপ্ত, যা তারা বাধ্য হয়ে করে।

রসুল স. এরশাদ করেন, উত্তম মানুষ, আমার যুগের মানুষ। এরপর তার পরবর্তীগণ। তারপর তার পরবর্তীগণ। এর পরে আসবে এমন মানুষ যাদের সাক্ষ্য হবে শপথের পূর্বে এবং শপথ হবে সাক্ষ্যের পূর্বে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আহমদ এবং তিবরানী। এ রকম আরো হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আয়েশা থেকে মুসলিম এবং হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে তিরমিজি ও হাকেম।

রসুল স. এরশাদ করেন, আমার সাহাবীগণের মন্দ বোল না। তোমরা আল্লাহর রাস্তায় উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করলেও তাদের এক সের অথবা আধা সের যব দান করার সমতুল্য হবে না। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম, হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। হজরত বোরায়দা থেকে তিরমিজি বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, যে মাটিতে আমার কোনো সাহাবী মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামতের দিন ওই এলাকার মানুষের জন্য সে হবে পথপ্রদর্শক এবং পথের আলো।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, মানুষের মধ্যে সবচাইতে উত্তম সে, যে শৃংখলাবদ্ধ (সিলসিলাভুক্ত) হয়ে আসে। তোমরা তাদেরকে ইসলামের অন্তর্ভুত করো।

আমি বলি, অতীত উম্মতের চেয়ে এই উম্মতের ধর্মপ্রচারক ও মোর্শেদের আল্লাহর পথে আকর্ষণ ক্ষমতা বেশী। হজরত আলী কুতুবুল এরশাদ এবং সাহেবে বেলায়েত ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক মাধ্যম ব্যতীত অতীত উম্মতের কেউ বেলায়েতের স্তরে উপনীত হতে পারেননি। এরপর তাঁর বংশধরদের মধ্যে এই পথের ফয়েজের সিলসিলা ইমাম হাসান আসকারী এবং শায়েখ আবদুল কাদের জীলানী পর্যন্ত পৌঁছেছে। শায়েখ জীলানী বলেছেন, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত এ পথের ফয়েজ হয়ে থাকবেন। আরো বলেছেন, প্রথম যুগের সূর্য অস্তমিত। এখন আমাদের সূর্য জ্বলছে।

উম্মতে মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা পুণ্যকর্ম করতে নির্দেশ দিবে এবং মন্দ কর্ম থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে তাদের অন্তরে বলবৎ রাখবে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসসহ অন্যান্য বিশ্বাস্য বিষয়সমূহে আস্থা রাখা। ওই ধরনের বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস যা গ্রহণীয়। আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও নবীগণের এক বা একাধিক জনকে অস্বীকার করা অথবা কিয়ামতকে সত্য না জানা ইমান বিরোধী। আহলে কিতাবেরা বিভিন্ন কিতাব ও বিভিন্ন নবীদেরকে মানে বটে কিন্তু সকল নবী এবং সকল কিতাবকে মানে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, 'যদি আহলে কিতাবগণ ইমান গ্রহণ করতো।'

হজরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তোমরা কি জানো আল্লাহর প্রতি ইমান আনা কাকে বলে? জুহাক আরজ করলেন, এ বিষয়ে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলই অধিক অবগত। তিনি স. বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সাক্ষ্য দেয়া, নামাজ কায়েম করা, জাকাত দেয়া, রমজানের রোজা রাখা এবং গণিমতের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করা। বোখারী, মুসলিম।

অনুযোগঃ সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের পূর্বে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিলো। কেননা প্রথমে ইমান তারপর সৎআমল। ইমানের পরেই তো সৎকাজ সংঘটিত হয়। কিন্তু এখানে সৎকাজের পরে ইমানের উল্লেখ করা হয়েছে।

উত্তরঃ এখানে সতর্ক করাই উদ্দেশ্য যে, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ তারা অন্তরের বিশ্বাসের কারণেই করবে। মানুষের কাছে প্রকাশ করার জন্য করবে না। কেননা সৎকাজের আদেশ দানের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি ইমান অতি অবশ্যই প্রয়োজন। অথবা এমনও হতে পারে যে, পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের জন্যই এখানে ইমানের উল্লেখ করা হয়েছে। পরের বাক্যে বলা হয়েছে, কিতাবীগণ যদি বিশ্বাস স্থাপন করতো তা তাদের জন্য কতই না উত্তম হতো। এরকম করলে উত্তম উম্মত সম্বোধনের অন্তর্ভূত হতে পারতো।

আমি বলি, এখানে আল্লাহ্‌র প্রতি ইমান অর্থ প্রকৃত ইমান। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছুর ধারণা থেকে মুক্ত প্রকৃত ইমান। এমন ইমান যা প্রবৃত্তির কুধারণা থেকে মুক্ত। এমন ইমান যা প্রেমপূর্ণ ও আন্তরিক, যে ইমান ইহ-পরকালের সকল আকর্ষণ ও লালসা থেকে পবিত্র।

কিতাবীদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য প্রকৃত ইমানদার। যেমন, হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন সালাম ও অন্যান্যরা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ۗ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۗ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

❒ সামান্য ক্লেশ দেওয়া ছাড়া কদাচ তাহারা তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তবে তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে, তারপর তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবেনা।

❒ আল্লাহের প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাহিরে যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে সেখানেই তাহারা হীনতাগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহের ক্রোধের পাত্র হইয়াছে এবং দারিদ্রগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা এই হেতু যে তাহারা আল্লাহের আয়াত প্রত্যাখান করিত এবং অন্যায়রূপে নবীগণকে হত্যা করিত; ইহা এইজন্য যে তাহারা অবাধ্য হইয়াছিল এবং সীমালংঘন করিত।

যখন ইহুদী নেতারা আবদুল্লাহ্ বিন সালাম ও অন্যান্য মুসলমান আহলে কিতাবদের ক্ষতি করতে প্রবৃত্ত হলো, তখন আল্লাহ্তায়ালা সান্ত্বনা প্রদানার্থে বললেন, কাফের আহলে কিতাবীরা বড় কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেনা। মৌখিক বাদানুবাদের মধ্যেই তাদের ক্ষতি সীমাবদ্ধ। জীবনহানি কিংবা সম্পদ বিনষ্টি, এরকম বড় কোনো ক্ষতি করা তাদের আওতাবহির্ভূত। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে তাদের জন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন নিশ্চিত। তোমরাই বিজয়ী। কারণ তোমরা আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যপ্রাপ্ত। বনি কোরাইজা, বনি নাজির এবং খয়বরবাসী ইহুদীদের লাঞ্ছনাগ্রস্ত জীবন এর সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহুদীদের জীবন, পরিবার পরিজন, সম্পদ তোমাদের জন্য হালাল। যদি তারা নিরাপত্তাপ্রার্থী হয় তবে ইসলামে তার অবকাশ রয়েছে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, 'আর যদি মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার নিকট আশ্রয়ার্থি হয় তবে আপনি তাকে আশ্রয় দিন।' অন্যত্র

এরশাদ করেন, 'যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিজিয়া দিতে স্বীকৃত হয়।' জিজিয়া দিলে তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ। তাই বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্র জিম্মাদারী এবং মানুষের জিম্মাদারী' অর্থাৎ মুসলমানরা জিম্মাদার হলে তা আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকেই হবে। এই জিম্মাদারীর বাইরে গেলেই তাদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা অনিবার্য। তারা আল্লাহ্তায়ালার ক্রোধের পাত্র। দারিদ্র ও লোভ তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে।

কৃপণ ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত। তাদের অবস্থা নিঃসম্বল ব্যক্তিদের মতোই। আর লোভীরা সম্পদ অর্জনের জন্য অস্থির। বায়যাবী লিখেছেন, ইহুদীরা অধিকাংশই ফকির মিসকিনদের মতো। কারণ, তারা সম্পদশালী হলেও ভিখারীদের মতো যাঞ্চা করে। সম্পদ গোপন করতে চায় বলে দারিদ্র প্রদর্শন করে। তাদের এই অপমানজনক অবস্থা আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত। তারা আল্লাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যানকারী, অন্যায়ভাবে নবী রসুলদেরকে হত্যাকারী। তাই তাদের জীবন লাঞ্ছনাহত।

দু'টি কারণে তাদের এই অপদস্থতা। ১. কুফরী ও নবীহত্যা। ২. পাপাসক্তিতে সীমালংঘন। পৃথিবীর অপদস্থতা এবং পরকালের শাস্তি তাদের জন্য অপরিহার্য।

ইবনে মান্দাহ্ তার আস্ সাহাবা গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, যখন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম, সালাবা বিন শোবা, উসাইদ বিন তাবীয়া, আসাদ বিন উবায়েদ এবং তাদের সাথে অন্যান্য ইহুদীগণ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলেন, তখন ইহুদী আলেমরা বলতে শুরু করলো, আমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট, তারাই মোহাম্মদ স. এর ধর্মমত গ্রহণ করেছে। তারা ভালো হলে কিছুতেই বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করে অন্যধর্ম গ্রহণ করতো না। তখন পরবর্তী আয়াত দু'টি নাজিল হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম।

আহমদ, নাসাঈ এবং ইবনে হাব্বান, হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুল স. ইশার নামাজ বিলম্ব করলেন। সাহাবীগণ অপেক্ষমাণ ছিলেন। নবী পাক স. তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, জেনে নাও। অন্য কোনো ধর্মমতের লোকেরা এ সময় আল্লাহ্তায়ালার স্মরণরত হয়না। তখন অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ۝ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝

❒ তাহারা সকলে এক রকম নহে। কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত একদল আছে; তাহারা রাত্রিকালে সিজদারত অবস্থায় আল্লাহের আয়াত আবৃত্তি করে।

❒ তাহারা আল্লাহ্ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎকার্য নিষেধ করে এবং তাহারা সৎকার্যে প্রতিযোগিতা করে। তাহারাই সজ্জনদিগের অন্তর্ভূক্ত।

❒ উত্তম কাজের যাহা কিছু তাহারা করে তাহার প্রতিদান হইতে তাহাদিগকে কখনও বঞ্চিত করা হইবে না। আল্লাহ্ সাবধানীদের সম্বন্ধে অবহিত।

সকল ইহুদী এরকম নয়। তাঁদের একদল মুসলমান। তাঁরা নামাজে দন্ডায়মান হন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাঁরা পথপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের সীমানায় অবস্থান করেন। মুজাহিদ বলেন, তাঁরা ন্যায়পরায়ণতাপ্রিয়। সুদ্দী বলেছেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম এবং অন্যান্য মুসলমান আহলে কিতাবগণ। তাঁরা আয়াত আবৃত্তিকারী রাত্রিকালে নামাজরত অবস্থায়। তাঁরা সিজদারত থাকেন অর্থাৎ নামাজ আদায় করেন। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রাত্রির নামাজ বলতে ইশার নামাজকে বোঝানো হয়েছে। ইহুদীরা ইশার নামাজ পড়তো না। কারণ, তাদের ধর্মমতে ইশা ফরজ ছিলোনা।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বলেছেন, এক রাতে আমরা ইশার নামাজের জন্য অপেক্ষমান ছিলাম। এক তৃতীয়াংশ রাত্রি গত হওয়ার পর রসুল স. মসজিদে এলেন। বিলম্বের হেতু কি, আমরা জানতাম না। রসুল স. বললেন, তোমরা ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীরা নামাজের জন্য প্রতীক্ষমান থাকেনা। উম্মতের

কষ্ট হবে মনে না করলে আমি এরকম সময়েই নামাজ আদায় করতাম। অতঃপর তিনি ইকামতের নির্দেশ দিলেন এবং সকলকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। মুসলিম।

আমি বলি, রসুল স. এর উল্লেখিত বাক্য ছিলো তাহাজ্জুদ নামাজ সম্পর্কে। ইশা সম্পর্কে নয়। এই আয়াতে এই ইঙ্গিতই দেয়া হয়েছে যে, রাত্রিকালে নামাজে দন্ডায়মান হওয়া ছিলো সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ নিয়ম। ইশার নামাজে বিলম্ব একটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার। সাধারণ নিয়ম নয়। আয়াত নাজিল হয়েছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই। বোখারী ও মুসলিমে অবশ্য একথার উল্লেখ নেই।

আতা বলেন, রাত্রিকালে নামাজরত দল বলতে নাজরানের চল্লিশ জন, হাবসার তিরিশ জন এবং রোমের আটজন খৃষ্টানের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা রসুলে পাক স. কে তাঁর পৃথিবীতে আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই বিশ্বাস করতেন। তাঁর স. হিজরতের পূর্বে তাঁরা ছিলেন আনসারদের বন্ধু। তাঁদের আনসার বন্ধুরা হলেন, আসাদ বিন জারারাহ, বারা বিন মারুর, মোহাম্মদ বিন মুসলিমাহ্, এবং আবু কাইস সেরমা বিন আনাস। মিল্লাতে ইব্রাহিম সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন তারা। স্ত্রী সহবাসের পরে গোসল করে যা জানতেন, তা পালন করতেন। রসুল স. এর আবির্ভাবের পর তাঁরা তাঁর স. এর প্রতি ইমান আনলেন এবং সাহায্যকারী হলেন।

'তারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী। তারা ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে এবং উত্তম কাজে পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী হয়'। রসুল স. এরশাদ করেন, বার্ধক্যের শক্তিহীনতা এবং স্মৃতিভ্রষ্টতা আসার পূর্বে অথবা রোগাক্রান্ত হয়ে ক্ষমতাহীন হওয়ার পূর্বে এবং নৈরাশ্য আসার আগে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করো। বর্ণনা করেছেন বায়হাকী, আবু উমামা থেকে।

ইহুদী চরিত্রের দোষগুলো হচ্ছে, সত্যবিচ্যুত হয়ে উদাসীনতায় রত থাকা, শিরিক করা, আল্লাহ্তায়ালার গুনাবলী সম্পর্কে বঙ্কিম বিশ্বাস এবং আখেরাত সম্পর্কে বিকৃত ধারণা। তারা মন্দ কাজে প্ররোচিত করতো, সৎকাজের প্রতিবন্ধক হতো এবং অতি দ্রুত পতিত হতো অসততায়। এই আয়াতে ইহুদীদের মন্দ স্বভাবের বিপরীত বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ পুণ্যবানদের চরিত্রে সম্যক বিদ্যমান। যাঁরা সরল অন্তঃকরণ এবং পবিত্র প্রবৃত্তির অধিকারী তাঁদের অন্তর বাহির উভয়ই পবিত্র। আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন, তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করা হবে। তাঁরাই সজ্জন, মুত্তাকী।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ مَثَلُ
مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ
حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ
دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ
مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
الْآيَاتِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ○

❐ যাহারা সত্য — প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্তুতি আল্লাহ্‌র নিকট কখনও কোন কাজে লাগিবেনা। তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

❐ এই পার্থিব জীবনে যাহা তাহারা ব্যয় করে তাহার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, যাহা যে জাতি নিজেদের প্রতি জুলুম করিয়াছে তাহাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতি কোন জুলুম করেন নাই, তাহারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

❐ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিওনা; তাহারা তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে ত্রুটি করিবে না; যাহা তোমাদিগকে বিপন্ন করে তাহাই তাহারা কামনা করে। তাহাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাহাদের হৃদয় যাহা গোপন রাখে তাহা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর।

সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বৈভব, সম্পদ এবং সন্তান-সন্তুতি আল্লাহ্‌র কাছে কোনো কাজে লাগেনা। তাদের অগ্নিবাস চিরস্থায়ী। পার্থিব জীবনে তারা যে সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করে তার উপমা দেয়া হয়েছে এরকম — যেনো ভয়ানক ঠান্ডা

বাতাস কোনো শস্যক্ষেত্রকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। কাফেরদের সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্র বিভিন্ন রকম। যেমন, রসুলপাক স. এর শত্রুতা সম্পাদনার্থে ব্যয় অথবা আত্মম্ভরিতা প্রকাশের জন্য ব্যয়। কাফের কোরাইশদের যুদ্ধপ্রস্তুতি সংক্রান্ত খরচ, মূর্তি প্রস্তুত সংক্রান্ত খরচ, ইহুদী আলেমদের জন্য ইহুদীদের সম্পদ ব্যয়, মুনাফিকদের অসৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত খরচ — এসমস্ত কিছুই নিষ্ফল। যদিও এসমস্তের পিছনে রয়েছে তাদের মনগড়া পুণ্যার্জনের ইচ্ছা। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, ভয়ানক ঠান্ডা বাতাস অর্থ অতি উত্তপ্ত লু হাওয়া। অতিশীতল অথবা অতি উত্তপ্ত ঝঞ্জা বায়ু যাই হোক না কেনো, বাতাসের ঝন্‌ঝাক্ষুব্ধতা শস্যক্ষেত্রকে অথবা শস্যরাজিকে তেমনিভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমন ধ্বংস সাধন করে নফসানিয়াত (প্রবৃত্তিপরায়ণতা) নির্মল মানবতাকে। এভাবেই কাফেররা (সত্য প্রত্যাখানকারীরা) হয় আত্মঅত্যাচারী। আপন নফসের উপর জুলুমকারী। তাদের এহেন পাপাচরণকে তারা নিজেরাই স্বাগত জানিয়েছে। আল্লাহ্ তাদের উপর কোনো জুলুম করেননি।

ইবনে জারীর এবং ইবনে ইসহাক, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, কতিপয় মুসলমান তাদের ইহুদী প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতেন। মূর্খতার যুগ থেকেই তাদের এ বন্ধুত্ব চলে আসছিলো। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, হে ইমানদারগণ! স্বসম্প্রদায়ভূত ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোর না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসীদের সঙ্গে অবিশ্বাসীদের বন্ধুত্ব অসম্ভব। কারণ, উৎকৃষ্টতা কখনো নিকৃষ্টতার সঙ্গে সমীভূত হয়না। এতে মুসলমানদের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। মন্দের সঙ্গে সম্পর্ক মন্দের, ভালোর সঙ্গে সম্পর্ক ভালোর, এটাই নিয়ম। এতে করে আরো বোঝা যায়, মন্দের সংসর্গ অপেক্ষা নিঃসঙ্গতা উত্তম। এবং নিঃসঙ্গতা অপেক্ষা উত্তম মানুষের সাহচর্য শ্রেয়। সুতরাং রাফেজী, খারেজী এবং অন্যান্য বেদাতীদের সঙ্গেও অন্তরঙ্গতা বৈধ নয়।

কাফেরদের প্রচেষ্টা সর্বাত্মক। তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে উদ্যত। মুসলমানদের ক্ষতিসাধন করাই তাদের সার্বক্ষণিক পরিকল্পনা। মুসলমানেরা বিপন্ন হোক, ক্ষতিগ্রস্ত হোক — এটাই তাদের একমাত্র কামনা। তাদের থেকে বাহ্যিক বিদ্বেষ যা প্রকাশ পায় তদপেক্ষা তাদের অন্তরের অবস্থা আরো বেশী ভয়াবহ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নিদর্শন বিবৃত করেছেন। তাই মুমিনদের উচিত অন্য মুমিনদের সঙ্গে যেনো অন্তরঙ্গতা স্থাপন করে এবং কাফেরদের প্রতি যেনো শত্রু মনোভাবাপন্ন হয়। মুমিনদের জন্য এরকম শত্রুতা রাখা ওয়াজিব। তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো কাফের যদি ইসলাম গ্রহণের কারণে দুশমনি না করে, ফেতনা ফাসাদ যদি তার উদ্দেশ্য না হয় অথবা আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশী হওয়ার কারণে যদি মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চায় তবে এ রকম

সুসম্পর্ক বজায় রাখতে দোষ নেই। যেমন, মুসলমান হওয়ার পূর্বে হজরত আব্বাস রসুল স. এর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতেন। তাঁর স. সঙ্গে আবু তালেবও এরকম শুভ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন।

হজরত আব্বাস বর্ণনা করেন, আমি রসুল স. এর নিকট আরজ করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আবু তালিব কি আপনার শুভাকাঙ্খী? তিনি তো দেখি আপনার আশপাশেই থাকেন (আপনার হেফাজত করেন)। আপনার প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবাপন্নদের প্রতি রাগান্বিত হন। তিনি স. বললেন, তাঁর টাখনু পর্যন্ত আগুনে প্রবিষ্ট থাকবে। আমাকে না পেলে তিনি হতেন দোজখের সর্বনিম্ন স্তরবাসী। মুসলিম। বায্‌যার, হজরত জাবের থেকে এবং মুসলিম, হজরত হোজায়ফা ও আবু সাঈদ খুদরী থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১১৯, ১২০।

هَٰٓأَنتُمْ أُو۟لَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۝ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

❐ দেখ তোমরাই তাহাদিগকে ভালবাস; কিন্তু তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না। এবং তোমরা সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস কর। তাহারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন তাহারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি'; কিন্তু তাহারা যখন একা হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তাহারা নিজেদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দাঁতে কাটিয়া থাকে। বল, আক্রোশেই তোমরা মর। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

❐ তোমাদের মঙ্গল হইলে তাহারা দুঃখিত হয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হইলে তাহারা আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং সাবধানী হও তবে তাহাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

আল্লাহ্ মুমিনদেরকে এই মর্মে সাবধান করে দিচ্ছেন যে, হে মুমিনগণ! তোমরা তো সরল বিশ্বাসী বলে অন্তরে লালন করো নিষ্কলুষ ভালোবাসা। কিন্তু কাফেররা বঙ্কিম পথানুসারী। তাদের ধর্মমত ভিন্ন। তাই তাদের অন্তরে তোমাদের জন্য কোনো ভালোবাসাই নেই। তোমরা সকল আসমানী কিতাবকে মান্য করো। যেমন মেনে নাও কোরআনকে, তেমনি তওরাতকেও। কিন্তু কাফেররা কোরআনকে মানে না, তওরাতের প্রতিও তাদের পূর্ণ মান্যতা নেই। সত্যের প্রতি তোমাদের দৃঢ়তা যতোটুকু, বাতিলের প্রতি তাদের দৃঢ়তা তদপেক্ষা বেশী। তবু দেখো তাদের মুনাফিকি কিরকম, তোমাদের সাথে মিলিত হলে তারা বলে, আমরাও তোমাদের মতো মোহাম্মদ স. কে মানি, কোরআনকেও মানি। কিন্তু তারা যখন স্বসমাজভুক্ত থাকে তখন তোমাদের সত্যনিষ্ঠতা দেখে তোমাদের কোনো ক্ষতি করার পথ না পেয়ে আক্রোশে ফেটে পড়ে। তোমাদের সামনে তারা নিজেদেরকে ইমানদার বলে জাহির করে এজন্য যে, এছাড়া তাদের গত্যান্তর নেই।

আল্লাহ্ পাক, নবী পাক স. অথবা সকল মুমিনকে কাফেরদের প্রতি এই বদদোয়া দিতে হুকুম করছেন যে, ক্রোধের আগুনে জ্বলে পুড়ে ভষ্ম হও তোমরা। আল্লাহ্তায়ালা কাফেরদের অনিষ্ট চিন্তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। কাফেরদের অন্তরের প্রজ্জ্বলিত ক্রোধাগ্নি সম্পর্কেও তিনি জানেন। তাই এরশাদ হয়েছে, হে মুমিনেরা তোমরা জানোনা, তাই আল্লাহ্ তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, তোমরা কাফেরদেরকে ঘৃণা করো। তাদের বাহ্যিক ভালোবাসায় আকৃষ্ট হয়ো না। তোমাদের কল্যাণ তাদের কাছে অসহনীয়। যুদ্ধবিজয়, পার্থিব শ্রীবৃদ্ধি, গনিমতের সম্পদ লাভ অথবা প্রতিবন্ধকতাহীন জীবন যাপন তাদের জন্য বড়ই কষ্টের কারণ। তোমাদের সামান্য কল্যাণও তারা সহ্য করতে পারেনা। পক্ষান্তরে যুদ্ধে পর্যুদস্ত হলে, উপার্জন কমে গেলে অথবা তোমাদের মৃত্যু হলে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কিন্তু হে মুমিনগণ! তোমরা যদি বিপদে ধৈর্যধারণ করো, আল্লাহ্ ভীতিকে আশ্রয় করে সাবধানী হও এবং তাদের সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপন থেকে বিরত থাকো, তবে তাদের অকল্যাণ কামনা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা।

ধৈর্য ও আল্লাহ্ভীতি অবলম্বনকারী সাবধানী ব্যক্তিগণ দুঃখের তীব্রতা কম অনুভব করেন। কারণ, বিপদের বিনিময়ে পুন্যপ্রাপ্তির আশা সদা উদ্ভাসিত থাকে তাঁদের সামনে। তাঁরা তাই অনুগ্রহের আস্বাদ অপেক্ষা বিপদগ্রস্ততায় অধিকতর আনন্দচিত্ত হন। প্রেমাস্পদের নিকট থেকে আগত দুঃখের আস্বাদ অনুগ্রহের আস্বাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। এরকম বিপদে যেহেতু প্রেমাস্পদের অভিপ্রায় সংযুক্ত থাকে, তাই প্রেমিকেরা এরকমই কামনা করেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, একদিন

আমি রসুল স. কে অনুসরণ করছিলাম। তিনি স. এরশাদ করলেন, বৎস। আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কিত হও। আল্লাহ্‌ই তোমাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ্‌র প্রতি সম্ভ্রমশীল হও, তবে তুমি তাঁকে সঙ্গে পাবে। আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থী হও, যদি কোনো প্রয়োজন অনুভব করো। জেনে নাও, যদি সমস্ত মানুষ সম্মিলিতভাবে তোমার প্রতি কোনো কিছু নিষিদ্ধ করে, তবে সফলকাম হবে না আল্লাহ্‌তায়ালার নির্ধারণ ব্যতিরেকে। আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতোটুকু ক্ষতিসাধন করার ক্ষমতাও কারো নেই। তকদির লিপিবদ্ধ করার কলমকে স্থগিত করা হয়েছে। শুকিয়ে গিয়েছে লেখার কালি। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন হাদিসটি হাসান সহীহ্‌।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার এমন একটি আয়াত জানা আছে যা সমস্ত মানুষের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন, 'যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তাকে মুক্তির পথ দেখান এবং অকল্পনীয় সূত্র থেকে তাকে রিজিক দান করেন।' আহমদ, ইবনে মাজা, দারেমী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন, আমার বান্দা যদি আমার পূর্ণ অনুগত হতো, তবে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করতাম রাত্রিতে এবং দিনকে করতাম মেঘমুক্ত। বিদ্যুতের আওয়াজও তারা শুনতে পেতো না (অর্থাৎ দিবা ভাগের ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য সাংসারিক কাজের ক্ষতি হতো না এবং চতুস্পদ জন্তুরাও পিপাসিত ও ক্ষুধার্ত থাকতো না। কারণ, বৃষ্টিপাতের ফলে পিপাাসার পানি পাওয়া যেতো এবং তৃণরাজি উৎপন্নের ব্যবস্থা হতো)। আহমদ।

হজরত সুহাইব বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীদের জীবন বিস্ময়কর। তাদের সকল কিছুই কল্যাণ। অবিশ্বাসীরা এরকম কল্যাণ লাভের উপযুক্ত নয়। মুমিনেরা অনুগ্রহমন্ডিত হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই কৃতজ্ঞতা বোধই কল্যাণ লাভকে অপরিহার্য করে। আর বিপদগ্রস্ত হলে তারা ধৈর্যধারণ করে। আর এই সহনীয়তাই কল্যাণ অর্জনকে অবধারিত করে দেয়। মুসলিম।

বিশ্বাসীদের কর্ম সমুহকে পরিবেষ্টন করে আছেন আল্লাহ্‌ স্বয়ং। তাই কাফেরদের ক্ষতি থেকে তারা নিরাপদ। তিনি কাফেরদেরকে শাস্তি দিবেন। ইচ্ছা করলে কাফেরদের গোপন চক্রান্ত থেকে রক্ষা করবেন, আবার ইচ্ছা করলে কাফেরদের দিক থেকে আগত বিপদ মুসিবতের বিনিময় প্রদান করে ধন্য করবেন।

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

❐ স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার পরিজন বর্গের নিকট হইতে প্রত্যুষে বাহির হইয়া যুদ্ধের জন্য বিশ্বাসীগণকে ঘাঁটিতে স্থাপন করিতেছিলে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ;

❐ 'যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং আল্লাহ্ উভয়ের সহায়ক ছিলেন। আল্লাহের প্রতিই যেন বিশ্বাসীগণ নির্ভর করে।'

হজরত হাসান বসরী বলেন, প্রসঙ্গটি বদর যুদ্ধের। হজরত মুকাতিল বলেন, আহযাব যুদ্ধের। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, উহুদ যুদ্ধের - এটাই বিশুদ্ধ মত।

ইবনে আবী হাতেম এবং আবুল ইয়ালী বর্ণনা করেন, হজরত মুসাওয়ার বিন মাখরিমা, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফকে বললেন, আমাদেরকে উহুদ যুদ্ধের ঘটনা বলুন। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ বললেন, সুরা আলে ইমরানের একশত বিশ আয়াতের পরের আয়াত পড়লে ঘটনাটি জানতে পারবে। আল্লাহ্তায়ালা সেখানে বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে দু'টি দল সাহস হারাতে বসেছিলো। কাফেরদের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভই ছিলো তাদের বাসনা।' অন্যত্র বলেছেন, 'মৃত্যুর আশংকা করছিলে তোমরা।' আরেক স্থানে উল্লেখ করেছেন, 'যদি তিনি মৃত্যু বরণ করেন অথবা নিহত হন তবে কি তোমরা তাঁর আদর্শচ্যুত হয়ে বিপরীত দিকে প্রত্যাবর্তন করবে?' সেই উহুদ যুদ্ধের দিন শয়তান চিৎকার করে বলেছিলো, মোহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ্পাক তখন মুসলমানদেরকে শান্ত করবার জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন যেনো তন্দ্রাবিভোরতার মাধ্যমে তাদের শংকা ও অক্ষমতা বোধ দূর হয়ে যায়।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আলে ইমরানের ষাটটি আয়াত উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ওই যুদ্ধে অনুপস্থিত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে।

মুজাহিদ, কালাবী, ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. সকাল বেলা হজরত আয়েশার ঘর থেকে বের হয়ে পদব্রজে উহুদ প্রান্তরে পৌঁছলেন এবং যেমন করে তীরকে সোজা করা হয়, তেমনি বিন্যস্ত করতে লাগলেন আপন বাহিনীকে। ইবনে জারীর এবং বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে এবং আবদুর রাজ্জাক মুসান্নাফ গ্রন্থে মামুরীর মাধ্যমে জুহুরীর বিবরণ দিয়েছেন এরকম, তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের বারো তারিখ বুধবারে তিন হাজার মুশরিক সৈন্য উহুদ প্রান্তরে পৌঁছলো। রসুল স. পরামর্শ সভা বসালেন। আবদুল্লাহ্ বিন উবাইকেও ডাকা হলো। ইতোপূর্বে কোনো পরামর্শ সভায় রসুল স. তাকে ডাকেননি। আবদুল্লাহ্ এবং অধিকাংশ আনসার আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! মদীনায় অবস্থান করাই শ্রেয়। মদীনার বাইরে গেলে শত্রুরাই জয়লাভ করতে পারে। আর এখানে অবস্থান করলে আমাদেরই জয়লাভের সম্ভাবনা। আপনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমাদের আর শংকা কিসের। মুশরিকেরা যদি আর অগ্রসর না হয়, তবে তো ভালোই। যদি এগিয়ে আসে, তবে আমাদের নেতৃস্থানীয় বীরেরা তাদেরকে প্রতিহত করবে। বালক ও রমনীরা উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করবে। তাদের প্রত্যাবর্তন হবে অকৃতকার্যতার সঙ্গে।

রসুল স. এই অভিমতটি পছন্দ করলেন। প্রবীন মোহাজির এবং আনসারদের অভিমতও এরকমই ছিলো। কিন্তু হজরত হামজা, হজরত সা'দ বিন উবাদা, হজরত নোমান বিন মালেক এবং আনসারদের কতিপয় যুবক (যারা অপ্রাপ্ত বয়স্কতার কারণে বদরে যুদ্ধ করতে পারেনি) এদের ইচ্ছা ছিলো, শহীদ হওয়ার এই সুযোগ গ্রহণ করতেই হবে। আল্লাহ্তায়ালা উহুদ যুদ্ধের দিন তাদের অভিলাষ পূর্ণ করেছিলেন। তাদের অভিমত ছিলো, ওই সমস্ত কুকুরদের দিকে ধাবিত হতে হবে যেনো তারা আমাদেরকে দুর্বল অথবা কাপুরুষ ভাববার সুযোগ না পায়।

রসুল স. বলেছেন, আমি স্বপ্নে গাভী দেখেছি। এর অর্থ উত্তম। স্বপ্নে আরো দেখলাম, আমার তলোয়ারের ধার নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এর অর্থ পরাজয়। আরো দেখলাম, আমি আমার হাত মজবুত বর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছি, এর অর্থ মদীনায় অবস্থান করাই উত্তম। তিনি স. চাইছিলেন যে, শত্রুরা যেনো মদীনায় এসে পড়ে এবং এখানেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আহমদ, দারেমী এবং নাসাঈর বর্ণনা এরকম, আমি আমার হাতকে মজবুত জেরার মধ্যে প্রবিষ্টাবস্থায় দেখেছি এবং গাভী জবাই করতে দেখেছি। বুঝলাম, মজবুত জেরা অর্থ মদীনা এবং গাভী জবাই করতে দেখাও উত্তম আলামত।

বায্যার ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন আবু সুফিয়ান তার সাথীদেরকে নিয়ে উহুদ প্রান্তরে তাবু ফেললো, তখন রসুল স. সাহাবীগণ বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার তরবারী জুলফিকার অবনত।

আরো দেখলাম, একটি গাভীকে জবাই করা হচ্ছে, এসমস্ত হচ্ছে মুসিবতের আলামত। স্বপ্নে আরো দেখেছি আমার শরীর যুদ্ধবস্ত্রাচ্ছাদিত। এই মদীনা তোমাদেরই শহর। ইনশাআল্লাহ্ তারা এই শহরে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না।

ইবনে ইসহাক, ইবনে উকবা এবং আবু সাঈদ বর্ণনা করেন, রসুল স. এই স্বপ্ন দেখেছিলেন জুমআর রাত্রিতে। ওরওয়া বলেছেন, তরবারী অবনত হওয়া ছিলো তাঁর স. এর পবিত্র অবয়বে আঘাতের প্রতি ইঙ্গিত। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তরবারী অবনত হওয়ার অর্থ ছিলো, আপনজনের মৃত্যু। রসুল স. বলেছেন, আমি আমার তরবারীকে দুইবার আন্দোলিত করলাম। প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থা উত্তম পরিদৃষ্ট হলো।

হজরত হামজা বলেছিলেন, যিনি আপনার উপর কোরআন নাজিল করেছেন সেই আল্লাহ্র কসম! মদীনার বাইরে গিয়ে আমি তাদেরকে প্রতিহত না করা পর্যন্ত পানাহার করবো না। হজরত হামজা জুমআর দিন রোজাদার ছিলেন। পরের দিনও রোজা রেখেছিলেন।

হজরত নোমান বিন বশীর আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আমাদেরকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন না। যার অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! জান্নাতে আমি প্রবেশ করবোই। রসুল স. বললেন, কীভাবে? নোমান বললেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ভালোবাসি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ স. আল্লাহ্র রসুল। যুদ্ধে কিছুতেই আমি পশ্চাদাপসরণ করবো না। রসুল স. বললেন, তুমি সত্যবাদী। ওই দিনই হজরত নোমান শহীদ হয়েছিলেন।

মালেক বিন সানান খুদরী এবং আয়াজ বিন আতীকও মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার ব্যাপারে অত্যধিক উৎসাহী ছিলেন। তাঁদের এই উৎসাহব্যঞ্জকতার মধ্যে সকলকে নিয়ে জুমআর নামাজ আদায় করলেন রসুল পাক স.। সদুপদেশ দিলেন, অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে বললেন। শেষে জানিয়ে দিলেন যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও, তবে বিজয় তোমাদেরই। শত্রুর প্রতি ধাবিত হওয়ার আদেশ শুনে সবাই আনন্দিত হলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কারো কারো মনঃপূত হলো না। আসরের নামাজের পর তিনি স. রমনী ও শিশুদেরকে উঁচু টিলায় নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। হজরত আবুবকর ও হজরত ওমরকে সঙ্গে নিয়ে গৃহাভ্যন্তরে গেলেন। জনতা সারিবদ্ধ হয়ে রসুল স. এর আগমন প্রতীক্ষায় রইলেন। এমন সময় হজরত সা'দ বিন মুআজ এবং হজরত উসায়েদ বিন হুজাইর এসে প্রতিক্ষারত জনতাকে বললেন, তোমরা রসুল স. এর অভিমত বিরোধী। তাঁর প্রতি আকাশ থেকে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। তোমাদের প্রতি হয় না। অতএব এটাই সঙ্গত যে, তোমরা তাঁর প্রতি নির্ভর করো। যে নির্দেশ তিনি দেন, তাই

পালন করতে সচেষ্ট থাকো। সহসা উপস্থিত হলেন রসুল স.। তিনি তখন রণবস্ত্র পরিহিত এবং অস্ত্রধারী। কটিদেশে কোষাবদ্ধ অসি। মস্তক শিরোস্ত্রাণশোভিত। জনতা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা অত্যন্ত অনুচিত কাজ করেছি। আপনার অভিমতের বিরুদ্ধাচারী হয়েছি। এখন আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে ক্ষান্ত হোন। তিনি স. বললেন, আমি তো এটাই বলেছিলাম। কিন্তু তোমরা সমর্থন করোনি। রণসাজে সজ্জিত হওয়ার পর যুদ্ধ সম্পাদনের পূর্বে রণসজ্জা পরিত্যাগ করা নবীদের সম্মানের অনুকূল নয়। সিদ্ধান্ত অনড়। চলো, আল্লাহ্র উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে যুদ্ধযাত্রা করো। ধৈর্যশীল হও। বিজয় তোমাদেরই।

একটু অগ্রসর হতেই রসুল স. দেখলেন, মালেক বিন আমর নাজ্জারীর জানাজা প্রস্তুত। তিনি জানাজা পড়লেন। তারপর বহির্বাটিতে এসে তাঁর ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। ঘোড়াটির নাম সাকিব। স্কন্ধে ধনুক তুলে নিয়ে অগ্রসর হলেন তিনি। তাঁর বামে দক্ষিণে চলছিলেন সা'দ বিন উবাদা এবং সা'দ বিন মুআজ। সকল সেনানীকে নিয়ে তিনি যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হলেন। সেখানে দেখলেন মদীনা থেকে আগত আরেকটি শক্তিশালী দল। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? বলা হলো, এরা আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের ইহুদীমিত্র দল (সাহায্য করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলো তারা)। রসুল স. জানতে চাইলেন, তারা কি মুসলমান হয়েছে? উত্তর দেয়া হলো, না। তিনি স. বললেন, মুশরিকদের সাহায্য আমরা চাইনা। একটু অগ্রসর হয়ে তিনি পৌছলেন শাইখাইন নামক স্থানে। সেখানকার দু'টি টিলার সম্মিলিত নাম ছিলো শাইখাইন।

চৌদ্দ বছর বয়সের কতিপয় বালক এসে উপস্থিত হলো। তারা সেনাদলে ভর্তি হতে ইচ্ছুক। রসুল স. তাদের ফিরিয়ে দিলেন। তাদের সংখ্যা ছিলো সতের জন। এরপর এগিয়ে এলো পনের বছর বয়সী কতিপয় বালক। তাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন ওমর, উসামা বিন জায়েদ, জায়েদ বিন আরকাম, বারা বিন আজীব, আবু সাঈদ খুদরী এবং আউস বিন সাবেত। রাফে বিন খাদিজকে ফিরিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু যখন বলা হলো তিনি দক্ষ তীরন্দাজ, তখন রসুল স. তাকে গ্রহণ করলেন। সামুরা বিন জুন্দুব বললেন, রাফে বিন খাদিজকে তো নেয়া হলো আর আমাকে ফিরিয়ে দেয়া হলো। অথচ আমি মল্লযুদ্ধে তাকে পরাস্ত করতে পারবো। এই সংবাদ রসুল স. এর কানে এলে তিনি বললেন, দু'জনের মধ্যে কুস্তি লাগিয়ে দাও। কুস্তি হলো। সামুরা রাফেকে পরাজিত করলেন। তখন সামুরাকেও সেনাদলের অন্তর্ভূত করা হলো।

সূর্য অস্তমিত হলো। আযান দিলেন হজরত বেলাল। রসুল স. তাঁর সহচরদের নিয়ে মাগরিবের নামাজ সম্পন্ন করলেন। ক্রমে এগিয়ে এলো ইশা। আযানের পর ইশার নামাজও সমাপ্ত হলো। রাত্রি গভীরতর হলো। মোহাম্মদ বিন মুসলিমার

নেতৃত্বে পঞ্চাশ জনের একটি দল রাতের পাহারাদার নিযুক্ত হলেন। অবশিষ্ট সৈন্যরা বিশ্রামের অনুমতি পেলেন। রসুল স. শয্যা গ্রহণ করলেন। নীরবে অতিবাহিত হলো শাইখাইনের রাত্রি। ফজরের নামাজ সমাপনান্তে রসুল স. বললেন, এমন কেউ কি আছো যে আমাকে শত্রুর সম্মুখবর্তী এই পাহাড় থেকে কিছুক্ষণের জন্য অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারে। আবু খাইসুমা দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল ! আমি পারবো। তিনি রসুল স. কে বনী হারেসার মাঠ ও বাগান ঘেঁষে নিয়ে চললেন। এসে পৌছলেন মিরবা বিন কানাতীর বাগানে। সে ছিলো মুনাফিক। তার দু'ই চোখ ছিলো দৃষ্টিহীন। রসুল পাক স. এর আগমন টের পেয়ে সে বলতে লাগলো, তুমি যদি রসুল হয়ে থাকো, তবে জেনে রাখো এ বাগানে প্রবেশের অনুমতি নেই। সে হাতে কিছু মাটি তুলে নিয়ে বললো, যদি নিশ্চিত বুঝতাম এই মাটি নিক্ষেপ করলে তোমার মুখের উপর পড়বে তবে এক্ষুণি ছুড়ে মারতাম। তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন রসুল স. এর সাথীগণ। রসুল স. বললেন, তাকে হত্যা কোর না, সে অন্ধ। কিন্তু রসুল স. এর নিষেধাজ্ঞার পূর্বেই সা'দ বিন জুবদা আশহালী ধনুকের আঘাতে তাকে আহত করলেন।

সহস্র সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে রসুল স. উহুদ অভিমুখে চললেন। বিভিন্ন বর্ণনায় মোট লোকসংখ্যা নয়শত পঞ্চাশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শত্রুর সম্মুখবর্তী হওয়ার আগেই মুনাফিক আবদুল্লাহ্ বিন উবাই তার তিনশত লোককে নিয়ে মদীনায় ফিরে গেলো। সে বলতে লাগলো, আমরা ও আমাদের সন্তানেরা জীবন দিতে যাবো কেনো? আবু জাবের সালামী তাদেরকে বললেন, যেওনা তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদেরই। আবদুল্লাহ্ বললো, আমরা যদি যুদ্ধবিদ্যা জানতাম তবে তোমাদের সঙ্গে থাকতাম।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন মুসলমানদের সাতশতজন অকুতভয় যোদ্ধা। ঘোড়া মাত্র দু'টি। একটি রসুল স. এর অপরটি হজরত আবু বুরদার। ইবনে উকবা বর্ণনা করেন, মুসলমান সেনাদলে আর কোনো অশ্বারোহী ছিলো না। খাজরাজ গোত্রের বনু সালমা এবং আউস গোত্রের বনু হারেসা ছিলেন মুসলিম সেনাদলের দুই অন্যতম বাহু। এই গোত্র দু'টিও আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের সাথে ফিরে যেতে চাইলো। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁদেরকে হেফাজত করলেন, তাঁরা ক্ষান্ত হলেন। সেদিকে লক্ষ্য করে এরশাদ হয়েছে, ওই দু'টি দল যারা সাহসিকতা থেকে প্রায় স্খলিত হয়ে যাচ্ছিলো, আল্লাহ্তায়ালা সহায় ছিলেন বলে শেষাবধি তারা রক্ষা পেয়েছিলো। ইমানদারদের উচিত তারা যেনো আল্লাহ্নির্ভর হয়। মুনাফিকদের পশ্চাদাপসরণ এবং ইত্যাকার সকল প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, এই আয়াত আমাদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরাই পশ্চাদাপসরণ করতে চেয়েছিলাম। এরকম অসুন্দর

প্রবণতা সত্ত্বেও আমরা এ কারণে আনন্দিত যে, আল্লাহ্তায়ালা আমাদের মতো অকিঞ্চনদেরকে তাঁর বিশেষ সহায়তা দ্বারা আবৃত করেছেন। আল্লাহ্তায়ালার এই অনুপম অনুগ্রহ প্রাপ্তিতে আমরা আনন্দিত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১২৩, ১২৪।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ۝

❒ বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ্ তো তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

❒ স্মরণ কর, যখন তুমি বিশ্বাসীগণকে বলিতেছিলে, ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন সহস্র ফেরেশতা দ্বারা তোমাদিগকে সহায়তা করিবেন?

সংখ্যাল্পতা এবং যুদ্ধোপকরণের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছিলেন। এই ঘটনা বিস্মৃত হওয়া ঠিক হয়নি। ওই কথা মনে থাকলে পশ্চাদাপসরণের চিন্তা মাথায় আস্তো না।

অনেকের মতে বদর মক্কা, মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান। কেউ কেউ বলেছেন, সেখানকার একটি কূপের নাম বদর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ওই কূপটির মালিকের নাম বদর। এরকম বর্ণনা করেছেন শা'বী। ওই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিলো তিনশত। উট ছিলো সত্তরটি। সৈন্যরা তাদের উপর পালাক্রমে আরোহী হতেন। ঘোড়া ছিলো মাত্র দু'টি। একটি হজরত মেকদাদের অপরটি হজরত জোবায়ের বিন আওয়ামের। অপ্রতুল রণপ্রস্তুতি সত্ত্বেও বিজয় লাভের এই দুর্লভ নেয়ামতের কারণে এই আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্কে ভয় করো যাতে কৃতজ্ঞচিত্ততার হক আদায় হয়।

তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণের প্রসঙ্গটিও বদর যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত। হজরত কাতাদা বলেছেন, ঘটনাটি ছিলো বদর প্রান্তরের। ইবনে আবী শা'বা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে এবং ইবনে আবী হাতেম শা'বীর উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, বদর প্রান্তরে রসুল স. ও মুসলমান বাহিনী জানতে পারলেন যে, করজ বিন জাবের

যুদ্ধরত মুশরিকদেরকে সাহায্য করতে চায়। এই সংবাদ মুসলমান বাহিনীর নিকট ছিলো অত্যন্ত পীড়াদায়ক। একদিকে নিজেদের সৈন্যস্বল্পতা, রণসম্ভারের অপর্যাপ্ততা। অপরদিকে শত্রুদের সংখ্যাধিক্য ও রণোন্মত্ততা। এ অবস্থায় নৈরাশ্য তার ছায়া বিস্তার করে যাচ্ছিলো। তখন আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ সহায়তা সংবলিত সুসংবাদটি অবতীর্ণ হয়।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১২৫

بَلَىٰٓ ۚ إِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ○

❐ হ্যাঁ, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং সাবধান হইয়া চল তবে তাহারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমন করিলে আল্লাহ্ পাঁচ সহস্র চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিবেন।

পূর্ববর্তী আয়াতে তিন হাজার ফেরেশতার সহায়তা কি যথেষ্ট নয়, এরকম প্রশ্ন করে এই আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন, তিন হাজার কেনো; পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা আল্লাহ্পাক সাহায্য করবেন। তবে শর্ত হচ্ছে, ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ যুদ্ধে অটল থাকতে হবে এবং রসুল পাক স. এর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

আমি বলি, বাক্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করার জন্যই এরকম প্রকাশভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রথমে প্রশ্ন এবং প্রশ্নের পরপরই জবাব। অর্থাৎ তিন হাজার ফেরেশতাই কি যথেষ্ট নয়? সাথে সাথে বলা হয়েছে, হ্যাঁ তিন হাজার কেনো পাঁচ হাজার ফেরেশতার সহায়তা দেয়া হবে যদি তোমরা আক্রান্ত হও। এবং আক্রান্তাবস্থায় অবলম্বন করো ধৈর্য এবং তাকওয়া।

জ্ঞাতব্য ঃ তিবরানী এবং ইবনে মারদুবিয়া শিথিল সনদের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন, রসুল স. 'মুসাইয়্যিমীন' শব্দের অর্থ করেছেন, 'মোয়াল্লিমীন' — নিশানাধারী শিক্ষকবৃন্দ। তিনি (ইবনে আব্বাস) আরো বলেছেন, বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের নিশানা ছিলো কালো পাগড়ী এবং উহুদে তাদের নিশানা ছিলো লাল পাগড়ী।

ইবনে আবী শা'বা এবং ইবনে আবী হাতেম শা'বীর বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত করে বলেছেন, করজ বিন জাবের বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজয় সংবাদ শুনে লজ্জিত হয়েছিলো (কেননা বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ একরকম অসম্ভব ছিলো)। মুশরিকদের সাহায্য করা তার পক্ষে তো সম্ভবই নয়। আর পাঁচ হাজার ফেরেশতার

সাহায্যের অতিরিক্ত সাহায্যের প্রয়োজনও ছিলো না মুসলমান বাহিনীর। মুসাওয়িন অর্থাৎ চিহ্ন যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে কাতাদা এবং জুহাক বলেছেন, ফেরেশতাগণ তাদের ঘোড়াগুলোর কপাল, গলা বিশেষভাবে চিহ্নিত করে নিয়েছিলেন। ইবনে আবী শা'বা তার মুসান্নাফ গ্রন্থে আমর বিন ইসহাকের মুরসাল বর্ণনা উল্লেখ করেছে রসুল স. বদর যুদ্ধের দিন সাহাবীগণকে বললেন, তোমরাও আপনাপন নিশানা লাগিয়ে নাও। ফেরেশতারা তাঁদের লৌহ শিরোস্ত্রাণে শাদা পশমের নিশানা লাগিয়েছিলেন। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর। তিনি আরো লিখেছেন, এটাই ছিলো প্রথম যুদ্ধ এবং এটাই প্রথম নিশানা লাগানোর ঘটনা। ওরওয়া বিন জোবায়ের বলেন, ফেরেশতাগণ আবলাক নামক ঘোড়ার উপরে আরোহণ করেছিলেন (শাদা কালো মিশ্রিত রং কে আবলাক বলে)। তাঁদের মস্তকে ছিলো পশমের পাগড়ী। কিন্তু হজরত আলী ও হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাঁদের পাগড়ী ছিলো শাদা। পাগড়ীর প্রান্তদেশ ঝুলছিল তাঁদের স্কন্ধে। হিসাম বিন ওরওয়া এবং কালাবী বলেন, হলুদ বর্ণের পাগড়ী তাঁদের কাঁধ বরাবর ঝুলন্ত ছিলো।

কাতাদা বলেছেন, বদর যুদ্ধে মুসলমানেরা সুস্থির ছিলেন। অটল ছিলেন রসুল পাক স. এর নির্দেশের প্রতি। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে পাঁচ হাজার ফেরেশতার সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন। হাসান বলেন, এই পাঁচ হাজার ফেরেশতা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মুসলমানদের সাহায্যকারী হয়ে থাকবেন। তবে তাঁদের সাহায্য লাভের শর্ত হচ্ছে ধৈর্য ও তাকওয়া। হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ বর্ণনা করেন, বদর ব্যতীত অন্য কোনো যুদ্ধে ফেরেশতাগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করেন নি। তবে তাঁরা উপস্থিত থাকতেন। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সাহয্যের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকাই ছিলো তাঁদের দায়িত্ব।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বদর যুদ্ধে আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যদি তোমরা সুস্থির থাকো এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত হও, তবে সকল যুদ্ধেই সাহায্য লাভ করবে। কিন্তু আহ্যাবের যুদ্ধ ব্যতীত মুসলমানেরা অন্য কোনো যুদ্ধে পরিপূর্ণ সুস্থিরতা অবলম্বন করতে সক্ষম হননি। আহ্যাব যুদ্ধের সময় বনু কোরাইজা এবং বনু নাজিরদেরকে অবরোধ করার সময় নেমে এসেছিলো আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ সাহায্য। হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আউফা বর্ণনা করেন, আমরা বনী কোরাইজা এবং বনী নাজিরকে অবরোধ করলাম। কিন্তু জয়লাভ করতে সমর্থ হলাম না। রসুল স. পানি চাইলেন কিন্তু পেলেন না। হজরত জিবরাইল এসে বললেন, তোমরা রণসজ্জা ত্যাগ করেছো অথচ দেখো ফেরেশতাগণ এখনো অস্ত্রসজ্জিত। একথা শুনে রসুল স. একটি বস্ত্র চেয়ে নিয়ে তাঁর আপন মস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত করলেন। সকলকে কাছে ডাকলেন। আমরা প্রস্তুত হলাম এবং কোরাইজা ও নাজিরদের বস্তিতে গিয়ে পৌছলাম।

আমাদের সাহায্যকারী হিসেবে ছিলেন তিন হাজার ফেরেশতা। সহজেই জয়লাভ করলাম আমরা।

জুহাক ও ইকরামা বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতটি উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কিত (বদর সম্পর্কিত নয়)। উহুদ যুদ্ধে সাহাবীগণ অটলতা ও সাবধানতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন বজায় রাখতে সক্ষম হননি বলে আল্লাহ্তায়ালার প্রতিশ্রুত সাহায্য পাননি। মুজাহিদ ও জুহাক বলেছেন, বদরের পরাজয় কাফেরদেরকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলো তাই উহুদে এসেছিলো তারা প্রতিশোধস্পৃহা পূর্ণ করতে। বদরের মতো উহুদেও রসুল স. অটল ছিলেন। ছিলেন আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের প্রতি সমর্পিতপ্রাণ। তাই জিব্রাইল এবং মিকাইল ছিলেন তাঁর সাহায্যকারী। হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, উহুদের দিন আমি রসুল স. এর সাহায্যকারী রূপে শ্বেতবস্ত্র পরিহিত দুই ব্যক্তিকে যুদ্ধ করতে দেখেছি। যুদ্ধের আগে ও পরে কখনো আমি তাদেরকে আর দেখিনি। এই দুইজন ছিলেন হজরত জিব্রাইল এবং হজরত মিকাইল। বোখারী, মুসলিম।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেন, রসুল স. থেকে সবাই ছিলেন দূরবর্তী। তাঁর কাছে ছিলেন কেবল সা'দ বিন মালেক। তিনি তীর নিক্ষেপ করছিলেন। এক যুবক তীর সংগ্রহ করে দিচ্ছিলেন। তীর শেষ হয়ে গেলে এক যুবকের আকৃতিতে হজরত জিব্রাইল তীর এনে দিলেন। বললেন, আবু ইসহাক নিক্ষেপ করো। যুদ্ধ শেষ হলে ওই যুবকটিকে আর দেখা গেলোনা।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১২৬, ১২৭

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ۝

❒ তোমাদের জন্য সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত-প্রশান্তি-হেতু আল্লাহ্ ইহা করিয়াছেন — এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহের নিকট হইতেই হয়।

❒ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার অথবা লাঞ্ছিত করার জন্য; ফলে তাহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়।

প্রকাশ্য উপকরণের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া মানুষের স্বভাব। তাই আল্লাহ্তায়ালা প্রকাশ্য উপকরণ হিসেবে ফেরেশতার সহায়তার কথা উল্লেখ করেছেন যাতে নিশ্চিতি ও স্বস্তি লাভ হয়। বস্তুতপক্ষে মানুষ ও ফেরেশতা

সবকিছুই আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টি। তিনি কখনো মাধ্যমে কখনো বিনা মাধ্যমে সাহায্য সহায়তা প্রদান করেন। আবার কাউকে রাখেন সাহায্যবিহীন। তিনি সাহায্য করেন নিতান্ত অনুগ্রহের কারণেই। এরকম করতে তিনি বাধ্য নন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত আয়াজ আশআরী বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়ারমুকের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। সেনানায়ক ছিলেন পাঁচজন — হজরত আবু ওবায়দা, হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান, হজরত ইবনে হাসান, হজরত খালিদ বিন ওলীদ এবং হজরত আইয়াজ। হজরত ওমর নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধান সেনাপতি হবেন হজরত আবু ওবায়দা। আমরা হজরত ওমরকে লিখলাম, সামনে মৃত্যু। সাহায্য প্রেরণ করুন। হজরত ওমর প্রত্যুত্তরে লিখলেন, তোমাদের চিঠি পেয়েছি। তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করেছো। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এমন এক সত্তার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হতে বলছি, যাঁর সেনাবাহিনী সর্বক্ষণ বিদ্যমান। সেই পবিত্র আল্লাহ্তায়ালার শরণ যাঞ্চা করো। বদর যুদ্ধে রসুল স. এর যুদ্ধোপকরণ এবং সেনাসংখ্যা তোমাদের চেয়েও কম ছিলো। তবু তাঁরা বিজয়ী হয়েছিলেন। পত্র পাঠ মাত্র যুদ্ধে লিপ্ত হও। আমার নিকট থেকে কোনো সাহায্যের অপেক্ষা করো না। পত্র পাঠ মাত্র আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। শত্রুদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম চার ফারসাখ দূরে।

কাফেরদের একটি দলকে নিশ্চিহ্ন অথবা লাঞ্ছিত করার কথা বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে অথবা উহুদ যুদ্ধের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। বদরে কাফেরদের সত্তরজন নেতা মারা যায় এবং বন্দী হয় সত্তরজন। উহুদ যুদ্ধে কাফেরদের ষোলজন নেতা মারা গিয়েছিলো। প্রথমে বিজয় ছিলো মুসলমান বাহিনীর অনুকূলে। কিন্তু পরে রসুল পাক স. এর নির্দেশ পালনে শিথিলতার কারণে বিজয় পর্যবসিত হয়েছিলো পরাজয়ে।

নিরাশ করে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ কঠোরভাবে পশ্চাদাপসরণে বাধ্য করা। কামুস গ্রন্থে বলা হয়েছে, এর অর্থ অপদস্থ করা, ধ্বংস করা, প্রবল রোষের সাথে ফিরিয়ে দেয়া, লাঞ্ছনায় নিপতিত করে দেয়া ইত্যাদি। আমি বলি, এসমস্ত কথাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সাহায্যের মাধ্যমে কাফেরদের কাউকে ধ্বংস করে দেন এবং অবশিষ্টদেরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন।

মুসলিম এবং ইমাম আহমদ হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, উহুদ যুদ্ধে রসুল স. আহত হয়েছিলেন। তাঁর সামনের দাঁত ভেঙে গিয়েছিলো এবং পবিত্র অবয়ব হয়েছিলো রক্তাক্ত। তখন তিনি স. বলেছিলেন, এই সম্প্রদায় কিভাবে সত্যানুসারী হতে পারবে, যারা তাদের নবীর সাথে এরকম আচরণ করে — যে নবী তাদেরকে আল্লাহ্তায়ালার দিকে আহবান করছেন। তখন নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

❐ এবং তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হইবেন অথবা তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই; কারণ তাহারা সীমালংঘনকারী।

❐ আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্‌রেই। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই — এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ ও ইমাম বোখারীর মাধ্যমে হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি নিজে রসুল স. কে বলতে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, হে আল্লাহ, অমুক ব্যক্তির উপর লানত বর্ষণ করো। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আবু সুফিয়ানের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করো। হারেছ বিন হিসামের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করো। সোহেল বিন আমর এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়ার উপরও লানত বর্ষণ করো। পরবর্তীতে এরা সকলেই তওবা করেছিলেন। বোখারী হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

শায়েখ ইবনে হাজার উপরোক্ত হাদিস দু'টিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। রসুল স. এর বদদোয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে জানিয়েছেন যে, এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই।

সাঈদ বিন মুসাইয়েব এবং মোহাম্মদ বিন ইসাহাক বর্ণনা করেছেন, উহুদ প্রান্তরে যখন কাফেরেরা শহীদগণের নাক, কান ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নিচ্ছিলো, তখন রসুল স. এবং সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে বিজয় দান করলে আমরাও এরকম করবো। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. যখন তাদেরকে সমুলে ধ্বংস করার জন্য দোয়া করতে ইচ্ছা করলেন, তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। কারণ, আল্লাহ্‌তায়ালা জানতেন, পরবর্তীতে তাদের অনেকেই মুসলমান হয়ে যাবে।

অপর একটি বর্ণনা এই বর্ণনার আপাতবিরুদ্ধ বলেই মনে হয়। হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ফজরের নামাজে

পড়তেন, 'আল্লাহুম্মাল আন্ রাআল ওয়া জাকওয়ান ওয়া উসাইয়া' অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াত নাজিল করেন। তখন রসুল স. বদদোয়া বন্ধ করে দেন। বিরে মাউনার ঘটনার কারণেই রসুল স. বদদোয়া করতেন। তিনি স. ওই গোত্রসমূহের নিকট প্রেরণ করেছিলেন সত্তর জন কোরআন আবৃত্তিকারক (ক্বারী)। তাঁদের নেতা ছিলেন মানজার বিন আমর। আমের বিন তোফায়েল প্রতারণার মাধ্যমে তাঁদেরকে হত্যা করেছিলো। এই ঘটনায় রসুল স. অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন এবং মাসাধিক কাল ধরে নামাজে তাদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার এই বর্ণনাটিকে মাদরাজ করে দিয়েছেন (যে হাদিসের মধ্যে বর্ণনাকারী তার নিজের অথবা সাহাবী বা তাবেয়ীর উক্তি প্রক্ষেপিত করেন তাকে মাদরাজ বলে)। এই মর্মবিদারক ঘটনাটি ঘটেছিলো উহুদ যুদ্ধের চারমাস পর। হতে পারে উহুদ এবং বিরে মাউনা দু'টি ঘটনাকে লক্ষ্য করেই এই আয়াত নাজিল হয়েছে। কিন্তু বোখারী তার ইতিহাসে এবং ইবনে ইসহাক সালেম বিন আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই ঘটনাটি — এক কোরাইশ ব্যক্তি রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, তুমি একেক বার একেক কথা বলো। একবার নিষেধ করো, আবার আদেশ করো। এই কথা বলে সে অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। রসুল স. অপ্রসন্ন হলেন এবং অপপ্রার্থনা করলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। পরে ওই ব্যক্তি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। বর্ণনাটি মুরসাল ও গরীব।

আল্লাহ্তায়ালা ওই সীমালংঘনকারীদেরকে শাস্তি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন। তারা মুসলমান হয়ে গেলে তোমরা সকলে আনন্দিত হবে। অথবা অবিশ্বাসে দৃঢ়পদ থাকার কারণে তাদেরকে শাস্তি দিলে তোমরা স্বস্তি লাভ করবে। আল্লাহ্তায়ালা তাই জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের প্রতি রহম করা বা শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদানকারী। এক্ষেত্রে তোমার করণীয় কিছু নেই। তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা অথবা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আদেশ প্রতিপালন করতে হবে, পরিণাম নির্দ্ধারণ করবেন আল্লাহ্তায়ালা। ইমাম তাফতাজানী রসুল স. এর প্রতি অবতীর্ন এ নির্দেশনাটিকে সকল মুসলমানের উপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য বলেছেন।

আমি বলি, এই আয়াতটিকে পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সংযুক্ত করলে অর্থ দাঁড়াবে এরকম, আল্লাহ্ বদরে তোমাদেরকে একারণে সাহায্য করেছেন যে, কাফেরদের একটি দলকে তিনি ধ্বংস করে দেবেন অথবা পরাজয়ের মাধ্যমে তাদের একটি দলকে নিষ্ক্রিয় করে দেবেন কিংবা মুসলমান হয়ে যাওয়ার কারণে তাদেরকে রহমত দান করবেন নয়তো তাদেরকে শায়েস্তা করবেন। এখানে কাফেরদের চারটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। অপপ্রার্থনা থেকে বিরত রাখার কারণেই 'তোমার করণীয় কিছুই নাই,' এই আপত্তিসূচক বাক্যটি নাজিল হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবীর সকলকিছুই আল্লাহ্তায়ালার অধিকারাধীন। তিনি কাউকে ক্ষমা করতে চাইলে ইসলামে প্রবেশের সুযোগ করে দেবেন। কারো জন্য নির্ধারণ করবেন শাস্তি। তবে আল্লাহ্তায়ালা কাউকে শাস্তি দিতে বাধ্য নন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়াপরবশ। কাজেই অপপ্রার্থনার দিকে অগ্রসর হয়ো না।

ফারইয়ানী মুজাহিদের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, মানুষ মূল্য পরিশোধের একটি সময় নির্ধারণ করে ক্রয় বিক্রয় করে থাকে এবং যখন পরিশোধের সময় এসে যায় তখন এরকম হয় যে, হয়তো অধিক মূল্য পরিশোধ করে কিংবা পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়। এই প্রেক্ষিতটি বিবেচনায় রেখে নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

❒ হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাইওনা এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

❒ এবং তোমরা সেই অগ্নিকে ভয় কর যাহা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

❒ তোমরা আল্লাহ্ ও রসুলের আনুগত্য কর যাহাতে তোমরা কৃপা লাভ করিতে পার।

❒ তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হইতে ক্ষমা এবং জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা কর, যাহার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের ন্যায়, যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে সাবধানীদের জন্য;

চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়োনা — এর অর্থ এই নয় যে, চক্রবৃদ্ধি সুদ ছাড়া অন্য সুদ বৈধ। বরং সুদ কম হোক বেশী হোক অর্থ্যাৎ যে প্রকৃতিরই হোকনা কেনো সকল সুদই হারাম। এক্ষেত্রে আল্লাহ্কে ভয় করতে বলা হয়েছে, যদি সফলতা বা মুক্তি কাম্য হয়। ভয় করতে বলা হয়েছে সেই অগ্নিকে যা কাফেরদের জন্য

নির্দিষ্ট। বায়যাবী লিখেছেন, আগুন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য এবং গোনাহ্গার বিশ্বাসীদের জন্য।

আমি বলি, কাফেরদের জন্য প্রস্তুতকৃত আগুন এবং পাপিষ্ঠ বিশ্বাসীদের জন্য আগুন এক নয়। তবে এখানে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সুদ অন্তরে একরকম তমসার সৃষ্টি করে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুফরীতে উপনীত করে। তাফসীরে মাদারেকে বলা হয়েছে, ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এই আয়াতটি কোরআনের সবচেয়ে ভীতিকর আয়াত। আল্লাহ্র নির্দেশ লংঘন করলে বিশ্বাসীদেরকে এখানে ওই আগুনের ভয় দেখানো হয়েছে, যা অবিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত। এর পরেই আল্লাহ্তায়ালার কৃপা লাভের শর্ত হিসাবে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের

আনুগত্য করতে হবে। প্রকৃত পক্ষে দোজখের আগুন সকল অবস্থায় কাফেরদের জন্যই। পাপী মুমিনগণ সেখানে প্রবিষ্ট হলেও সাময়িকভাবে হবে। আর অবিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত আগুন এবং পাপী বিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত আগুন পৃথক প্রকৃতির। এই আয়াতের মর্ম মারজিয়া ফেরকার বিশ্বাসবিরোধী। মারজিয়াদের মত এই যে, ইমান থাকলে গোনাহ্ দ্বারা কোনো ক্ষতি হয় না।

এর পরে বলা হয়েছে, ক্ষমা ও জান্নাতের জন্য প্রতিযোগীতা করতে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ক্ষমার দিকে ধাবিত হওয়ার অর্থ ইসলামের দিকে ধাবিত হওয়া। ইকরামা বলেছেন, আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হওয়া। অর্থ্যাৎ ক্ষমা অর্থ ইসলাম অথবা তওবা। হজরত আলী বলেছেন, ফরজ আদায় করা এবং হজরত আনাস বিন মালেক বলেছেন, নামাজের তাকবীরে উলা (প্রথম তাকবীর) আয়ত্তে রাখা। এসমস্ত মতামতের শেষ ফল এই যে, ক্ষমা বা মাগফিরাত অর্থ এমন বিশ্বাস, উত্তম চরিত্রাবলী এবং পূণ্যকর্ম যার মাধ্যমে পাপ সমুহের ক্ষমা, দোজখ থেকে মুক্তি এবং রহমতের সুশীতল ছায়া লাভ হয়। এ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে হজরত আবু উমামা বর্ণিত একটি হাদিসে এরকম বলা হয়েছিলো, অক্ষমতা আগমনের পুর্বে সৎকর্ম সম্পাদন করো। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সাতটি বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আগেই আমল সম্পাদন করো। এমন দরিদ্রতা যা অন্যমনস্ক করে, এমন সম্পদ যা অহংকার নিয়ে আসে, এমন ব্যাধি যা সুস্থতাবিরোধী, এমন ষাটোর্ধ্ব বার্ধক্য যা বিস্মৃতি ঘটায়, আকস্মিক মৃত্যুর, অথবা দাজ্জালের। এ সমস্ত পরিস্থিতি আগমনের প্রতীক্ষা করা নিকৃষ্ট আচরণের অন্তর্ভুক্ত। সবচেয়ে বেশী তিক্ত ও ভয়ংকর বিপদ হচ্ছে কিয়ামত। তিরমিজি, হাকেম।

বেহেশতের বিস্তৃতি আকাশ পৃথিবীর বিস্তৃতির মতো — এটি হচ্ছে উপমা। প্রকৃতপক্ষে বেহেশতের প্রশস্ততা এর চেয়ে বেশী। মানুষের জ্ঞান অনুযায়ী বেহেশতের প্রশস্ততার উপমা এখানে দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে যেমন বলা

হয়েছে, 'খলিদীনা ফীহা মা দামাতিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' — এখানে জান্নাতে বসবাসের স্থায়িত্বকে আকাশ ও পৃথিবীর স্থায়িত্বের সঙ্গে তুলনীয় করা হয়েছে। কারণ সর্বসাধারণের বিবেচনায় আকাশ ও পৃথিবী সর্বাপেক্ষা অধিক স্থায়ী।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বিন মালেককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, জান্নাত আকাশে না পৃথিবীতে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আকাশ ও পৃথিবীতে কিভাবে জান্নাতের সংকুলান হতে পারে। এরপর প্রশ্ন করা হয়েছিলো, তবে কোথায়? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, সপ্তম আকাশের উপরে এবং আরশের নিচে।

কাতাদা বলেছেন, সাহাবীগণ মনে করেন, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপরে এবং জাহান্নাম সপ্তস্তর মাটির নিচে। আবু শায়েখ আজিমা গ্রন্থে আবু জা'রা সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ্‌র উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম, জান্নাত সকল কিছুর উপরে, সাত আসমানেরও উপরে। আর দোজখ সবচেয়ে নিচে, সপ্তস্তর জমিনেরও নিচে। মুত্তাকীদের (সাবধানীদের) জন্যই বেহেশত নির্ধারিত। ওই ব্যক্তি মুত্তাকী, যিনি কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত, তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুকে অন্তরে স্থাপন করেন না। মুত্তাকীগণ সরাসরি এবং পাপী বিশ্বাসীগণ শাস্তির মাধ্যমে পাপক্ষয়ের পর জান্নাত লাভের অধিকার লাভ করবেন। তাঁদের জান্নাত পৃথক প্রকৃতিরও হতে পারে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৩৪

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۚ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

❒ যাহারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়নদিগকে ভালবাসেন;

'আস্সররাই' অর্থ ওই আস্বাদ যা সম্পদের কারণে অর্জিত হয়। আর **'আদ্দররাই'** অর্থ সম্পদের স্বল্পতা। 'কামুস'। ইমাম বাগবী লিখেছেন, জান্নাত লাভের অধিকার তাকওয়া অবলম্বনকারীরা অর্জন করবেন — আর তাঁদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দানশীলতা। এই আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র, বেহেশতের এবং মানুষের অধিক নৈকট্যধারী এবং দোজখ থেকে দূরবর্তী। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্, বেহেশত এবং মানুষ থেকে দূরবর্তী, কিন্তু দোজখের নিকটবর্তী। মূর্খ দাতা কৃপণ আবেদের চেয়ে উত্তম। তিরমিজি। এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে।

বাগবী বর্ণিত হাদিসে কৃপণ আবেদের পরিবর্তে কৃপণ আলেম শব্দ এসেছে। এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন, বায়হাকী হজরত জাবের থেকে এবং তিবরানী হজরত আয়েশা থেকে। হজরত ইবনে আব্বাসের মারফু বর্ণনায় এসেছে, দানশীলতা আল্লাহ্তায়ালার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ইবনে নাজ্জার।

রসুল স. এরশাদ করেন, দানশীলতা জান্নাতের বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ, যার শাখাপ্রশাখাগুলো পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত। যে ব্যক্তি এসমস্ত শাখা প্রশাখার একটি ধারণ করবে, সে দোজখ থেকে দূরবর্তী হয়ে যাবে। এরকম বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী ও বায়হাকী, হজরত আলী এবং হজরত আদী থেকে। বায়হাকী আবু হোরায়রা থেকেও এরকম বর্ননা করেছেন। আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের এবং হজরত আবু সাঈদ থেকে। ইবনে আসাকের হজরত আনাস থেকে এবং দায়লামী হজরত মুআজ থেকে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, এক দিরহাম একলক্ষ দিরহামের বাজী মেরে দিয়েছে। একজন আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল স. এটা কিরকম? তিনি স. বললেন, অত্যন্ত সম্পদশালী এক লোক একলক্ষ দিরহাম দান করলো। দুই দিরহামের মালিক আরেক ব্যক্তি দান করলো একটি দিরহাম। তাঁর এই একটি দিরহাম ওই একলক্ষ দিরহাম অপেক্ষা উত্তম। নাসাঈ, ইবনে খাজিমা, ইবনে হাব্বান, হাকেম। হাকেম একে বিশুদ্ধ বলেছেন।

বেহেশতের অধিকারী ব্যক্তিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য, ক্রোধ সংবরণ। এ সম্পর্কে রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার ক্রোধকে সংবরণ করবে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে ইমান ও আমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেবেন। আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে আবিদ্ দুনিয়া। বাগবী হজরত আনাসের মারফু বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার রোষের প্রচন্ডতাকে সন্ত্রাস্থ করে ফেলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সকলের সামনে উপস্থিত করে তার ইচ্ছামতো হুর নির্বাচিত করে নিতে বলবেন।

ইবনে আবিদ্ দুনিয়া হজরত ইবনে ওমরের মারফু হাদিসে বলেছেন, আল্লাহ্পাক রোষ দমনকারীদের দোষ গোপন রাখেন।

বেহেশতিদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষমাশীলতা। বাঁদী এবং গোলামদের প্রতি ক্ষমাশীল হওয়া অথবা ন্যায়বিরোধী এবং অসুন্দর আচরণকারীদেরকে ক্ষমা করা। বর্ণনা করেছেন জায়েদ বিন আসলাম ও মুকাতিল। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এরকম লোক হবে অল্প সংখ্যক। আল্লাহ্ই তাদের হেফাজতকারী। সায়লাবী, মুকাতিল থেকে এবং বায়হাকী ইবনে মালেক থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন।

'আল মুহ্সিনীন' এর লাম বর্ণটি এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যাবলীকে সম্পৃক্ত করেছে। অথবা এই আয়াতের প্রথমে বর্ণিত সমস্ত উম্মতকে অন্তর্ভূত করেছে।

সুফিয়ান সওরী বলেছেন, মন্দ আচরণকারীর প্রতি উত্তম আচরণ করাই এহ্সান। উত্তম আচরণকারীর প্রতি উত্তম আচরণ করাও এহ্সান। হজরত ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, যখন হজরত জিব্রাইল আ. রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকট এহ্সানের অর্থ জানতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি স. বলেছিলেন, এহ্সান (উত্তম ইবাদত) হচ্ছে, তুমি এমনভাবে আপন প্রতিপালকের ইবাদতে লিপ্ত হও যেনো তুমি তাঁকে দেখছো। অথবা এরকম মনে করো তিনি তো অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।

আমি বলি, আহলে এহ্সান বলতে সুফিয়ায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে। ফানায়ে নফ্স (কু প্রবৃত্তির বিলীনতা)ই এখানে উদ্দেশ্য। অহংকার, ঘৃণা, বিবাদ, কৃপণতা — এসমস্ত মন্দ বৈশিষ্ট্যসমুহ্ গজবকে অবধারিত করে। এখানে ফানায়ে কল্বের (অন্তরের কামনা বাসনার বিলীনতা) ইঙ্গিতও রয়েছে। কল্বের ফানা হলে মানবতার সাধারণত্বের যবণিকা উন্মোচিত হয়। সকল কার্যের প্রকৃত কর্তা যে আল্লাহ্তায়ালাই তা সম্যক পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তখন মানুষকে অভিযুক্ত করার মনোবৃত্তি আর থাকে না। লক্ষ্য থাকে কেবল আল্লাহ্তায়ালার হুকুমের দিকে। সম্পদের স্বল্পতা এবং পর্যাপ্ততা — এই দুই অবস্থাতেই তখন দানশীলতা প্রবহমান রাখা সম্ভব হয়। আল্লাহ্তায়ালাই অধিক জ্ঞাত।

এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে আহলে তাকওয়া এবং আহলে এহ্সানদের বৈশিষ্ট্যাবলী। এখন বর্ণিত হচ্ছে গোনাহ্গার মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য সমুহ্ যারা তওবার মাধ্যমে তাকওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৩৫

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

☐ যাহারা কোন অশ্লীল কার্য করিয়া ফেলিলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করিলে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করিবে? এবং তাহারা যাহা করিয়া ফেলে জানিয়া শুনিয়া তাহাই করিতে থাকেনা।

অশ্লীল কার্য (ফাহেশা) অর্থ কবীরা গোনাহ্ (বড় অপরাধ)। হজরত জাবের বলেছেন, ফাহেশা অর্থ ব্যভিচার (জেনা)। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, মুসলমানগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের চেয়ে তো বনী ইসরাইলেরাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অধিক সম্মানীয়। তারা রাতে গোনাহ্ করলে

সকালে তাদের দরোজার চৌকাঠে গোনাহের কথা লিপিবদ্ধ দেখতে পেতো। গোনাহের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তারা নিজেদের নাক অথবা কান কেটে ফেলতো। একথা শুনে রসুল স. নীরব রইলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

আতা বলেছেন, এই আয়াত নাবহান নামক এক খেজুর বিক্রেতার কারণে অবতীর্ণ হয়েছে। তার ডাক নাম ছিলো আবু মাবাদ। খেজুর বিক্রয়কালে একদিন এক সুন্দরী রমণী তার নিকট খেজুর কিনতে এলো। সে ভনিতা করে বললো, এই খেজুরগুলো খারাপ। আমার ঘরে ভালো খেজুর আছে। একথা বলে নাবহান রমণীটিকে তার ঘরে এনে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো এবং তাকে চুমু খেলো। রমণী বলে উঠলো 'ইত্তাকিল্লাহ্' — আল্লাহ্কে ভয় করো! নাবহান তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দিলো এবং অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে রসুল স. এর দরবারে এলো। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

মুকাতিল ও কালাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এক আনসার ও এক সাকাফীর মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। সাকাফী রসুল স. এর সঙ্গে এক যুদ্ধে গিয়েছিলেন। আনসারের দায়িত্ব ছিলো তার এবং আনসার পরিবারের তত্ত্বাবধান করা। একদিন আনসার বাজার থেকে গোশ্ত কিনে আনলেন। সাকাফীর স্ত্রী যখন গোশ্ত নিতে এলেন তখন আনসারী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন এবং তাঁকে চুমু খেলেন। সাকাফীর স্ত্রী বলে উঠলেন, 'ইত্তাকিল্লাহ্' — আল্লাহ্কে ভয় করো! তিনি লজ্জিত হলেন এবং পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন। সাকাফী গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর স্ত্রী আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, আল্লাহ্ এরকম ভাইয়ের প্রতিপালন যেনো না করেন। সাকাফী তখন খুজঁতে খুজঁতে পাহাড়ের দিকে গিয়ে দেখলেন লজ্জিত আনসারী পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছেন এবং আল্লাহ্র তসবী পাঠ করছেন। তিনি তাঁর অপরাধ স্বীকার করলেন। দু'জনে মিলে তখন হজরত আবুবকর সিদ্দিকের নিকট গেলেন। হজরত আবুবকর বললেন, আমি জানিনা তোমার মুক্তি কিভাবে হবে। এরপর দু'জনে গেলেন হজরত ওমরের কাছে। হজরত ওমরও একই উত্তর দিলেন। শেষে তাঁরা রসুলে পাক স. এর নিকটে গিয়ে বললেন, আমাদের মুক্তির উপায় কি? তখন এই আয়াত অবতীর্ন হয়।

নিজেদের প্রতি জুলুম করা অর্থ সগীরা গোনাহ্, ব্যাভিচারের চেয়ে নিম্নস্তরের গোনাহ্। যেমন চুম্বন করা, জড়িয়ে ধরা অথবা স্পর্শ করা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, জুলুম অর্থ মুখে বা কাজে আমল করে জুলুম করা। কেউ কেউ বলেন, সীমাতিরিক্ত গোনাহ্ ফাহেশা এবং যা সীমাতিরিক্ত নয়, তা জুলুম।

ফাহেশা অথবা জুলুম সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহ্তায়ালার স্মরণ হওয়ার অর্থ আল্লাহ্র আযাবের কথা স্মরণ হওয়া, জবাবদিহীর কথা মনে পড়া। গোনাহ্কারী

তখন লজ্জিত হয়ে তওবা ও ইস্তেগফার করলে ক্ষমা লাভ হয়। মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা অর্থ মৌখিকভাবে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা।

আমি বলি, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার অর্থ নামাজ ও ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)। হজরত আলী, হজরত আবুবকর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, গোনাহ্ করার পর কেউ যদি উত্তমরূপে অজু করে নামাজ পড়ে নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন। তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান। তিরমিজির বর্ণনায় অতিরিক্ত সংযোজন রয়েছে, অতঃপর রসুল স. পাঠ করলেন, 'ওয়াল্লাজিনা ইজা ফাআলু ফাহিশাতান আও জালামু আনফুসাহুম জাকারুল্লাহ্' .... ক্ষমা করার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌র। অধিকার ক্ষুন্ন হলে মানুষ কেবল অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার দায় থেকে অন্যায়কারীকে অব্যাহতি দিতে পারে। কিন্তু গোনাহ্ মাফ করতে পারে না। আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করার নামই গোনাহ্। মানুষের অধিকার তো তাঁর নির্দেশের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই প্রকৃতপক্ষে গোনাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ। মানুষ যখন অন্যকে ক্ষমা করে তখন উদ্দেশ্য থাকে এই যে, এরকম করলে আল্লাহ্‌ও তাকে ক্ষমা করে দিবেন। ব্যাপারটা ব্যবসায়ের মতো, যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই লাভবান হয়। লাভ ও উদ্দেশ্য ব্যতীত ক্ষমা প্রদর্শন কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই শোভনীয়। তাই প্রশ্নের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে, আল্লাহ্ ছাড়া ক্ষমাকারী কে?

সগীরা, কবীরা সব ধরনের গোনাহ্‌র জন্যই লজ্জিত হওয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। গোনাহ্ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করাও প্রয়োজন, যাতে পরবর্তী স্খলন থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হয়। রসুল স. এরশাদ করেছেন, ক্ষমাপ্রার্থনাকারী সীমালংঘনকারী নয়, যদিও তার দ্বারা প্রতিদিবসে সত্তরবার গোনাহ্ সংঘটিত হয়। আবু দাউদ, তিরমিজি।

রসুলে পাক স. আরো বলেছেন, গোনাহে প্রতিষ্ঠিত থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করা আপন প্রতিপালকের প্রতি উপহাসতুল্য। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী ও ইবনে আসাকের।

<u>মাসআলা</u> ঃ সগীরা গোনাহে সুদৃঢ় থাকা কবীরা গোনাহ্। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কবীরা গোনাহ্ আর গোনাহ থাকেনা যদি ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়। অন্যদিকে সগীরা গোনাহ্‌ও কবীরায় পরিণত হয় যদি তাতে সীমালংঘন করা হয়। সীমালংঘনপরায়ণতাই কবীরা গোনাহ্।

গোনাহে সীমাতিক্রম না করার কারণ হতে হবে আল্লাহ্‌র ভয়। স্বভাবগত অনীহা, আলস্য, লোকলজ্জা অথবা সুযোগ না পাওয়া — এসমস্ত কারণে গোনাহ্ থেকে বিরত থাকলে পুণ্য লাভ হয় না। তবে এতে করে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে মুক্ত থাকা যায়। যে গোনাহ্ আদৌ সংঘটিত হয় না, তার জন্য আযাব নেই। সওয়াব লাভের কারণ সওয়াবপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য ও আশা। আল্লাহ্‌তায়ালার স্মরণ।

তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা প্রতিপালন। আয়াতের শেষে উল্লেখিত হয়েছে 'ওয়াহুম ইয়ালামুন' - এর অর্থ তারা জেনে শুনে অপরাধ করেনা। জুহাক বলেছেন, 'ওয়াহুম ইয়ালামুন' অর্থ তারা আল্লাহ্‌কেই মাগফিরাতের মালিক মনে করে। হোসাইন বিন ফজল বলেছেন, তারা জানে যে, এ কাজের মালিক আল্লাহ্। তিনিই একমাত্র গোনাহ্ মাফকারী। কোনো আলেম বলেছেন, তাদের বিশ্বাস এই যে, গোনাহ যত বেশীই হোক তা আল্লাহের ক্ষমাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখেনা। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের নিশ্চিত প্রত্যয় রয়েছে, ক্ষমাপ্রার্থনা করলে আল্লাহ্‌তায়ালা ক্ষমা করে দিবেন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি গোনাহ্ করার পর আরজ করলো, হে আমার প্রতিপালক! আমি অন্যায় করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করো। আল্লাহ্‌তায়ালা তখন বলেন, আমার বান্দা জানে যে তার পাপ ক্ষমাকারী এক প্রতিপালক আছেন। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। কিছুদিন পর সে আবার গোনাহ করে ফেললো। আরজ করলো, পরোয়ারদিগার আমিতো গোনাহ্ করে ফেলেছি। আমাকে মাফ করে দাও। আল্লাহ্ পাক বলবেন, আমার বান্দা জানে তার এক মালিক আছেন যিনি ক্ষমা করতে পারেন অথবা পাকড়াও করতে পারেন। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। কিছুদিন পর আবারও পাপ করলো সে। তারপর প্রার্থনা জানালো, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করো। আল্লাহ্ তখন বলবেন, আমার বান্দা বুঝে যে, তার প্রভু তাকে ক্ষমা করতে অথবা শাস্তি দিতে সক্ষম। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। সে যা খুশী করতে পারে। বোখারী, মুসলিম।

তিবরানী ও হাকেম বিশুদ্ধ সনদে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে, আমিই গোনাহ্ ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখি - আমি তাকে ক্ষমা করে দিই। অধিক গোনাহের পরওয়া আমি করিনা যতক্ষণ না সে আমার সাথে শরীক করে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৩৬

أُولَٰئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَٰمِلِينَ ○

❒ উহারাই তাহারা যাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। এবং কর্মে সিদ্ধদিগের পুরস্কার কত উত্তম।

তাকওয়া এবং তওবা অবলম্বনকারীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার পুরস্কার — ক্ষমা এবং স্বর্গোদ্যান। সেই স্বর্গোদ্যানের পাদদেশে রয়েছে প্রবহমান স্রোতস্বিনীসমূহ। তবে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের চেয়ে তওবাকারীদের পুণ্যপ্রাপ্তি কম হবে। ইতোপূর্বের আয়াতে প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে তাকওয়া ধারণকারীদেরকে (সৎকর্মপরায়নদিগকে) আল্লাহ্ ভালোবাসেন। তাঁরা আল্লাহ্ পাকের প্রিয়জন, আল্লাহ্র মহব্বত ধারণের উপযোগী। পরের আয়াতে বলা হয়েছে ক্ষমাকৃত বান্দাদের কথা। এতেই সুস্পষ্ট হয় যে, উভয় দল জান্নাত লাভ করলেও তওবা অপেক্ষা তাকওয়াই অধিক মর্যাদাশালী। তওবার বিনিময় সওয়াব। আর তাকওয়ার বিনিময় সওয়াব সহ প্রেম।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, পাপ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির মতো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আসাকের হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এবং কুশাইরি, ইবনে নাজ্জার এবং হজরত আলী থেকে।

জ্ঞাতব্য ঃ তাকওয়া অবলম্বনকারী ও তওবাকারীরাই জান্নাতের অধিকারী। কিন্তু এটাও ঠিক যে পাপাচ্ছন্ন ইমানদারও এক সময় জান্নাত লাভ করবেন। অপরদিকে দোজখ কেবল কাফেরদের জন্য নির্ধারিত হলেও পাপী বিশ্বাসীরাও দোজখে প্রবেশ করবেন যদিও তারা সেখানে স্থায়ী হবেন না। অর্থ এরকমও হতে পারে যে, কবীরা গোনাহকারীদেরকে দোজখাগ্নির শাস্তির মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে, কর্মকারের অগ্নিকুন্ডে পুড়িয়ে যেমন খনিজবস্তুকে বিশুদ্ধ করা হয়। আল্লাহ্তায়ালা বড় পাপীদেরকে আযাব না দিয়ে নিছক ক্ষমার মাধ্যমেও পরিশুদ্ধ করে দিতে পারেন। এরকম ক্ষমাপ্রাপ্তরা তওবার মাধ্যমে ক্ষমাপ্রাপ্তদের মতো।

সাবেত বুনানী বলেছেন, আমি সংবাদ পেয়েছি, 'ওয়াল্লাজিনা ইজা ফায়ালু ফাহিশাতান' — এই আয়াত নাজিল হলে শয়তান খুব কেঁদেছিলো।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ○ هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ○ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

❑ অতীতে তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ছিল, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমন কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কী পরিণাম!

❒ ইহা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সাবধানীদের জন্য দিশারী ও শিক্ষা।

❒ তোমরা হীনবল হইওনা এবং দুঃখিত হইওনা; বিশ্বাসী হইলে তোমরাই শ্রেষ্ঠ।

'সুনানুন' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'সুন্নাতুন, অর্থ ভালো অথবা মন্দ যা অনুসরণ করা হয়। রসুল স. বলেছেন, হেদায়েতের প্রতি আহ্বানকারী ব্যক্তি তার ডাকে সাড়া দানকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে। সাড়া দানকারী অনুসারীর সওয়াব তাতে একটুও কমবেনা। আর ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তির জন্য রয়েছে তার ডাকে সাড়া দানকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ গোনাহ্। অথচ তার অনুসরণকারী ব্যক্তির গোনাহ্ তাতে একটুও কমবে না। এই হাদিসের প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ এরকম দাঁড়ায় — তোমাদের পূর্বে ভালো মন্দ উভয় সম্প্রদায়ের অনেক লোক চলে গিয়েছে। তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখো মিথ্যাশ্রয়ীদের কী পরিণতি হয়েছিলো। মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ অতীতের কাফেরদের প্রতি আমার নিয়ম ছিলো, আমি তাদের জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম, তারপর তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আমি আমার পয়গম্বর ও তাঁদের অনুসারীদেরকে বিজয়ী করেছি। তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে অপরাধীদের ধ্বংসচিহ্ন দেখে নাও এবং উপদেশ গ্রহণ করো। কালাবী বলেছেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ছিলো পথপ্রাপ্তির বিশেষ পদ্ধতি। সে পদ্ধতিকে যারা মান্য করেছে,তারা লাভ করেছে আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ। যারা মানেনি আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের ধ্বংসের নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করো।

মানুষের জন্যই আল্লাহ্তায়ালা এসবের স্পষ্ট বিবরণ দান করেছেন। যারা সাবধানী (মুত্তাকী) পথনির্দেশ কেবল তাদের জন্যই। এর মাধ্যমে কেবল তারাই উপকৃত হয়।

উহুদ যুদ্ধে বিপর্যস্ততার কারণে হীনবল এবং দুঃখিত হওয়া অনুচিত। তোমরা যেহেতু মুমিন তাই প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদেরই। বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার এই সান্ত্বনা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হচ্ছে পরবর্তীতে। আল্লাহ্তায়ালা জানিয়েছেন, হত্যাকারীদের হত্যাকান্ডের কারণে বিষন্নচিত্ত হয়োনা। প্রকৃত বিজয় তোমাদেরই। কারণ, এই বিপদগ্রস্ততার কারণে মুমিনদের জন্য রয়েছে সওয়াব। কাফেরদের জন্য কিছু নেই। কাফেরদেরকে যারা হত্যা করেছে তারা লাভ করবে জান্নাত এবং তোমাদেরকে যারা হত্যা করেছে তারা প্রবিষ্ট হবে দোজখে।

উহুদ যুদ্ধে হজরত হামজা এবং মোসয়াব সহ মুহাজিরদের পাঁচজন এবং আনসারদের সত্তর জন শহীদ হয়েছিলেন। উহুদের বিপদ সম্পর্কে অন্য আয়াতে

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'নিরুৎসাহিত হয়োনা, শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবণ করো। আঘাত কেবল তোমরাই পাওনি, আঘাত পেয়েছে তারাও। আল্লাহ্র সকাশে রয়েছে তোমাদের সওয়াব প্রাপ্তির আশা অথচ অবিশ্বাসীরা আশাহীন।' কালাবী বর্ণনা করেছেন, উহুদের বিপর্যস্ততার পর রসুল স. মুসলমানদেরকে দুশমনদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হুকুম দিয়েছিলেন। শ্রান্ত ও বিপর্যস্ত মুসলমান বাহিনীর নিকট এই হুকুম ছিলো কষ্টকর। তাদের এ অবস্থা দেখে আল্লাহ্তায়ালা সান্ত্বনা প্রদানার্থে এই আয়াত নাজিল করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, খালিদ বিন ওলীদ ছিলেন তখন শত্রুপক্ষে। তার বাহিনী অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পাহাড়ে উঠে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিলো। হুজুর স. তখন দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! এরা যেনো আমাদের কাছে না আসতে পারে। তোমার শক্তি ব্যতীত আমরা শক্তিহীন। মুসলমান তীরন্দাজদের একটি দল তখন উঠে গেলো পাহাড়ে। সারা রাত তারা সেখানে কাটালো এবং তীর বর্ষণের মাধ্যমে ঠেকিয়ে রাখলো মুশরিক বাহিনীকে। পরে এই ব্যূহ ভেঙে পড়ায় মুসলমান বহিনী পর্যুদস্ত হয়। আল্লাহ্তায়ালা তাই সান্ত্বনা জানিয়ে বলেছেন, তোমরা যেহেতু মুমিন তাই তোমরাই শ্রেষ্ঠ। আপাতবিপর্যস্ততার কারণে মনঃক্ষুন্ন হওয়া বা ভেঙে পড়া ইমানের অনুকূল আচরণ নয়।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪০

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ○

❐ যদি তোমাদের আঘাত লাগিয়া থাকে তবে অনুরূপ আঘাত উহাদেরও তো লাগিয়াছে। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাহাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণকে জানিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে কতককে সাক্ষী করিয়া রাখিতে পারেন এবং আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

'ক্বরহুন' এবং 'কুরহুন' শব্দ দু'টির অর্থ যথাক্রমে আঘাত এবং আঘাতের কষ্ট। এই কষ্ট কারো একচেটিয়া নয়। উহুদে যেমন মুসলমানেরা জখম হয়েছেন, তেমনি ইতোপূর্বে বদরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলো কাফেরেরা। আল্লাহ্তায়ালা তাই

এখানে জানিয়েছেন বিজয় আবর্তিত হয়। কখনো বিজয় লাভ করে এই দল, কখনো ওই দল।

হজরত বারা বর্ণনা করেন, রসুল স. হজরত জোবায়ের বিন মুতইমের নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তীরন্দাজের একটি বাহিনীকে গিরিপথে মোতায়েন করে নির্দেশ দিলেন, পুনঃর্নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেনো এই স্থান ত্যাগ না করে। বললেন, তোমরা যদি এরকম দেখো যে, পাখিরা আমাদের গোশ্‌ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, তবুও পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত স্থান ত্যাগ কোর না। আর যদি এরকম দেখো যে, আমরা শত্রুদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছি, তবুও পুনঃনির্দেশের অপেক্ষা কোর। বর্ণনাকারী বলেন, প্রথম দিকে রসুল স. শত্রুদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি নিজে দেখলাম, মহিলারাও কাপড় চোপড় গুটিয়ে নিয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করছে। এ সমস্ত দেখে তীরন্দাজ বাহিনী বলতে লাগলো, দেখো তোমাদের সাথীরা বিজয় লাভ করেছে। তবে আর অপেক্ষা কেনো? আবদুল্লাহ্ বিন জোবায়ের বললেন, তোমরা রসুল স. এর নির্দেশ বিস্মৃত হচ্ছো। লোকেরা বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এগিয়ে গিয়ে গণিমতের মাল সংগ্রহ করবো। একথা বলে তারা যখন নির্দেশিত স্থান ত্যাগ করলেন তখনই ঘুরে গেলো যুদ্ধের মোড়। গিরিপথ উন্মুক্ত পেয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালালো কাফের বাহিনী। মুসলমান বাহিনী হয়ে পড়লো ছত্রভঙ্গ। রসুল স. সকলকে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন। তাঁর কাছে তখন উপস্থিত ছিলেন মাত্র বারোজন সাহাবী। কাফেরদের আক্রমনে শহীদ হন সত্তরজন। বদর যুদ্ধে মুশরিকদের সত্তরজন নিহত এবং সত্তরজন বন্দী হয়েছিলো। সেই প্রতিশোধ কার্যকর করে এই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি তিনবার উচ্চস্বরে ডেকে বললো, তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ এখনো বেঁচে আছে নাকি? রসুল স. এর নির্দেশে সকলেই নিরুত্তর রইলেন। আবু সুফিয়ান পুনরায় তিনবার চিৎকার করে বললো, আবু কোহাফার ছেলে (হজরত আবু বকর) আছো নাকি? সবাই নিরুত্তর রইলেন। আবু সুফিয়ান পুনরায় চিৎকার করে বললো, খাত্তাবের পুত্র (হজরত ওমর) আছো নাকি? এবারও সে কোনো জবাব না পেয়ে তার সাথীদেরকে বলতে লাগলো, নেই। সব মরে গিয়েছে। হজরত ওমর আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন, হে আল্লাহ্‌র দুশমন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি মিথ্যাবাদী। আমরা সবাই এখনো জীবিত। তোমার দুঃখের কাঁটা এখনো অটুট। আবু সুফিয়ান বললো, বদরের প্রতিশোধ দেয়া হলো। যুদ্ধ চড়ক গাছের দোলনার মতো উঁচু নিচুতে এবং নিচু উঁচুতে উঠে যায়। তোমাদের কিছু লোকের নাক, কান অথবা অন্য কোনো অঙ্গ কর্তিত হয়েছে। আমি অবশ্য এর হুকুম দেইনি। তবে একে মন্দও মনে করিনা। এরপর কাফের সেনারা সমস্বরে গেয়ে উঠলো, জয় হোবলের জয়! তাদের কল্পিত এই হোবল দেবতার

উপাসনাকারী ছিলো তারা। রসুল স. বললেন, তোমরা উত্তর দাও। তাঁরা আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা কী বলবো? তিনি স. বললেন, বলো আল্লাহ্ সর্বোচ্চ এবং সম্মানার্হ। আবু সুফিয়ান বললো, আমাদের উজ্জা আছে তোমাদের নেই (উজ্জা কাফেরদের একটি কল্পিত দেবী — রমণীমূর্তি)।

রসুল স. এরশাদ করলেন, তোমরা নিরুত্তর কেনো? সাহাবীগণ আরজ করলেন, আমরা কী বলবো? রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ আমাদের মাওলা। তোমাদের কোনো মাওলা নেই।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু সুফিয়ান হজরত ওমরকে বললো, নির্ভয়ে এগিয়ে এসো। রসুল স. বললেন, এগিয়ে যাও। দেখো সে কী বলে। হজরত ওমর এগিয়ে গেলেন। আবু সুফিয়ান বললো, আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি; বল আমরা কি মোহাম্মদকে হত্যা করেছি? তুমি আমার দৃষ্টিতে ইবনে কামিয়া অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী ও সত্য কসমকারী। ইবনে কামিয়া কোরাইশদেরকে বলেছে যে, সে নাকি মোহাম্মদকে হত্যা করেছে? হজরত ওমরকে নিরুত্তর দেখে আবু সুফিয়ান পুনরায় বললো, এক বছর পর ছোট বদরে আবার তোমাদের সাথে মোকাবেলা হবে। রসুল স. বললেন, বলে দাও। আমরাও রাজি। আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলো।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, আবু সুফিয়ান বললো, দিন আবর্তিত হয়। যুদ্ধ চড়ক গাছের দোলনার মতো পালাক্রমে উঁচু নিচু হয়। হজরত ওমর বললেন, তোমাদের ও আমাদের অবস্থা একরকম নয়। আমাদের নিহত ব্যক্তিরা প্রবেশ করবেন বেহেশতে। আর তোমাদের নিহত ব্যক্তিরা অবস্থান করবে দোজখে।

জুযাজ বলেন, মুসলমানরাই বিজয়ী। কেননা আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, আমাদের সৈন্যরাই বিজয় লাভ করবে। উহুদের সময় পরাজয়ের কারণ এই ছিলো যে, মুসলমানদের তীরন্দাজ বাহিনী রসুল পাক স. এর নির্দেশ পালনে ব্যত্যয় ঘটিয়েছিলো।

যুদ্ধের জয় পরাজয়, উত্থান পতনের হিকমত এই যে, আল্লাহ্তায়ালা এর মাধ্যমে এই বিষয়টি স্পষ্ট করেন যে, বিশ্বাসীরা বিপদে ধৈর্যশীল থাকেন এবং ইমানে প্রতিষ্ঠিত থেকে সম্মানার্হ হতে পারেন। কালের জয় পরাজয় একথাই প্রমাণ করে যে, সৃষ্টি ও ধ্বংস আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারিত বিধান। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় কে সাচ্চা ইমানদার। অবশ্যই আল্লাহ্তায়ালা আদি অন্তের সমস্ত কিছু জানেন। কিন্তু পুরস্কার ও তিরস্কারের উপযোগী হতে হলে বাস্তব পৃথিবীতে তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তাই এই উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়।

উহুদের শহীদগণ বিপর্যস্ততার কারণে তাঁদের কাঙ্খিত মর্যাদা লাভ করেছেন। অন্যান্যরাও তাদের এই আত্মদানের জ্বলন্ত সাক্ষী। এই সাক্ষ্যদাতাদেরকে স্পষ্ট করাও ছিলো আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রেত।

ইবনে আবী হাতেম হজরত ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন মদীনার রমনীকুল দীর্ঘ অপেক্ষার পর যুদ্ধের সংবাদ না পেয়ে উহুদের পথে এগিয়ে গেলেন। উষ্ট্রারোহী দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, রসুল পাক স.কেমন আছেন? আরোহীদ্বয় বললেন, জীবিত আছেন। এক রমনী বললেন, এখন আমরা আর কোনো কিছুর পরোয়া করি না। আল্লাহ্ আমাদের কিছুসংখ্যক লোককে শহীদ করে দিলেও আর কোনো চিন্তা আমাদের নেই। ওই রমনীটির উক্তি লক্ষ্য করে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

অবিশ্বাসী কাফের ও মুনাফিক সম্প্রদায়কে আল্লাহ্তায়ালা পছন্দ করেন না। কিন্তু কখনো তাদেরকে বিজয় দান করেন — এটা তাদের জন্য অবকাশ (গোনাহ্ বৃদ্ধি অথবা তওবার সুযোগ দানার্থে) এবং মুসলমানদের জন্য পরীক্ষা।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪১, ১৪২

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ○ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ○

❒ এবং যাহাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণকে পরিশোধন করিতে পারেন এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারেন।

❒ তোমরা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যখন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করিয়াছে এবং কে ধৈর্যশীল তাহা এখনও জানেন না?'

যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে পরিশুদ্ধ করা এবং অবিশ্বাসীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়াই আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্য। অবিশ্বাসীদেরকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করা, শহীদ হওয়ার সুযোগ প্রদান এবং গোনাহ্ থেকে পাক পবিত্র করা। আর বিশ্বাসীদেরকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্য কাফেরদেরকে ধ্বংস করা এবং তাদের নিদর্শন সমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া।

আল্লাহ্‌তায়ালা মুসলমানদেরকে জানাচ্ছেন, জেহাদ না করলে, জেহাদের বিভীষিকায় ধৈর্যশীল বলে পরীক্ষিত না হলে কী করে তোমরা অধিকার করবে জান্নাত। আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞানে যা রয়েছে,তা বাস্তব পৃথিবীতে স্পষ্ট হলেই কেবল জান্নাতের অধিকার লাভ করা যায়। ইবনে আবী হাতেম, আওফার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম — বদর যুদ্ধে শহীদদের মর্যাদা অবহিতির পর সাহাবীগণ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যদি আমরা সুযোগ পেতাম তবে আমরাও শাহাদাত বরণ করে সৌভাগ্যশালী হতে পারতাম এবং শহীদের দলভুক্ত হয়ে জান্নাতের পবিত্র রিজিকের অধিকারী হতে পারতাম। কিন্তু উহুদে যখন পরীক্ষা করা হলো, তখন আল্লাহ্‌ যাদেরকে চেয়েছিলেন তারা ব্যতীত অন্য কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকতে পারেনি। একথাই আল্লাহ্‌তায়ালা উল্লেখ করেছেন নিম্নের আয়াতে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪৩

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

❑ মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা উহা কামনা করিতে, এখন তোমরা তো তাহা চোখে দেখিলে?

স্নেহসিক্ত ভর্ৎসনার মাধ্যমে বলা হচ্ছে, তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে দেখেছো। অভিলাষ প্রকাশ করেছো সুযোগ পেলে তোমরাও ওই মর্যাদায় ভূষিত হতে চাও। কিন্তু তোমাদের আচরণ ছিলো তোমাদের অভিলাষবিরুদ্ধ। তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অচঞ্চল থাকতে পারোনি। সরে এসেছো। বিজয় যেমন কাফেরদের একমাত্র ইচ্ছা হয়ে থাকে তেমনি মুসলমানদের একান্ত কামনা শাহাদাতই হওয়া উচিত।

ইবনে আবী হাতেমও রবী'র উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন এরকম, কাফেরদের অতর্কিত আক্রমণের মুখে মুসলমানেরা যখন রসুল স. এর নিরাপত্তাচিন্তায় চঞ্চল হয়ে পড়লেন, তখন কেউ কেউ বললো, তিনি তো শহীদ হয়ে গিয়েছেন। কেউ কেউ বললো, তিনি নবী হলে নিহত হতেন না। আবার কেউ বললো, যে কাজের জন্য নবী স. জেহাদ করছেন, তোমরাও সেই কাজের জন্য জেহাদ করতে থাকো আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন, অথবা তোমরা রসুল পাক স. এর সঙ্গে মিলিত হবে।

ইবনে মুনজির, হজরত ওমরের উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন এরকমভাবে — উহুদ যুদ্ধে আমরা রসুল পাক স. এর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আমি একটি পাহাড়ে উঠে গিয়ে এক ইহুদীকে বলতে শুনলাম, মোহাম্মদ নিহত হয়েছেন। আমি বললাম, একথা যে বলবে আমি তার শিরোশ্ছেদ করবো। এমন সময় আমি দেখলাম, রসুল স. কয়েকজনকে সঙ্গে করে ফিরে আসছেন।

বায়হাকী তাঁর দালায়েলে আবু নাযীহ্'র বর্ণনা থেকে লিখেছেন, এক মোহাজির কোনো এক আহত আনসারের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আনসার সাহাবী রক্তসাগরে যেনো হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। মোহাজের সাহাবী তাঁকে বললেন, এবিষয়ে কি তুমি নিশ্চিত যে, মোহাম্মদ স. শহীদ হয়েছেন? তিনি উত্তর দিলেন, মোহম্মদ স. তোমাদেরকে আল্লাহ্র পয়গাম পৌছে দিয়েছেন। তিনি শহীদ হলে হয়েছেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনের পক্ষ থেকে জেহাদ চালিয়ে যাও।

জ্ঞাতব্য ঃ বোখারী হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, (ইন্তেকালের পর) রসুলে পাক স. এর গৃহ থেকে বের হয়ে হজরত আবু বকর দেখলেন হজরত ওমর মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। হজরত আবু বকর বললেন, ওমর বসে যাও। অতঃপর বললেন, যারা মোহাম্মদ স. এর পূজারী তারা জেনে নিক তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহ্তায়ালার ইবাদত করে, তারা শুনে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চিরঞ্জীব। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'অমা মোহাম্মাদুন ইল্লা রসুল .... শাকিরিন।' বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্র কসম ! আমাদের মনে হচ্ছিলো হজরত আবু বকরের তেলাওয়াতের পূর্বে যেনো এই আয়াত নাজিলই হয়নি। তাঁর তেলাওয়াতের পর সকলেই এই আয়াত তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন। তেলাওয়াত করছেন না এমন কাউকেই পেলাম না।

হজরত আবু হোরায়রা এবং ওরওয়া বলেছেন, তাঁর খেলাফত কালে জাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে হজরত আবুবকর বলেছিলেন, জাকাত হিসাবে প্রাপ্য উটের পা বাঁধার রশিও যদি কেউ দিতে অস্বীকার করে, তবে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করবো। অতঃপর তিনি 'অমা মোহাম্মাদুন ইল্লা রসুল' এই আয়াত শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেছিলেন। নিম্নে রয়েছে এই আয়াতের পূর্ণ উদ্ধৃতি।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۝

❑ মুহাম্মদ রসুল ব্যতীত কিছু নয়; তাহার পূর্বে বহু রসুল গত হইয়াছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে? এবং কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে কখনও আল্লাহের ক্ষতি করিবে না এবং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিবেন।

কামুস গ্রন্থে হজরত মোহাম্মদ স. এর হামদ ও তাহমীদ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, হামদ অর্থ কৃতজ্ঞতা, সন্তুষ্টি, প্রতিদান এবং হক আদায় করা এবং তাহমীদ অর্থ সর্বক্ষণ প্রশংসা করা। চুড়ান্ত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মোহাম্মদ স. এমন ব্যক্তিত্ব, সর্বক্ষণ যাঁর প্রশংসা করা যায়। আমি বলি, মোহাম্মদ স. ওই মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর গুণগান সর্ব অবস্থায়, সকল সময়ে চুড়ান্তভাবে করা যায়। ইমাম বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ স. তিনি, যিনি সকল প্রশংসাকে সম্মিলিত করেছেন। ওই ব্যক্তিত্বই প্রশংসার উপযুক্ত যিনি পূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী। আর তাহ্মীদের মর্যাদা হামদ অপেক্ষা অধিকতর। অধিক বর্ণবিশিষ্ট শব্দ অধিক অর্থবোধক, তাই ওই ব্যক্তি তাহমীদের উপযুক্ত, যিনি চুড়ান্ত সীমার পূর্ণত্বকে বেষ্টন করে আছেন। হাসান বিন সাবেত বলেছেন, তোমরা কি জানো না, আল্লাহ্ তাঁর আপনতম বান্দাকে তাঁর নিজস্ব দলিল (কোরআন) দিয়ে প্রেরণ করেছেন? সর্বোচ্চ মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্তায়ালারই। তিনি সম্মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের নাম থেকে তাঁর আপনতম বান্দার নাম সংকলিত করেছেন। অতএব, আরশের মালিক প্রশংসিত এবং তাঁর প্রশংসাধন্য মোহাম্মদ স. ও প্রশংসিত। ইতোপূর্বে আবির্ভূত নবী ও রসুলগণ সকলেই ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রণীত দ্বীন ছিলো প্রবহমান। তাই আল্লাহ্তায়ালা এখানে প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন এইভাবে, মোহাম্মদ স.ও একজন রসুল। তিনি ইন্তেকাল করলে তোমরা কি তাঁর প্রতিষ্ঠিত দ্বীন থেকে সরে পড়বে? এরপর সকলকে সতর্ক করা হয়েছে একথা বলে যে, দ্বীন থেকে সরে পড়লে আল্লাহ্র কোনো ক্ষতি নেই। কারণ আল্লাহ্ মুখাপেক্ষিতারহিত। যাঁরা দ্বীনে অটল, অবিচল, তাঁরাই কৃতজ্ঞচিত্ত। আর কৃতজ্ঞচিত্তদের জন্য রয়েছে পুরস্কার যা তারা অচিরেই লাভ করবে।

হজরত আলী বলেছেন, শাকিরিন অর্থাৎ 'কৃতজ্ঞচিত্ত' তাঁরাই, যাঁরা দ্বীনের উপর অনড়তাসহ দন্ডায়মান, যেমন দণ্ডায়মান ছিলেন হজরত আবু বকর। হজরত আলী আরো বলেছেন, হজরত আবু বকর শাকিরিনদের সরদার।

উহুদ যুদ্ধের কাহিনী ঃ রসুলে পাক স. সাতশত সৈন্য সহ উহুদ প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। মুসলমান বাহিনীর বাম পাশের একটি গিরিপথ রক্ষা করতে নিযুক্ত হলো পঞ্চাশ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনী। তাঁদের নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন জোবায়ের। শত্রু সৈন্য এগিয়ে আসতে লাগলো। তাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতা ছিলো খালেদ বিন ওলীদ। পশ্চাদবর্তী বাহিনীর নেতা ছিলো ইকরামা বিন আবু জাহেল। কাফের বাহিনীর সঙ্গে অনেক মহিলাও এসেছিলো। তারা দফ বাজিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে সৈন্যদেরকে উত্তেজিত করতে লাগলো। যুদ্ধ শুরু হলো। রসুল স. একটি তলোয়ার হাতে নিয়ে বললেন, এই তলোয়ারের হক আদায় করবে কে? শত্রুদেরকে হত্যা করে রক্ত প্রবাহিত করবে কে? আবু দাজানা বিন সিমাক বিন হারসা আনসারী তলোয়ারটি গ্রহণ করলেন এবং লাল পাগড়ী মাথায় বেঁধে তলোয়ার হাতে নিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। রসুল স. বললেন, এরকম বীরত্বব্যাঞ্জক পদবিক্ষেপই আল্লাহ্র পছন্দ। ক্ষিপ্রগতিতে মুসলমান বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো কাফের বাহিনীর উপর। তারা পিছু হটতে লাগলো। কেউ কেউ নিহত হলো। বাঁ পাশের গিরিপথ বেয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলো কাফেরদের অশ্বারোহী দল। কিন্তু মুসলমানদের তীব্র তীর বর্ষণের মুখে তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। হজরত আলী এগিয়ে গিয়ে মুশরিকদের ঝান্ডাবাহী তালহা বিন তালহাকে হত্যা করলেন। মুসলমানদের আল্লাহু আকবর রণধ্বনিতে প্রকম্পিত হলো আকাশ। কাফেরেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। হজরত জোবায়ের বিন আওয়াম বলেছেন, আমি দেখলাম হিন্দা এবং তার সঙ্গিনীরা দ্রুতবেগে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে আমি বন্দী করতে পারতাম। কাফের বাহিনীর ছত্রভঙ্গ অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে উঠলেন মুসলমান তীরন্দাজ বাহিনী। গণিমতের মাল সংগ্রহের জন্য তারা তাদের অবস্থান ত্যাগ করতে লাগলেন। তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ বিন জোবায়ের তাদেরকে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। জেগে উঠেছে লুন্ঠনের লোভ। মাত্র জনাদশেক তীরন্দাজ রইলেন হজরত জোবায়েরের সঙ্গে। দূর থেকে সব কিছু লক্ষ্য করলো খালেদ বিন ওলীদ। সে কাফের অশ্বারোহীদেরকে একত্র করে পিছন দিক থেকে মুসলমান বাহিনীকে আক্রমণ করলো। মুসলমানদের ব্যূহ ভেঙে পড়লো। অনেকে শহীদ হলেন। স্বস্থানে থেকে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন আবদুল্লাহ্ বিন জোবায়ের। কাফেররা তাঁকে নির্বস্ত্র করলো। নাক, কান ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেললো। ওদিকে মুসলমানদের কেউ কেউ

তখনও লুণ্ঠনরত। খালেদ বিন অলীদ রসুলুল্লাহ্ স. কে বেষ্টনকারী বাহিনীকে আক্রমণ করলো। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন তাঁরা। কেউ কেউ শহীদ হলেন। গণিমতের মাল এবং বন্দী সবকিছুই হাতছাড়া হয়ে গেলো মুসলমানদের। দিনের প্রথমাংশে যদিও ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিলো কিন্তু শেষাংশে পশ্চাদাপসরণে বাধ্য হলেন মুসলমানেরা। ত্রিধাবিভক্ত অবস্থা তখন মুসলমান বাহিনীর। কেউ শহীদ। কেউ আহত। আবার কেউ পশ্চাদাপসরণ করে আত্মরক্ষায় রত।

ইমাম বায়হাকী হজরত মেকদাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এভাবে, ওই পবিত্র সত্তার শপথ! যিনি রসুল স. কে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন। তিনি স. তাঁর আপন অবস্থানে অটল ছিলেন। একটুও হটেন নি। অতিসত্বর সাহাবীদের একটি ক্ষুদ্র দল তাঁর নিকটে এসে একত্রিত হলেন। তাঁরা ছিলেন পনের জন মাত্র। মুহাজিরদের আটজন — হজরত আবুবকর, ওমর, আলী, তালহা, জোবায়ের, আব্দুর রহমান বিন আউফ, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং আবু উবাদা বিন জাররাহ্ (রাদিআল্লাহু আনহুম)। সাতজন আনসারী সাহাবী ছিলেন — হাব্বাব বিন মুনজার, আবু দাজানা, আসেম বিন সাবেত, হারেস বিন সুময়া, সহল বিন হানীফ, মোহাম্মদ বিন মুসলিমা এবং সা'দ বিন মুআজ (রাদিআল্লাহু আনহুম)। কোনো কোনো বর্ণনায় সা'দ বিন মুআজের স্থলে সা'দ বিন উবাদার কথা বলা হয়েছে। কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রচন্ড আক্রমণ এসে পড়লো এই ক্ষুদ্র বাহিনীটির উপর। দিশাহারা অবস্থা সকলের। কিন্তু নিঃশংকচিত্ত রসুলে পাক স. সহজ সাহসিকতার সঙ্গে কখনো তীর নিক্ষেপ করছেন, কখনো নিক্ষেপ করছেন পাথর।

আব্দুর রাজ্জাক, জুহুরীর মুরসাল বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এরকম, রসুল স. সতেরটি আঘাত পেলেন। ওতবা বিন ওয়াক্কাস রসুল স. এর প্রতি চারটি প্রস্তর নিক্ষেপ করেছিলো। প্রস্তরাঘাতে রসুল স. এর সামনের নিচের মাড়ির রুবাইয়া নামক দাঁতটি ভেঙে গেলো। জখম হয়ে গেলো নিম্নের ওষ্ঠাধার। হাফেজ বলেছেন, ওই পবিত্র দাঁতটি ছিলো কেটে নেওয়া ও চিবানোর দাঁতের মধ্যবর্তী একটি দাঁত। হাতেব বিন বোলতা বলেছেন, আমি ওতবাকে হত্যা করেছি এবং তার দেহচ্ছিন্ন মস্তক রসুল স. এর খেদমতে হাজির করে দিয়েছি। রসুল স. আমার এই খেদমতে আনন্দিত হয়েছিলেন এবং আমার জন্য দোয়া করেছিলেন। হাকেম।

আবদুল্লাহ্ বিন শিহাব জহুরীর নিক্ষেপিত পাথর গিয়ে পড়লো রসুল স. এর পবিত্র মস্তকে। তাঁর পবিত্র মস্তক এবং পবিত্র শ্মশ্রু রক্তরঞ্জিত হলো। এই পাথর নিক্ষেপকারী অবশ্য পরে মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আবদুল্লাহ্ বিন কামিয়া পাথর ছুঁড়ে রসুল স. এর গন্ডদেশ জখম করে দিলো। লৌহশিরস্ত্রানের দু'টি কড়া তাঁর গন্ডদেশে বিদ্ধ হলো। সে হত্যা করতে উদ্যত হলো রসুল স. কে। বাধা হয়ে দাঁড়ালেন সাহাবী মুসায়াব বিন উমায়ের। তিনি ছিলেন রসুল স. এর

পতাকাধারী। ইবনে কামিয়া তাঁকে শহীদ করে দিলো। সে ভেবেছিলো রসুল স.ই শহীদ হয়েছেন। সে তৎক্ষণাৎ তার বাহিনীতে ফিরে গিয়ে বললো, আমি মোহাম্মদকে হত্যা করেছি। কে যেনো তখন চিৎকার করে বলতে লাগলো, মোহাম্মদ স. কে মেরে ফেলা হয়েছে। এই চিৎকার ছিলো ইবলিসের। তিবরানী, হজরত আবু উমামার মাধ্যমে লিখেছেন, রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ ইবনে কামিয়ার মূলোচ্ছেদ করুন। বদদোয়ার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হলো। আল্লাহ্ একটি পাহাড়ী বকরীকে তার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিলেন। সেই বকরী শিং দ্বারা আঘাত করতে করতে তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিলো। রসুল স. অবস্থান বদল করে প্রশস্ত স্থানে যেতে চাইলেন। দু'টি রণবস্ত্র পরিহিত ছিলেন তিনি। তাই সহজে উঠতে পারছিলেন না। হজরত তালহা তাঁকে উঠিয়ে নিলেন এবং প্রশস্ত একটি স্থানে পৌছলেন। রসুল স. বললেন, তালহা নিজের জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিয়েছে।

ওদিকে কাফের বাহিনীতে আনন্দের হিল্লোল। হিন্দা ও তার সঙ্গিনীরা শহীদগণের নাক ও কান কেটে নিলো। সেসব দিয়ে হিন্দা তৈরী করলো হার। হজরত হামজার কলিজা বের করে চিবাতে লাগলো সে। এদিকে রসুল স. ডাক দিলেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! উঠে এসো। তাঁর ডাক শুনে সেখানে তিরিশজন এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, আমাদের উপরে আঘাত এসে পড়ুক। আপনি নিরাপদে থাকুন। শান্তিতে থাকুন। কাফেরদের উপুর্যপরি আক্রমণ প্রতিহত করলেন সকলে মিলে। তুখোড় তীরন্দাজ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এতো অধিক তীর নিক্ষেপ করলেন যে, একে একে ছয়টি ধনুক ভেঙে গেলো। তীরাধার থেকে তীর বের করে দিচ্ছিলেন রসুল পাক স. স্বয়ং। তিনি বললেন, নিক্ষেপ করো। তোমার উপর কোরবান হোক আমার মাতা পিতা। বোখারী।

তীর নিক্ষেপে হজরত আবু তালহা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষিপ্র। তিনিও দুই তিনটি ধনুক ভেঙে ফেললেন। তীরবাহী কাউকে দেখলে তিনি ক্রমাগত বলে যাচ্ছিলেন, আবু তালহার জন্য তীর বের করে দাও। তাঁর তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যস্থল বারবার দেখছিলেন রসুল স.। অতি দ্রুত তীর বর্ষণ করছিলেন তিনি। এক সময় তাঁর তীর শেষ হয়ে গেলো। আবু দাউদ তায়ালুসি এবং ইবনে হাব্বান, হজরত আয়েশার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর বলেছেন, ওই সময়ে তালহার কারণেই হেফাজতে ছিলেন রসুলে পাক স.। মোহাম্মদ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, হঠাৎ হজরত তালহা মাথায় আঘাত পেলেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। হজরত আবু বকর পানি ছিটিয়ে দিলেন। সংজ্ঞা ফিরে আসতেই হজরত তালহা উদ্বেগাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, রসুলে পাক স. এর কী হয়েছে? হজরত আবু বকর বললেন, ভালো আছেন। হজরত তালহা বলেছেন,

আমাকে রসুল স. এর সকাশে হাজির করা হোক। আল্লাহ্তায়ালার অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমি দেখলাম যুদ্ধের বিভীষিকা তখন স্তিমিতপ্রায়। হজরত কাতাদা বিন নোমানের চোখে আঘাত লেগেছিলো। একটি চোখ নেমে এসেছিলো গন্ডদেশের উপর। রসুল স. তাঁর পবিত্র হাতে চোখটিকে যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন। ফলে এমন অবস্থা হলো যেনো তার চোখে কিছুই হয়নি।

যুদ্ধের প্রান্তর থেকে ফিরে আসছিলেন রসুল স.। পথে দেখা হলো উবাই বিন খালফ্ জামাহীর সাথে। সে বললো, আমার হাত থেকে বেঁচে যেতে পারলে আল্লাহ্ যেনো আমাকে না বাঁচায় (এখন আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করবো)। সঙ্গী সাহাবীগণ আরজ করলেন, আমরা কি প্রতিশোধ গ্রহণ করবো (তাকে হত্যা করবো)? রসুল স. বললেন, না। থাক। উবাই নিকটতর হয়ে বললো, আমার একটি কালো রং এর মাদি ঘোড়া আছে তাকে আমি প্রতিদিন একপাত্র যব খাওয়াই। ওই ঘোড়ায় চড়ে আমি তোমাকে হত্যা করবো। রসুল স. বললেন, পারবে না। বরং আমিই তোমাকে হত্যা করবো। রসুল স. হারেস বিন সামাহ'র নিকট থেকে একটি বল্লম নিয়ে উবাই এর স্কন্ধে আঘাত করলেন। উবাই ঘোড়া থেকে পড়ে গেলো এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো ছটফট করতে করতে বললো, মোহাম্মদ আমাকে মেরে ফেললো ! তার সঙ্গীরা বললো, ঘাবড়াচ্ছো কেনো আঘাত তো অতি সামান্য? সে বললো, তোমরা জানো না (মোহাম্মদের কোপানল কতো ভয়াবহ)। এ আঘাত রবিয়া এবং মোজার গোত্রের উপর আপতিত হলে তাদের জনপদের সমস্ত মানুষই মরে যেতো। আমি তোমাকে হত্যা করবো, এরকম কথাতো কেউ কোনোদিন আমাকে বলেনি। এরপর বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি। যন্ত্রনাদগ্ধ উবাই সেরফ নামক স্থানে পৌঁছেই মরে গেলো।

বোখারী, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম, যাকে নবী পাক স. হত্যা করেছেন এবং যে ব্যক্তি রসুল স. এর পবিত্র অবয়ব রক্তাক্ত করে দিয়েছিলো, তাদের উপর আপতিত হয়েছে আল্লাহ্র কঠিনতম গজব।

ইতিহাসবেত্তাগণ লিখেছেন, রসুল স. এর শহীদ হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই হতবিহ্বল হয়ে গেলেন মুসলমানেরা। কেউ কেউ বললেন, চলো আবদুল্লাহ্ বিন উবাই এর নিকটে যাই। সে আমাদের জন্য আবু সুফিয়ানের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভের ব্যবস্থা করে দিবে। কেউ কেউ হতবাক হয়ে বসে রইলেন। মুনাফিকেরা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ নিহত হলে তোমরা বসে থাকবে কেনো? আগের ধর্মেই ফিরে যাও। হজরত আনাস বিন মালেকের চাচা হজরত আনাস বিন নজর বললেন, শোনো সকলে! রসুলুল্লাহ শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিপালক তো চিরঞ্জীব। আল্লাহ্র রসুলই যদি শহীদ হয়ে যান, তবে তোমরা আর বেঁচে আছো কেনো? যে উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধ করেছেন, তোমরাও

সেই উদ্দেশ্যে যুদ্ধে রত হও। যে উদ্দেশ্যে শহীদ হয়েছেন তিনি, তোমরাও সে উদ্দেশ্যে পান করো শাহাদাতের শরাব। তিনি আরও বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আমার ভ্রাতৃবৃন্দের অক্ষমতা স্বীকার করছি আমি। আর মুনাফিকদের বাক্যাবলীর প্রতি প্রকাশ করছি আমাদের অসন্তোষ, এই বলে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। তারপর অসমসাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। রসুল স. একটি প্রশস্ত প্রস্তর প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সবাইকে আহবান করছিলেন। সর্বপ্রথম হজরত কাব বিন মালেক তাঁকে চিনে ফেললেন। তিনি বলেছেন, আমি রসুল স. কে চিনতে পেরেই উচ্চ স্বরে ঘোষণা করলাম, হে মুসলিম বাহিনী। সুসংবাদ শ্রবণ করো! এই যে এখানে । রসুল স. ইঙ্গিতে বললেন, নীরব থাকো। সাহাবায়ে কেরাম একে একে রসুল স. এর নিকট জমায়েত হতে লাগলেন। পশ্চাদাপসরণের কারণে তিনি মৃদু ভর্ৎসনা করলেন সকলকে। তাঁরা আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল। আমাদের জনক-জননী আপনারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। আমরা সংবাদ পেয়েছিলাম আপনি শাহাদাৎ বরণ করেছেন। এই মর্মন্তুদ সংবাদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম আমরা। তাই পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে। আপনার শাহাদাতের সংবাদই আমাদেরকে উদ্দীপনারহিত করে দিয়েছে, এরপর নাজিল হলো - 'ওয়া মা মোহাম্মাদুন ইল্লা রসূল... ।'

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪৫, ১৪৬

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ○ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○

❒ আল্লাহের অনুমতি ব্যতীত কাহারও মৃত্যু হইতে পারে না, যেহেতু উহার মিয়াদ অবধারিত। কেহ পার্থিব পুরস্কার চাহিলে আমি তাহাকে তাহার কিছু দেই এবং কেহ পারলৌকিক পুরস্কার চাহিলে আমি তাহাকে তাহার কিছু দেই এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিব।

❒ এবং কত নবী যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের সাথে বহু রব্বানী ছিল। আল্লাহের পথে তাহাদের যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহাতে তাহারা হীনবল হয় নাই, দুর্বল হয় নাই এবং নত হয় নাই। আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদিগকে ভালবাসেন।

উৎসাহব্যঞ্জকতাশোভিত এই আয়াতে মুসলমানদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মৃত্যু অবধারিত এবং তা সঠিক সময়েই এসে পড়বে। এক মুহূর্ত আগেও নয়, পরেও নয়। গনিমতের মালের প্রতি ধাবিত হওয়ার ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছে, পৃথিবীকামীদেরকে পৃথিবী-ই যৎকিঞ্চিত দেয়া হয়। আর আখেরাতকামীদের দেয়া হয় আখেরাত। আর যাঁরা কৃতজ্ঞ ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ তাদের জন্য রয়েছে প্রকৃত বিনিময়। আমি বলি, এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, যাঁরা কৃতজ্ঞ তাঁদেরকে দুনিয়া কিংবা আখেরাত নয়, অন্য কোনো মহামর্যাদামন্ডিত বিনিময় প্রদান করা হবে যার সম্যক পরিচয় জ্ঞান দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। এই বিনিময় আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং। এই বিনিময় ধারণাতীত।

জ্ঞাতব্য ঃ কৃতজ্ঞদের মনোভঙ্গি হতে হবে এরকম — 'তোমাকে যে চিনতে পেরেছে সে তাঁর জীবন, পরিবার পরিজন, বংশমর্যাদা, কোনো কিছুই ভ্রুক্ষেপ করে না। প্রেমোন্মাদনায় পূর্ণনিমজ্জিত করার পর তুমি তাকে দান করো উভয় কাল — পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী। তোমার প্রেমবিভোরতাই উভয় জগতের সফলতা।

কামুস গ্রন্থে বলা হয়েছে, কৃতজ্ঞতা (শোকর) অর্থ অনুগ্রহরাজী সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ। হজরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, আখেরাত অর্জনই যাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহ্ তাঁর অন্তরকে দুনিয়া অন্বেষণ থেকে অমুখাপেক্ষি করে দেন। তাঁর উদ্বিগ্নতাকে অপসারিত করেন। দুনিয়া নত হয়ে যায় তাঁর কাছে। আর যার উদ্দেশ্য হয় কেবল দুনিয়া অন্বেষণ, আল্লাহ্ তাঁর সামনে উপস্থাপন করেন অসহায়তা ও উদ্বিগ্নতা। তার দুনিয়ার অর্জন অতি ন্যূন। আল্লাহ্তায়ালা তার জন্য এই ন্যূনতাকেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইমাম বাগবী।

হজরত ওমর বিন খাত্তাব বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমল নিয়তের প্রতি নির্ভরশীল। মানুষ যে রকম নিয়ত করে, সে রকমই পায়। কাজেই যাঁর হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দিকে, সে তাঁর আল্লাহ্ ও রসুলের বলেই গণ্য হবে। আর যার হিজরতের উদ্দেশ্য থাকবে দুনিয়া লাভ কিংবা কোনো রমণীকে বিবাহ করা, সে হবে সেই দিকেরই। বোখারী ও মুসলিম।

পূর্বের অনেক নবী যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের সাথী ছিলেন বহুসংখ্যক আল্লাহ্প্রেমিক (রব্বানীগণ)। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, রব্বানীগণ অর্থ অসংখ্য সাহায্যকারী। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন,

হাজার হাজার সাহায্যকারী। কালাবী বলেছেন, দশহাজার সহায়তাকারী। হাসান বসরী বলেছেন, ফকীহ্ ও আলেম সম্প্রদায়। কেউ কেউ বলেছেন অনুসরণকারীগণ। এরকমও বলা হয়েছে যে, রব্বানী অর্থ আল্লাহ্তায়ালার অনুগত বান্দা বা আল্লাহ্র উপাসনাকারী।

নবী ও তাঁদের সাথী রব্বানীগন বিপর্যয়ের মুখে কখনো হীনবল হননি। হতোদ্যম হননি। নতি স্বীকারও করেননি। এরকম যাঁরা, আল্লাহ্ তাঁদেরকেই ভালোবাসেন। কারণ তাঁরা ধীর, ধৈর্য্যশীল।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪৭, ১৪৮

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ ○ فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ع

❒ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে-সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর ইহা ব্যতীত তাহাদের আর কোন কথা ছিল না।

❒ অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে পার্থিব পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

নবী ও তাঁদের রব্বানী সাথীগণ চরম বিপর্যস্ততার সময় ক্ষমাপ্রার্থী হতেন। বলতেন, হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল গোনাহ্ ক্ষমা করো। আমাদেরকে সরল পথে অধিষ্ঠিত রাখো এবং দান করো যুদ্ধাবস্থানের দৃঢ়তা। কাফেরদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দান করো বিজয়ের। বিজয়ী হওয়ার এই প্রার্থনা বিশ্বাসীদেরকে জানাতেই হয়। কারণ, তাদেরকে বিজয়ী করতে আল্লাহ্তায়ালা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, 'মুমিনদের সহায়তা দান করা আমার দায়িত্ব।' অন্যত্র বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমার সৈন্যরাই তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী।' ত্রুটি ও সীমালংঘনের কারণে বিশ্বাসীদের উপর বিপদ নেমে আসে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমাদের উপর আপতিত বিপদ তোমাদেরই অর্জিত কর্মপরিণাম। আর বহু ত্রুটি তো তিনি এমনিতেই ক্ষমা করে দেন।' বিপর্যস্ততার সময়ে বিশ্বাসীদের কর্তব্য হচ্ছে, গোনাহের জন্য লজ্জিত হতে হবে, ত্রুটি স্বীকার করতে

হবে এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে। এরপর জানাতে হবে দৃঢ়পদ থাকার প্রার্থনা। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত সাহায্যকারী। তাঁর অভিজ্ঞান তুলনারহিত। বিশ্বাসীগণকে গোনাহ্ থেকে পবিত্র করাই তাঁর অভিপ্রায়। তিনি ক্ষমাপ্রার্থনাকে দোয়া কবুলের শর্ত করে দিয়েছেন। দোয়ার প্রতিফল হিসাবে আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় প্রকার পুরস্কার দানে ধন্য করেন। যুদ্ধ জয়, গণিমত, রাজ্য এবং সম্মান এগুলো হচ্ছে পার্থিব পুরস্কার। আর পারলৌকিক পুরস্কার হচ্ছে, জান্নাত, স্থায়ী মর্যাদা, আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য ও সন্তোষ। আল্লাহ্তায়ালার সামান্যতম সন্তোষ সকল কিছু থেকে শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ্তায়ালা সৎকর্মশীলদেরকে (মুহ্সিনিনদেরকে) ভালোবাসেন। মুহ্সিনিন তাঁরাই, যাঁরা আল্লাহ্তায়ালাকে সদা বিদ্যমান জেনে ও মেনে তাঁদের উপাসনা সুসম্পন্ন করেন। তাঁদের অন্তর আল্লাহ্মুখী। অন্যমনস্কতা থেকে মুক্ত।

শান্তি-অশান্তি, সুখ-দুঃখ সবকিছুই আল্লাহ্র নিকট থেকে সমাগত। দয়া তাঁর অপরিসীম। আনুগত্যে অটল থাকা পর্যন্ত তিনি তাঁর অনুগ্রহরাজীকে পরিবর্তন করেন না। আনুগত্য শিথিল হলেই কেবল অনুগ্রহ বর্ষণে ব্যত্যয় ঘটান। কিছু বিপদ মুসিবত দান করেন, যেনো এই বিপদাঘাত তাদের অনুভূতিকে সজাগ করে তোলে। যেনো তারা ক্ষমাপ্রার্থী হয় এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পার্থিব বিপদ ভোগ করে চিরতরে পবিত্র হয়ে যায়।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪৯, ১৫০

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ○

❒ হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের আনুগত্য কর তবে তাহারা তোমাদিগকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।

❒ আল্লাহ্ই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

হজরত আলী বলেছেন, এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বলতে মদীনার মুনাফিকদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা বলেছিলো, মোহাম্মদ নবী হলে নিহত হতেন না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অর্থ হবে মক্কার কাফের অর্থাৎ আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গী-সাথীরা। এক্ষেত্রে আল্লাহ্তায়ালার বাণীর উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অনুসরণ

করলে অর্থাৎ মুনাফিক কিংবা আবু সুফিয়ানের দলের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থী হলে তারা তোমাদেরকে তাদের ধর্মমতের দিকে নিয়ে যাবে। তখন তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ততা ও ব্যর্থতা ভিন্ন অন্য কিছু লাভ হবে না। আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক। তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী। সুতরাং কাফেরদের সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপন করা থেকে বিরত থাকো।

যুদ্ধ শেষে ষোলই শাওয়াল তারিখে আবু সুফিয়ান এবং তার অনুসারীরা মক্কা প্রত্যাবর্তনকালে আক্ষেপ করতে লাগলো, কাজটাতো আমরা ভালো করিনি। প্রথম দিকে তো আমরাই তাদেরকে অধিক হারে নিহত করেছি। তারা আমাদেরকে প্রতিহত করতে পারেনি। পশ্চাদাপসরণ করেছিলো। অথচ আমরা তাদেরকে পূর্ণপর্যুদস্ত করার আগেই ফিরে এলাম। এখন ফিরে গিয়ে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়ে আসাই বাঞ্ছণীয়। পুনরাক্রমণের এই ইচ্ছাকে আল্লাহ্তায়ালা অপসারিত করে দিলেন। তাদের অন্তরে ঢেলে দিলেন মুসলমান বাহিনীর আতংক। এই প্রসঙ্গটিকে ইঙ্গিত করেই নাজিল হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫১

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ○

❐ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিব, যেহেতু তাহারা আল্লাহের শরীক করিয়াছে, যাহার সপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই। জাহান্নাম তাহাদের আবাস ; কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল সীমালংঘণকারীদের।

যখন কাফের বাহিনী পুনরাক্রমণের পরিকল্পনা করছিলো, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে ভীত–সন্ত্রস্ত করে দিলেন। কারণ তারা মুশরিক (অংশীবাদী)। তাদের অংশীবাদীতার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। যেমন প্রমাণ রয়েছে রসুল স. এর প্রতি অবতীর্ণ ওহির। আল্লাহ্তায়ালার প্রমাণ অবলম্বনকারীরাই সাহায্যপ্রাপ্ত। তাই আল্লাহ্তায়ালা মুশরিকদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দিয়ে প্রমাণ অবলম্বনকারীদেরকে সাহায্য করেছেন। সীমালংঘনকারীদের প্রকৃত বসবাসস্থল জাহান্নাম। এখানে সীমালংঘনকারীদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে জালেম শব্দ দ্বারা। এই শব্দটির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার অসন্তোষের প্রমাণ। অংশীবাদীতা জুলুম। আবাসস্থল হিসাবে দোজখের স্থায়ী নির্ধারণ এই জুলুমের কারণেই।

রসুল স. সাহাবীগণ সহ যখন মদীনায় ফিরে এলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম বলাবলি করছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাদেরকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ একি ঘটনা ঘটলো উহুদ প্রান্তরে। তাঁদের এই কথপোকথনের পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫২

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۭ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۭ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

❒ আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছিলেন যখন তোমরা তাহাদিগকে আল্লাহের অনুমতিক্রমে বিনাশ করিতেছিলে এবং সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারাইয়াছিলে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছিলে এবং যাহা তোমরা ভালবাস তাহা তোমাদিগকে দেখাইবার পর তোমরা অবাধ্য হইয়াছিলে। তোমাদের কতক ইহকাল চাহিতেছিল এবং কতক পরকাল চাহিতেছিল। সুতরাং তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদিগকে তাহাদিগের হইতে ফিরাইয়া দিলেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন। এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

অবশ্যই আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে থাকেন। আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্তির শর্ত হচ্ছে ধৈর্য্য ও সাবধানতা (সবর ও তাকওয়া)। যুদ্ধের শুরুতে এই শর্ত বলবৎ ছিলো বলেই আল্লাহ্র বলে বলীয়ান হয়ে মুসলমান বাহিনী কাফেরদেরকে পর্যুদস্ত করে যাচ্ছিলো। কিন্তু যখনই শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেয়া হলো, তখন রুদ্ধ হয়ে এলো সাহায্যপ্রাপ্তির পথ। জ্ঞানের শক্তি স্তিমিত হলো। কেননা, সম্পদের লোভ দুর্বল জ্ঞানের পরিচয়বাহী। যুদ্ধাবস্থানে অবিচল থাকা না থাকা নিয়ে শুরু হলো মতভেদ। আবদুল্লাহ্ বিন জোবায়েরের তীরন্দাজ বাহিনীর অনেকেই কাফের বাহিনীকে পিছু হটতে দেখে বলতে লাগলেন, এখানে থাকার তো আর প্রয়োজন নেই। আবদুল্লাহ্ বললেন, তোমরা কি রসুল স. এর এরশাদ বিস্মৃত হয়েছো? তাঁরা উত্তর দিলেন, রসুল স. এর এরশাদের অর্থ এরকম নয় যে,

কাফেররা পরাস্ত হওয়ার পরও তোমরা স্থান ত্যাগ করতে পারবে না। গণিমত সংগ্রহের এইতো সুযোগ। আবদুল্লাহ্ এবং তাঁর স্বল্পসংখ্যক সমর্থকেরা বললেন, আমরা রসুল স. এর হুকুম মোতাবেকেই থাকবো। এই পরিস্থিতিটিকেই আল্লাহ্তায়ালা এভাবে উপস্থাপনা করেছেন যে, তোমরা সাহস হারিয়েছিলে। যুদ্ধাবস্থানে থাকা না থাকা নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলে। দেখিয়েছিলে গণিমতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মতো অবাধ্যতা। কাফেরদের পরিত্যক্ত সম্পদকে ধরে নিয়েছিলে বিজয় বলে। তাই কাফেরদের পুনরাক্রমণের মাধ্যমে পরীক্ষা আপতিত হয়েছিলো তোমাদের প্রতি।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ স. এর সাথীদের মধ্যে পৃথিবীপ্রাপ্তির লোভ দেখিনি। উহুদ প্রান্তরের কতিপয় সাহাবীর শিথিলতার এই ঘটনাটি ছিলো সাময়িক এবং শিক্ষণীয় বিষয়। এটা ছিলো এমন এক পরীক্ষা যার মাধ্যমে বাস্তবসম্মত জ্ঞান লাভ হয়। উদ্দেশ্য ছিলো, পরীক্ষার প্রতিকূলতার মাধ্যমে মুমিনগণ যেনো পূনঃপবিত্রতা লাভে সক্ষম হন। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, কোনো বাহিনীর কতিপয় সদস্যের শিথিলতার শাস্তি আপতিত হয় সম্পূর্ণ বাহিনীর উপর। আল্লাহ্তায়ালার এই বিধানের হিকমত এই যে, এই শাস্তি যেনো শৈথিল্য প্রদর্শনকারীদের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং দৃঢ়তা অবলম্বনকারীদের জন্য অধিক পূণ্য অর্জনের কারণ হয়।

মুমিনদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালা অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁদের স্খলনকে শাস্তি ব্যতিরেকেই ক্ষমা করে দিতে পারেন। আর যদি শাস্তি দেন তবুও তা অনুগ্রহই। কারণ, এই শাস্তির উদ্দেশ্য, অবাধ্যতার অপরিচ্ছন্নতা থেকে বিশুদ্ধ করা।

ইমাম বাগবী হজরত আলী থেকে বলেছেন, আমি তোমাদের নিকট ওই বরকতপূর্ণ আয়াতটি বিবৃত করছি, যা রসুল স. আমাদেরকে জানিয়েছেন। আয়াতটি এই - 'ওয়ামা আসাবাকুম মিম মুসিবাতিন ফা বিমা কাসাবাত আইদিকুম ওয়া ইয়া'ফূ আ'ন কাসীর।'

রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, হে আলী! এই আয়াতের তাফসীর শুনে নাও, রোগ-ব্যাধি অথবা পার্থিব বিপদাপদ তোমাদের আমলের কারণেই আসে। পৃথিবী ও আখেরাত দু'ই স্থানে শাস্তি দেয়া আল্লাহ্তায়ালার মর্যাদার অনুকূল নয়। কারো অপরাধের শাস্তি পৃথিবীতে না দিলে আখেরাতে শাস্তি দান সম্পূর্ণতই তাঁর ইচ্ছানির্ভর।

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا ۢبِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ ۢبِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

❒ স্মরণ কর তোমরা যখন উপরের দিকে পালাইতেছিলে এবং পিছনে কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলে না যদিও রসুল তোমাদিগকে পিছন দিক হইতে আহবান করিতেছিল। পরে তিনি তোমাদিগকে দুঃখের উপর দুঃখ দিলেন যাহাতে তোমরা যাহা হারাইয়াছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর আসিয়াছে তাহার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।

উপরের দিকে পলায়ন করার অর্থ পাহাড়ে আরোহন করা। পাঠভিন্নতার কারণে সমতল ভূমিতে নেমে যাওয়া অথবা দূরে চলে যাওয়া, এরকমও অর্থ হতে পারে। ইমাম বাগবী লিখেছেন, দু'রকম অবস্থাই হয়েছিলো। কেউ সমতল ভূমিতে দূর ব্যবধানে চলে গিয়েছিলেন এবং কেউ কেউ উঠে গিয়েছিলেন পাহাড়ে। কেউ কারো দিকে তাকানোর ফুরসত পাচ্ছিলেন না। রসুল স. আহবান করছিলেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আমার দিকে এসো। আমি আল্লাহ্র রসুল। যে আমার দিকে আসবে, সে জান্নাতের অধিকারী হবে।

এই দুঃখ-কষ্টের উপর আরো দুঃখ-কষ্ট অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ্তায়ালা। দুঃখের উপরে দুঃখ অর্থ ক্রমাগত আঘাত, পরাজয়ের বিষন্নতা, শত্রু পক্ষের বিজয়োল্লাস এবং রসুল স. এর শাহাদাতের মর্মন্তুদ প্রচারণা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, প্রথম দুঃখ হচ্ছে গণিমত হস্তচ্যুত হওয়া। পরের দুঃখ হচ্ছে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া, অথবা প্রথম দুঃখ আঘাত প্রাপ্ত হওয়া এবং দ্বিতীয় দুঃখ রসুল পাক স. এর শাহাদাতের সংবাদ পাওয়া।

একত্রিত হওয়ার আহবান জানাতে জানাতে রসুল পাক স. একটি কংকরময় স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে ছিলেন কতিপয় মুসলমান সৈন্য। বিপর্যস্ততা, বিশৃঙ্খলা এবং ভীতিবিহ্বলতার কারণে তাঁরা প্রথমে রসুলে পাক স. কে চিনতেই পারলেন না। একজন তীর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন। তিনি স. বললেন, আমি আল্লাহ্র রসুল। সম্বিত ফিরে পেলেন তাঁরা। রসুল স. কে অক্ষত দেখে আনন্দিত হলেন। রসুল স.ও ক্ষুদ্র বাহিনীটিকে পেয়ে খুশী হলেন। ধনুর্ধর বাহিনীর সদস্যদের অবস্থানচ্যুত হওয়া এবং সেই সাথে অনেকের শাহাদাৎ প্রাপ্তির সংবাদ রসুল স.

জানিয়ে দিলেন তাঁদেরকে। সহসা সামনের ঘাঁটির মুখে আবু সুফিয়ান তার বাহিনী সহ আর্বিভূত হলো। মুসলমান বাহিনীকে দেখে হতচকিত হয়ে গেলো তারা। ভীত হয়ে গেলো এই ভেবে যে, নিশ্চয়ই এরা আমাদেরকে হত্যা করবে। আক্রমণের চিন্তা বাদ দিয়ে তখন তারা আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত হয়ে পড়লো। রসুল স. সাথীদেরকে বললেন, ওরা আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না। তিনি প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! এই ক্ষুদ্র দলটির মৃত্যু হলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার জন্য আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি উচ্চ স্বরে ছত্রভঙ্গ মুসলমান বাহিনীকে একত্রিত হতে আহবান জানালেন। সাহাবীগণ পুনঃএকত্রিত হয়ে কাফেরদেরকে পাথর মারতে মারতে হটিয়ে দিলেন। আমি বলি, এই পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে 'সানুলক্বি ফি কুলুবিল্লাজিনা কাফারু'। আল্লাহ্তায়ালা আবু সুফিয়ান ও তার বাহিনীর সদস্যদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দিয়েছিলেন। আমি আরো বলি, দুঃখের পরে দুঃখ অর্থ্যাৎ দ্বিতীয় দুঃখ হচ্ছে, মদীনায় যাঁরা আছেন তাঁদের জন্য দুশ্চিন্তা। আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে যখন মক্কায় ফিরে যাচ্ছিলো, তখন রসুল স. ও সাহাবীগণ আতংকিত হলেন এই ভেবে যে, ওরা হয়তো মদীনায় পৌঁছে অসহায় শিশু ও নারীদেরকে নির্যাতন করবে। মদীনা রক্ষার জন্য রসুল স. হজরত আলী এবং হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসকে নিযুক্ত করলেন। বললেন, যদি দেখো তারা উটের পিঠে উঠে অশ্বগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে তবে মনে করবে তারা মক্কাতেই যাচ্ছে। আর যদি তারা ঘোড়ায় চড়ে উটগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতে থাকে, তবে বুঝবে তাদের এই যাত্রার উদ্দেশ্য মদীনা লুণ্ঠন করা। আমার জীবনাধিকারী পবিত্র সত্তার শপথ! তারা মদীনা আক্রমণ করলে আমিই তাদের মোকাবেলা করবো। হজরত আলী এবং সা'দ, আবু সুফিয়ান বাহিনীকে অনুসরণ করলেন। দেখলেন, তারা উষ্ট্রারোহী হয়ে অশ্বগুলোকে সাথে নিয়ে চলেছে। মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলো তারা। কিন্তু তাদের সাথী সাফওয়ান বিন উমাইয়া তাদেরকে একাজ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলো।

'দুঃখের পরে দুঃখ' এর আরো একটি অর্থ এরকম হয় যে, তোমরা রসুল স. কে দুঃখ দিয়েছো তাই ওই দুঃখের পরে আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে দুঃখ দিয়েছেন। এই দুঃখ দানের উদ্দেশ্য মহৎ। এতে করে বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করার মতো মহান গুণ লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে রয়েছে আগামী ঘাত প্রতিঘাতময় জীবনকে অতিক্রম করার মহান শিক্ষা। আমি বলি, এতে রয়েছে উপর্যুপরি দুঃখবরণের বিনিময় (সওয়াব) লাভের সুযোগ। রয়েছে নবীর মাধ্যমে আগত সুসংবাদ। সুতরাং বিষণ্নতা পরিহার করে নির্বিকারচিত্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তোমাদের বিপদে তোমরা একা নও, তোমাদের রসুলও এই দুঃখবেদনার

অংশীদার। সুতরাং অনানন্দিত হওয়ার অবকাশ কোথায়। আর আল্লাহতায়ালাতো জানেনই তোমাদের আমল কীরকম। আমলের উদ্দেশ্যই বা কীরকম।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫৪

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً
مِنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ
الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ
كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا
مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ
الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي
صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

❑ অতঃপর দুঃখের পরে তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিলেন নিরাপত্তা, যাহা তোমাদের একদলকে তন্দ্রাভিভূত করিয়াছিল। এবং একদল প্রাগ-ইসলামী অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করিয়া নিজেরাই নিজদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল এই বলিয়া যে, 'আমাদের কি কিছু করণীয় আছে? ' বল, 'সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌েরই এখ্‌তিয়ারে।' যাহা তাহারা তোমার নিকট প্রকাশ করেনা তাহা তাহারা তাহাদের অন্তরে গোপন রাখে এই বলিয়া যে 'এই ব্যাপারে আমাদের কোন কিছু করণীয় থাকিলে আমরা এই স্থানে নিহত হইতাম না।' বল, 'যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করিতে তবুও নিহত হওয়া যাহাদের অবধারিত ছিল তাহারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বাহির হইত;' ইহা এই জন্য যে আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা পরিশোধন করেন। অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।

মুসলমান বাহিনীকে তন্দ্রাভিভূত করে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালা। এই তন্দ্রাভিভূত প্রশান্তির উত্তরাধিকার লাভ করেছেন সুফিয়ায়ে কেরাম।

আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ রহমত বর্ষণের সময় সুফিয়ায়ে কেরাম তন্দ্রাভিভূতির এই মগ্নতা লাভ করেন। এই মগ্নতা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল কিছুর সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়।

হজরত আনাসের মাধ্যমে ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু তালহা বলেছেন, উহুদ প্রান্তরে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে ছিলাম। আমাদেরকে এমন এক তন্দ্রা আচ্ছাদিত করলো যে, আমরা বার বার চেতনাচ্যুত হচ্ছিলাম। হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যাচ্ছিলো। সামান্য চৈতন্য হতেই তলোয়ার তুলে নিচ্ছিলাম। আবার পড়ে যাচ্ছিলো। আবার তুলে নিচ্ছিলাম। হজরত সাবেত ও হজরত আনাসের মাধ্যমে আরো বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু তালহা বলেছেন, আমি মাঝে মাঝে মাথা উঠিয়ে দেখছিলাম, এমন কেউই নেই যিনি তন্দ্রাচ্ছন্নতার কারণে টলে টলে পড়ছিলেন না।

মুনাফিকদের অবস্থা ছিলো অন্যরকম। তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও মগ্নতা তাদেরকে এতোটুকু প্রভাবান্বিত করেনি। মগ্নতার প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত ছিলো তারা। তারা তাদের অপবিত্র ধারণায় এই ভেবে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলো যে, আল্লাহ্ মোহাম্মদকে সাহায্য করবেন না। কখনো ভাবছিলো মোহাম্মদ যদি নবীই হতেন তাহলে নিহত হতেন না। কখনো আক্ষেপ করছিলো, আল্লাহ্ বিজয়ের ওয়াদা করেছিলেন কিন্তু আমরা তো তার কিছুই পেলাম না। এক বর্ণনায় এসেছে, বনী খাজরাজ গোত্রের কতিপয় সাহাবীর শাহাদাতের সংবাদ শুনে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই এরকম বলেছিলো। মুনাফিকরা একথা ভেবেও বিক্ষুব্ধ হচ্ছিলো যে, কেনো আমাদেরকে পীড়াপিড়ি করা হচ্ছে। কবে আমরা বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হতে পারবো।

ইবনে রাহওয়াইহ্, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত জোবায়ের বলেছেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে উহুদ প্রান্তরে আতংকিত অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় আল্লাহ্ আমাদেরকে তন্দ্রামগ্ন করলেন। মগ্নতার কারণে সকলেরই চিবুক বুকের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছিলো। তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে আমি স্বপ্নে দেখলাম, মা'তাব বিন কুশায়ের বলছেন 'লাও কানা লানা মিনাল আমরি শাইয়ুমঁ মা ক্বতিল্না হাহুনা।' তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা 'ছুম্মা আনযালা আলাইকুম থেকে ওয়াল্লাহু আলিমুম বিজাতিস্ সুদুর' পর্যন্ত নাজিল করলেন। মুনাফিকেরা বলেছিলো, বিজয়ের প্রতিশ্রুতি আর প্রতিপালিত হলো কোথায়? বরং আমাদের অনেকেই নিহত হলেন। আমাদেরতো মতামত দেয়ার অধিকারই নেই। আমরা মদীনা থেকে বের না হলে শত্রুপক্ষ আমাদেরকে এভাবে হত্যা করতে পারতো না। তাদের এই মনোভাবকে স্পষ্ট করে দিয়ে আল্লাহতায়ালা তাঁর রসুলকে জানালেন, হে নবী আপনি বলে দিন, মৃত্যুর সময় ও স্থান নির্ধারিত। যথাসময়ে মৃত্যু অবশ্যই উপস্থিত হবে, তোমরা আপন গৃহে অবস্থান করলেও

মৃত্যুর নির্ধারিত স্থানে তোমাদেরকে আসতেই হবে। আল্লাহতায়ালার সিদ্ধান্তই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। প্রকৃত বিজয় অবশ্যই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্যই। বাহ্যিক বিপর্যয় ধর্তব্য নয়। মুমিনদেরকে ধৈর্যের প্রতিদান প্রদান এবং মুনাফিকদের কপটতা স্পষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ রকম বিপদ অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই বিপদের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তর শয়তানের কুমন্ত্রণামুক্ত হয়। হৃদয় ভরে যায় নির্মলতার আলোকচ্ছটায়।

সকলের অন্তরের অবস্থা আল্লাহতায়ালা তো নিশ্চিতভাবেই জানেন। তবুও পার্থিব বাস্তবতায় মুমিন ও মুনাফিকদেরকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে এ রকম ঘটনার প্রয়োজন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫৫

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

❐ যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল সেই দিন যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাহাদের পদস্খলন ঘটাইয়াছিল। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। আল্লাহ্ ক্ষমা পরায়ণ ও পরম সহনশীল।

উহুদ প্রান্তরে চরম বিপর্যস্ততার মুহূর্তে রসুল স. এর কাছে মাত্র তেরজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। ওদিকে তীরন্দাজ বাহিনীতে অনড় ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের সহ দশজন। অন্যান্যরা ছিলেন ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শয়তানের কুমন্ত্রণার কারণে গণিমত লুণ্ঠনের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন একদল। লুণ্ঠনের প্রতি তাঁদের এই ধাবমানতা ছিলো শয়তানের কুমন্ত্রণাপ্রসূত। তাঁদের অনুপস্থিতিতে অরক্ষিত গিরিপথ বেয়ে কাফের বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ করতে সাহসী হয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াতে লুণ্ঠনের প্রতি ধাবিতদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার কথা ঘোষণা করে বলেছেন, শয়তানই তাদের এই স্খলন ঘটিয়েছে।

পরবর্তীতে মিশরবাসীরা যখন উহুদ যুদ্ধে পশ্চাদাপসরণ এবং বদর যুদ্ধে ও বায়াতে রিদওয়ানে অনুপস্থিত থাকা নিয়ে হজরত ওসমানকে অভিযুক্ত করেছিলো তখন ইবনে ওমর তাদেরকে বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তাঁদের স্খলনকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর হজরত ওসমানের বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকার

কারণ ছিলো এই, তাঁর স্ত্রী রসুল স. এর কন্যা হজরত রোকেয়া তখন অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ স্ত্রীর পরিচর্যার কারণেই রসুল স. তাঁকে বদর অভিযানে অংশগ্রহণের অনুমতি দেননি। রসুল স. তাঁকে বলেছিলেন, তুমি বদর যুদ্ধে গমনকারীদের মতো সওয়াব লাভ করবে। বায়াতে রেদওয়ানের ঘটনাটি ছিলো এ রকম, তিনি স. তাঁকে দূত হিসাবে মক্কার কোরাইশদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। কারণ, তিনি ছিলেন সম্মানিতজন। তাঁর চেয়ে বেশী সম্মানিত কেউ থাকলে রসুল স. তাঁকেই পাঠাতেন। হজরত ওসমান সেখান থেকে ফিরে আসার আগেই বায়াতে রেদওয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। রসুল স. তাঁর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে বললেন, এটাই ওসমানের হাত। তারপর দুই হাত মিলিয়ে বললেন, এটাই ওসমানের বায়াত। হজরত ইবনে ওমর দোষারোপকারীদেরকে বললেন, এই কথাগুলো স্মরণে রেখো। বোখারী। উহুদ যুদ্ধে পশ্চাদাপসরণকারী সাহাবীদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা বৈধ নয়। তাছাড়া পশ্চাদাপসরণের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ঘটনাটি ঘটেছিলো। তাই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার দোষারোপ থেকে তাঁরা মুক্ত।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল। তিনি পশ্চাদাপসরণ-কারীদেরকে অভিযুক্ত করেননি। ক্ষমামন্ডিত করে ধন্য করেছেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫৬

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۗ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

❐ হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও তাহাদের ভ্রাতাগণ যখন দেশে দেশে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহাদের সম্পর্কে বলে, 'তাহারা যদি আমাদের নিকট থাকিত তবে তাহারা মরিত না।' ফলতঃ আল্লাহ্ ইহাই তাহাদের মনস্তাপে পরিণত করেন; আল্লাহ্ই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার দ্রষ্টা।

মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এবং তার সঙ্গীদের অনুসরণ না করার জন্য নির্দেশ এসেছে এই আয়াতে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কোনো সম্প্রদায়ের অনুসারী ব্যক্তিকে ওই সম্প্রদায়ভূত বলেই গণ্য করা হবে। এই হাদিস হজরত ইবনে ওমর থেকে আবু দাউদ এবং হজরত হোজায়ফা থেকে তিবরানী মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কুফরী ও মুনাফিকির অনুসরণ থেকে বিরত থাকা ফরজ। এ ধরনের অনুসরণ কুফর পর্যন্ত উপনীত করায়। তারা আমাদের সঙ্গে থাকলে মরতো না — এ ধরনের কথা তকদীরের প্রতি বিশ্বাসকে বিনষ্ট করে। তকদীর অস্বীকার করা কুফরী। এই উম্মতের ক্বদরিয়া ফেরকার বিশ্বাসও এরকম। তকদীরের প্রতি আস্থা তাদের নেই।

এই আয়াতে 'তাহাদের ভ্রাতাগণ' বলতে সফর কিংবা যুদ্ধে নিহতদেরকে বোঝানো হয়েছে। যারা এখনো জীবিত তাদেরকে লক্ষ্য করেও এই শব্দটির উল্লেখ করা হতে পারে। আমি বলি, 'তাহাদের ভ্রাতাগণ' বলতে তাদের সম্মুখে উপস্থিত ব্যক্তিদেরকেই বোঝানো হয়েছে। যারা মৃত তারাও এই সম্বোধনের অন্তর্ভূত। কারণ, কোনো দলের কিছু সংখ্যক লোক যদি কোনো ক্রিয়ার কর্তা হয়, তবে ওই ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ দলটি সম্পৃক্ত হয়ে যায়। যারা যুদ্ধবিজয়ী (গাজী) তারা মুনাফিকদের ভ্রাতা হলেও মুনাফিক নন। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ এই যে, কোনো অবস্থাতেই যেনো বিশ্বাস ও বক্তব্যকে মুনাফিকির অনুকূল না করা হয়।

আল্লাহ্তায়ালা যেমন জীবন দান করেন, তেমন মৃত্যুও ঘটান। সফর অথবা জেহাদ না করলে হায়াত বাড়বে না। আর হায়াত শেষ না হলে ভ্রমণকালে অথবা যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যু আসবে না।

আয়াতের শেষে, 'তোমরা যাহা করো আল্লাহ্ তাহার দ্রষ্টা' একথা বলে মুমিনদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের বিশ্বাস ও আচরণের অনুসরণ তাঁর দৃষ্টির আওতা বহির্ভূত নয়। সুতরাং সাবধান!

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫৭, ১৫৮

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ وَلَئِنْ مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ۝

❐ তোমরা আল্লাহের পথে নিহত হইলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে যাহা তাহারা জমা করে, আল্লাহের ক্ষমা এবং দয়া তাহা অপেক্ষা শ্রেয়।

❒ এবং তোমাদের মৃত্যু হইলে অথবা তোমরা নিহত হইলে আল্লাহেরই নিকট তোমাদিগকে একত্র করা হইবে।

জীবন ও মৃত্যুতে সফর এবং জেহাদের কোনো অধিকার নেই। জীবন-মৃত্যুর নিরঙ্কুশ অধিকার কেবল আল্লাহ্তায়ালার। সকল কার্যকারণের স্রষ্টা তিনিই। সফর ও জেহাদ যদি মৃত্যুর কারণ বলে প্রতিভাত হয়, তবে তাতে চিন্তিত হওয়ার কী আছে? বরং এ রকম মৃত্যু আল্লাহ্তায়ালার রহমত ও মাগফিরাত অর্জনের সহায়। এবং আল্লাহ্তায়ালার রহমত, মাগফিরাত পৃথিবীর সকল বৈভব অপেক্ষা নিঃসন্দেহে উত্তম। পরকালের কল্যাণাকাঙ্খীদের জন্য পরিত্যাজ্য পৃথিবীর জন্য আক্ষেপ নিরর্থক।

যারা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং যারা শাহাদাতের অবিনশ্বর গৌরব লাভে ধন্য হয় — সকলকে আল্লাহ্র সকাশেই উপস্থিত হতে হবে। এর জন্য পৃথিবীর জীবনে সকল চেষ্টা ও সাধনাকে আল্লাহ্র মহব্বত অর্জনার্থে নিয়োজিত করতে হবে, যাতে নির্ধারিত মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবীর বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্র মাহবুবিয়াতের স্থায়ী সৌভাগ্য লাভ সহজ হয়।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫৯

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ○

❒ আল্লাহের দয়ায় তুমি তাহাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হইয়াছিলে, যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ কর এবং তুমি কোন সংকল্প করিলে আল্লাহের প্রতি নির্ভর করিবে; যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন।

যারা রসুল স. এর হুকুম পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছিলেন, রসুল স. তাঁদের প্রতি রুষ্ট হননি বরং কোমল আচরণ করেছিলেন। এই কোমলতা আল্লাহ্তায়ালার দান। ভুল বুঝবার পর এমনিতেই অন্তর অনুতাপে জর্জরিত হতে থাকে। ওই সময়ে তাদেরকে ক্ষমার্হ ভাবা এবং তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করাই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু এ রকম উত্তম আচরণ আল্লাহ্তায়ালার নিছক রহমত ছাড়া সম্ভব নয়। কর্কশ ভাষণ ও কঠোরতা মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। অনুতাপবিক্ষতদেরকে কর্কশ ভাষায় ভর্ৎসনা করা হলে ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ রকম হেদায়েত হয়েছে যে, এ রকম করলে তারা আপনার নিকট থেকে সরে যেতো। শেষ পর্যন্ত ইসলামের গন্ডি থেকেই বেরিয়ে যেতো হয়তো, হয়ে যেতো জান্নাত লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। অনুসরণকারীদের সংখ্যা কম হওয়ার অর্থ সওয়াব কম হওয়া। এ সমস্ত কিছুকে সদয় বিবেচনায় রেখে হে নবী, আপনি আপনার হক ক্ষমা করে দিন। আর তারা যে আল্লাহ্র হক নষ্ট করেছে সে জন্য আল্লাহ্র কাছে মাগফেরাত কামনা করুন।

যুদ্ধকালে এবং অন্যান্য সকল অবস্থায় সমস্যা সমুপস্থিত হলে, কর্তব্যকর্ম নির্ধারণার্থে পরামর্শ বিনিময় করা প্রয়োজন। এখানে আল্লাহ্র রসুলকে পরামর্শ বিনিময় করতে বলা হয়েছে। যেনো পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত লাভ সহজতর হয় এবং পরমর্শসভায় উপস্থিত সকলের অন্তর সন্তোষ লাভ করে। আর এই উম্মতের জন্য এই নিয়মটিও জারি হয়ে যায়। ইমাম বাগবী তাঁর সূত্রপরম্পরায় উল্লেখ করেছেন, হজরত আয়েশা বলেছেন, আমি কাউকে রসুল স. অপেক্ষা অধিক পরামর্শ করতে দেখিনি। পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহনের পর প্রয়োজন আল্লাহ্তায়ালার প্রতি পূর্ণনির্ভরতা। রসুল স. এমনই করতেন। এজন্যই রণসাজে সজ্জিত হয়ে উহুদ প্রান্তরের দিকে যাত্রার প্রাক্কালে যখন তাঁকে ক্ষান্ত হতে বলা হয়েছিলো, তখন তিনি বলেছিলেন, রণসজ্জিত হওয়ার পর যুদ্ধ না করে যুদ্ধসজ্জা খুলে ফেলা নবীদের জন্য শোভনীয় নয়।

সকল সময় নির্ভর করতে হবে আল্লাহ্র উপরেই। কেননা তিনিই অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। পরামর্শ বিনিময়ের উপকার এই যে, এতে করে সর্বোত্তম সিদ্ধান্তটির স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু মানুষের সিদ্ধান্ত সর্বোত্তম হলেও সম্পূর্ণ নির্ভূল নয়। তাই ভরসা (তাওয়াক্কুল) আল্লাহ্র প্রতি করতে হবে। আল্লাহ্ সম্পর্কে এ রকম বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি নিশ্চয়ই উত্তম বিনিময় প্রদানে সক্ষম।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, রিজিক অর্জনকালে আল্লাহ্তায়ালার অবাধ্য না হওয়ার নামই তাওয়াক্কুল। রিজিকপ্রাপ্তির বিষয়টি আল্লাহ্তায়ালার প্রতি সমর্পণ করতে হবে। অবৈধ বিষয়ে আল্লাহ্তায়ালার উপর ভরসা করার কোনো সুযোগ নেই। কেউ কেউ বলেছেন, তাওয়াক্কুল অর্থ আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যকারী, রিজিক দাতা এবং তত্ত্বধায়ক মনে না করা।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তাদের পরিচয় কী? তিনি স. বললেন, তারা ওই

সমস্ত লোক যারা দেহে দাগ দেয় না, যাদু মন্ত্র পড়ে না এবং শুভাশুভ নির্ণয় করে না; তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি নির্ভরশীল। বোখারী ও মুসলিম। ইমরান বিন হোসেন থেকে বাগবীও এ রকম হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন।

হজরত ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্-তায়ালার অধিকার অনুসারে যদি তাওয়াক্কুল করতে সমর্থ হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এমনভাবে রিজিক দান করবেন, যে রকম দান করেন পাখিদেরকে। পাখিরা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় অন্ন অন্বেষণে বের হয়। আর বিকালে ফিরে আসে পরিতৃপ্ত হয়ে। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে এ রকম ধারণার সৃষ্টি হয় যে, বস্তুসামগ্রী পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করাই তাওয়াক্কুল। যেমন, আঘাতপ্রাপ্ত হলে এ জন্য কাউকে দোষী সাব্যস্ত না করা। আমি বলি, এ রকম সন্দেহের সুযোগ এখানে নেই। দ্রব্যসামগ্রী পরিত্যাগ করা তাওয়াক্কুল নয় বরং এ সবের প্রতি ভরসা না করা তাওয়াক্কুল। পরামর্শবিনিময়ও এক প্রকারের দ্রব্যসামগ্রীর মতো, যা গ্রহণ করতে হবে কিন্তু এর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাবে না। বস্তুসামগ্রীর মাধ্যম গ্রহণ তাওয়াক্কুলবিরোধী নয়। বিনা হিসাবে বেহেশতীগণ বস্তু সামগ্রীর মাধ্যম গ্রহণ করেন না — এর অর্থ অতিরিক্ত অথবা মাকরূহ বস্তু সমূহকে তারা পরিত্যাগ করেন। জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। যেমন, পানাহার, প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ। নামাজ রোজাও জান্নাতে প্রবেশ করার কারণ বা মাধ্যম। কিন্তু নামাজ রোজা প্রতিপালন করা জরুরী।

জ্ঞাতব্য ঃ গ্রন্থকার বলেন, হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে, এই আয়াতে হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের নিকট থেকে পরামর্শ নেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াত হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের শানে নাজিল হয়েছে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, তোমরা দু'জনে ঐকমত্য স্থির করলে আমি তার বিরোধিতা করবো না। ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর একবার ওমরকে বললেন, যুদ্ধের ব্যাপারে রসুল স. পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। তুমিও পরামর্শ গ্রহণ করো। জুহাক বলেছেন, হজরত ওমর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এমনকি রমণীদের নিকট থেকেও।

যাঁরা তাওয়াক্কুল করেন, আল্লাহ্ তাঁদেরকে ভালোবাসেন । আল্লাহ্‌র ভালোবাসা সর্বোত্তম নেয়ামত। তাওয়াক্কুলকারীদেরকে আল্লাহ্ই সাহায্য করেন এবং দ্বীন-দুনিয়ার সংশোধন দানে ধন্য করেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্‌র উপরে ভরসাকারীদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' হাদিসে

কুদসীতে এসেছে, আমি আমার বান্দার ধারণার অনুকূল। অর্থাৎ বান্দা ভালো বা মন্দ যে রকম ধারণা আমার প্রতি রাখে, আমি সে রকমই আচরণ করি তাদের সাথে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬০

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

❒ আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিলে তোমাদের উপর জয়ী হইবার কেহই থাকিবে না। আর তিনি তোমাদিগকে সাহায্য না করিলে তিনি ছাড়া কে সে যে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? বিশ্বাসীগণ আল্লাহের উপরই নির্ভর করুক।

যাঁরা আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যপ্রাপ্ত, কেউই তাদেরকে পরাস্ত করতে পারে না। আর যাদেরকে তিনি সহায়তাবিহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করেছেন, কেউ তাদেরকে সাহায্য করতে সমর্থ নয়। প্রশ্নাকারে এই কথাটিই উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে কে সাহায্য করবে? এ রকম সাহায্যের প্রত্যাশা অকল্পনীয়। এই আয়াতে ইমানদারদের কর্তব্যকর্ম এটাই সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, তারা যেনো কেবল আল্লাহ্তায়ালার প্রতি তাওয়াক্কুল করতে ব্রতী হয়। এটাই তাদের ইমানের অনুকূল আচরণ।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬১, ১৬২, ১৬৩

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۚ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○ اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

❒ নবী অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করিবে, ইহা অসম্ভব। এবং কেহ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করিলে যাহা সে অন্যায়ভাবে গোপন করিবে কিয়ামতের

দিন সে তাহা লইয়া আসিবে। অতঃপর প্রত্যেককে যাহা সে অর্জন করিয়াছে তাহা পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে। তাহাদের প্রতি কোন জুলুম করা হইবে না।

❐ আল্লাহ্ যাহাতে রাজী, যে তাহারই অনুসরণ করে সে কি উহার মত যে আল্লাহের ক্রোধের পাত্র হইয়াছে এবং জাহান্নামই যাহার আবাস? এবং উহা কত নিকৃষ্ট পরিণামস্থল!

❐ আল্লাহের নিকট তাহারা বিভিন্ন স্তরের; তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহার দ্রষ্টা।

নবীর জন্য অন্যায়ভাবে কোনো বস্তু গোপন করা সম্ভব নয়। গোপন করা অর্থ গণিমতের সম্পদ গোপন করা বা খেয়ানত করা। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, এখানে গোপন করার অর্থ ওহি বা প্রত্যাদেশ গোপন করা। অর্থাৎ লোভ, ভয় অথবা সুবিধার কারণে ওহির কোনো অংশ বিশেষকে গোপন করা নবীর জন্য বৈধ নয়। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, কতিপয় প্রতাপশালী ব্যক্তি তাদের অধিকারবহির্ভূত দাবী পেশ করে গণিমতের সম্পদপ্রার্থী হলো, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। উদ্দেশ্য এই যে, বিধানবহির্ভূতভাবে কোনো দলকে গণিমত দেয়া অথবা বঞ্চিত করা নবীর জন্য শোভনীয় নয়। গণিমতের সুষম বন্টন জরুরী। বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, আবু দাউদ, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। তিরমিজি বলেছেন বর্ণনাটি হাসান। বদর যুদ্ধে গণিমতের মাল থেকে একটি নকশী লাল চাদর হারিয়ে গিয়েছিলো। কেউ কেউ ধারণা করেছিলেন, চাদরটি রসুলপাক স. নিয়েছেন। তখন এই আয়াত নাজিল করে আল্লাহ্তায়ালা জানালেন যে, মালে গণিমতের খেয়ানত করা নবীর জন্য দুরস্ত নয়।

কালাবী এবং মুকাতিল বলেছেন, উহুদের যুদ্ধলব্ধ গণিমত সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। তীরন্দাজ বাহিনীর সদস্যরা তাদের অবস্থানস্থল পরিত্যাগের সময় বলেছিলেন, মনে হচ্ছে রসুল স. এ রকম বলেছেন যে, যে ব্যক্তি যে বস্তু সংগ্রহ করবে সেটা তারই। তারা ধারণা করছিলেন, বদরের মতো এবারও মনে হয় গণিমতের সকল মাল বন্টন করা হবে না। এ রকম চিন্তাই তাদেরকে গণিমতের দিকে ধাবিত করেছিলো। পরে রসুল স. যখন বলেছিলেন, আমি কি তোমাদেরকে একথা বলিনি যে, আমার পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত স্থান ত্যাগ কোর না। তখন তারা বলেছিলেন, আমাদের অন্য সাথীরা তো সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন। রসুল স. বলেছিলেন, তোমরা মনে করেছো গণিমতের মাল খেয়ানত করা হবে। যথাবন্টন হবে না। এই সময় এই আয়াত নাজিল হয়। মুসান্নিফ গ্রন্থে ইবনে আবী শাইবা এবং জুহাকের মাধ্যমে ইবনে জারীরের মুরসাল বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. কিছুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলেন। গণিমতের মাল বন্টন করা হয়েছিলো তাদের অনুপস্থিতিতে। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

রসুল স. তাদেরকে গণিমত দেননি। কিন্তু এটাকে খেয়ানতও বলা যায় না। নবীকে খেয়ানতকারী বলা জায়েয নয়।

হজরত কাতাদা বলেছেন, আমাদের নিকট বর্ণনা পৌছেছে যে, সাহাবীগণ কেউ হয়তো গণিমতের মাল খেয়ানত করে থাকবেন। এই আয়াত নাজিল হয়েছে তাদের সম্পর্কেই। কবীর পুস্তকে তিবরানী সুদৃঢ় সনদের মাধ্যমে ইবনে আব্বাসের উক্তি এ মতো উল্লেখ করেছেন যে, রসুল স. কতিপয় সৈন্যকে কোনো এক জায়গায় পাঠালেন। তাঁরা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলেন। পুনরায় পাঠালেন। পুনরায় তাঁরা ফিরে এলেন। কারণ ছিলো, তাঁরা হরিণের মস্তক পরিমাণ একটি স্বর্ণখন্ড খেয়ানত করেছিলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

যে খেয়ানত করবে কিয়ামতের দিন সে তার খেয়ানতসহ উপস্থিত হবে। কালাবী বলেছেন, দোজখে খেয়ানতকৃত বস্তুর আকৃতিতে কোনো বস্তু প্রস্তুত করে রাখা হবে। খেয়ানতকারীকে বলা হবে, নিচে নেমে গিয়ে ওই বস্তুটি নিয়ে এসো। সে নিচে গিয়ে ওই বস্তুটি পিঠে করে নিয়ে উঠে আসবে। তখন বস্তুটি পড়ে যাবে। পুনরায় তাকে হুকুম দেয়া হবে তলদেশে গিয়ে বস্তুটি নিয়ে এসো। এভাবেই চলতে থাকবে তার অবরোহন ও আরোহন (আল্লাহ্ই জানেন এ অবস্থা কতোদিন ধরে চলবে)। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, খয়বর অভিযানে আমরা রসুল পাক স. এর সঙ্গে উষ্ট্রারোহী হয়ে গমন করেছিলাম। ওই যুদ্ধ থেকে গণিমত হিসাবে সোনা রূপা কিছু পাওয়া যায়নি। পাওয়া গিয়েছিল উট, কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী। আমরা এক ঘাঁটিতে পৌছলে মোদয়াম নামক এক হাবশী গোলাম রসুল স. এর উটের হাওদা নামানোর সময় তীরবিদ্ধ হলো। মোদয়াম ছিলো রসুল স.কে হেবা কৃত রেফায়াহ্ বিন জায়েদের গোলাম। তীরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো মোদয়াম। কে তীর মেরেছিলো তা জানাও সম্ভব হলো না। সাহাবীগণ দোয়া করলেন, তার জন্য বরকতপূর্ণ জান্নাত নসীব হোক। রসুল স. বললেন, কখনোই নয়। সে খয়বর যুদ্ধের গণিমত থেকে ছোট একটি কম্বল নিয়েছিলো, যা তার প্রাপ্য ছিলো না। সে তার জন্য আগুণ প্রজ্বলিত করেছে। এই কথা শুনে এক ব্যক্তি দু'টি চামড়ার টুকরা এনে রসুল স.এর সামনে পেশ করে বললেন, এই টুকরা দু'টিও আগুনের (যদি ফেরত না দিতাম তবে এই টুকরা দু'টিই হতো আমার জন্যে প্রজ্বলিত আগুন)। বাগবী।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, কোনো এক ব্যক্তি মোদয়াম নামক গোলামকে রসুল স. এর নিকট হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করেছিলো।

হজরত ইয়াজিদ বিন খালেদ জুহুনী বর্ণনা করেছেন, খয়বর অভিযানকালে এক জনের মৃত্যু হলো। সাহাবীগণ তার কথা রসুল স. কে জানালেন। রসুল স.

বললেন, তোমরাই তোমাদের সাথীর নামাজ পড়ো। এরশাদ শুনে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলেন সকলে। রসুল স. বললেন, তোমাদের সাথী আল্লাহ্‌র রাস্তায় খেয়ানত করেছে। বর্ণনাকারী বলেছেন, আমরা তার মালপত্র খুঁজে ইহুদীদের নিকট থেকে লুণ্ঠন করা দু'টি মুক্তা দেখতে পেলাম, যার মূল্য হবে দুই দিরহাম। মালেক, নাসাঈ।

হজরত আবু হোমায়েদ সায়েদী বর্ণনা করেছেন, আজদ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিলো ইবনে কাতিবা। রসুল স. তাকে জাকাত আদায় করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ফিরে এসে সে কিছু মাল জমা দিলো এবং কিছু নিজের কাছে রেখে বললো, এগুলো আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। রসুল স. ভাষণ দানের জন্য দন্ডায়মান হলেন। আল্লাহর স্তুতি প্রশস্তি বর্ণনার পর বললেন, আল্লাহ আমাকে দায়িত্ব দান করেছেন। আর আমি প্রতিনিধি হিসাবে তোমাদের কতিপয় ব্যক্তিকে দায়িত্ব দান করেছি। জাকাত আদায়ের দায়িত্ব সমাপনান্তে কেউ যদি কিছু মাল জমা দিয়ে কিছু মাল নিজের কাছে রেখে সেটাকে হাদিয়া বলে তবে সে নিজ গৃহে বসে থেকে দেখলো না কেনো হাদিয়া তার কাছে আসে কি না? আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো বস্তু গ্রহণ করবে, ওই ব্যক্তি অবশ্যই সেই বস্তুর বোঝা নিয়ে আল্লাহর সকাশে উপস্থিত হবে। সেদিন কেউ কেউ উট, গাভী অথবা বকরীর বোঝা নিয়ে উপস্থিত হবে। বোখারী, মুসলিম।

দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর রসুল স. দুই হাত উত্তোলন করে বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি তোমার হুকুম পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? হজরত আদী বিন উমায়ের বলেন, আমি রসুল স. কে এ রকম বলতে শুনেছি, আমি তোমাদেরকে যে দায়িত্ব দেই, সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কেউ যদি একটি সুঁচ অথবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোনো বস্তু গোপন করে ফেলে, তবে তা হবে চুরি। কিয়ামতের দিন ওই চুরিসহই তাকে হাজির হতে হবে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একদা রসুল স. ভাষণ দেয়ার জন্য দন্ডায়মান হলেন। জাকাত অথবা গণিমতের মাল আত্মসাৎ করা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, শুনে রাখো। কেউ যেনো স্কন্ধদেশে উট নিয়ে আমার সামনে হাজির না হয়। যখন সে বলতে থাকবে, হে আল্লাহর রসুল! সাহায্য করুন। আমি তখন বলবো, আল্লাহর সামনে এখন আমার কিছুই করার নেই। আমি তো তোমাকে আল্লাহর হুকুম পৌঁছে দিয়েছিলাম। এরপর রসুল স. ওই সমস্ত লোকের কথা উল্লেখ করলেন, যাদের ঘাড়ে থাকবে ঘোড়া, বকরী অথবা সোনা রূপার বোঝা। তারাও রসুল স. এর সাহায্যপ্রার্থী হবে। তিনি স. তাদেরকে একই উত্তর দিবেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ওমর থেকে আবু ইয়া'লী এবং বায্যার, হজরত সা'দ বিন আবু উবাদা ও হালাব থেকে আহমদ, হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত আয়েশা থেকে বায্যার এবং হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে তিবরানীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ সমস্ত হাদিসে জাকাতের মাল আত্মসাৎ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

হজরত আবু মালেক আশআরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সবচেয়ে বড় আত্মসাৎ হচ্ছে চুরি। একটি জমির দু'জন অংশীদারের মধ্যে একজন যদি অন্যজনের অংশ থেকে একগজ অধিকার করে নেয় তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ ওই ব্যক্তিকে সপ্তস্তর জমির শিকল পরিয়ে উঠাবেন।

হজরত মুআজ বিন জাবাল বলেছেন, আমাকে রসুল স. ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। বললেন, আমার আদেশ ব্যতীত কোনো বস্তু গ্রহণ কোর না। করলে তা হবে আত্মসাৎ ও চুরি। 'ওয়া মাইয়াগলুল ইয়া'তি বিমা গাল্লা ইয়াউমাল কিয়ামাহ।' — যে ব্যক্তি আত্মসাৎ বা চুরি করে সে তার চুরির মালসহ কিয়ামতে হাজির হবে।

হজরত আমর বিন শোয়ায়েবের দাদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স., হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর আত্মসাৎ ও চুরির সামগ্রী পুড়িয়ে দিতেন। আবু দাউদ।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বলেছেন, সম্পদ সংরক্ষণের জন্য রসুল স. এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন। যার নাম ছিলো করকরা। করকরার মৃত্যু হলে রসুল স. বললেন, সে দোজখী। সবাই দেখতে পেলো তার ব্যক্তিগত মালপত্রের মধ্যে রয়েছে একটি আবা (এক প্রকার আরবীয় পোশাক), যা সে আত্মসাৎ করেছিলো। বোখারী।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হজরত ওমর বলেছেন, খয়বর যুদ্ধের সময় কতিপয় সাহাবী বললেন, অমুক অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়েছে। একজনের জানাজা পড়ে তাঁরা বললেন, এই ব্যক্তি শহীদ। রসুল স. বললেন, কখনোই নয়। আমি তাকে আগুনপরিবেষ্টিত দেখলাম। কারণ, সে একটি চাদর আত্মসাৎ করেছে। অথবা বললেন, একটি আবা আত্মসাৎ করেছে। এরপরে বললেন, হে মানুষেরা! তিনবার উচ্চস্বরে ঘোষণা করে দাও, জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল মুমিন। হুকুম মোতাবেক আমি সবাইকে উচ্চস্বরে জানিয়ে দিলাম, জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল মুমিন। মুসলিম।

কিয়ামত দিবসে মানুষকে তার কৃতকর্মের ফলাফল দেয়া হবে। নেক আমলের সওয়াবও কম দেয়া হবে না। মন্দ আমলের জন্য আযাবও অতিরিক্ত করা হবে না। যাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী তাঁরা কখনো আল্লাহ্র গজবে পরিবেষ্টিতদের মতো নয়। অর্থাৎ মোহাজির ও আনসাররা কখনো মুনাফিক ও

ফাসেকদের সমতুল্য নয়। দুই দলের গতিপথ দু'দিকে। একদিকে রয়েছে সওয়াব আর অন্যদিকে আযাব। তবে বিশ্বাসীরা আল্লাহর নৈকট্যের পথে একজন অন্যজন অপেক্ষা অগ্রগামী হবেন। তেমনি দোজখীরাও একজন অপরজন অপেক্ষা অধিক অপরাধী হবে। কারো শাস্তি হবে লঘু। কারো গুরু। আল্লাহ ভালো ও মন্দ উভয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে সম্যক অবগত। তিনিই উপযুক্ত বিনিময় দানকারী।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬৪

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

❐ তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রসুল প্রেরণ করিয়া আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন; সে তাহার আয়াত তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে, তাহাদিগকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়; এবং তাহারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলো।

ইমানদারদের প্রতি আল্লাহতায়ালার সবিশেষ অনুগ্রহ এই যে, তিনি তাদের মধ্য থেকে একজন মহান রসুল নির্বাচিত করেছেন। কোনা কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে ইমানদারগণ বলতে রসুল স. এর বংশীয় কোরাইশ মুমিনদেরকে বোঝানো হয়েছে। রসুল স. বলেছেন, সমস্ত মানুষই কোরাইশদের অনুগামী। সাধারণ মুমিন যেমন কোরাইশ মুমিনদের অনুগামী। তেমনি সাধারণ কাফেররাও অনুগামী কোরাইশ কাফেরদের। বোখারী, মুসলিম।

রসুল স. বলেছেন, খেলাফতের অধিকার কোরাইশদের, যতোক্ষণ কমপক্ষে তাদের দু'জনও অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য এই হুকুমের শর্ত হলো যোগ্যতা এবং তাকওয়া। ফাসেক ও জালেমদেরকে এই বাক্যের মাধ্যমে খলিফা নির্বাচিত করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ইমানদার বলতে আরবের সকল মুসলমানকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, বনী তাগলীব ছাড়া আরবের সমস্ত গোত্রই কোরাইশ বংশসম্পৃক্ত। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, 'হুয়াল্লাজি বা'য়াসা উম্মিয়্যিনা রসুলাম মিনহুম।'

'তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে' — অর্থ আরব জাতির মধ্য থেকে। উদ্দেশ্য এই যে, যেনো তারা তাদের রসুলের সত্যনিষ্ঠতা ও আমানতদারী সম্পর্কে স্পষ্ট

ধারণা লাভ করতে পারে এবং এই মহান রসুলের জন্যে ধন্য এবং গৌরাবান্বিত হতে পারে। হজরত সালমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমাকে বললেন, আমার প্রতি ঘৃণা পোষণ কোর না। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি এরকম কেমন করে করবো? আল্লাহতায়ালা তো আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন। রসুল স. বললেন, আরবদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করলেই আমার প্রতি ঘৃণা পোষণ করা হবে। এই হাদিস তিরমিজি বর্ণনা করে বলেছেন, হাদিসটি হাসান।

কোনো কোনো আলেম ধারণা করেন, এখানে ইমানদারগণ বলতে সকল ইমানদারদের বোঝানো হয়েছে। তিনি আরব হন অথবা অনারব। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'লাক্বদ জায়াকুম রসুলুম মিন আনফুসিকুম।' — এখানে মানব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে রসুল নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ রসুল মানব সম্প্রদায়ভূত। তিনি ফেরেশতা কিংবা অন্য কোনো সম্প্রদায়ভূত নন। মানুষের জন্য মানুষের ভিতর থেকেই নবী নির্বাচিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। যেমন, আল্লাহ বলেছেন, 'পৃথিবীতে যদি স্বাভাবিকভাবে ফেরেশতারা বিচরণ করতো, তবে আমি তাদের জন্য আসমানের ফেরেশতাকেই রসুল হিসাবে পাঠাতাম।'

নবী আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনান। মানুষের অন্তরকে ভুল বিশ্বাস থেকে এবং গায়েরুল্লাহর ইবাদত করার স্পৃহা থেকে পরিশুদ্ধ করেন। মানুষের ভিতর বাহির পবিত্র করেন। তিনি আল্লাহর কিতাব থেকে শিক্ষা দান করেন এবং হিকমতের তালিম দেন। নবীর এই কর্মকান্ড জারি হওয়ার পূর্বে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া মানুষের জন্য অন্য কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬৫

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

❐ যখন তোমাদের উপর মুসীবত আসিয়াছিল, যাহার দ্বিগুণ তোমরা ঘটাইয়াছিলে, তখন কি তোমরা বলিয়াছিলে 'ইহা কোথা হইতে আসিল?' বল, 'ইহা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হইতে;' আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

ইমাম আহমদ, বোখারী, মুসলিম এবং নাসাঈ, হজরত বারা'র এরকম উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকেরা আমাদের সত্তর জনকে শহীদ

করেছিলো আর বদর যুদ্ধে আমরা মুশরিকদের সত্তর জনকে হত্যা এবং সত্তর জনকে বন্দী করেছিলাম।

আমি বলি, বন্দীদেরকে হত্যা করাই ছিলো আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রেত। মুসলমানেরা তাদেরকে হত্যাও করতে পরতো। হত্যা করাই সমীচীন ছিলো। ফিদইয়া গ্রহণ করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি ছিলো আল্লাহতায়ালার অভিপ্রায়বিরোধী।

উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলমান বাহিনী পর্যুদস্ত হলো , তখন কেউ কেউ বলতে লাগলেন, এরকম হলো কেনো? আল্লাহতায়ালা তো মুসলমানদেরকে বিজয় দান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের মধ্যে আল্লাহর রসুলও উপস্থিত। এই আয়াতে আল্লাহতায়ালা এই সন্দেহের নিরসন করছেন। খন্ডিত নয়, সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিষয়টি অনুধাবন করতে বলেছেন। বদর ও উহুদ যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে একই সঙ্গে চিন্তা করলে দ্বিধা-সন্দেহ আর থাকে না। বিজয় দানের সঙ্গে দুটি শর্ত ছিলো — ধৈর্য্য এবং তাকওয়া। বদর যুদ্ধের সময় এই শর্তদ্বয় প্রতিপালিত হয়েছিলো বলেই যুদ্ধের ফলাফল ছিলো মুসলমানদের পক্ষে। উহুদে শর্ত দু'টি থেকে স্খলন ঘটেছিলো। তাই আল্লাহতায়ালার অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হয়নি। অতএব এই পরাজয়ের গ্লানি যে তোমাদের কারণেই তা ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত। তোমরা বলছো, আল্লাহর রসুল উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এহেন বিপদ আপতিত হবে কেনো? তোমরা বিপদকে রসুলের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চাচ্ছো, অথচ ভেবে দেখা উচিৎ,রসুলের উপস্থিতির কারণেই তোমাদের শেষ রক্ষা হয়েছে। তাঁর উপস্থিতি আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ বই অন্য কিছু নয়। আল্লাহ তাঁর রসুলকে নির্দেশ করছেন এই কথাটি জানিয়ে দিতে যে, সবর ও তাকওয়ার শর্ত প্রতিপালিত হয়নি বলেই তোমাদের এই দুরবস্থা।

ইবনে আবী হাতেম হজরত ওমর বিন খাত্তাবের উক্তি উল্লেখ করেছেন এ রকম, বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়ার কারণেই মুসলমান বাহিনীকে উহুদ যুদ্ধে পর্যুদস্ত করা হয়েছে। ফিদইয়া গ্রহণ করে তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার কারণে উহুদ যুদ্ধে সত্তর জন মুসলমান শহীদ হন, মুসলমান বাহিনী বিপর্যস্ত হয় এবং রসুল স. এর সামনের দাঁত শহীদ হয়। তাঁর পবিত্র মস্তক ও অবয়ব হয় রক্তাক্ত।

ইমাম বাগবী হজরত আলী থেকে বর্ণনা করেন, হজরত জিব্‌রাইল রসুলুল্লাহ স. কে বললেন, বন্দীদেরকে ফিদইয়া নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, এই সিদ্ধান্তটি আল্লাহতায়ালার অপছন্দ। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী আপনি আপনার অনুসারীদেরকে হত্যা করা অথবা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলেছিলেন। তারা বলেছিলো, হে আল্লাহর রসুল! এরা তো আমাদের স্বজন। আমরা বরং ফিদইয়া গ্রহণ করে তাদেরকে ছেড়ে দেই। ফিদইয়ার এই সম্পদ আমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে অধিক শক্তিশালী হতে সাহায্য করবে। তাদেরকে ছেড়ে দিলে তাদের সমসংখ্যক মুসলমান শহীদ হবে জেনেও তারা বলেছিলো,

আমরা রাজী। উহুদ যুদ্ধে তাই ঘটেছে। শহীদ হয়েছেন সত্তরজন মুসলমান, সেই সত্তরজন মুক্তিপ্রাপ্ত কাফেরের পরিবর্তে।

জ্ঞাতব্য ঃ সাঈদ বিন মনসুর আবু সাখার থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন, উহুদের সত্তরজন শহীদের মধ্যে চারজন ছিলেন মুহাজির এবং অবশিষ্ট ছিষট্টি জন ছিলেন আনসার। মুহাজির শহীদগণ হচ্ছেন, হজরত হামজা, হজরত মুসয়াব বিন উমায়ের, হজরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ এবং হজরত সাম্মাস বিন ওসমান। কিন্তু ইবনে হাব্বান এবং হাকেম হজরত উবাই বিন ক্বাব থেকে বর্ণনা করেছেন, আনসারী শহীদ ছিলেন চৌষট্টিজন এবং মুহাজির শহীদ ছিলেন ছয়জন। পঞ্চম মুহাজির শহীদ হচ্ছেন, হাতেম বিন বালতা'র মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সা'দ এবং ষষ্ঠ শহীদ হচ্ছেন, সাকিফ বিন আমর আসলামী। বর্ণনা করেছেন হাফেজ।

বোখারী হজরত কাতাদা থেকে বলেছেন, আনসারদের চেয়ে বেশী শহীদ আরবের অন্য কোনো গোত্র থেকে হয়েছে, এ রকম তথ্য আমাদের জানা নেই। হজরত আনাস বলেছেন, উহুদ যুদ্ধে সত্তর জন, বিরে মাউনার ঘটনায় সত্তরজন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে সত্তর জন আনসার শহীদ হয়েছিলেন। হাফেজ মুহিব তাবারী, মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন, উহুদ যুদ্ধে শহীদগনের সংখ্যা ছিলো পঁচাত্তর জন। তন্মধ্যে একাত্তর জন ছিলেন আনসার।

ইমাম শাফেয়ী শহীদগণের সংখ্যা বাহাত্তর জন বলে উল্লেখ করেছেন। আইয়ুন গ্রন্থে উহুদ যুদ্ধে শহীদগণের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। তাতে উল্লেখিত হয়েছে ছিয়ানব্বই জনের নাম। এগার জন মুহাজির, আটত্রিশজন আউস এবং সাতচল্লিশজন খাজরাজ। দিমিয়াতীর মাধ্যমে একশ' চার অথবা একশ' পাঁচ জনের কথা এসেছে। কোরআনের বর্ণনায় বলা হয়েছে সত্তর জনের কথা।

আল্লাহপাক কখনো সাহায্য করেন। কখনো সাহায্যবিহীন রাখেন। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা সর্ব পরিব্যাপ্ত। সকল কিছুই তাঁর ক্ষমতাধীন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬৬, ১৬৭

وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ۚ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ ۚ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ۝

❒ যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহা আল্লাহের অনুমতিক্রমেই ঘটিয়াছিল; ইহা বিশ্বাসীগণকে জানিবার জন্য।

❒ এবং মুনাফিকদিগকে জানিবার জন্য; এবং তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'আইস, তোমরা আল্লাহের পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরক্ষা কর।' তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি জানিতাম যুদ্ধ হইবে তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করিতাম।' সেদিন তাহারা বিশ্বাস অপেক্ষা সত্য প্রত্যাখ্যানের নিকটতর ছিলো। যাহা তাহাদের অন্তরে নাই তাহারা তাহা মুখে বলে; তাহারা যাহা গোপন রাখে আল্লাহ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।

উহুদের বিপর্যয় নেমে এসেছিলো আল্লাতায়ালার অনুমোদনক্রমেই। এর উদ্দেশ্য ছিলো ইমানদারদের ইমান এবং মুনাফিকদের নেফাক (অপবিত্রতা) যেনো সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। তাদেরকে বলা হয়েছিলো, আল্লাহর পথে জেহাদ করো অথবা শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে আপন অবস্থানে অটল থাকো যাতে মুসলমানবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি হয়। তিনশ' মুনাফিকের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই তখন বলেছিলো, যুদ্ধপদ্ধতি ভালোভাবে জানা থাকলে তোমাদের সঙ্গে যেতে আমাদের আপত্তি ছিলো না।

'যদি জানতাম যুদ্ধ হইবে' - একথার অর্থ যদি আমরা বিশ্বাস করতাম তোমরা সত্যের উপরে আছো এবং এই যুদ্ধ যে সত্যি সত্যিই আল্লাহর পথে যুদ্ধ, এরকম প্রতীতি থাকলেই না যুদ্ধে যোগদানের কথা আসে। তাছাড়া মক্কার মুশরিকদের যুদ্ধ তো তোমাদের বিরুদ্ধেই। আমাদের বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে তো তারা যুদ্ধোদ্যোত হয়নি। তোমরাও চাও তাদেরকে পরাস্ত করতে। এসব তো তোমাদেরই পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপার। সুতরাং আমরা এই ঝামেলায় জড়াতে যাবো কেনো।

মুনাফিকদের এরকম চিন্তাভাবনা তাদেরকে ইমানের নিকটবর্তিতা থেকে অপসারিত করে দিচ্ছিলো। মুসলমান ও মুনাফিক এতোদিন মিলে মিশে ছিলো। কিন্তু যুদ্ধের মাধ্যমেই তাদের অভ্যন্তরীন অপবিত্রতা স্পষ্ট হয়ে পড়লো। তাদের স্বভাব হচ্ছে সুবিধা দেখলে সাথে থাকে আর বিপদ দেখলে দুরে সরে যায়। উহুদ যুদ্ধের মাধ্যমেই মুনাফিকদেরকে প্রথম চিহ্নিত করা হয়েছিলো। এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছিলেন কেবল বিশ্বাসীরাই। ইমানের ভান করলেও মুনাফিকরা যে অবিশ্বাসী তা প্রমাণিত হয়েছিলো উহুদের ঘটনায়। তাদের অন্তর ও বাহির এক নয়। মনে অবিশ্বাস। মুখে বিশ্বাসের ঘোষনা। এরকম কপটচারীরাই মুনাফিক। আল্লাহ্ তাদের অন্তরের কলুষ বিশ্বাস সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞাত। আর যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি সর্বসমক্ষে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ রসুল স. একবার ইসলাম প্রচারের জন্য সত্তরজন ক্বারী সাহাবীকে এক আরব সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। ওই সম্প্রদায়ের কিছু লোক, তাদের সকল মানুষ ইসলাম গ্রহন করবে একথা বলে সাহাবীদেরকে বিরে মাউনায় নিয়ে যায় এবং শহীদ করে দেয়। তাদের এই প্রবঞ্চনায় রসুল স. মর্মাহত হয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে বদদোয়া করেছিলেন। এখন কথা হচ্ছে, এই মর্মবিদারক অবস্থা এবং উহুদের পর্যুদস্ততা — এসমস্ত যদি আল্লাহ্তায়ালার অনুমতিক্রমেই সংঘটিত হয় (যেমন বলা হয়েছে, 'যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিলো তাহা আল্লাহের অনুমতিক্রমেই ঘটিয়াছিলো') তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, বৈধ অবৈধ সকল কার্যই কি আল্লাহ্তায়ালার অনুমোদন প্রাপ্ত? উত্তরে এই বলা যায় যে, ভালো মন্দ কোনো কাজই আল্লাহ্তায়ালার হুকুম ছাড়া সংঘটিত হয় না। এটা তকদীরের লিখন। এই তকদীর বিশ্বাসীদেরকে মানতেই হয়। কিন্তু সুখ অথবা বিপদ কোনো অবস্থাই ইমানদারদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কারণ তাঁরা সুখে কৃতজ্ঞ এবং দুঃখে ধৈর্য্যশীল। তাই সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থাই তাদেরকে উত্তম বিনিময় লাভের উপযোগী করে তোলে। কাফের ও মুনাফিকেরা এর বিপরীত। সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থাই তাদের অবিশ্বাস ও অপরিচ্ছন্নতাকে প্রবলতর করে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬৮, ১৬৯

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○

❒ যাহারা ঘরে বসিয়া তাহাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলিত যে তাহারা তাহাদের কথা মত চলিলে নিহত হইত না। তাহাদিগকে বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর।'

❒ যাহারা আল্লাহের পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে কখনোই মৃত মনে করিওনা। না, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তাহারা জীবিকা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মৃত্যুর সময় ও স্থান নির্ধারিত। মৃত্যু সমুপস্থিত হলে ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য কারো নেই। মৃত্যু নিশ্চিত। মুনাফিকেরা অজ্ঞ, তাই বলেছে, তাদের শহীদ স্বজনেরাও বেঁচে থাকতে পারতো যদি তাদের মতো যুদ্ধে না যেতো। আল্লাহ্ তাই

তাঁর প্রিয়তম নবীর মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, তোমরা যদি তোমাদের কথায় আস্থাশীল হও তবে মৃত্যুকে সরিয়ে দিও। এটা যে অসম্ভব — তা বুঝিয়ে দেয়াই এই বাক্যটির উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁরা মৃত নন। মহিমান্বিত জীবনের অধিকারী তাঁরা। ইবনে মাজা ও বাগবী বলেছেন, হাসান সনদে তিরমিজী এবং বিশুদ্ধ সনদে ইবনে খুজাইমা উল্লেখ করেছেন, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, একবার রসুলে পাক স. আমাকে দেখে বললেন, জাবের! তুমি বিষন্নচিত্ত কেনো? আমি বললাম, আমার পিতা শহীদ হয়েছেন। তাঁর সন্তান-সন্তুতি, সম্পদ সব কিছুই পড়ে থাকলো। রসুল স. বললেন, আমি কি তোমাকে জানাবো না, তোমার পিতা কীভাবে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়েছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল, জানিয়ে ধন্য করুন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ কারো সঙ্গে কথা বললে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলেন। কিন্তু তোমার পিতাকে জীবিত করে আল্লাহ্ অন্তরালবিহীন বাক্যালাপ করেছেন। বলেছেন, বান্দা, বলো, অভিলাষ কী? আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করবো। তোমার পিতা বললেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আবার আমাকে পৃথিবীতে পাঠাও যেনো আমি পুনরায় তোমার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। আল্লাহ বলেছেন, আমার সিদ্ধান্ত চিরন্তন। মৃত্যুর পর পুনরায় পৃথিবীবাস আমার বিধান নয়। বর্ণনাকারী বলেছেন, এ সমস্ত শহীদদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, 'যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে কখনোই মৃত মনে করিও না।'

মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম এবং বাগবী, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, উহুদের শহীদগণের রূহকে আল্লাহতায়ালা সবুজ পাখির মধ্যে স্থাপন করলেন। পাখিরা জান্নাতের নির্ঝরিনীর পানি পান করে, জান্নাতের ফল ভক্ষন করে, ইচ্ছামতো উড়াল দেয়। ফিরে ফিরে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করে আল্লাহর আরশের সোনালী বিভায়। এই চিরস্থায়ী সুখ সন্দর্শনে পাখিরা বললো, এই আনন্দের সংবাদ আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষদেরকেও দেয়া হোক, যেনো তারাও আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার সুযোগ অন্বেষণ করতে পারে। আল্লাহ বললেন, আমি তাঁদেরকে এই সংবাদ জানিয়ে দিব। আল্লাহতায়ালার এই ঘোষণায় শহীদগণ পুলকিত হলেন। আল্লাহতায়ালা তখন এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

এরকমও বলা যেতে পারে, শহীদগণের পৃথিবীবাসী আত্মীয় স্বজন পার্থিব নেয়ামত আস্বাদনকালে আক্ষেপ করে বলে যে, তারা যদি বেঁচে থাকতো তাহলে আমাদের মতো নেয়ামত ভোগ করতে পারতো। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

'মৃত মনে করিওনা' — এই সম্বোধন রসুলে পাক স. কে করা হয়েছে। অথবা শহীদগণের আত্মীয় স্বজনকে কিংবা মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

ইবনে মুনজির হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, উহুদে হজরত হামজা ও তাঁর সাথীগণ শাহাদাত লাভের পর অবিস্মণীয় নেয়ামত প্রাপ্ত হয়ে বলেছিলেন, কোনো সংবাদদাতা যদি আমাদের এই অভূতপূর্ব বিনিময় লাভের কথা আমাদের স্বজনদেরকে পৌছে দিতো! তাঁদের এই অভিলাষ পূর্ণ করতেই আল্লাহ্পাক এই আয়াত নাজিল করেছেন।

'সাবিলিল্লাহ্' অর্থ জেহাদ। যাঁরা আল্লাহ্র পথে অটল ও সাধনারত তারাও জেহাদে শামিল। শ্রেষ্ঠ জেহাদ হচ্ছে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এটাকে জেহাদে আকবর বলে। সশস্ত্র যুদ্ধ হচ্ছে জেহাদে আসগর বা ছোট যুদ্ধ। কিন্তু এই আয়াতে আল্লাহ্র পথে নিহত হওয়া বলতে কেবল সশস্ত্র যুদ্ধে শহীদদেরকেই বিশেষভাবে বোঝানো হয়েছে। এই শহীদগণ অতুলনীয় নেয়ামতের অধিকারী হবেন।

'তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত' — এই মর্মে আবুল আলীয়া বলেছেন, তাঁরা সবুজ পাখির আকার নিয়ে জান্নাতের মধ্যে যথেচ্ছা ওড়াউড়ি করতে পারবেন। বর্ণনা করেছেন ইবনে হাতেম। ইমাম বাগবী লিখেছেন, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহ্র আরশের নিচে তাঁদের রূহ সমূহ রুকু ও সেজদারত থাকবে।

ইবনে মান্দা বর্ণনা করেছেন, হজরত তালহা বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আমি জঙ্গলে আমার হারানো উট অনুসন্ধান করছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে রাত হয়ে গেলো। সেখানে আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারামের কবর ছিলো। আমি কবরের পাশে দাঁড়ালাম। শুনলাম কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ। কোরআনের এরকম সুমিষ্ট আবৃত্তি আগে কখনো শুনিনি। আমি রসুলে পাক স. এর খেদমতে হাজির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। রসুল স. বললেন, শহীদদের এরকম অবস্থাই হয়। শহীদদের রূহ কবজ করে নিয়ে আল্লাহ্তায়ালা জমরুদ ও ইয়াকুতের ঝাড়ে স্থাপন করেন এবং সেই ঝাড়কে জান্নাতে ঝুলিয়ে রাখেন। রাত্রি এলে সেই রূহ সমূহ তাদের আপনাপন কবরে চলে আসে। ফজরের সময় সেগুলো আবার জান্নাতে ফিরে যায়। এই বর্ণনাটির মাধ্যমে বোঝা যায় মৃত্যুর পরও শহীদগণ উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত হতে থাকেন। তাঁদের পবিত্র মরদেহ পঁচেনা। মৃত্তিকাও তাঁদেরকে আত্মস্থ করতে পারে না। এটাও তাঁদের জীবিত থাকার একটি নিদর্শন।

আপন সূত্রে বায়হাকী এবং ভিন্ন সূত্রে ইবনে সা'দ ও বায়হাকী ও মোহাম্মদ বিন আমর তাঁর মাশায়েখগণের সূত্রপরম্পরায় উল্লেখ করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, যখন হজরত মুয়াবিয়া নহর খনন করলেন, তখন আমরা ভয়ে ভয়ে উহুদের শহীদগণের মাজারে পৌছলাম। খননকালে তাঁদের মাজার উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিলো। আমরা দেখলাম তাঁদের শরীর সম্পুর্ন সতেজ এবং তাঁদের হাত-পা জীবিত মানুষের মতো কোমল। মোহাম্মদ বিন আমর আরো বলেছেন, হজরত

জাবের তাঁর শহীদ পিতাকে দেখলেন, তিনি তাঁর জখমের উপর হাত রেখেছেন। জখম থেকে হাত সরিয়ে দিতেই দেখা গেলো রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তাঁর হাতকে পূর্বস্থানে স্থাপন করা হলো। তখন রক্ত বন্ধ হয়ে গেলো। হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, আমার পিতাকে দেখে মনে হলো তিনি স্বাভাবিকভাবে শুয়ে রয়েছেন। যে কম্বলে আবৃত করে তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো, সেটি তেমনই রয়েছে। ছেচল্লিশ বছর পূর্বে তিনি শহীদ হয়েছিলেন। নহর খননকালে একজন শহীদের শরীরে কোদালের আঘাত লেগেছিলো। দেখা গেলো আঘাতের স্থান থেকে তাজা রক্ত বেরুচ্ছে। মাশায়েখগণ বলেছেন, তিনি ছিলেন হজরত হামজা। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, শহীদগণের জীবিত থাকা সবাই স্বীকার করতেন। নহর খননকালে তাদের কবর উন্মোচিত হতেই মেশক আম্বরের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছিলো।

ইমাম বাগবী হজরত ওবায়েদ বিন উমায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, উহুদ প্রান্তর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রসুল স. শহীদ মুসআব বিন উমায়েরের কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দাঁড়ালেন এবং দোয়া করলেন। অতঃপর তেলাওয়াত করলেন, "মিনাল মু'মিনিনা রিজালুন সদাকু মা আহাদুল্লাহ্া আলাইহি" — 'আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ কিছুসংখ্যক মুমিন তাদের কৃত অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করেছে।' তেলাওয়াত শেষে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, কিয়ামতের দিন এসমস্ত মানুষ আল্লাহ্র সকাশে শহীদ পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হবেন। সতর্ক হও! তোমরা শহীদগণের কবর জিয়ারত করবে এবং তাদেরকে সালাম বলবে। আমার জীবনাধিপতি পবিত্র সত্তার শপথ! তারা নিশ্চয়ই সালামের উত্তর দেবে ।

ইমাম হাকেম এবং বায়হাকী হজরত আবু হোরায়রা থেকে, ইমাম বায়হাকী হজরত আবু জর থেকে এবং ইবনে মারদুবিয়া হজরত খাব্বাব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. শহীদ মুসয়াব বিন উমায়েরের কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কবরের নিকটে দাঁড়ালেন এবং দোয়া করলেন। তারপর পড়লেন, 'কতিপয় মুমিন যারা সত্যবাদী, আল্লাহ তাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন।' এরপর বললেন, তোমাকে মক্কায় দেখেছিলাম উত্তম পরিচ্ছদাচ্ছাদিত এবং আনন্দচিত্ত অবস্থায়। আর আজ আল্লাহর পথে তোমার এহেন মুসলা (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্তিত করাকে মুসলা বলে)।

প্রশ্নঃ যারা শহীদ নন তারা কি শহীদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারবেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ। পারবেন। শহীদদের মর্যাদার বর্ণনা দৃষ্টে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, অন্যেরা ওই মর্যাদা লাভ করতে পারবেন না। হজরত ওবায়েদ বিন খালেদের মাধ্যমে আবু দাউদ এবং নাসাঈ লিখেছেন, রসুল স. দুই ব্যক্তিকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। একজন আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে গেলেন। দ্বিতীয়জন ইন্তেকাল করলেন। এক জুমআ পর তার জানাযার নামাজ সমাধা হলে রসুল স. উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, তোমরা তাঁর জন্য কী বলেছো? তাঁরা বললেন, আমরা তাঁর মাগফেরাত ও রহমত লাভের দোয়া করেছি এবং বলেছি, আল্লাহপাক তাঁকে যেনো তাঁর শহীদ ভ্রাতার মর্যাদা পর্যন্ত উপনীত করেন। রসুল স. বললেন, তবে তার পরের নামাজ, রোজা ও সৎ আমলগুলো কোথায় যাবে? দু'জনের পার্থক্য তো আকাশ-জমীনের মতো (পরে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি প্রথম শহীদ ব্যক্তির চেয়ে অনেক উচ্চ মর্যাদাধারী। কারণ, তাঁর নামাজ রোজা ও নেক আমল বেশী)।

আম্বিয়া, শুহাদা, সিদ্দিকীন ও মুমিনীনের বর্ণনা সুরা মুতাফফিফিনের তাফসীরে আলোচিত হবে। আর বিশেষ করে শহীদগণের জীবিত থাকার প্রসঙ্গটি সুরা বাকারার, 'ওয়ালা তাকুলু লি মাইঁউক্বতালু ফী সাবীলিল্লাহি আমওয়াত' আয়াতের তাফসীরে ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

'তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত।' অর্থাৎ প্রতিপালকের দৃষ্টিতে তাঁরা এমন নৈকট্যভাজন যা বর্ণনাবোধ্য নয়। মিলিত, প্রবিষ্ট, আকৃতিগত, বস্তুগত — কোনো দিক থেকেই এই নৈকট্যের ধরণ অনুভব যোগ্য নয়।

আমার শায়েখ এবং ইমাম হজরত মীর্জা মাযহারে জানে জানাঁ শাহাদাত লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আমি আমার কাশফের দৃষ্টিতে দেখেছি, আল্লাহ্তায়ালার জাতী তাজাল্লী তাঁর প্রতি অঝোর বৃষ্টির ধারার মতো বর্ষিত হচ্ছে। শহীদগণ আল্লাহর পথে জীবনপাত করেছেন। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেছেন — 'ওয়ামা তুক্বদ্দিমু লি আঙফুসিকুম মিন খইরিন তাজিদুহু ইনদাল্লাহ্।'

তোমরা নেক আমল সঞ্চয়ের পূর্বে প্রেরণ করবে, আল্লাহ্র সমীপবর্তী হওয়ার পর সে তদপেক্ষা উত্তম বিনিময় লাভ করবে। আল্লাহ্র পথে প্রাণপাতকারীগণ তাঁদের আপন অস্তিত্ব বিলীন করে দেন। তাই তাঁরা আল্লাহর অস্তিত্বরঞ্জিত 'জাতী' তাজাল্লী লাভ করেন।

তাঁরা জান্নাত থেকে রিজিক প্রাপ্ত। তাঁরা জীবিত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৭০

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

❒ আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে তাহারা আনন্দিত এবং তাহাদের পিছনের যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই

তাহাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, এই জন্য যে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

শহীদগণ আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ লাভে ধন্য, আনন্দিত। তাঁদের এই অনন্যসাধারণ মর্যাদা জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা দুরূহ। আবদুর রাজ্জাক মোসান্নাফ গ্রন্থে ইবনে আবী শায়বা, আহমদ এবং ইবনে মুনজির হজরত মাসরূকের উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম, আমরা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট এই আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, আমি রসুল স. এর নিকট এই আয়াত সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। রসুল স. বলেছেন, তাঁদের রূহসমূহ সবুজ রঙের পাখির বক্ষে সম্পৃক্ত থাকে। আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় রয়েছে, শহীদগণের আত্মা হবে সবুজ পাখির মতো। তাঁদের জন্য রয়েছে আরশের স্তম্ভের সঙ্গে ঝুলন্ত স্বর্ণালোকের ঝাড়। তাঁরা জান্নাতে যথা ইচ্ছা উড়াল দিতে পারেন। তাঁরা উড়াল দেন আর ফিরে ফিরে আসেন সেই স্বর্ন আলোকচ্ছটায়। আল্লাহতায়ালা প্রতিদিন তিনবার তাঁদেরকে এই প্রশ্নটি করবেন, তোমরা কি আমার কাছে কিছু চাও? অন্য বর্ণনায় এসেছে আল্লাহ বলবেন, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই চাও আমার কাছে। তারা উত্তর দেবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কী চাইবো? আমরা তো জান্নাতে ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়াতে পারি। যখন তাঁরা দেখবেন কিছু যাঞ্চা করাটাই আল্লাহতায়ালার অভিপ্রেত, তখন তাঁরা নিবেদন করবেন, হে আমাদের আল্লাহ! আমরা চাই আমাদের রূহ সমূহকে আমাদের পার্থিব শরীরে পুনঃসংস্থাপিত করা হোক, যেনো আমরা তোমার পথে আরেকবার জেহাদ করতে পারি। আল্লাহ বলবেন, আমি কাউকে পৃথিবীতে পুনরায় পাঠাই না। আমার এই বিধান অলংঘনীয়।

শহীদগণ তাঁদের পৃথিবীবাসী আত্মীয়স্বজনদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। তাঁদের নিশ্চিন্তির কারণ এই যে, আল্লাহতায়ালাই তাদের পক্ষ থেকে হকদারদের সন্তুষ্ট রাখেন এবং তাদের দাবী পূর্ণ করে দেন। আমি বলি, এ রকম অর্থ হওয়াও সম্ভব যে, শহীদগণ তাঁদের নিকটজনের জন্যে শাফায়াতের অধিকার লাভ করবেন। শাফায়াতের মাধ্যমে আপনজনরা আল্লাহর শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবেন। তাই ফেলে আসা স্বজনদের জন্য তাঁরা ভাবনামুক্ত, আনন্দিত।

আবু দাউদ ও ইবনে হাব্বান হজরত আবু দারদার উক্তি উল্লেখ করেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, শহীদগণ আপন পরিবারভূত সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে আহমদ ও তিবরানী এবং হজরত মিকদাম বিন মাদী কারাব থেকে তিরমিজি ও ইবনে হাব্বান। ইবনে মাজা এবং বায়হাকী হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামত

দিবসে নবী আ. গণ শাফায়াত করবেন। তারপর শাফায়াত করবেন আলেমগণ। তার পর শহীদগণ। বায্যার এই হাদিস উল্লেখ করে শেষে লিখেছেন, অতঃপর মুয়াজ্জিন। আমি বলি, হাদিস শরীফে শাফায়াত প্রসঙ্গে শহীদগণের পূর্বে যে আলেমদের কথা বলা হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন ওলামায়ে রসেখীন। তাঁরাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের প্রকৃত আলেম।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৭১

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

❒ আল্লাহের অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং ইহা এই কারণে যে আল্লাহ বিশ্বাসীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

শহীদগণ নেয়ামতের সুসংবাদ প্রাপ্ত। নেয়ামতের সঙ্গে এখানে ফযল শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। আমলের বিনিময়ের চেয়েও অনেক বেশী পাওয়াকে ফযল বলে। এখানে ফযলের অর্থ হবে দীদারে এলাহি ও কোরবতে এলাহি অর্থাৎ আল্লাহর দর্শন এবং আল্লাহর নৈকট্য। নেয়ামত ও ফযল ছাড়াও আরো একটি সুসংবাদ এই যে, আল্লাহ ইমানদারদের শ্রমপ্রচেষ্টা বিনষ্ট করেন না। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর কলেমাকে সমুন্নত করার জন্য জেহাদের উদ্দেশ্যে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়, তাঁর জিম্মাদারী গ্রহণ করেন স্বয়ং আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি তাঁর শাহাদাত মঞ্জুর করেন, তবে তাঁর জান্নাত লাভ নিশ্চিত। আর গৃহে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিলে তাঁকে দান করেন গণিমত ও সওয়াব। যাঁর অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! তিনিই জানেন, আল্লাহর পথে যে আহত বা নিহত হয় তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী (আল্লাহর সন্তোষ সাধন, না কেবল যশলাভের জন্য বীরত্ব প্রদর্শন)। কিয়ামত দিবসে শহীদদের আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে। রক্তের গন্ধ হবে মেশক আম্বরের সুবাসের মতো। বাগবী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, শহীদদের মৃত্যুকষ্ট পিপীলিকা দংশনের মতো। দারেমী, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান গরীব। সুনান গ্রন্থে নাসাঈ এবং ওয়াসাত গ্রন্থে তিবরানী বিশুদ্ধ ধারাবাহিকতার মাধ্যমে হজরত আবু কাতাদা থেকেও এ রকম বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে বদর যুদ্ধের শহীদদের সম্পর্কে। তাঁরা ছিলেন চৌদ্দজন। আটজন আনসার এবং ছয়জন

মুহাজির। কিন্তু এই বর্ণনাটি দুর্বল। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে বিরে মাউনার শহীদদের সম্পর্কে। ঘটনাটি মোহাম্মদ বিন ইসহাক, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই হজরত আনাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন এভাবে, আমের বিন মালেক বিন জাফর আমেরী রসুল স. এর দরবারে হাজির হয়ে দুটি ঘোড়া এবং দু'টি উট হাদিয়া পেশ করলো। রসুল স. বললেন, মুশরিকের দেয়া হাদিয়া আমি কবুল করবো না। যদি চাও আমি হাদিয়া কবুল করি, তাহলে মুসলমান হয়ে যাও। কিন্তু আমের বিন মালেক ও তার সাথীরা ইসলাম গ্রহণ করলো না। ইসলামকে অপছন্দও করলো না। দলনেতা আমের বললো, মোহাম্মদ যে আহবান জানাচ্ছেন তা অত্যন্ত সুন্দর। যদি তিনি তাঁর কতিপয় সঙ্গীকে নজদবাসীদের নিকট প্রেরণ করেন; তবে আমার ধারণা, তারা ইসলামের আহবানে সাড়া দিবে। রসুল স. বললেন, নজদবাসীদের নিকট লোক পাঠাতে আমি শংকা বোধ করি। আবু বারা বললেন, আমি তাদের নিরাপত্তার জিম্মাদারী গ্রহণ করছি। অতঃপর রসুল স. সত্তর জন ক্বারী (কোরআন পাঠক) সাহাবীকে একত্রিত করলেন। নেতা নির্বাচন করলেন হজরত মুনজির বিন ওমর সায়দীকে। হজরত আবু বকরের মুক্ত গোলাম আমের বিন ফাহিরাও ছিলেন এই দলে।

চতুর্থ হিজরীর সফর মাস। ক্বারীদের দল পথ চলতে চলতে গিয়ে পৌঁছলেন বিরে মাউনায়। বিরে মাউনা ছিলো বনু আমের এবং বনু সুলাইম এর মধ্যবর্তী একটি পাথুরে প্রান্তর। সেখান থেকে হজরত হারাম বিন মিলহানকে বনু আমেরের কিছু লোকের সাথে রসুলে পাক স. এর চিঠিসহ আমের বিন তোফায়েলের নিকট পাঠানো হলো। হজরত হারাম বললেন, আমি রসুলের দূত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান আনয়ন করো। সহসা সেখানে হাজির হলো বল্লমধারী এক ব্যক্তি। সে বল্লম নিক্ষেপ করে হজরত হারামকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলো। বল্লমবিদ্ধ হজরত হারাম বললেন, আল্লাহু আকবর। কাবার প্রভুর কসম! আমি কামিয়াব। আমের বিন তোফায়েল চিৎকার করে বনি আমেরদেরকে সাহাবীগণকে আক্রমণ করতে বললো। বনি আমের তার আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে বললো, আবু বারা'র জিম্মাদারী ভঙ্গ কোর না। আমের বিন তোফায়েল তখন ডাক দিলো বনু সুলাইমকে। সুলাইম গোত্রের রায়াল, আসিয়া, জাকওয়ান ও অন্যান্যরা লাব্বায়েক বলতে বলতে সাহাবীগণকে ঘিরে ফেললো। অতর্কিত এই আক্রমণের ফলে ক্বাব বিন জায়েদ ছাড়া অন্য সকল সাহাবী শাহাদাত বরণ করলেন। গুরুতর আহত ক্বাব বিন জায়েদ মৃতবৎ পড়েছিলেন সঙ্গী শহীদগণের পাশে। কাফেরেরা তাঁকে মৃত মনে করেছিলো। ক্বাব বিন জায়েদ পরে খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। কাফেরেরা সেখানে উপস্থিত

আমর বিন উমাইয়াকেও বন্দী করলো। আমর বললেন, আমি মোজার গোত্রের লোক। তখন তাঁকে ছেড়ে দেয়া হলো। তিনি রসুল স. এর নিকটে গিয়ে এই মর্মবিদারক ঘটনাটি বিবৃত করলেন। রসুল স. বললেন, এই চক্রান্ত কি তবে আবু বারার? আবু বারা এসে আমর বিন তোফায়েলের বিশ্বাসভঙ্গের কথা জানিয়ে নতশির হয়ে রইলেন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আমের বিন তোফায়েল তখন বলেছিলো, ওই ব্যক্তিকে পরলোকগমনের সময় আকাশের দিকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। মনে হচ্ছিলো, যেনো আকাশ নেমে এসেছে। লোকেরা বললো, তিনি আমের বিন ফাহিরা। অতঃপর বারার ছেলে রবীয়া আমর বিন তোফায়েলকে আক্রমণ করলেন। আমর তখন তার ঘোড়ার পিঠে। রবীয়া বল্লমের আঘাতে তাকে হত্যা করলেন।

বোখারী ও মুসলিম হজরত কাতাদা এবং হজরত আনাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এ রকম, রায়েল, জাকওয়ান, আসিয়া এবং লেহইয়ান গোত্র চতুষ্টয় রসুল স. এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, আমরা মুসলমান হয়েছি। শত্রুদের মোকাবেলা করতে হবে। আমাদেরকে সৈন্য সাহায্য দিন। রসুল স. সত্তর জন ক্বারী সাহাবীকে তাদের সাহায্যকারী করে দিলেন। তাঁরা সকলে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করতেন। রাতে নামাজে নিমগ্ন হতেন। বিরে মাউনা নামক স্থানে মুসলমান নামধারী কপটেরা তাঁদেরকে শহীদ করে দেয়। এই সংবাদ রসুল স. এর জন্য ছিলো অত্যন্ত মর্মবিদারক। তিনি এক মাস ধরে ফজরের নামাজে দোয়া কুনুত পড়েছিলেন। ওই দোয়া কুনুত ছিলো রায়াল, জাকওয়ান, আসিয়া এবং বনী লেহইয়ানদের জন্য বদদোয়া।

ইমাম আহমদ, মুসলিম এবং বায়হাকী হজরত আনাস থেকে, বায়হাকী হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এবং বোখারী, হজরত ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, একদল লোক রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, কোরআন ও সুন্নার শিক্ষক হিসাবে আমাদেরকে কিছু লোক দিন। রসুল স. আনসার সাহাবীদের মধ্য থেকে সত্তর জন ক্বারীকে তাদের সঙ্গী করে দিলেন। যথাস্থানে পৌছার আগেই ওই কপটচারীরা ক্বারী সাহাবীদেরকে শহীদ করে দিলো। শাহাদাতের প্রাক্কালে তাঁরা বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমাদের এই বিপর্যস্ত অবস্থার সংবাদ আমাদের নবীর কাছে পৌঁছে দাও। অন্য বর্ণনায় এসেছে, হে আল্লাহ! আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দকে জানিয়ে দাও যে, আমরা তোমাকে পেয়েছি। আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ ওহির মাধ্যমে তাঁর রসুলকে জানিয়ে দিলেন, 'তারা আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।'

হজরত আনাস বলেছেন, প্রথম দিকে আমরা বিরে মাউনার শহীদদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ এই আয়াতটি পড়তাম — 'বাল্লিগু আন্না কাওমানা আন্না ক্বদ লাকীনা রব্বানা ফা রদিয়া আন্না ওয়া আরদনা।' 'আমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দাও আমরা তাদের প্রতি রাজী।' পরে এই আয়াতটি রহিত করে দেয়া হয়েছে এবং কোরআন থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হচ্ছে। রসুল স. এই ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি স. একাধারে চল্লিশ দিন ফজরের নামাজে দোয়া কুনুতের মাধ্যমে রায়েল, জাকওয়ান, আসিয়া এবং বনী লেহইয়ানদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

ইমাম বাগবী, হজরত আনাস থেকে এই অতিরিক্ত বর্ণনাটি করেছেন যে, আমরা এই আয়াত এক যুগ ধরে পড়েছিলাম। অতঃপর একে উঠিয়ে নেয়া হলো। তৎপরিবর্তে আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, 'ওয়ালা তাহ্ সাবান্নাল্লা জিনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াতা.......শেষ পর্যন্ত। আমি বলি, এই আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে মতদ্বৈধতা রয়েছে। কিন্তু এই আয়াত প্রকৃতপক্ষে বিরে মাউনার শহীদগণসহ সকল শহীদদেরকেই অর্ন্তভূত করেছে। সুতরাং হুকুমটি আম (সাধারণ)।

<u>মাসআলা</u> ঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, শহীদদেরকে গোসল দিতে হয় না। উহুদ যুদ্ধের শহীদগণকেও গোসল করানো হয়নি। রসুল স. এর নির্দেশে তাঁদের দেহ থেকে অস্ত্র ও চামড়ার জিনিসপত্র খুলে নেয়া হয়েছিলো। তারপর রক্তমাখা কাপড়সহ গোসল ব্যতিরেকেই তাঁদেরকে দাফন করা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন আবু দাউদ ও ইবনে মাজা।

নির্দোষ সনদের মাধ্যমে নাসাঈ, হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তাদেরকে রক্তরঞ্জিত অবস্থাতেই দাফন করে দাও। যারা আল্লাহ্র রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছে, কিয়ামত দিবসে তাঁরা রক্তরঞ্জিত অবস্থাতেই উত্থিত হবে। রক্তের রঙ হবে লাল এবং তার সুবাস হবে মেশক আম্বরের। এ ধরনের আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, হজরত জাবের থেকে। বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি বুকে তীরবিদ্ধ হলেন এবং তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। রক্তাক্ত শরীর এবং পরিচ্ছদসহই তাঁকে দাফন করা হলো। আমি তখন রসুলে পাক স. এর সঙ্গে একই বাহনে উপবিষ্ট ছিলাম।

<u>মাসআলা</u> ঃ শারীরিক অপবিত্রতা অবস্থায় কেউ শহীদ হয়ে গেলে তাঁকে গোসল দিতে হবে কিনা? এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গোসল দিতে হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হবে না। তাঁদের পক্ষে দলিল এই হাদিসটি, রসুল স. বলেছেন, তাদেরকে রক্তমাখা কাপড় সহই দাফন করো। ইমাম আবু হানিফা তাঁর পক্ষে

হানযালা বিন আবী আমেরের ঘটনাটি দলিল হিসাবে পেশ করেন। ঘটনাটি এই, রসুল স. বলেছেন, আমি দেখলাম, ফেরেশ্‌তারা হানযালাকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি রূপার পাত্রে স্থাপন করে শ্বেতশুভ্র মেঘপুঞ্জমিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করাচ্ছে। হজরত আবু উসাইয়েদ সায়দী বর্ণনা করেন, আমরা হজরত হানযালার সদ্যস্নাত মরদেহ দেখতে পেলাম। দেখলাম তখনো তাঁর মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছে। আমি রসুল স. কে জানালাম এ কথা। রসুল স. হজরত হানযালার অবস্থা জানতে চেয়ে তাঁর স্ত্রীর নিকট লোক পাঠালেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, সঙ্গমপরবর্তী গোসল না করেই তিনি যুদ্ধের ময়দানে ছুটে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর বংশধরদেরকে গাছাছুল মালায়িকার (ফেরেশতা কর্তৃক গোসলকৃতের) বংশ বলা হতো।

ইবনে জাওজী এই হাদিসকে মোহাম্মদ বিন সা'দের মুরসাল বর্ণনা থেকে এবং ইবনে হাব্বান, হাকেম ও বায়হাকী ইবনে ইসহাকের সিলসিলার মাধ্যমে উদ্ধৃত করেছেন। হাকেম উদ্ধৃত করেছেন আবু উসাইয়েদ থেকে। কিন্তু তাঁর সনদ শিথিল। হাকেম, তিবরানী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস থেকে। হাকেমের বর্ণনাসুত্রের একজনের নাম মুয়াল্লা বিন আব্দুর রহমান। তিনি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত নন। তিবরানীর সূত্রমধ্যে হাজ্জাজের নাম নেই। আর বায়হাকীর সূত্রসংযুক্ত আবী শায়বাও দুর্বল।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, শহীদদের জানাযার নামাজ পড়তে হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ থেকে পড়তে হবে ও হবে না—দু'রকমই বর্ণনা পাওয়া যায়।

আমাদের বক্তব্য এই যে, জানাযার নামাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাগফেরাত কামনা, মৃত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন অথবা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির প্রার্থনা। আর শহীদগণ এমনিতেই অনন্যসাধারণ মর্যাদাধারী। তবে জানাযার নামাজ না পড়ার কারণে মৃত ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি পায় এ কথাও ঠিক নয়। ঠিক হলে রসুল স. এর জন্য এ রকম করা হতো। সৃষ্টির মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। তবুও তাঁর জানাযা পড়া হয়েছিলো। প্রকৃত কথা এই যে, শরিয়তসম্মত নিষিদ্ধতা না থাকলে নামাজ বাদ দেয়া বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ী, হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, উহুদ যুদ্ধের শহীদদেরকে এক বস্ত্রে দু'জন করে দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন রসুলে পাক স.। দাফন করার আগে রসুল স. জানতে চাইতেন, এ দু'জনের মধ্যে কোরআন সম্পর্কে কে বেশী জানে? কোরআনের জ্ঞান যার বেশী, প্রথমে তাঁকে এবং পরে অন্যজনকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিলো। এই নিয়মে সকলের দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর রসুল স. বললেন, আমি তাদের কিয়ামত দিবসের সাক্ষী। রসুল স. তাঁদেরকে গোসলও করাননি, জানাযার নামাজও পড়াননি। বোখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান।

হজরত আনাস বলেছেন, উহুদ প্রান্তরে এক সঙ্গে দু'জন, কখনও তিনজনকে একই কাফন দিয়ে দাফন করা হয়েছিলো। তাদের জন্য জানাযাও পড়া হয়নি। তিরমিজি, আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান। হাকেম বলেছেন, সহীহ্। আর বোখারী বলেছেন, মুয়াল্লাল। তিনি লিখেছেন, জুহুরী এবং আনাস থেকে উসামা বিন জায়েদের বর্ণনাটি ভুল। তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন হজরত জাবেরের বর্ণনাটিকে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, রসুল স. ছিলেন আহত, রক্তাক্ত। তাঁর পবিত্র দাঁত উৎপাটিত হয়েছিলো। তাই তিনি শহীদদের জন্য জানাযার নামাজ পড়েননি। হয়তো অন্যান্যরা পড়েছিলেন। আবু দাউদ, হাকেম এবং তাহাবী, হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত আমীর হামজার পাশ দিয়ে গমনকালে দেখেছিলেন তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে। তখন তিনি তাঁর জানাযা পড়েছিলেন। অন্য শহীদদের জন্য তিনি জানাযা পড়েননি। তাহাবীর বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে এতোটুকু, রসুল স. বলেছেন, আমি কিয়ামত দিবসে তাদের জন্য সাক্ষী হবো।

একটি ধারণা ঃ দারা কুতনী এই হাদিস উদ্ধৃত করে লিখেছেন, রসুল স. হজরত হামজা ব্যতীত অন্য শহীদদের জানাযা পড়েননি, একথা ওসমান বিন আমর ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনাকারী বলেননি। আমরা বলি, ইবনে জাওজী লিখেছেন, ওসমান বর্ণিত হাদিস বোখারী এবং মুসলিমও বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য (সিকাহ্)। এরকম বর্ণনাকারীর অতিরিক্ততাও গ্রহণীয়। বায়হাকী লিখেছেন, শহীদদের জানাযা পড়া সুন্নত না হলে রসুল স. হামজার জানাযা পড়তেন না। তিনি হামজার জন্য জানাযা পড়েছিলেন। অন্যদের জন্য পড়েননি। গুরুতর আহত ছিলেন তিনি। হজরত জাবের বলেছেন, যুদ্ধশেষে স. হজরত হামজার অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু পেলেন না। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, আমি দেখলাম একটি বৃক্ষের নিকট রসুল স. হজরত হামজার ক্ষতবিক্ষত মরদেহ দেখতে পেলেন। সশব্দে কেঁদে উঠলেন তিনি। এক আনসারী সাহাবী একটি চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন হজরত হামজার পবিত্র দেহাবয়বকে। রসুল স. তাঁর জন্য জানাযা পড়লেন। অন্যান্য শহীদদেরকেও হজরত হামজার বরাবর এনে একত্রিত করা হলো। সকলের জন্যই তিনি জানাযার নামাজ পড়লেন। বললেন, হামজা শহীদগণের সর্দার। বিশুদ্ধ সনদসহ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম হাকেম। তাঁর সনদসংযুক্ত এক জনের নাম মোফাদ্দল বিন সাদাকাহ্ আবু হাম্মাদ হানাফী। কেউ কেউ তাঁকে বর্জনীয় বলেছেন। নাসাঈ ও ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, দূর্বল। আহওয়াজী বলেছেন, আতা বিন মুসলিম তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। তাঁর পুরাপুরি প্রশংসা করেছেন আহমদ বিন মোহাম্মদ বিন শোয়ায়েব। ইবনে আদি বলেছেন, আমি তাঁর মধ্যে খারাপ কিছু পাইনি। তাই এই হাদিসটিকে হাসান পর্যায়ভুক্ত থেকে বিচ্যুত বলা যায় না।

ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর নির্দেশে হজরত হামজার পবিত্র মরদেহ চাদরাবৃত করা হলো এবং তিনি সাত তকবীরের সঙ্গে জানাযার নামাজ আদায় করলেন। এরপর অন্যদের লাশ এনে একত্রিত করা হলো। তিনি স. পুনরায় হজরত হামজাসহ সকলের জানাযা পড়লেন। তিনি হজরত হামজার নামাজ বাহাত্তর বার পড়েছিলেন। ইবনে ইসহাক এই হাদিসটি উল্লেখ করে বলেছেন, এই হাদিসের বর্ণনাকারী এমন এক ব্যক্তি, যিনি মিথ্যাচারের দোষমুক্ত। তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন মোকসাম। তিনি হজরত আব্বাসের মুক্ত দাস। মুসলিমের ভূমিকায় উল্লেখিত পূর্ণ সূত্রটি এ রকম — শায়বা, হাসান বিন আম্মার, হিকাম, মোকসাম, ইবনে আব্বাস। বর্নিত হয়েছে, রসুল স. উহুদের শহীদদের জন্য জানাযার নামাজ পড়েছেন। এ ব্যাপারে আমি হাকেমের নিকট জানতে চাইলে তিনি বললেন, রসুল স. উহুদের শহীদদের জানাযা পড়েননি। সুহাইলি বলেছেন, হাসান বিন আম্মার দুর্বল। হাফেজ লিখেছেন, হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম, ইবনে মাজা, তিবরানী এবং বায়হাকী — ইয়াজিদ বিন জিয়াদ, মোকসাম, ইবনে আব্বাসের সুত্রে। হাফেজ বলেছেন, ইয়াজিদের রয়েছে দুর্বলতা। ইবনে জাওজী বলেছেন, বর্ণনাটি পরিত্যাজ্য। বোখারী ও নাসাঈ বলেছেন, বর্জনীয়।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. হজরত হামজার জানাযা পড়েছেন সত্তর বার। আহমদ। এই বর্ণনাটিও দুর্বল। কিন্তু ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হাদিসটি হাসানের স্তরবিচ্যুত নয়। আবু মালেক গাফ্ফারী থেকে বর্ণিত হয়েছে (আবু দাউদও এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন), রসুল স. দশজন দশজন করে একত্রিত করে জানাযা পড়েছেন। প্রতি দশজনের মধ্যে হজরত হামজাকেও শামিল করেছেন। তিনি হজরত হামজার জানাযা পড়েছিলেন সত্তর বার। হাফেজ বলেছেন, এই হাদিসের বর্ণনাকারী সিকাহ্। বর্ণনাকারীর প্রকৃত নাম আজওয়ান বিন মালেক। তিনি ছিলেন তাবেয়ী। ইমাম শাফেয়ী এই হাদিসকে মুয়াল্লাল বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, এর বর্ণনাভঙ্গিতে রয়েছে বিরোধাভাস। দশজন দশজন করে জানাযা পড়লে জানাযার নামাজের সংখ্যা দাঁড়ায় সাত। এই দ্বিধাদীর্ণতার জবাব দেয়া হয়েছে এইভাবে, দশজনকে একত্রিত করে একত্রে একবার জানাযা পড়া হয়েছে, হাদিসটির বক্তব্য এ রকম নয়। বরং ব্যাপারটা এরকম, তিনি প্রতি শহীদের জন্য একবার জানাযা পড়েছেন এবং প্রতিবারই হজরত হামজাকে শামিল করেছেন।

এই হাদিস দ্বারা রসুল স. যে শহীদগণের জানাযার নামাজ পড়েছিলেন, তা প্রমাণ হয়ে যায়। অপরদিকে নামাজ না পড়ার হাদিসগুলোও সঠিক। কারণ ব্যক্তিগতভাবে তিনি জানাযার নামাজে শরীক ছিলেন না। তিনি সাহাবীগণকে

নামাজ পড়ার হুকুম দিয়েছেন। তাই হুকুমদাতা হিসাবে তিনিও জানাযায় শামিল। তাই জানাযা পড়েছেন বলা যেতে পারে। পড়েননি, তাও বলা যেতে পারে। কারণ, তিনি নিজে পড়েননি।

ইমাম নাসাঈ ও তাহাবী সাদ্দাম বিন হাদের মাধ্যমে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন, হিজরতের সময় এক বেদুইন রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে মুসলমান হলেন। তাঁর দেখাশোনার জন্য রসুল স. একজন সাহাবীকে নিযুক্ত করেছিলেন। এর পর এক জেহাদের গনিমতের মাল বন্টনকালে রসুল স. বেদুইনকেও তাঁর অংশ দিলেন। বেদুইন আরজ করলেন, আমি এজন্যে তো আপনার অনুসারী হইনি। নিজের গলা দেখিয়ে তিনি বললেন, আমি চেয়েছি এখানে তীর বিদ্ধ হোক এবং আমি শাহাদাত বরণ করে জান্নাত লাভ করি। পরে ওই বেদুইন শহীদ হলেন। দেখা গেলো তাঁর গলাতে তীর লেগেছে। রসুল স. তাঁকে সামনে রেখে জানাযার নামাজ পড়লেন। তিনি প্রকাশ্যে তাঁর জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তোমার ওই বান্দা হিজরত করেছে এবং শহীদ হয়েছে, আমি এর সাক্ষী। হাদিসটি মুরসাল। আর আমাদের নিকট মুরসাল হাদিসও কোনো কোনো সময় মাসআলা উদ্ভাবনের স্পষ্ট দলিল হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ বোখারী ও অন্যান্যরা উকবা বিন আমের থেকে লিখেছেন, রসুল স. উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের জানাযার নামাজ আট বছর পর অর্থাৎ ইন্তেকালের কিছু আগে পড়েছেন। বায়হাকী এই হাদিসে উল্লেখিত সালাত শব্দটির অর্থ করেছেন দোয়া (অর্থাৎ রসুল স. আট বছর পর শহীদদের জন্য দোয়া করেছেন)। ব্যাখ্যাটি অতিরিক্ত মনে হয়। আট বছর পর কেবল একবার দোয়া করেছেন, এই চিন্তাটি যথাযথ নয়। কারণ তাহাবী ও অন্যান্যের বর্ণনায় এসেছে, একদিন রসুল স. গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে শোহাদায়ে উহুদের জন্য নামাজ পড়েছেন, মৃতদের জন্য যে রকম নামাজ পড়া হয়। হানাফীদের নিকট তিন দিন পর মৃত ব্যক্তির জন্য নামাজ বৈধ নয়। অথচ এখানে আট বছর পর জানাযার নামাজ পাঠের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে তবে হানাফীগণ কী বলবেন? আমার নিকট এর উত্তর এই যে, তিন দিন পরে জানাযার নামাজ বৈধ নয়, এর কারণ হিসাবে হানাফীগণ উল্লেখ করেছেন, তিন দিন পর কবরস্থ লাশ ফেটে যায়। মৃতব্যক্তির অবয়ব তখন আর অবিকৃত থাকে না। কিন্তু শহীদগণ তো অন্যরূপ। মাটি তাদের শরীরকে ভক্ষণ করার অধিকার রাখে না। তাদের শরীর বিকৃতও হয় না। তাই তাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র। আর রসুল স.ও যেহেতু আট বছর পরে তাদের জানাযা পড়েছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে তাই তাঁদের জন্য জানাযা পাঠ অবশ্যই বৈধ।

ফারিয়ানী, নাসাঈ ও তিবরানী বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এ রকম, উহুদ যুদ্ধ শেষে মক্কা প্রত্যাবর্তনকালে মুশরিক

বাহিনী বলাবলি করতে লাগলো, বড্ড ভুল হয়ে গেলো! মোহাম্মদ কে হত্যা করা গেলো না। যুবতী মহিলাদের প্রতিও কোনো আক্রমণ পরিচালিত হলো না। চলো আবার ফিরে যাই। রসুল স. এই সংবাদ জানতে পেরে সবাইকে ডাকলেন। লাব্বায়েক বলতে বলতে সাহাবীরা হাজির হয়ে গেলেন।

মোহাম্মদ বিন আমর বর্ণনা করেছেন, সেদিন ছিলো শনিবার। সেদিনই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন রসুল স.। সাহাবীগণ সকলেই রণক্লান্ত। শক্রুদের পুনরাক্রমণের আশংকায় তবুও সবাইকে পুনরায় যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হলো। রসুল স. এর গৃহের চতুর্দিকে সারা রাত পাহারারত রইলেন সকলে। পরদিন রবিবার। ফজরের আযান দিলেন হজরত বেলাল । সাহাবীগণ নামাজের অপেক্ষায় রইলেন। রসুল স. বেরিয়ে আসতেই এক মাজানী ব্যক্তি মুশরিক বাহিনীর গতিবিধির সংবাদ জানালো। মুশরিকদের কথপোকথন ছিলো এ রকম, তাদের দলনেতা আবু সুফিয়ান বললো, চলো আবার যাই। অবশিষ্টদেরকে উৎপাটিত করি। সাফওয়ান বিন উমাইয়া ভিন্নমত পোষণ করলো। বললো, এ রকম কোর না। তারা তো পরাজিত হয়েছেই। আমার আশংকা, খাজরাজ গোত্রের অবশিষ্ট লোকেরা একাত্রিত হয়ে এবার আমাদেরকে আক্রমণ করবে। তখন আমরা আর পরাজয় ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না। তাই চলো মক্কার দিকেই যাই। রসুল স. বলেছেন, সাফওয়ানের কথাই ঠিক। আমার জীবনাধিপতি ওই পবিত্র সত্তার শপথ। মুশরিকদের প্রতি প্রস্তরবর্ষণের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। তারা ফিরে এলে নিশিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর রসুল স. হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরকে ডেকে মুশরিক বাহিনীর অবস্থা জানালেন। তাঁরা বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! শক্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে, যাতে তারা পুনরাক্রমণের দুঃসাহস পরিত্যাগ করে। রসুল স. তখন হজরত বেলালকে ডেকে বললেন, ঘোষণা করে দাও। রসুল স. তোমাদেরকে শক্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। হজরত বেলাল ঘোষণা করলেন। সবাই একত্রিত হলেন। দেখা গেলো হাজির হয়েছেন কেবল তাঁরাই যাঁরা গতকাল যুদ্ধ করেছিলেন। উসাইয়েদ বিন হাদীরের শরীরে ছিলো নয়টি আঘাত। তিনি তাঁর জখমের চিকিৎসা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। পুনরাক্রমণের আহবান শুনে তিনি বললেন, থাক, চিকিৎসার আর দরকার নেই। সকলে চলুন আল্লাহ্র রসুলের ডাকে সাড়া দেই। বনু সালমা গোত্রে আহত হয়েছিলেন চল্লিশ জন। এই যুদ্ধাহতরাও এসে পড়লেন। তোফায়েল বিন নোমান তেরটি, খারাশ বিন সুমহা দশটি, ক্বাব বিন মালেক দশের অধিক এবং আতিয়া বিন আমের নয়টি আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁরাও এসে হাজির হলেন। রক্তাক্ত শরীরের দিকে দৃকপাত ছিলো না তাঁদের। উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে প্রস্তুত হলেন সবাই।

ইবনে ওতবা বর্ণনা করেছেন, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বললো, হে রসুল! আমি আপনার উটের সঙ্গে থাকতে চাই। রসুল স. বললেন, না। ইবনে ইসহাক এবং মোহাম্মদ বিন ওমর বর্ণনা করেন, হজরত জাবের বিন

আবদুল্লাহ আরজ করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি গতকাল যুদ্ধে যাইনি। কারণ এই, আমি যুদ্ধপ্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমার পিতা বললেন, তুমি তোমার বোনদের হেফাজতে থাকো। আমার বোন সাতজন (অথবা নয়জন)। আমার পিতা বললেন, এদেরকে অরক্ষিত রেখে যাওয়া না তোমার জন্য শোভনীয় হবে, না আমার জন্য। বরং আমি যুদ্ধে যাই। তুমি এদের দেখাশোনা করো। আমার একান্ত ইচ্ছা আমি শহীদ হই। যদি শহীদ হই তবে এরা অভিভাবকহীন হবে না। আমি তাই যুদ্ধে যাইনি। আমার পিতা গতকাল শহীদ হয়েছেন। এখন আমার সুযোগ। দয়া করে আমাকে সঙ্গে নিন। রসুল স. রাজী হলেন। হজরত জাবের আরো বলেছেন, যারা যুদ্ধে যায়নি, তাদের অনেকে অনুমতি প্রার্থনা করলো। কিন্তু রসুল স. আমি ছাড়া আর কাউকে অনুমতি দেননি। রসুল স. সত্তরজনকে সঙ্গে নিলেন। শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ওই সত্তর জনের মধ্যে ছিলেন হজরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, জুবায়ের, সাদ, আবদুর রহমান বিন আউফ, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হোজায়ফা বিন ইয়ামান এবং আবু উবাদা (রাদিআল্লাহ আনহুম)। আমরাউল আসাদ নামক স্থানে এসে থামলেন রসুল স.। এই স্থানটি মদীনা থেকে আট মাইল দূরে। এখান থেকে বামদিকে জুল হুলায়ফা পর্যন্ত রাস্তা চলে গেছে। সাদ বিন উবাদা যুদ্ধ যাত্রার জন্য তিরিশটি উট প্রস্তুত করলেন। এ ছাড়া জবেহ করে খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য রাখলেন কয়েকটি উট। সোমবার এবং মঙ্গলবার — এই দুই দিন অবস্থান গ্রহণ করলেন রসুল স.। ওদিকে তখন শত্রুপক্ষের কাছেও এই সংবাদ পৌঁছে গিয়েছে। তারা বুঝলো, প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা পরাজিত হয়নি। সারাদিন রসুল স. সকলকে নিয়ে অনেক লাকড়ি সংগ্রহ করলেন। সন্ধ্যায় আগুন জ্বালানো হলো। রসুল স. এর নির্দেশ মতো পাঁচশত স্থানে আগুন প্রজ্বলিত করা হলো। উদ্দেশ্য, দূর থেকে মুশরিকেরা যেনো আগুন দেখে বুঝতে পারে তাদেরকে আক্রমণ করতে এসেছে মুসলমানদের বিশাল বাহিনী।

তিহামা নামক স্থানের মুশরিকেরা বনী খোজায়া গোত্রের মুসলমান এবং কাফেরদের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক রাখতো। রসুল স. এর সঙ্গে সন্ধি ছিলো তাদের। তারা ছিলো মুসলমানদের শুভাকাঙ্খী। ওই মুশরিক গোত্রের মা'বাদ খাজায়ী রসুল স. এর বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলো। সম্ভবত তখনো তিনি মুশরিক। কিন্তু আবু আমর ও ইবনে জাওজী তাঁকে মুসলমান বলেছেন। তিনি বললেন, হে মোহাম্মদ! আমি আপনার ও আপনারা সঙ্গীদের বিপর্যস্ততায় ব্যথিত। আমার একান্ত কামনা ছিলো, আল্লাহ যেনো আপনাকে বাঁচিয়ে রাখেন। মা'বাদ খাজায়ী তখন ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে রাওয়াহা নামক স্থানে গিয়ে আবু সুফিয়ানের বাহিনীর

সাথে মিলিত হলো। তারা পুনরাাক্রমণের সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলো। বলাবলি করছিলো, মুসলমানদের বড় বড় নেতাদেরকে আমরা হত্যা করেছি। এখন আবার হামলা করে তাদরেকে পুরাপুরি ধ্বংস করে দিয়েই আমরা নিশ্চিন্ত হবো। মা'বাদ খাজায়ীকে দেখে আবু সুফিয়ান বললো, খবর কী? মা'বাদ বললেন, মোহাম্মদ বিশাল বাহিনী নিয়ে তোমাদের সন্ধানে বের হয়েছেন। এমন যুদ্ধপ্রস্তুতি আমি আর কখনো দেখিনি। তারা রোষে ফেটে পড়ছে। যারা যুদ্ধে ছিলো না, তারাও এবার যোগ দিয়েছে। যুদ্ধে যোগ না দেয়ায় তারা অনুতপ্ত। আবু সুফিয়ান বললো, তোমার অকল্যাণ হোক। কী বলছো তুমি? মা'বাদ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমার মনে হয় তোমরা আর স্থানান্তরে যেতে পারবে না। আবু সুফিয়ান আরো বললো, আমরা তো সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আবার তাদেরকে আক্রমণ করবো। মা'বাদ বললেন, আমি তোমাদেরকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিচ্ছি। সাফওয়ানও এই পরামর্শ দিয়েছিলো। আবু সুফিয়ান দ্রুত তার সিদ্ধান্ত বদলে ফেললো। অতি দ্রুত তার বাহিনী নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে গেলো। পথে আবদুল কাইসের কতিপয় লোকের সঙ্গে দেখা হলো তাদের। আবু সুফিয়ান বললো, কোথায় যাচ্ছো তোমরা? তারা বললো, মদীনার জমিতে উৎপন্ন ফসল আনতে যাচ্ছি। আবু সুফিয়ান বললো, তোমরা যদি আমার একটি কথা মোহাম্মদ   কে জানিয়ে দিতে পারো, তবে আগামী উকাজের মেলায় আমি তোমাদের উটগুলোকে কিসমিস দিয়ে ভরে দেবো। পারবে? তারা বললো, হ্যাঁ। আবু সুফিয়ান বললো, তোমরা মোহাম্মদকে বলো আমরা পুনরাক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তোমাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়াই আমাদের ইচ্ছা। তারা এসে উপস্থিত হলো রসুল স. এর অবস্থান স্থলে এবং আবু সুফিয়ানের সংবাদটি জানালো। রসুল স. বললেন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি' মাল ওয়াকিল।' রসুল স. সেখানে সোম, মঙ্গল ও বুধ এই তিনদিন অবস্থান করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো —

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৭২

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

❐ জখম হওয়ার পর যাহারা আল্লাহ ও রসুলের ডাকে সাড়া দিয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্য করে এবং সাবধান হইয়া চলে তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহতায়ালা যুদ্ধাহত সাহাবীদেরকে মহাপুরস্কার প্রদানের সুসমাচার জানিয়েছেন। তাদের গুণ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা সৎকর্মশীল এবং মুত্তাকী।

জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াতে এহসান ও তাকওয়া বিশিষ্ট মানুষদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই দুটি গুণ হচ্ছে 'মহাপুরস্কার' লাভের যোগ্যতার মাপকাঠি।

অধিকাংশ তাফসীরকারদের অভিমত, এই আয়াত নাজিল হয়েছে উহুদের যুদ্ধাহত সাহাবীদের সম্পর্কে। মুজাহিদ এবং ইকরামা অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, ছোট বদর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এই আয়াত।

উহুদ প্রান্তর পরিত্যাগের সময় আবু সুফিয়ান বলেছিলো, মোহাম্মদ তুমি কি চাও আগামী বছর ছোট বদরে আমাদের মোকাবেলা হোক? রসুল স. বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ্! তাই হবে। বৎসর অতিক্রান্ত হলে আবু সুফিয়ান তার বিশাল বাহিনী নিয়ে ছোট বদর অভিমুখে চললো। তার সৈন্য সংখ্যা ছিলো দুই হাজার। অশ্বারোহী ছিলো পঞ্চাশজন। মুশরিক বাহিনী এসে উপনীত হলো মাররুজ জাহরানের পার্শ্ববর্তী মুজান্না নামক স্থানে। তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন আল্লাহতায়ালা। তারা ফিরে যেতে মনস্থ করলো। নাঈম বিন মাসউদ আশজায়ী ওমরা করার জন্য মক্কাভিমুখে যাচ্ছিলেন। পথে দেখা হলো আবু সুফিয়ানের সাথে। আবু সুফিয়ান বললো, নাঈম। আমি তো মোহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে কথা দিয়েছিলাম। এক বছর পর ছোট বদরে তাদেরকে মোকাবেলা করবো। কিন্তু এখন তো শুষ্ক মওসুম। এরকম সময়ে যুদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা বরং আমাদের পশুগুলোকে সবুজ মাঠে চরিয়ে নিয়ে বেড়াবো এবং তাদের দুধ পান করবো। ছোট বদরে আমরা আর যাবো না। কিন্তু এটাও ঠিক নয় যে, আমরা যাবো না, অথচ মুসলমানরা এসে পড়বে। এতে করে তাদের সাহস যাবে বেড়ে। আর আমাদের কৃত অঙ্গীকারও ভঙ্গ হয়ে যাবে। উত্তম এই যে, আমরা চাই মুসলমানরাও যেনো না আসে। তুমি বরং মদীনায় পৌঁছে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করো। তাদেরকে বলো, আবু সুফিয়ানের অনেক সৈন্য। তাকে মোকাবেলা করার সাধ্য তোমাদের নেই। যদি তুমি একাজটুকু করতে পারো, তবে আমি তোমাকে দশটি উট দেবো। উটগুলো সুহাইল বিন আমরের নিকট জামানত স্বরূপ রেখে দিচ্ছি। সুহাইল তৎক্ষণাৎ দশটি উটের জিম্মাদার হয়ে গেলো। নাঈম ওমরা শেষে মদীনায় ফিরে গিয়ে দেখলো, বিশাল যুদ্ধপ্রস্তুতি চলছে। নাঈম বললো, এ কি করছো তোমরা? সাহাবীগণ বললেন, আবু সুফিয়ানের সঙ্গে ছোট বদরের মিলা নামক স্থানে যুদ্ধ করতে আমরা অঙ্গিকারাবদ্ধ। নাঈম বললো, তোমাদের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত মন্দ। তোমরা আপনাপন গৃহেই অবস্থান করো। যদি সেখানে যাও, তবে পালাবার পথ পাবে না। তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

তোমরা সেখানে গেলে আর বেঁচে থাকতে হবে না। সাহাবীগণ কিছুটা হতোদ্যম হলেন। মুনাফিক ও ইহুদীরা খুব খুশী হলো। তারা বলতে লাগলো, মোহাম্মদকে আর বাঁচতে হবে না। রসুল স. সব কথা শুনে চিন্তিত হলেন এই ভেবে যে, অঙ্গীকার পূরণের কী হবে? হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহর রসুল! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে বিস্তৃত করবেন। অবশ্যই তিনি তাঁর নবীকে বিজয়ী করবেন। আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ সুতরাং পিছপা হতে পারি না। আপনি যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা দিন। এটাই উত্তম। রসুল স. তাঁদের কথা শুনে প্রীত হলেন। বললেন, কসম ওই জাতের যিনি আমার জীবন রক্ষক। কেউ না গেলেও আমি একাকী যুদ্ধযাত্রা করবো।

সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে রসুল স. ছোট বদর অভিমুখে চললেন। ছোট বদরে উপস্থিত হলো মুসলমান বাহিনী। সেখানকার মুশরিকদের নিকট তাঁরা জানতে চাইলেন, তোমরা কুরাইশ বাহিনীর সংবাদ জানো কি? মুশরিকেরা বললো, অনেক সৈন্য নিয়ে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। মুসলমান বাহিনী বললেন, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল (আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট — তিনিই সর্বোত্তম কর্মনির্বাহী)।

মুর্খতার যুগে বদরে বিরাট মেলা বসতো। মেলা চলতো আটই জিলকদ পর্যন্ত। তারপর ভেঙে যেতো। পড়ে রইতো খোলা প্রান্তর। রসুল স. সেখানে আবু সুফিয়ানের বাহিনীর অপেক্ষায় রইলেন। ওদিকে আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে মুজান্না থেকে মক্কায় ফিরে গেলো। যুদ্ধ হলো না। মুসলমানদের সাথে ছিলো কিছু ব্যবসা সামগ্রী। সেগুলো মেলায় বিক্রয় করে তাঁরা দ্বিগুণ মুনাফা পেলেন। তারপর মদীনায় ফিরে গেলেন তাঁরা। এই আয়াত নাজিল হলো তখনই। ইমাম বোখারীর প্রথম বর্ণনা এরকমই। ইবনে জারীরও এরকম বলেছেন।

আমি বলি, আয়াতের বিবরণে এটা স্পষ্ট যে, যুদ্ধাহত অবস্থায় সাহাবীগণ পুনরাক্রমনের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। ছোট বদরের যুদ্ধ তো ছিলো এক বছর পরে। তখন কেউ আর আহতাবস্থায় ছিলেন না। সবাই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। যদি এ রকম বলা যায় যে, ছোট বদরের যুদ্ধ ছিলো উহুদের অব্যবহিত পরেই, তবে ছোট বদরের প্রাক্কালে এই আয়াত নাজিল হয়েছে, একথা মেনে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু ছোট বদরের ঘটনা তখনি ঘটেনি — ঘটেছে এক বছর পরে। সুতরাং এই আয়াতটি উহুদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছোট বদরের সঙ্গে নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○

❒ ইহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল যে 'তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হইয়াছে সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর;' কিন্তু ইহা তাহাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়াছিল এবং তাহারা বলিয়াছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট; এবং তিনি কত উত্তম কর্ম-বিধায়ক।'

যদি এই আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতটির সাথে একই সঙ্গে নাজিল হয়েছে বলে মনে করা যায়, তবে 'আল্লাজীনা ক্বলা' পূর্ববর্তী 'আল্লাজীনা তাজালু' এর স্থলবর্তী হবে। যদি মনে করা যায় পৃথকভাবে আয়াত দুটি নাজিল হয়েছে, তবে প্রথমটি হবে উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়টি বিধেয়।

অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলেছেন, 'লোকে বলিয়াছিলো' বলতে ওই লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা আবু সুফিয়ানের বাহিনীর সঙ্গে হামরাউল আসাদে সাক্ষাত করেছিলো, যেখানে উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো আবু সুফিয়ানের বাহিনী। মুজাহিদ এবং ইকরামা বলেছেন, এই লোক হচ্ছে নাঈম বিন মাসউদ আশজায়ী, যে ওমরা করতে যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান বাহিনীর সাক্ষাত পেয়েছিলো, যাকে দশটি উট দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলো আবু সুফিয়ান। এরকমও বলা যেতে পারে যে, নাঈম বিন মাসউদ আশজায়ীর সঙ্গে মদীনার আরো কিছু লোক জুটে গিয়েছিলো। তারা সকলে মিলে আবু সুফিয়ানের কথাটি প্রচার করেছে। 'লোকে বলিয়াছিল' বলতে এখানে ওই সকল লোকদেরকে বোঝানো হয়ে থাকবে। আমাদের নিকট এই মতটি গ্রহণীয় যে, এই আয়াত ছোট বদরের যুদ্ধ সম্বন্ধে আর পূর্ববর্তী আয়াতটি ছিলো হামরাউল আসাদে অবস্থানকালীন সময়ের। এ দুটি ঘটনার ব্যবধান ছিলো এক বছর।

'লোক জমায়েত হইয়াছে' — এ কথায় বোঝা যায়, প্রথমেই জমায়েত ছিলো না পরে জমায়েত হয়েছে। এরকম জমায়েত ছোট বদর যুদ্ধের জন্যই হয়েছিলো। উহুদ যুদ্ধের সময়ে তো মুশরিক বাহিনী জমায়েত অবস্থাতেই ছিলো।

ইমাম রাজীর উক্তি আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে আসতে সহায়তা করেছে। তিনি লিখেছেন, উহুদ এবং ছোট বদর এই দুই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুমিনদের প্রশংসা আল্লাহ্ পাক এই দুই আয়াতে করেছেন। প্রথমটিতে পুনরাক্রমণের জন্য হামরাউল আসাদে একত্রিত মুমিনগণের জন্য। দ্বিতীয়টিতে ছোট বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমা হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো, এরকম ভীতি সঞ্চারক সংবাদ নাঈমের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে — একথা উল্লেখ করার পর আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন, তিনি ইমানদারদের ইমান দৃঢ়তর করে দিয়েছিলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে ইমানদারগণ অতি সহজেই উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি কতো উত্তম কর্মবিধায়ক।' অবস্থা হলো এই যে, সাহাবীগণ নাঈমের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করলেন না। তাঁদের ইমান হলো অধিকতর শক্তিশালী। আশায়েরা এবং অন্যান্য সুন্নত জামাতের ইমামগণ ইমানকে একক আকার বিশিষ্ট বস্তু বলেন। যার আকার বেড়ে যাওয়া অথবা কমে যাওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু ইমান এই অর্থে বাড়ে এবং কমে যে, বিশ্বাসী নৈকট্য বাড়ে অথবা কমে। এই অর্থে ইমান বেড়ে গেলে অধিকতর মর্যাদা লাভ হয়। এভাবে প্রকৃত ইমান উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। যতোবেশী নৈকট্য লাভ হয় ইমান ততোটুকু বর্ধিত অথবা বলশালী হয়।

'হাসবুনাল্লাহ' — অর্থ আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। 'হাসব' শব্দটি এসেছে মুহসিবুনা, মুহসিবুন অথবা আহ্সাব শব্দ থেকে। আল্লাহ্ই যথেষ্ট এ কথায় আল্লাহতায়ালার অতিরিক্ত কোনো প্রশংসা বর্ণিত হয় না। এটি একটি সত্য উচ্চারণ। সত্যানুসারী ইমানদারগণই কেবল একথাটি উচ্চারণ করার যোগ্য।

'ওয়াকীল' শব্দের অর্থ যাঁর কাজে পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া যায় তিনিই ওয়াকিল। অর্থাৎ উত্তম কর্মবিধায়ক। সৃষ্টির সকল কর্মকান্ডের জিম্মাদার তিনি। কেউ কেউ বলেছেন, 'হাসবুনাল্লাহ ওয়া 'নিয়ামুল ওয়াকীল' বাক্য বিশ্বাসীদের বাক্য নয়। বাক্যটি আল্লাহ্র। বিশ্বাসীগণ 'এবং' শব্দের মাধ্যমে একত্রে উচ্চারণ করেছে মাত্র।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. 'হাসবুনাল্লাহ্ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' বলেছেন। অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে হজরত ইব্রাহিম আ. ও একথা বলেছিলেন। রসুল স. এর সাহাবীগণও এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা তোমাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য অনেক মানুষ ও অস্ত্রসম্ভার একত্রিত করেছে। যাতে তোমরা তাদেরকে ভয় করো এবং ছোট বদরের দিকে অগ্রসর না হও। তাদের কথার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্তায়ালা ইমানদারদের ইমান বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁরা বলেছেন, 'হাসবুনাল্লাহ্ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল'। বোখারী।

'হাসবুনাল্লাহ' এবং 'নি'মাল ওয়াকীল' একটিই বাক্য। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় তাই একক সর্বনাম উল্লেখ করা হয়েছে। বাক্য দু'টি হলে সর্বনাম ব্যবহৃত হতো দ্বিবচনের। 'হাসবুনাল্লাহ্' বাক্যটি বিবৃতিমূলক। 'ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' বাক্যটি প্রশ্নবোধক। বিবৃতিমূলক বাক্যের প্রতি প্রশ্নবোধক বাক্যের আতফ করা (সংযোগ করা) আরবী ভাষাতে একটি রীতিবিরুদ্ধ প্রয়াস। সেক্ষেত্রে ব্যকরণবিদগণের নিকট থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়। হতে

পারে হাসবুনাল্লাহ ও নি'মাল ওয়াকীল' বাক্য দু'টির মাঝখানে ব্যবহৃত ওয়াও অব্যয়টি মু'মিনগণের উক্তি নয়। বর্ণনাকারীর উক্তি। আবার হতে পারে বাক্য দু'টি নীতিগতভাবে ভিন্নার্থে ব্যবহৃত। কিন্তু বাস্তবে প্রশ্নবোধক বাক্যটিও বিবৃতমূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই সংযোগবিধান শুদ্ধ।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ○ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۖ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

❒ তারপর তাহারা আল্লাহের অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, কোন অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই, এবং আল্লাহ যাহাতে রাজী তাহারা তাহারই অনুসরণ করিয়াছিল এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

❒ শয়তানই তোমাদিগকে তাহার বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিওনা, আমাকেই ভয় কর।

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানে ত্বরিতগতি তাহাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তাহারা কখনও আল্লাহের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ পরকালে তাহাদিগকে কোন অংশ দিবার ইচ্ছা করেন না, তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে।

❒ যাহারা বিশ্বাসের বিনিময়ে অবিশ্বাস ক্রয় করিয়াছে তাহারা কখনও আল্লাহের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

ছোট বদর থেকে মুসলমান বাহিনী ফিরে এসেছেন ইমান, সম্পদ ও সম্মানের সঙ্গে। এটাই আল্লাহ্‌র অবদান ও অনুগ্রহ। আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে সকলের ইমান উন্নত হয়েছে। ব্যবসার মাধ্যমে অর্থাগম ঘটেছে। শত্রুরা ভীত হয়েছে বলে বীর যোদ্ধাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো প্রকার অনিষ্ট তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি। অর্থাৎ তাঁরা আহতও হননি, নিহতও হননি। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর সন্তোষানুসারী। ইমাম বাগবী লিখেছেন, মুসলমান বাহিনী বলেছিলেন, এটা কি জেহাদ (এখানে তো আঘাত প্রত্যাঘাত বলে কিছু নেই)? আল্লাহ্‌তায়ালা মহা অনুগ্রহশীল। এই প্রচেষ্টাকেই আল্লাহতায়ালা জেহাদ বলে গণ্য করলেন। এতে অংশগ্রহণকারীদেরকে সওয়াব দান করলেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টও হলেন।

যারা জেহাদে যোগ দেয়নি তারা শয়তানের বন্ধু। আবু সুফিয়ান এবং নাঈমের মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে ভীত করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ বিশ্বাসীদের জন্য এ রকম আচরণ একান্ত অশোভনীয়। তাই এরশাদ হচ্ছে, যদি তোমরা বিশ্বাসকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল বলে গ্রহণ করে থাকো, তবে আর অন্যকে ভয় করবে কেনো? আমাকেই ভয় করো। বিজয় দান করি আমিই। সুতরাং আমার নির্দেশ অমান্য কোর না এবং আমার রসুলের আনুগত্যে স্থিত হও। আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং সকল বিষয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করাই ইমান। রসুল স. এরশাদ করেছেন, যদি কিছু যাঞ্চা করতে ইচ্ছ করো, তবে আল্লাহর নিকটই যাঞ্চা করো। সাহায্য চাইলে আল্লাহর নিকট চাও। জেনে রেখো, সকল মানুষ একত্রিত হয়ে তোমার উপকার করতে চাইলেও পারবে না, আল্লাহ যদি তা অনুমোদন না করেন। সকলে মিলে ক্ষতি করতে চাইলেও পারবে না, যদি না তাতে আল্লাহ সায় দেন। তাই হবে, যা লিপিবদ্ধ রয়েছে অদৃষ্টলিপিতে। অদৃষ্ট লিপিবদ্ধকারী কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কালিও শুকিয়ে গিয়েছে। বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

'সত্য প্রত্যাখ্যানে ত্বরিতগতি' বলতে বোঝানো হয়েছে কাফের কোরাইশদেরকে — একথা বলেছেন জুহাক। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এ কথায় রয়েছে মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত। তারা কাফেরদেরকে সাহায্য করতে তৎপর। এরশাদ হয়েছে, তাদের এই তৎপরতা যেনো তোমাদেরকে চিত্তক্ষুন্ন না করে। আখেরাতের সওয়াব তাদের নসীবে নেই। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। আল্লাহতায়ালার হাদী (পথ প্রদর্শনকারী) গুণের প্রতিবিম্ব পড়েছে তোমাদের উপর, তাই তোমরা লাভ করেছো পথপ্রাপ্তির নিশ্চিন্ততা। আর ওদের উপরে পড়েছে আল মুদিল্লু (পথ ভ্রষ্টকারী) গুণের প্রতিচ্ছায়া। তাই তারা ভ্রষ্টতার পথে তৎপর। তোমরা চাও ইমান। তারা চায় কুফরী। উভয় দলের আকাঙ্খাই বাস্তবায়িত করা হয়েছে। সুতরাং তাদের পথভ্রষ্টতা তোমাদেরকে ক্ষুন্ন করবে কেনো? আল্লাহ চান না তারা পরকালে কোনো কল্যাণ লাভ করুক। মহাশাস্তি অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে। বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসকেই তারা আরাধ্য

করেছে। আহলে কিতাবেরা রসুল স. এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করেছে। আবির্ভাবের পরে করেছে প্রত্যাখ্যান। তিনি প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, তবু তারা মানলো না। লোভ ও হিংসাই তাদেরকে ইমানচ্যুত করেছে। তাদের এই অবাধ্যতার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি — যা অবধারিত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৭৮

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ○

❒ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে আমি কাল বিলম্বিত করি তাহাদের মঙ্গলের জন্য; আমি কাল বিলম্বিত করি যাহাতে তাহাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

পৃথিবীতে সাধারণতঃ অবিশ্বাসীদেরকে নিরুপদ্রব জীবন যাপন করতে দেয়া হয়। এটা অব্যাহতি নয়। তারা যেনো মনে না করে এতে কল্যাণকর কিছু রযেছে। এই আপাত অব্যাহতি দানের উদেশ্য এই যে, অনুকূল অবস্থা পেয়ে তারা যেনো অধিকতর পাপাসক্ত হয়ে কঠিনতর শাস্তির উপযোগী হয়। এই আয়াতের মাধ্যমে আরো একটি বিষয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, পাপও সংঘটিত হয় আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায়। প্রাথমিক পাপাসক্তি বান্দা থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু তা আল্লাহ্‌তায়ালার অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত বাস্তবায়িত হতে পারে না। বান্দারা তাদের পাপের কারণেই অভিযুক্ত হবে যেহেতু পাপের সূচনা করেছে তারাই এবং একান্তভাবে কামনা করেছে যেনো তাদের পাপাভিপ্রায় বাস্তবে রূপ লাভ করে।

অপমানজনক শাস্তি রয়েছে তাদের জন্যে। মুকাতিল বলেছেন, মক্কার মুশরিকদের জন্য এই অপমানজনক শাস্তির ঘোষণা এসেছে। আতা বলেছেন, লাঞ্ছনাদায়ক এই শাস্তির ঘোষনা এসেছে বনু কোরাইজা ও বনু নাজিরের ইহুদিদের জন্যে।

হজরত আবু বকর বর্ণনা করেন, রসুল স. এর নিকট একবার জানতে চাওয়া হলো, সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি স. বললেন, যাঁর বয়স বেশী এবং আমল উত্তম। আবার বলা হলো, সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যার বয়স বেশী এবং আমল মন্দ। আহমদ, তিরমিজি, দারেমী।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন পৃথিবীতে ষাট বছর বয়স পেয়েছিলো যারা তাদেরকে ডাকা হবে। তাদের সামনে উচ্চারণ

করা হবে ওই আয়াত — 'আওয়ালাম নুয়াম্মির কুম মা ইয়াতাজাক্কারু ফিহি মাংতাজাক্কারা ওয়া জায়াকুমুন নাজির।' আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাদের আয়ু এতোটুকু দেইনি যে, তোমরা বুঝতে চাইলে বুঝতে পারতে। তাছাড়া তোমাদের নিকট ভয় প্রদর্শকও এসেছিলো। বায়হাকী।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৭৯

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ
مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ
مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ
اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

❒ অসৎকে সৎ হইতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রহিয়াছ আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণকে সেই অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদিগকে অবহিত করা আল্লাহের কাজ নয়; তবে আল্লাহ তাঁহার রসুলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলদিগকে বিশ্বাস কর। তোমরা বিশ্বাস করিলে ও সাবধান হইয়া চলিলে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রহিয়াছে।

ইমানদারদের বিশুদ্ধতা এবং মুনাফিকদের অপবিত্রতা সম্মিলিত থাকতে পারে না। এখানে ইমানদার অর্থ সাহাবীগণসহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল ইমানদার। আর পরবর্তী সকল মুনাফিকও মদীনার প্রথম মুনাফিকদের সঙ্গে সম্বন্ধিত। ইমান ও নিফাককে পৃথক করা সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, 'মুনাফিকদের আশংকা এমন সুরা আবার নাজিল হয়ে না পড়ে, যাতে তাদের অন্তরের কথা প্রকাশ করে দেয়া হয়। (হে নবী!) আপনি বলে দিন, তোমরা বিদ্রুপ করে যাও নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সেই বিষয়কে প্রকাশ করে দেবেন, যার আশংকা তোমরা করো।' উহুদ যুদ্ধের দিন মুনাফিকেরা এই আশংকাতেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলো।

অদৃশ্যের (গায়েবের) জ্ঞান জানানোর ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কোনো বাধ্যবাধ্যকতা নেই। তবে তিনি তাঁর নবীদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে অদৃশ্য বিষয়ে অবগতি দান করেন। যেমন রসুল মোহাম্মদ স. কে তিনি মুনাফিকদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিতি দিয়েছিলেন। এলমে গায়েব সম্পর্কে সুরা

জ্বিনের আয়াতটিও প্রনিধাণযোগ্য; যেখানে বলা হয়েছে, তিনি গায়েবী বিষয় পরিজ্ঞাত। গায়েব সম্পর্কে তিনি কাউকে জানান না, তবে মনোনীত কোনো রসুল এর ব্যতিক্রম।

ইমাম বাগবী, সাদীর বর্ণনার মাধ্যমে লিখেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার সামনে আমার উম্মতকে মৃত্তিকাস্থিতাবস্থায় হাজির করা হলো। যেমন আদম আ. এর সামনে হাজির করা হয়েছিলো তাঁর বংশধরদেরকে। আমার উপর কারা ইমান আনবে, কারা আনবে না, সবই আমাকে বলে দেয়া হয়েছে। এ কথা মুনাফিকদের কানে পৌঁছলে তারা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ দাবী করে যে, যারা এখনো জন্মলাভ করেনি তাদের মধ্যে কারা ইমানদার হবে কারা হবে না–সে বিষয়ে তিনি বলে দিতে পারেন। অথচ আমরা তাঁর সাথে থাকি, তবু তিনি আমাদেরকেই চিনতে পারেননি।

মুনাফিকদের এই কথপোকথনের সংবাদ শুনে রসুল স. মসজিদের মিম্বরে দন্ডায়মান হলেন। আল্লাহ তায়ালার স্তুতি, প্রশংসা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, তারা আমার জ্ঞান সম্পর্কে সন্দিহান। তোমরা এখন কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারো। আমি জবাব দিতে পারবো। আবদুল্লাহ্ ইবনে হোযাফা দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার পিতা কে? রসুল স. বললেন, হোযাফা। হজরত ওমর তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমরা আল্লাহ্তায়ালাকে প্রতিপালক মেনে নিয়ে, ইসলামের অনুসারী হয়ে, কোরআনকে বিশ্বাস করে এবং আপনাকে নবী হিসাবে পেয়ে পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্ত। আপনি ক্ষমাপ্রাপ্ত। আমাদেরকেও ক্ষমা করে দিন। রসুল স. এরশাদ করলেন, তোমরা কি ফিরে এসেছো? তোমরা কি প্রত্যাবর্তনকামী হয়েছো? মিম্বর থেকে নেমে এলেন রসুল স.। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

শায়েখ জালালুদ্দিন সুয়ুতি লিখেছেন, এরকম বর্ণনা আমার নিকট পৌঁছেনি। আমি বলি, এই সহীহ্ বর্ণনাটির মাধ্যমে এবং এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, রসুল স. গায়েবের জ্ঞান লাভের জন্য আল্লাহর মনোনীত। তিনি গায়েবের এলেম সম্পর্কে অবহিত নন — এরকম কথা এই হাদিসের মাধ্যমে রদ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু রসুল স. এর জন্য এটা বৈধ নয় যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত অন্য কাউকে এই গায়েবী এলেমের অংশী বানাবেন। নবীগণ কাফেরদের কুফরী সম্পর্কে অবগত। কিন্তু তাঁরা তা প্রকাশ করেন না। কারণ, এটা তাঁদের ব্যক্তিগত জ্ঞান। আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যকে অবগত করানোর অধিকার তাঁদের নেই। কর্তব্যকর্ম হচ্ছে এই যে, বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করতে হবে। অপরিচ্ছন্নতা ও পাপাসক্তি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। তবেই রয়েছে পুরস্কার। মহা পুরস্কার।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتٰىهُمُ اللّٰهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا
لَّهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ
مِيرٰثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

❑ এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যাহা তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে তাহাদের জন্য উহা মঙ্গল ইহা যেন তাহারা কিছুতেই মনে না করে। না, ইহা তাহাদের জন্য অমঙ্গল। যাহাতে তাহারা কৃপণতা করিবে কিয়ামতের দিন উহাই তাহাদের গলার বেড়ি হইবে। আসমান ও জমিনের চরম স্বত্বাধিকার আল্লাহেরই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।

সম্পদ আল্লাহর দান। আল্লাহ্‌তায়ালা হুকুম করেছেন, সম্পদশালীদেরকে জাকাত দিতে হবে। যারা কৃপণ তারা জাকাত দিতে অনীহ। তাদের অনীহার কারণ, জাকাত দিলে সম্পদ কমে যাবে। বরং না দেয়াতেই লাভ। তাদের মনোভাবের বিরুদ্ধেই এই আয়াতে বলা হয়েছে, তারা যাকে লাভজনক মনে করেছে, আসলে তা লাভজনক নয়। তাদের জাকাত না দেয়া সম্পদ তাদের জন্য নিশ্চিত অকল্যাণকর। তাদের এই অশুভ সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি করে দেয়া হবে।

হজরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, আবু ওয়ায়েল, শায়বী এবং সুদ্দী বলেছেন, যারা জাকাত দেয় না, তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ কাউকে ধনী করেছেন অথচ সে জাকাত দেয়নি, কিয়ামতের দিন তার বিত্ত-বৈভবকে সাপের আকৃতি দেয়া হবে। ওই সাপের মাথা হবে কেশহীন, তার চোখের উপর থাকবে কালো দাগ। সে ওই ব্যক্তির কণ্ঠাদেশ বেষ্টন করবে এবং দংশন করতে করতে বলবে, আমি তোমার সম্পদ। আমি তোমার জাকাত না দেয়া ধন। এর পর রসুল স. এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন। বোখারী।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অনেক উট, গাভী, মহিষ অথবা ছাগলের মালিক হয়, সে যদি জাকাত আদায় না করে, তবে সে কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে, তার পশুগুলো অনেক মোটা তাজা হয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। উট উত্তেজিত হয়ে তাকে পিষ্ট করতে থাকবে। গাভী ও ছাগলগুলো তাকে শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকবে। তাদের আঘাতের আক্রমণে

সে কখনো হবে পশ্চাদবর্তী কখনো বা সম্মুখবর্তী। বিচার সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থাই চলতে থাকবে। বোখারী, মুসলিম।

আতীয়া বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদি আলেমদের সম্পর্কে। তারা তওরাতের মাধ্যমে রসুল স. এর নবুয়ত ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা খুব ভালোভাবেই জানতো। তাদের এই জ্ঞান গোপন করাকে বখিলি বা কৃপণতা বলা হয়েছে। আর 'গলার বেড়ি হবে'–একথার অর্থ, তাদেরকে তাদের পাপের বোঝা ওঠাতে হবে।

আল্লাহ্ই আকাশ ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকারী। সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত রয়েছে বিলয়। মৃত্যুকালে মানুষকে সম্পদচ্যুত হতেই হয়। এরপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক বানিয়ে দেন। পরবর্তী মালিক হয়তো তার বংশভূত হবে অথবা হবে বংশবহির্ভূত। সম্পদের মোহ যার রয়েছে, তার সঙ্গী হবে বৈভব বিচ্যুতির আক্ষেপ। আর তার জন্যে নির্ধারিত হবে আযাব।

আল্লাহ্ সকলের কর্মকান্ড সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। তিনি অবশ্যই সৎকর্মের বিনিময় প্রদান করবেন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম, হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে লিখেছেন, রসুল স. হজরত আবু বকরকে একটি লিখিত ফরমানসহ বনী কায়নুকার ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করলেন। ফরমানটিতে ছিলো ইসলাম গ্রহণের আহবান। নামাজ, জাকাত এবং আল্লাহ্র জন্য করজে হাসানা প্রদান করার নির্দেশনা। হজরত আবু বকর ইহুদীদের একটি শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, প্রখ্যাত ইহুদী আলেম ফাখ্খাজ বিন আজুরকে ঘিরে বসে আছে ইহুদী জনতা। তার পাশে বসে আছে আশীয় নামক আরেকজন আলেম। হজরত আবু বকর ফাখ্খাজকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো। মুসলমান হয়ে যাও। আল্লাহর কসম! একথা তোমরা ভালোভাবেই জানো যে, মোহাম্মদ স. আল্লাহ্র নিকট থেকে সত্যের আহবান নিয়ে এসেছেন। তাঁর বিবরণ রয়েছে তওরাতেও। সুতরাং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং আল্লাহকে করজে হাসানা দাও। আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাত দান করবেন এবং দ্বিগুণ সওয়াব দিবেন। ফাখ্খাজ বললো, আবু বকর তুমি বলছো আল্লাহ্ আমাদের কাছে ঋণপ্রার্থী? 'যারা নিঃসম্পদ তারাই তো সম্পদশালীদের নিকট যাঞ্চা করে। তোমার কথা ঠিক হলে বুঝতে হবে আল্লাহ্ ফকির আর আমরা ধনী। আল্লাহ্ তোমাদেরকে সুদ দিতে নিষেধ করেছেন। আমরা সুদ পাবো না, আবার দানও করবো? রোষান্বিত হলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক । তিনি ফাখ্খাজের মুখে আঘাত করলেন এবং বললেন, আমার জীবনাধিপতি ওই পবিত্র সত্তার শপথ! তুমি আল্লাহ্র দুশমন। আমরা তোমাদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ বলে নিরুপায়, তা না

হলে এক্ষুণি তোমার শিরোশ্ছেদ করতাম। ফাখ্খাজ রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, দেখো মোহাম্মদ! তোমার সাথী আমার সঙ্গে এই আচরণ করেছে। হজরত আবু বকর বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! এই আল্লাহর দুশমন বলেছে, আল্লাহ ফকির আর আমরা ধনী। তার একথা শুনেই আমি ক্ষিপ্ত হয়েছিলাম এবং তার মুখে আঘাত করেছিলাম। ফাখ্খাজ হজরত আবু বকরের একথাকে অস্বীকার করলো। (হজরত আবু বকরের পক্ষে কোনো সাক্ষ্য ছিলো না) অতঃপর আল্লাহ্ ফাখ্খাজের কথাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে হজরত আবু বকরের পক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে অবতীর্ণ করলেন নিম্নের আয়াত। ইকরামা, সুদ্দী ও মুকাতিল।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৮১, ১৮২

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

❒ যাহারা বলে 'আল্লাহ অভাবগ্রস্ত ও আমরা অভাবমুক্ত' তাহাদের কথা আল্লাহ্ শুনিয়াছেন; তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা ও নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখিয়া রাখিব এবং বলিব 'তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর।'

❒ ইহা তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং উহা এই কারণে যে আল্লাহ্ দাসদের প্রতি জালিম নহেন।

আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনী — এই চরম গর্হিত বাক্যটি আল্লাহ্ শুনেছেন। ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উপস্থাপন করেছেন এভাবে, ইহুদীরা রসুল স.এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, আল্লাহ্ তাহলে দরিদ্র। না হলে আমাদের কাছে কর্জ চাইবেন কোনো? করজে হাসানা প্রদান সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হওয়ার সময় ইহুদীরা একথা বলেছিলো। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। হাসান বলেছেন, 'আল্লাহ দরিদ্র আমরা ধনী' একথাটি বলেছিলো ইহুদী হুয়াই বিন আখতাব। আয়াতে বলা হয়েছে এ বিষয়টি আমি লিখে রাখবো, এর অর্থঃ আমার হুকুমে আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতারা লিখে রাখবে। আমল লিপিবদ্ধ করার কাজ ফেরেশতাদের। আল্লাহর নয়। অন্য আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই' আমি অর্থাৎ আমার ফেরেশতারা লিখে নিবে।'

ইহুদীরা তাদের পূর্ববর্তী নবীদেরকে হত্যা করেছিলো। তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের এই আচরণকে পছন্দ করে যাচ্ছে। তাদের এই অশুভ পছন্দকে লিখে রাখা হচ্ছে। কিয়ামতে তাদের শাস্তির প্রাক্কালে আমার ফেরেশতারা বলবে, এবার আস্বাদ গ্রহণ করো জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিশিখার। 'আজাবুল হারীক্ব' অর্থ যন্ত্রণাদায়ক লেলিহান আযাব। আস্বাদ গ্রহণ করা বোঝাতে এখানে 'জুক্ব' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। রূপক অর্থে সকল অনুভূতিকে এই শব্দটির অন্তর্ভুত করা যায়। দুর্বল ব্যক্তিদের কাছ থেকে সুদ গ্রহণ করে ইহুদীরা এক ধরনের আনন্দানুভব করতো। তাদের এই আনন্দানুভূতির অনুকূলে ব্যাঙ্গার্থে তাই 'জুক্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'ইয়াদ' অর্থ হাত। আয়াতে এর বহুবচন হিসাবে 'আইদি' উল্লেখ করা হয়েছে। এই শব্দটির সরাসরি অর্থ গ্রহণ করা হলে, হাত সমূহের মাধ্যমে তারা যা অর্জন করেছে–এ রকম বলতে হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থ হবে 'কৃতকর্ম'। দহন যন্ত্রণা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যাচারী নন। অর্থাৎ কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তির অতিরিক্ততা তিনি করেন না।

আশায়েরাদের একটি সন্দেহমূলক মাসআলা ঃ আল্লাহতায়ালা সকল প্রকার মন্দ থেকে মুক্ত। জুলুম নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম। তাই তাঁর জন্য জুলুম থেকে পবিত্র থাকা জরুরী। জুলুম না করলে ইনসাফ করা আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়। ইনসাফের জন্য জরুরী পূণ্যের প্রতিদান এবং পাপের শাস্তি নিশ্চিত করা। এরকম দৃষ্টিভঙ্গি মোতাজিলাদের। তারা বলে ইনসাফ করতে অর্থাৎ সওয়াব ও আযাব দিতে আল্লাহতায়ালা বাধ্য। এরকম ধারণা সুন্নত জামাতের অন্তর্ভুত আশায়েরাদের বিশ্বাসবিরুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালা কোনোকিছু করতে বাধ্য নন। তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, তেমনই হয়। ঔচিত্য ও বাধ্যতাজ্ঞাপক সকল কিছু থেকে তিনি মুক্ত, পবিত্র।

জুলুম শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনোকিছুর স্থানচ্যুতি ঘটানো।হ্রাসবৃদ্ধি কিংবা পরিবর্তন পরিবর্ধন যেভাবেই হোক না কেনো। এভাবে কোনোকিছুর যথাঅধিকার ক্ষুন্ন করা আল্লাহর মর্যাদার জন্য শোভনীয় নয়। একথাও ভালোভাবে জেনে নেয়া দরকার যে, অপরাধ ব্যতিরেকেই যদি আল্লাহ পাক সমস্ত সৃষ্টিকে শাস্তিদান করেন, তবুও জুলুম হবে না। কারণ তিনি একক মালিক। তাঁর হস্তক্ষেপ তাঁর আপন মালিকানার ভিতরেই (অন্যের মালিকানায় হলে জুলুম হতো)। যার অস্তিত্ব অথবা সম্ভাবনা রয়েছে, তাকেই কেবল অপসারণ করা সম্ভব। তাই আল্লাহ্র জন্য জুলুম শব্দটির প্রয়োগই সম্ভব নয়। তবু এখানে তিনি জালেম নন — একথা উল্লেখ করা হয়েছে। যা নাই তা অপসারণ করার প্রশ্নও আসতে পারে না। কিন্তু কোনো

সিদ্ধান্তে পৌছতে গেলে চিন্তায় অনুমানকেও প্রশ্রয় দিতে হয়। এবং অনুমানকৃত বিষয়ও অপসারণযোগ্য বলে প্রমাণ করে দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হয়। মানুষের পারস্পরিক অধিকারক্ষুন্নতাকে বলে জুলুম। এ রকম জুলুম থেকে আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র। এ রকম অবস্থা আল্লাহ্‌তায়ালার সীমাহীন অনুগ্রহের নিদর্শন।

নবীগণকে যারা কষ্ট দিয়েছে অথবা হত্যা করেছে তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে আল্লাহতায়ালা বাধ্য নন, তবুও তা তিনি করবেন। কারণ নবীদের প্রতি রয়েছে তাঁর বিশেষ ফজল ও করম। তাঁর ইচ্ছা, তিনি তাঁদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। নবী হন্তারকদেরকে শাস্তি দিবেন। তাদেরকে (কাফেরদেরকে) শাস্তি না দেয়াই বরং জুলুম। তিনি তাঁর প্রকৃত বান্দাদের (নবীদের) প্রতিও জুলুম করবেন না। তাই তাঁদের শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, তাদেরকে আযাব দিবেন। — এই ব্যাখ্যাভঙ্গিতে নবীদের প্রশংসাও বর্নিত হয়েছে যে, তাঁরা আল্লাহর ইবাদত করেই পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। লাভ করেছেন বান্দা নামে অভিহিত হবার মহাসৌভাগ্য। তাঁদের কামালিয়াত লাভের অন্তর্নিহিত অর্থ এটাই। 'আল্লাহ দাসদের প্রতি জালিম নহেন' — একথার প্রকৃত অর্থ তিনি এমন জালিম নন যে,অবিশ্বাসী বান্দা কাফেরদেরকে শাস্তি না দিয়ে তাদের অধিকার নষ্ট করবেন অথবা হন্তারকদের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে বিশ্বস্ত বান্দা নবীদের অধিকার নষ্ট করবেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৮৩

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ○

❐ যাহারা বলে, 'আল্লাহ আমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে, আমরা যেন কোন রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সে এমন কুরবানী না করিবে যাহা অগ্নি গ্রাস করিবে,' তাহাদিগকে বল, 'আমার পূর্বে অনেক রসুল স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা সহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিল; যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কেন তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলে?'

গনিমতের মাল এবং কোরবানীর পশুর গোশত্ বনি ইসরাইলদের জন্য হালাল ছিলো না। পূর্ববর্তী শরিয়তের নির্দেশ ছিলো, গণিমতের সামগ্রী একত্রিত করে কোনো খোলা প্রান্তরে রেখে দিতে হতো। তখন আকাশ থেকে নেমে আসতো শাদা আগুন। ওই লেলিহান আগুন এসে গণিমতের সম্পদকে জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতো। এটা ছিলো জেহাদ কবুল হওয়ার নিদর্শন। আগুন নেমে আসবার সময় বাঘের গর্জনের মতো আওয়াজ শোনা যেত। আগুণ না নেমে এলে বুঝা যেতো জেহাদ কবুল হয়নি।

কালাবী বলেছেন, কাব বিন আশরাফ, মালেক বিন জয়িফ, ওয়াহাব বিন ইয়াহুদা, জায়েদ বিন তাবুত, ফাখখাজ বিন আজুর এবং হুয়াই বিন আখতাব রসুল স. এর নিকট হাজির হয়ে বললো, মোহাম্মদ! তুমি বলছো, আল্লাহ তোমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন। আর তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে তওরাত নির্দেশিত প্রমাণ দেখাও। তওরাতে বলা হয়েছে, যদি কেউ নবী হবার দাবী করে, তবে যতক্ষণ না সে তোমাদের সামনে এমন কোরবানী হাজির করে যা আকাশী আগুনে ভস্মীভূত হয়, ততক্ষন পর্যন্ত তোমরা তাকে বিশ্বাস করো না। এখন তুমি যদি তোমার কোরবানী আকাশী আগুন দ্বারা ভস্মীভুত হয়েছে দেখাতে পারো, তবে আমরা তোমার প্রতি ইমান আনবো।

ইমাম সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ পাক বনি ইসরাইলদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি কেউ নবী বলে দাবী করে তবে তাকে এমন কোরবানী উপস্থিত করতে বলো যা আগুন এসে গ্রাস করে। যদি সে তা না পারে তবে তাকে বিশ্বাস কোরো না। তবে হজরত ঈসা এবং হজরত মোহাম্মদ স. এর ব্যতিক্রম। তাদেরকে এ রকম প্রমাণ হাজির করতে হবে না। এই প্রমাণ ছাড়াই তাঁদেরকে মান্য করতে হবে।

ইহুদীদের এ রকম কুটতর্কের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীর মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন, তোমাদের উদ্দেশ্য অসৎ। স্পষ্ট প্রমাণকে অমান্য করা তোমাদের বৈশিষ্ট্য। ইতোপূর্বে এ রকম প্রমাণ তো সকল নবীই পেশ করেছিলেন, কিন্তু তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো। কোনো কোনো নবীকে হত্যা করতেও পিছপা হওনি (হজরত যাকারিয়া ও হজরত ইয়াহিয়া নবী প্রমাণ পেশ করা সত্ত্বেও তাঁরা তোমাদের হাতে নিহত হয়েছিলেন)। তোমরাও তোমাদের পূর্বপুরুষদের মতো। কপট ও অবিশ্বাসী। বিশ্বাস স্থাপনের পূর্বশর্ত হিসাবে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশকে মান্য করা নিশ্চয় তোমাদের অভিপ্রায় নয়। তাই যদি হতো তবে যাকারিয়া এবং ইয়াহিয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হতো। তোমাদের কথা সত্য নয়। তোমরা হিংসুক এবং বংশগৌরবে মগ্ন। আল্লাহ্র নির্দেশের কারণে নয় — হিংসা এবং গোত্র অহমিকার কারণেই তোমরা ইমান বিমুখ। তোমরা যা বলছো তা বাহানা মাত্র।

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝

❒ তাহারা যদি তোমার উপর মিথ্যা আরোপ করে, তোমার পূর্বে যে সব রসুল স্পষ্ট নিদর্শন, অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহ এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ আসিয়াছিল তাহাদের উপরও তো মিথ্যা আরোপিত হইয়াছিল।

এই আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে তাঁর প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদ স. কে সান্ত্বনা দিয়েছেন। বলেছেন, তাঁরাও পেশ করেছিলেন সুস্পষ্ট নির্দশন, প্রোজ্জ্বল কিতাব। ইহুদীদের অস্বীকৃতি বংশপরম্পরায় চলে এসেছে। তাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন ছিলো, এরাও তেমনি। তারা পূর্বে যেমন বিরুদ্ধাচরণ করতো, তেমনি এখনও করছে। এই বিরোধিতা নতুন নয়। তাই দুঃখ করবার কিছু নেই। আগের নবীরা যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, তেমনি এখনো ধৈর্য অবলম্বন করাই সমীচীন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৮৫

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

❒ জীব মাত্রই মরণশীল। কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হইবে। যাহাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সেই সফলকাম। এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছু নয়।

পৃথিবীর জীবন স্থায়ী নয়। সামনে এগিয়ে আসছে মৃত্যু। অনড়, অবিচল মৃত্যু। মানুষসহ সকল সৃষ্টির এ এক আমোঘ পরিণতি। এ বিধান সকলের জন্য।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, হাদিস শরীফে এসেছে, যখন আল্লাহ হজরত আদমকে সৃষ্টি করলেন, তখন পৃথিবী অনুযোগ উত্থাপন করলো, আদম সৃষ্টিতে

আমার অংশ নিয়ে নেয়া হলো। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিলেন, তোমার কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে, তা ফিরিয়ে দেয়া হবে। মৃত্যুর পর তাকে এবং তার সকল বংশধরকে তোমার অভ্যন্তরেই স্থাপন করা হবে।

পৃথিবী কর্মের স্থান। ফল প্রদান করা হবে মৃত্যুত্তোর জীবনে। বিনিময় দেয়া হবে যথানিয়মে। মন্দের বদলে মন্দ। ভালোর বদলে ভালো। বিশ্বাসীদের ধৈর্য ও আনুগত্য এবং অবিশ্বাসীদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যাচার — সবকিছুর পূর্ণবিনিময় দানের স্থান হিসাবে আখেরাতকেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে কিঞ্চিত প্রতিফল অবশ্য কখনো কখনো দুনিয়াতেও মিলবে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ বলেছেন, 'আমি ইব্রাহিমকে পৃথিবীতে বিনিময় দান করেছি। আখেরাতেও সে হবে সৎকর্মপরায়নদের অন্তর্ভূত।'

পৃথিবী ও আখেরাতের মধ্যবর্তী স্থান কবর। আখেরাতের বিনিময় লাভের প্রক্রিয়া শুরু হবে এই কবর থেকেই। হজরত আবু সাইদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কবর হবে জান্নাতের উদ্যানের মধ্য থেকে একটি উদ্যান অথবা দোজখের অগ্নিগহবরগুলোর মধ্য থেকে একটি গহবর।

পার্থিব জীবন প্রতারণা বৈ অন্য কিছু নয়। এখানকার সৌন্দর্য, সম্পদ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। অন্তরকে করে উদাসীন। দ্বিধা, সন্দেহ আর প্রচারনাপীড়িত এই পৃথিবী অনন্ত জীবনের বাস্তবতায় স্বপ্নের মতো ধুসর, অস্তিত্বহীন। পৃথিবী মগ্নরা সংকীর্ণ চিত্ত, অস্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন।

হজরত কাতাদা বলেছেন, এই আয়াতের শেষ শব্দটির (গুরূর) অর্থ বাতিল। দুনিয়া অন্যের জন্য রেখে চলে যেতে হয়। পার্থিবতা অপসৃত হবে শ্রীঘ্রই। তাই পার্থিব জীবনে তোমরা আল্লাহর আনুগত্যকে আশ্রয় করো।

হাসান বসরী বলেছেন, দুনিয়া তৃণগুল্মাদির সজীবতার মতো (সাময়িক)। কিশোর কিশোরীদের ক্রীড়াকর্মের মতো (অস্থায়ী)।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, আমি পুণ্যবানদের জন্য দর্শনাতীত এবং শ্রবণাতীত নেয়ামতসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছি,যা উপলব্ধিতেও ধারণ করা যায় না। প্রমাণ চাইলে পাঠ করো 'ফালা তা'লামু নাফ্সুম মা উখ্ফিয়ালাহুম মিন কুররতি আইয়ুনিন জাযা আম বিমা কানূ ইয়া'মালূন।' জান্নাতের একটি বৃক্ষের বিস্তৃতি এমন যে, একশ বছর ভ্রমণ করেও সেই বৃক্ষছায়ার সীমানা অতিক্রম করা যায় না। যদি প্রমাণ চাও তবে পড়ো — 'ওয়া জিল্লিম মামদূদ।' সুবিস্তৃত ছায়া থাকবে সেখানে। জান্নাতের যষ্টি পৃথিবী ও পার্থিবতা থেকে শ্রেয়। যদি চাও তবে পড়তে পারো — 'ফামান জুহ্জিহা আনিন্নার ওয়া উদ্খিলাল জান্নাতা ফা কদ্ব ফাজা।' বাগবী। অন্য সনদে বোখারী, মুসলিম।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۚ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۚ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○

❒ তোমাদিগকে নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে। তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের এবং অংশীবাদীদের নিকট হইতে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনিবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সাবধান হইয়া চল তবে উহা হইবে কর্মে দৃঢ় সংকল্প।

পৃথিবী পরীক্ষার স্থান। এখানের বিত্তবৈভব এবং জীবনসম্পৃক্ততার বিভিন্ন সূত্র থেকে নেমে আসবে অনেক বিপদ। এখানে নামাজ রোজা হজ জাকাত এবং জেহাদ সম্পাদনের তিক্ত দায়িত্বকে যেমন নির্বিবাদে বরণ করে নিতে হবে, তেমনি ধৈর্যের সঙ্গে মেনে নিতে হবে কখনো কখনো সম্পদ বিনষ্টিকে, ব্যবসার অসফলতাকে। বুক পেতে নিতে হবে নিরাময়যোগ্য অথবা নিরাময়রহিত রোগব্যধিজনিত অসহায়ত্বকে। স্বজনহারানোর শোককে। তদুপরি শুনতে পাবে মর্মবিদারক বাক্যাবলী আহলে কিতাবদের। কখনো মুশরিকদের। ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, অপবাদ – অনেক কিছুই মেনে নিতে হবে বিশ্বাসবানদেরকে। সুতরাং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। ত্যাগ তিতিক্ষায় অটল থাকতে হবে।

ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম তাঁদের গ্রন্থে উত্তম সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এ রকম, এই আয়াতের শানে নুজুল ওই ঘটনাটি যা সংঘটিত হয়েছিলো হজরত আবু বকর এবং ফাখখাজ ইহুদীর মধ্যে। ফাখখাজ বলেছিলো, আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনী। ইকরামা, মুকাতিল, কালাবী এবং ইবনে জারীহ্ও এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, রসুল স. হজরত আবু বকরকে বনু কায়নুকার সর্দার ফাখখাজ বিন আজুরার নিকট একটি চিঠিসহ প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিলো কিছু সম্পদ সংগ্রহ করা। হজরত আবু বকরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তিনি যেনো উত্তেজিত না হন। তিনি গলায় একটি তলোয়ার ঝুলিয়ে ফাখ্খাজ এর নিকট গেলেন এবং বরকতপূর্ণ চিঠিটি দিলেন। চিঠি পড়ে ফাখখাজ বললো, এখন তোমাদের প্রতিপালক আমাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা শুনে হজরত আবু বকর তাকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করতে চাইলেন কিন্তু রসুল স. এর নির্দেশ স্মরণ করে সংযত হলেন। তিনি ফিরে এলেন। তখন নাজিল হলো এই আয়াত।

আবদুর রাজ্জাক জুহুরীর বর্ণনা থেকে আবদুল্লাহ বিন ক্বাব বিন মালেকের উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম, এই আয়াত নাজিল হয়েছে কাব বিন আশরাফ সম্পর্কে। সে তার কবিতায় রসুল স.কে বিদ্রুপ করতো এবং মুসলমানদেরকে গালি দিতো। কবিতার মাধ্যমে সে রসুল স. ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে উত্তেজিত করে তুলতো।

আমি বলি, ঘটনাটি বদর যুদ্ধের পরের। কাব যখন দেখলো, তার চোখের সামনে কোরাইশদের বড় বড় নেতারা মারা গেলো, তখন সে মক্কায় চলে গেলো। মুশরিকদেরকে একত্রিত করে পুনরাক্রমণের জন্য প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হলো সে। কোরাইশরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, বলো। আমাদের দল সত্যানুসারী না মোহাম্মদের দল? সে বললো, তোমাদের দল। কবিতার জবাব কবিতার মাধ্যমে দেয়াই সমীচীন। রসুল স. তাই হজরত হাস্‌সানকে কবিতার মাধ্যমে জবাব দিতে নির্দেশ দিলেন। হজরত হাস্‌সান কাবের ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপের উপযুক্ত জবাব দিলেন। বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কাব বিন আশরাফ তার কবিতার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে দুঃখ দিয়েছে এবং মুশরিকদেরকে উদ্দীপিত করেছে। তাকে হত্যা করতে পারবে কে? মোহাম্মদ বিন মোসলেমা বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এই খেদমত সম্পাদন করবো আমি। তিনি আমার মামা। আমিই তাকে হত্যা করবো। রসুল স. বললেন, তথাস্তু।

মোহাম্মদ বিন মোসলেমা নিজ গৃহে ফিরে এলেন। পানাহার পরিত্যাগ করলেন তিনি। তিনদিন অতিবাহিত হলো এভাবে। রসুল স. তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি পানাহার ছেড়ে দিয়েছো কেনো? তিনি বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি চিন্তিত — কৃত অঙ্গীকারটি পূর্ণ করতে পারবো কিনা। রসুল স. বললেন, চেষ্টা করাই তোমার কাজ। সা'দ বিন মুআজ এর সাথে মতবিনিময় করো। নির্দেশমতো তিনি হজরত সা'দের সাথে পরামর্শ করলেন। সা'দ বললেন, তুমি তার নিকট গিয়ে ধার হিসাবে কিছু খাদ্যসামগ্রী চাও।

কাবকে হত্যা করার জন্য ছোট একটি দল প্রস্তুত হলো। মোহাম্মদ বিন মোসলেমার সঙ্গে যোগ দিলেন ওবাদ বিন বিশর, আবু নায়েলা, সুলকান বিন সালামা, হারেস বিন আবাস এবং হারেস বিন আউস বিন মুআজ। তাঁরা মিলিত হলেন আবু আবাস বিন হিবরের সঙ্গে। সকলে মিলে রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁরা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমরা কাবকে হত্যা করতে গিয়ে কৌশল অবলম্বনার্থে আপনার বিরুদ্ধে কিছু অসঙ্গত কথা উচ্চারণ করতে পারি – এ ব্যাপারে আমাদেরকে অনুমতি দিন। রসুল স. বললেন, ঠিক আছে। যা প্রয়োজন হয় বোল। তখন সকলে মিলে প্রথমে পাঠালেন আবু নায়েলাকে। আবু নায়েলা ছিলেন কবি। কাব্যসূত্রে তিনি কাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কবিতা বিষয়ক

আলোচনা জুড়ে দিলেন। দুই কবি কিছুক্ষণ তাদের কবিতাপরস্পরকে আবৃত্তি করে শোনালেন। এরপর আবু নায়েলা বললেন, আমি তোমার কাছে এসেছি এক কাজে। কিন্তু আগে কথা দাও ব্যাপারটা গোপন রাখবে? কাব বললো, ঠিক আছে। আবু নায়েলা বললেন, আমাদের হয়েছে এক মুসিবত! এমন এক ব্যক্তি আমাদের এখানে এসেছে, যার জন্য সমগ্র আরব দেশই আমাদের শত্রু। সকলের সঙ্গেই আমরা সম্পর্কচ্ছিন্ন। ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে আমাদের পরিবার পরিজনেরা। কাব বললো, আমি তো আগেই বলেছি, শেষ পর্যন্ত এরকমই হবে। আবু নায়েলা বললেন, আমার সঙ্গী রয়েছে আরো কয়েকজন। আমরা তোমার কাছে খাদ্য কিনতে এসেছি। এর জন্য আমরা বন্ধক রাখতে প্রস্তুত। কাব বললো, তোমাদের সন্তানদেরকে বন্ধক রাখো। আবু নায়েলা বললেন, এরকম বন্ধক রাখাতো অত্যন্ত লজ্জাকর। বরং পরিশোধের সময় আমরা এক ওসকের বিনিময়ে দুই ওসকের বন্ধক রাখলাম। কাব বললো, তবে তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখো। আবু নায়েলা বললেন, তা কি করে সম্ভব! তুমি আরবদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত, সুপুরুষ। তোমার সৌন্দর্য দেখে কোনো মহিলাই আত্মসংবরণ করতে পারবে না। আমরা বরং আমাদের যুদ্ধাস্ত্রগুলো বন্ধক রাখবো। তুমি তো জানোই অস্ত্রের প্রয়োজন আমাদের কতোটুকু। কাব বললো, আচ্ছা। আবু নায়েলা তাঁর দলের নিকট ফিরে এলেন। এই কৌশলটিকে পছন্দ করলেন সকলে। তাঁরা রসুল স.কে পূর্ণ ঘটনা জানালেন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক এবং ইমাম আহমদ বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের বিবরণ উল্লেখ করেছেন এরকম, রাত্রিকালে রসুল স. এই দলটিকে বাকীয়ে গারকাদ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বললেন, আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাও। হে আল্লাহ, তুমি এদেরকে সাহায্য করো।

চৌদ্দই রবিউল আউয়ালের রাত্রি। চরাচর জুড়ে জ্যোস্নার প্লাবন। রসুল স. ফিরে এলেন। সাহাবীদের ক্ষুদ্র দলটি চললেন কাব বিন আশরাফের গৃহাভিমুখে। আবু নায়েলা বললেন, আমি কাবের মাথার চুল যখন শক্ত করে ধরবো, তখন তোমরা তরবারী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপরে। কাবের বাড়িতে পৌঁছে আবু নায়েলা ডাক দিলেন। নতুন বিবাহিত কাব ডাক শুনে চাদর মুড়ি দিয়ে উঠে পড়লো। তার স্ত্রী তার চাদরের কোনা ধরে টেনে বললো, তুমি একটা জংলী। জংলী না হলে কেউ এসময়ে বের হয়। আমার তো ভয় করছে। বাইরে বেরিও না। ঘরে থেকেই তুমি তাদের সাথে কথা বলো। কাব বললো, আমি তাদের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আর ওরাতো আমার আত্মীয়ই। মোহাম্মদ বিন মোসলেমা আমার ভাগ্নে আর আবু নায়েলা আমার দুধ ভাই। তারা আমাকে ডেকে তুলবেই। আর এরকম নেতিবাচক আচরণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জন্য অশোভন। চাদর বেষ্টিত কাব

বাইরে বেরিয়ে এলো। তার চাদর থেকে ছড়িয়ে পড়ছিলো সুঘ্রাণ। আবু নায়েলার দল বললেন, চলো। শোয়াবে আজুয পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে যাই। ওখানে বসেই কথাবার্তা বলি। কাব বললো, চলো। আবু নায়েলা বললেন, খুব সুঘ্রাণ যে! কাব বললো, আরবের সর্বাপেক্ষা রূপসী রমনী এখন আমার স্ত্রী। আবু নায়েলা বললেন, অনুমতি হলে আমি একটু সুবাস নেই। কাব বললো, নাও। আবু নায়েলা কাবের মাথায় হাত রাখলেন এবং হাতে খুশবু মেখে নিয়ে বললেন, এই রাতের মতো এতো সুগন্ধ আর কোনোদিন পাইনি। কাব ছিলো সুদর্শন। মাথায় ছিলো কোঁকড়ানো চুল। মেশকের পানির সঙ্গে আম্বর মিশিয়ে কানে পিঠে লাগাতো সে। আবু নায়েলা চলতে চলতে বারবার তার মাথায় হাত ঘষে ঘষে সুঘ্রাণ নিচ্ছিলেন। একসময় অতর্কিতে তিনি তার চুল মজবুতভাবে ধরে ফেললেন এবং সাথীদেরকে বললেন, আল্লাহর দুশমনকে হত্যা করো। উপর্যুপরি চললো তলোয়ারের আঘাত। মোহাম্মদ বিন মোসলেমা বলেছেন, আমি আমার কোষাবদ্ধ ধারালো খঞ্জরটি বের করলাম। কাব খুব জোরে চিৎকার করে উঠলো। তার চিৎকার শুনে আশপাশের ঘরগুলোতে আলো জ্বলে উঠলো। আমি আমার খঞ্জরটি আমূল বিদ্ধ করে দিলাম তার পেটে। মাটিতে পড়ে গেলো খঞ্জরবিদ্ধ কাব। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, আবু আবাস কাবের বগলে আঘাত করলেন। অন্য সকলে কেটে নিলেন তার মাথা। একটি আঘাত এসে লাগলো হারেস বিন আউস বিন মুআজের মাথায়। পাহারারত ইহুদীদের ভয়ে আমরা দ্রুত চলে আসছিলাম। রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো হারেস বিন আউসের মাথা থেকে। কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিলেন তিনি। তিনি বলে উঠলেন, রসুল স. এর নিকট আমার সালাম পৌছে দিও। তাঁর কথা শুনে অন্য সকলে পিছিয়ে এলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চললেন রসুল স. এর খেদমতে। বাকীয়ে গারকাদ যখন তারা পৌছলেন, তখন রাত্রি প্রায় শেষ। তাঁরা সমস্বরে উচ্চারণ করলেন, আল্লাহু আকবর। রসুল স. তখন নামাজ পড়ছিলেন। তকবীর ধ্বনি শুনে তিনিও তকবীর উচ্চারণ করলেন। বুঝলেন, কাবকে হত্যা করা হয়েছে। একটু পরেই তাঁরা মসজিদে নববীতে পৌছে দেখতে পেলেন, রসুল স. দরোজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি স. বললেন, তোমাদেরকে খুব খুশী দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা বললেন, হে রসুল স.! আপনাকেও আমরা আনন্দচিত্ত দেখছি। তাঁরা কাবের মস্তক রেখে দিলেন রসুল স. এর সামনে। তিনি স. আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। আহত হারেসের জখমের উপর তিনি তাঁর পবিত্র থুথু লাগিয়ে দিলেন। জখম যন্ত্রনা চলে গেলো তৎক্ষণাৎ। আপনাপন গৃহে ফিরে গেলেন সকলে।

সকাল হলো। রসুল স. বললেন, ইহুদীদেরকে হত্যা করো — যাকে হাতের কাছে পাও। মাহিসা বিন মাসউদ হত্যা করলেন ইহুদী ব্যবসায়ী শাগিনাকে।

মাহিসার ভাই খাভিসা ছিলো কাফের। তারা দুজনই ছিলো ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত। খাভিসা বললো, তুমি শাগিনাকে মারলে কেনো? আল্লাহর কসম! তোমার পেটের অধিকাংশ চর্বি তার সম্পদ থেকে সৃষ্ট। মাহিসা বললেন, আল্লাহর কসম! ভ্রাতৃহন্তার হুকুম পেলে আমি তোমাকেও হত্যা করবো। খাভিসা বললো, মোহাম্মদের হুকুমে তুমি তোমার ভাইকেও হত্যা করবে! মাহিসা বললেন, হ্যাঁ। খাভিসা বললো, আশ্চর্য! মোহাম্মদের দ্বীন তোমাকে এতোদূর পৌঁছে দিয়েছে! এরপর খাভিসাও মুসলমান হয়ে গেলেন। কাব নিহত হওয়ার পর ইহুদীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলো। তাদের নেতারা অবনত হলো। ষড়যন্ত্র ও শত্রুতা থেকে বিরত হলো তারা।

ইবনে সা'দ বলেন, ইহুদীরা ভীত হলো। তারা রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, আমাদের সরদারকে অজ্ঞাতসারে হত্যা করা হয়েছে। রসুল স. কাবের অসৎ আচরণের বিবরণ দিলেন। সে মক্কার মুশরিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেছে। কাব্য চর্চার নামে দুঃখ দিয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে। রসুল স. তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। একটি সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করা হলো। সন্ধিপত্রটি তিনি গচ্ছিত রাখলেন হজরত আলীর কাছে।

মাসআলা ঃ ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যদি কেউ রসুল স. কে গালি দেয়, অসম্মানজনক উক্তি করে অথবা অন্য কোনো উপায়ে দুঃখ দেয় তবে তাকে হত্যা করা বৈধ। সে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাক অথবা নাই থাক। ইমাম আবু হানিফা বলেন, সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কেউ রসুল স.কে গালি দিলে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। তাঁকে স. গালি দেয়া কুফরী। এবং কাফেরদের সঙ্গে সন্ধি বৈধ (সন্ধি তো পূর্বাহ্নেই হয়) তবে কাবের হত্যাকান্ডটি এই কারণে যে, সে ছিলো সন্ধির অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সহায়তা দান করা হবে না এরকম সন্ধিপত্র পূর্বাহ্নেই সম্পাদিত থাকা সত্ত্বেও সে মক্কায় গিয়ে মুশরিকদেরকে রসুল স. বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেছিলো।

মাসআলা ঃ এই হত্যাকান্ডের জন্য মোহাম্মদ বিন মোসলেমা এবং আবু নায়েলাকে বিশ্বাসঘাতক বলা বৈধ নয়। হজরত আলীর মজলিসে এক ব্যক্তি এরকম বলতেই তিনি তাকে কতল করেছিলেন। নিরাপত্তার অঙ্গীকার দেয়ার পর হত্যা করলেই কেবল বিশ্বাস ঘাতকতার প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু এখানে মোহাম্মদ বিন মোসলেমা এবং তাঁর সঙ্গীগণ নিরাপত্তা দানের অঙ্গীকার করেননি। তাঁদের কথাবার্তা ছিলো খাদ্য ক্রয় এবং বন্ধক দান সম্পর্কিত।

জ্ঞাতব্য ঃ বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, কাবের সঙ্গে কথা বলেছিলেন মোহাম্মদ বিন মোসলেমা। কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনাকারী বলেছেন, আবু নায়েলা কথা বলেছিলেন

তার সাথে। সামঞ্জস্য সাধনার্থে একথা বলা যেতে পারে যে, দু'জনই ছিলেন কাবের সঙ্গে কথোপকথনকারী।

আয়াতের শেষে সবর ও তাকওয়ার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি হয় সবর ও তাকওয়ার মাধ্যমেই। কর্মে দৃঢ়সংকল্প মূলতঃ ধৈর্য ও সাবধানতারই সমীভূত পরিনাম। আতা বলেছেন, 'আজমিল উমুর' (দৃঢ় সংকল্প) অর্থ প্রকৃত ইমান।

আমি বলি, সবর অর্থ পরীক্ষাক্ষণে অসতর্ক না হওয়া, আনুগত্যশীলতা বজায় রাখা এবং আপতিত বিপদে আক্ষেপ না করা। কিন্তু অনিষ্ট করতে উদ্যত কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা সবর বিরোধী নয়। যেমন কাব বিন আশরাফের এই ঘটনা।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৮৭

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ○

❒ স্মরণ কর, যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল আল্লাহ তাহাদের প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন 'তোমরা উহা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবে এবং উহা গোপন করিবে না;' ইহার পরও তাহারা উহা অগ্রাহ্য করে ও স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে' সুতরাং তাহারা যাহা ক্রয় করে তাহা কত নিকৃষ্ট।

হজরত কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ আলেমদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যা জানো তা অন্য লোককে জানাও। কোনো কিছু গোপন করো না। ইল্‌মকে গোপন করলে ধ্বংস অনিবার্য।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আল্লাহ্ আহলে কিতাবদের নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমি তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করি তা গোপন কোর না। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। পুনরায় বললেন, যে তার জ্ঞানকে গোপন করবে কিয়ামতের দিন তার মুখে লাগিয়ে দেয়া হবে আগুনের লাগাম। বিশুদ্ধ সূত্রে এই বর্ণনাটি পেশ করেছেন আহমদ ও হাকেম। ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন হজরত আনাস থেকে। বাগবী লিখেছেন, হাসান বিন আম্মারা বর্ণনা করেন, হাদিস বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছেন জেনেও জুহুরীর নিকট গেলাম।

বললাম, উত্তম মনে করলে আমার নিকট কোনো হাদিস বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, একথা কি তুমি জানো না, আমি আর হাদিস বর্ণনা করিনা? আমি বললাম, জানি। তবুও আমার ইচ্ছা, আপনি একটি হাদিস বর্ণনা করুন। আমিও একটি হাদিস বর্ণনা করবো আপনার নিকটে। তিনি বললেন, বলো। আমি বললাম, আমার কাছে হাকাম বিন উয়াইনা ইয়াহিয়া জাযারের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, জাযার বলেন, আমি হজরত আলীর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ জাহেলদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনের অঙ্গীকার ততোক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করবেন না, যতোক্ষণ না গ্রহণ করবেন আলেমদের অঙ্গীকার। এরপর জুহরী আমার কাছে চল্লিশটি হাদিস বললেন। সা'লাবী তাঁর তাফসীরের মধ্যে এই হাদিসটি হারেসের সূত্রে আবু ওসামার বর্ণনা থেকে লিখেছেন। মসনাদে ফেরদাউস গ্রন্থে হজরত আলী এই হাদিসটি মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৮৮, ১৮৯

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ ع

❒ যাহারা নিজেরা যাহা করিয়াছে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যাহা নিজেরা করে নাই এমন কার্যের জন্য প্রশংসিত হইতে ভালবাসে তাহারা শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে এরূপ তুমি কখনও মনে করিও না। তাহাদের জন্য মর্মন্তদ শাস্তি রহিয়াছে।

❒ আসমান ও জমিনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহেরই; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

মুনাফিকের স্বভাব এই যে, তারা বিভ্রান্তি, ধোকা, সত্যগোপন ইত্যাকার গোনাহ্ অবলীলায় করে যায়। অপরাধবোধ ও অনুতাপ বলে তাদের কিছু নেই। এরা অন্যায় সম্পাদনের পরও পরিতুষ্ট থাকে। তাদের মুখে বিশ্বাস, অন্তরে অবিশ্বাস। আবার তারা এটাও চায় যে, তাদের মৌখিক বিশ্বাস এবং বাহ্যিক আনুগত্যকে গ্রহণ করা হোক, এজন্যে তাদের প্রশংসাও করা হোক। এই আয়াতে আল্লাহতায়ালা তাদের মুখোশ উন্মোচিত করে দিয়েছেন। তাঁর প্রিয় রসুলকে জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের বর্তমান অবস্থা যাই হোক, ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। কপটতার জন্য মহাশাস্তি অপেক্ষা করছে তাদের জন্য।

বোখারী ও মুসলিম, হামিদ বিন আব্দুর রহমান বিন আউফের মাধ্যমে এবং বাগবী, বোখারী সূত্রে আলকামা বিন ওয়াক্কাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, মারওয়ান তাঁর দরবার থেকে অন্য এক স্থানে গিয়ে হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা তো সকলেই আপনাপন কর্মকান্ডে পরিতুষ্ট। আর আমরা এ রকমও চাই যে, সৎকার্যের মূল্যায়ন হোক। তবে কি আমাদেরকেও শাস্তি দেয়া হবে?' ইবনে আব্বাস বললেন, এই আয়াতের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কোথায়? মুনাফিকদের একটি ঘটনা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এই আয়াত। একবার রসুল স. ইহুদীদের নিকট কতিপয় প্রশ্ন করলেন। তারা সঠিক জবাব না দিয়ে অন্য কথা বললো। এভাবে আল্লাহর রসুলকে ধোকা দিতে পেরেছে ভেবে তারা খুশী হলো খুব। আবার সঠিক জবাব দিয়েছে বলে প্রশংসাও পেতে চাইলো। এ পর্যন্ত বলে হজরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতটি পাঠ করলেন।

বোখারী ও মুসলিম হজরত আবু সাইদ খুদরী থেকে লিখেছেন, কতিপয় মুনাফিকের অভ্যাস ছিলো এমন — তারা যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসে থাকতো। এভাবে বাহানা করে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি লাভ করে তারা খুশী হতো খুব। রসুল স. জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর কাছে কসম খেয়ে নানা ওজর আপত্তি পেশ করতো তারা। আবার আশা করতো, ওজর না থাকলে তারা যুদ্ধযাত্রা করতে পিছপা হতো না, যুদ্ধের খাঁটি উদ্দেশ্য তাদের ছিলো, তাই তাদের প্রশংসা করা হোক। সাহাবীগণ যুদ্ধ করে যে প্রশংসাভাজন হয়েছেন, যুদ্ধ না করেই মুনাফিকরা সেই প্রশংসার দাবীদার হতো। তাদের এহেন আচরনের পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আবদ তাঁর তাফসীরে জায়েদ বিন আসলামের বর্ণনা থেকে লিখেছেন, মারওয়ানের দরবারে উপস্থিত ছিলেন হজরত রাফে বিন খাদীজ এবং জায়েদ বিন ছাবেত। মারওয়ান জিজ্ঞাস করলেন, এই আয়াত কার শানে নাজিল হয়েছে? হজরত রাফে বললেন, কতিপয় মুনাফিক জেহাদ থেকে বিরত থাকতো। তারা বলতো, আমরা আন্তরিকভাবে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু বিশেষ কারণে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ওই মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এই আয়াত। এই জবাব মারোয়ানের মনঃপুত হলো না। তিনি জায়েদ বিন ছাবেতকে বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি আপনি কি বিষয়টি জানেন? হজরত জায়েদ বললেন, হ্যাঁ। বিষয়টি এরকমই।

উপরে বর্ণিত দুটি ঘটনাই এই আয়াত নাজিলের কারণ। মদীনার ইহুদী এবং মুশরিক উভয় শ্রেণীর মুনাফিকদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে এই আয়াত। এভাবেই ঘটনা দু'টির সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে।

ফারা বলেছেন, ইহুদীরা বলতো, আমরা আগে থেকেই বিশ্বাস, সালাত ও আনুগত্য নিয়ে আছি। তারা এরকম বলতো বটে, কিন্তু রসুল স.এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতো না। তাদের কারণেই এই আয়াত নাজিল হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম বিভিন্ন সূত্রে তাবেয়ীনদের একটি দল থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাটিও এই আয়াত নাজিলের আর একটি কারণ হওয়াতে কোনো বাধা নেই।

বাগবী হজরত ইকরামার মাধ্যমে লিখেছেন, এই আয়াত ফাখখাজ এবং অন্য একজন ইহুদী আলেম আশাইয়া'র সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা আলেম বলে গর্ববোধ করতো এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করতো।

মুজাহিদ বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের বিশেষ মর্যাদার কথা শুনে ইহুদীরা আনন্দিত হতো,কিন্তু প্রকৃত অর্থে তারা তাঁকে মানতো না। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, খয়বরের ইহুদীরা রসুল স. এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললো, আমরা আপনাকে চিনি এবং মান্য করি। মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। আমরা তাদের সাহায্যকারী। মুসলমানেরা তাদের ছলছাতুরী ধরতে পারতেন না বলে তাদের প্রশংসা করতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। বলতেন, তোমরা ঠিকই বলেছো। ওই সমস্ত ইহুদীদেরকে চিহ্নিত করতেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আসমান ও জমিনের নিরঙ্কুশ আধিপত্য কেবল আল্লাহর। বৃষ্টিপাত, রিজিক বন্টন, শস্যোৎপাদন, খনিজ সম্পদ — সব কিছুই তাঁর অধিকারাধীন। তাই তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন। যেমন ইচ্ছা হুকুম জারী করতে পারেন।

আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। অবিশ্বাসী কপটদেরকে শাস্তিদান করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। একথা বলে ইহুদীদের ন্যাককারজনক উক্তি 'আল্লাহ ফকির' - এর জবাব দেয়া হয়েছে।

তিবরানী এবং ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করলো, হজরত মুসা কী মোজেজা নিয়ে এসেছিলেন? ইহুদীরা বললো, লাঠি এবং শুভ্র হস্ত। এরপর কোরাইশরা গেলো খৃষ্টানদের কাছে। বললো, হজরত ঈসা কী মোজেজা নিয়ে এসেছিলেন? খৃষ্টানেরা বললো, তিনি জন্মান্ধকে চক্ষু দান করতেন, কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করতেন এবং মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। তাদের কথা শুনে কুরাইশরা এসে উপস্থিত হলো রসুল স. এর কাছে। আবেদন জানালো, দোয়া করুন, আল্লাহ যেনো আমাদের জন্য এই সাফা পাহাড়কে সোনার পাহাড় বানিয়ে দেন। রসুল স. দোয়া করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯০

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

❒ আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রি পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে বোধ শক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য;

আকাশ পৃথিবীর সকল সৃষ্টি ছিলো অস্তিত্বহীন। তিনিই এ সবকিছুকে অনস্তিত্বতা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। এটা তাঁর অপার মাহিমা ও ক্ষমতার নিদর্শন। এ এক অসীম বিস্ময়। দিনরাত্রির বিবর্তনও তেমনি। এ সমস্ত কিছু হচ্ছে আল্লাহতায়ালার পূর্ণত্ব, জ্ঞান, পরাক্রম ও অভিপ্রায়ের প্রমাণ। এই প্রমাণ বুঝতে পারেন কেবল তাঁরাই যাঁরা প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিমান, যাঁরা প্রবৃত্তিপ্রসুত ধারণা এবং শয়তানী কুমন্ত্রণামুক্ত।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আক্ষেপ তাদের প্রতি যারা এই আয়াত পাঠ করে কিন্তু এ বিষয়ে গবেষণা করেনা। এই হাদিসটি সিহাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আখরাজা বিন হাব্বান।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক রাতে আমি রসুল স. এর গৃহে শয়ন করলাম। দেখলাম, তিনি স. ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক করলেন। অজু করলেন এবং 'ইন্না ফী খলক্বিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' শেষ পর্যন্ত পড়লেন। তারপর দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। নামাজের কেয়াম, রুকু ও সেজদা করলেন অনেকক্ষণ ধরে। নামাজ শেষে শুয়ে পড়লেন তিনি। নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর জেগে উঠে আবার আগের মতো মেসওয়াক, অজু, তেলাওয়াত ও নামাজ পড়লেন। আবার শুয়ে পড়ে নিদ্রাভিভুত হলেন। তৃতীয় বারও এ রকম করলেন। এই নিয়মে মোট ছয় রাকাত নামাজ পড়লেন তিনি।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯১

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

❒ যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টির সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা অনর্থক সৃষ্টি করো নাই, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদিগকে অগ্নি শাস্তি হইতে রক্ষা করো।'

জ্ঞানীগণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে — তাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর স্মরণমগ্ন থাকেন। সার্বক্ষণিক জিকির, ফিকির, তাসবীহ, ইস্তেগফার, দোয়া, বিনয় — ইমানের ও জ্ঞানের পরিচয়। যারা এই বৈশিষ্ট্যাবলীবিমুক্ত তারা চতুস্পদ জন্তু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ চতুস্পদ জন্তুরাও তাদের নিজস্ব নিয়মে তাসবী পাঠ করে।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস, নাখয়ী এবং কাতাদার অভিমত, এই আয়াতের জিকির অর্থ নামাজ – দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া, না পারলে বসে, তাও না পরলে শুয়ে। এর সমর্থনে রয়েছে সুরা নিসার ওই আয়াতটি যেখানে বলা হয়েছে, 'যখন তোমরা নামাজ সম্পন্ন করো তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণে রাখো দাঁড়ানো অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায়।

হজরত ইমরান বিন হোসাইন বলেন, আমি রসুল স. কে অসুস্থ ব্যাক্তির নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি স. বললেন, দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো,́ না পারলে বসে পড়ো। তাও না পারলে শুয়ে নামাজ পড়ো। বোখারী, আসহাবে সুনানে আরবা। নাসাঈ এই হাদিসের সঙ্গে সংযোজন করেছেন, শুয়ে কাত হয়ে না পড়তে পারলে চিৎ হয়ে পড়ো। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যবহির্ভূত নির্দেশ দেন না।

হজরত আলী বর্ণনা করেন, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে চেষ্টা করবে। না পারলে বসে নামাজ পড়বে। সেজদা আদায় করতে সক্ষম না হলে ইশারায় সেজদা করবে। সেজদার ইশারা রুকু অপেক্ষা অধিক নত হয়ে করবে। বসতে সক্ষম না হলে ডান কাত হয়ে কেবলার দিকে মুখ করে শুয়ে নামাজ পড়বে। এ রকম না পারলে পা কেবলার দিকে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ পাঠ করবে। দারা কুতনি। এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারীর নাম হোসাইন বিন জায়েদ — ইবনুল মাদিনী তাকে দুর্বল বলেছেন। অন্য আরেক বর্ণনাকারী হাসান বিন হাসান মাতরুক (অনির্ভরযোগ্য)। এই হাদিসের প্রেক্ষিতেই ইমান শাফেয়ী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, রোগী ব্যক্তি দাঁড়াতে অসমর্থ হলে বসে-বসতে না পারলে ডান কাতে শুয়ে-তাও না পারলে কেবলার দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ইশারায় রুকু সেজদা আদায় করে নামাজ সম্পন্ন করবে।

ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদের অভিমতও প্রায় এরকমই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ডান কাতে শুতে অক্ষম হলে চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ আদায় করতে হবে। আর ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে ডান কাতে শোয়ার ক্ষমতা থাকা সত্বেও চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ আদায় করতে পারবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বসতে অক্ষম হলে কেবলার দিকে পা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ আদায় করবে। চিৎ হতে না পারলে ডান কাতে শুয়ে নামাজ পড়তে পারবে। তিনি আরো বলেছেন, এই আয়াতে কিংবা সুরা নিসার উপরোল্লিখিত

আয়াতে রোগীদের নামাজের কথা বলা হয়নি। সাধারণ তাফসীরকারদের মত এই যে, সার্বক্ষণিক জিকিরের কথা বলা হয়েছে এই আয়াতে। কেননা সকল সময় মানুষ দাঁড়ানো, বসা কিংবা শোয়া অবস্থাতেই থাকে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের বাগানে পরিভ্রমণ করতে পছন্দ করে, সে যেন আল্লাহর জিকির অত্যাধিক পরিমাণে করে। হাদিসটি হজরত মুয়াজ থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা এবং তিবরানী।

একথা যদি মেনেও নেয়া যায় যে, আয়াতটি রোগীদের নামাজ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, তবুও এখানে চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ পড়াতে কোনো বাধা নেই। ইমাম শাফেয়ী বর্ণিত নিয়ম এখানে সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয় না। ইবনে হুম্মাম হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইমরানের ফোঁড়া হয়েছিলো। হাদিস শরীফে চিৎ হয়ে শোয়ার বর্ণনা ছিলোনা বলে তিনি চিৎ হয়ে শুতে পারতেন না। তাই তাঁর বর্ণনায় চিৎ হয়ে শোয়ার কথা আসেনি। তবে নাসাঈ বর্নিত হাদিসের সূত্র সঠিক প্রমাণিত হলে অবশ্য ইমাম শাফেয়ীর দলিল মজবুত হতে পারে। হজরত আলীর মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসের সূত্রশৃংখলে দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে – তাই এ হাদিসটিও দলিল বলে গ্রহণীয় হতে পারে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, চিৎ হয়ে শুতে হবে। না পারলে কাত হয়ে নামাজ পড়বে। কারণ তাঁর মতে, নামাজে রুকু সেজদার গুরুত্ব অত্যধিক। তিনি বলেছেন, যে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু রুকু সেজদা করতে সমর্থ নয়, তার পক্ষে বরং বসে নামাজ পড়াই উত্তম। কারণ উপবিষ্ট অবস্থার ইশারা সেজদার নিকটবর্তী। দাঁড়ানো অবস্থার ইশারা সেজদা থকে দূরবর্তী। কিন্তু জমহুরের অভিমত, দাঁড়াতে সমর্থ হলে বসে নামাজ পড়া বৈধ হবে না। সেজদার গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করতে গেলে কেয়ামের (দাঁড়ানোর) গুরুত্বকে খাটো করতে হয় (রুকু সেজদার মতো কেয়ামও ফরজ)। চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ পড়লে ইশারা কাবার দিকেই হয়। কাত হয়ে শুলে ইশারা হবে পায়ের দিকে। কাজেই কাত হওয়া অপেক্ষা চিৎ হওয়ার গুরুত্বই বেশী।

ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফেয়ীর নিকট রুকু সেজদার গুরুত্ব কেয়াম অপেক্ষা বেশী নয়। নামাজের স্তম্ভ হিসাবে তিনটি অবস্থাই সমান গুরুত্ববহ। এ কারণেই দাঁড়াতে সমর্থদের জন্য উপবেশন করা বৈধ নয়। তার জন্য দন্ডায়মান অবস্থাতেই রুকু সেজদার ইশারা করা আবশ্যিক। এবার আসা যাক চিৎ হয়ে শোয়ার ব্যাপারটিতে। চিৎ হয়ে শুলে মুখ কাবার দিকে থাকে না। থাকে আকাশের দিকে। ডান কাতে শুলেই বরং কাবার দিকে মুখ থাকে। পায়ের দিকে নয়। নির্দেশ রয়েছে, 'যেখানেই থাকুন, মুখ মন্ডল রাখবেন কাবার দিকে।' কালাম পাকের এই আয়াতটি লক্ষণীয়।

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ইবাদত। একে বলে তাফাক্কুর। এই বিশাল রহস্যময় সৃষ্টি আল্লাহ্তায়ালার অপার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। তাঁর প্রজ্ঞা, কৌশল এবং এককত্বকে প্রমাণিত করে। হজরত আলী বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, তাফাক্কুরের মতো কোনো ইবাদত নেই। শোয়াবুল ইমানে বায়হাকী এবং দোয়াফায় ইবনে হাব্বান এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। অবশ্য উভয়েই বলেছেন, হাদিসটি দুর্বল।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, এক ব্যক্তি রাতে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো বিস্ময়ঘেরা নক্ষত্রমন্ডলে। তিনি অভিভূত হলেন এবং সাক্ষ্য দিলেন, নিশ্চয়ই আমার প্রভুপ্রতিপালক সত্য, আমার স্রষ্টা সত্য। হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা করো। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করলেন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। আবু শায়েখ, ইবনে হাব্বান, সা'লাবী।

যুক্তিবিদগণের নিকট ফিকিরের অর্থ হলো অজানা কোনোকিছুকে জানবার চেষ্টায় চিন্তাকে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করা। কামুস অভিধানে রয়েছে, কোনোকিছুকে জ্ঞানায়ত্ব করার প্রয়াসকে ফিকির বলে। সিহাহ্ গ্রন্থে জুহরী লিখেছেন, ফিকির হলো জ্ঞানের পথ বা পদ্ধতি যা চূড়ান্ত বোধ পর্যন্ত পৌঁছাতে সহায়তা করে। ফিকির করবার যোগ্যতা কেবল মানুষেরই আছে। প্রজ্ঞা দেয়া হয়েছে কেবল মানুষকেই। অন্য সকল সৃষ্টির অনুভূতি আছে কিন্তু প্রকৃষ্ট বুদ্ধি নেই। যা চিন্তার আওতায় আনা সম্ভব সে বিষয়েই কেবল ফিকির বা গবেষণা করা সম্ভব। এ জন্য বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে চিন্তা করো, আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি চিন্তা পরিচালিত কোর না। কারণ, তিনি বোধাতীত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফিকির শব্দটি ফারাক শব্দের বিপরীত। ফারাক অর্থ পৃথক হওয়া। আর ফিকির হচ্ছে পৃথকতাবিরুদ্ধ। ফিকির সম্মিলিত তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম।

আমি বলি, সকল বিষয়ে গবেষণা করো, কিন্তু আল্লাহ্র অস্তিত্বের গবেষণা থেকে বিরত হও। কেননা সপ্তম আসমান থেকে আল্লাহর কুরসী পর্যন্ত রয়েছে সাত হাজার নূরের আড়াল। তার পরে আল্লাহর অস্তিত্ব, যা অবোধ্য। আবু শায়েখ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, গবেষণা নিবদ্ধ রাখো সৃষ্টির সীমানায়, স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ো না। কারণ, তিনি অননুমানীয়। হজরত আবু জরের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করো, আল্লাহ্কে চিন্তায়ত্ত করতে চেয়ো না। এরকম করলে ধ্বংস হয়ে যাবে। ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করো, আল্লাহ্র জাত সম্পর্কে গবেষণা কোর না। আওসাত পুস্তকে তিবরানী শিথিল সনদের মাধ্যমে উল্লেখ

করেছেন, আল্লাহ্র অনুগ্রহসম্ভার নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হও, আল্লাহ্র অস্তিত্বকে বোধগম্য করতে চেয়ো না। আবু শায়েখ, ইবনে আদী এবং বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

এ সমস্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা গবেষনায় লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ। চিন্তা গবেষণা করতে হবে আল্লাহর নাম, গুণাবলী এবং কার্যাবলীর প্রতিফলন সম্পর্কে। এখানে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট যে, নাম গুণাবলীর প্রতিফলনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ব্যতিরেকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব নয়। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী কু. বলেন, কেবল আল্লাহর অস্তিত্বের মাধ্যমে ইলমে হুজুরীর (আত্মজ্ঞানের) সম্পর্ক নির্ণয় করা কঠিন। কেননা আত্মজ্ঞান প্রেম ভালোবাসা নির্ভর। আত্মজ্ঞান নফসের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা মাধ্যমবিহীন। আত্মজ্ঞান তাই জ্ঞানীর অস্তিত্বনির্ভর। বিশ্বাস অবিশ্বাসের তত্ত্বও তাই নফস বা প্রবৃত্তিনির্ভর। আল্লাহ আমাদের নফস বা সত্তাপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী। এই অতি নিকটবর্তীতাই বিস্মরণের কারণ। অতি নিকটবর্তীতাকে জ্ঞান ধারণ করতে পারে না। অতিনৈকট্যের এই পর্দা অতিক্রামসাধ্য নয়। তাই কেবলই পর্দা, কেবলই পর্দা। দূরত্ব সে যতো দূরত্বই হোক না কেনো তা অতিক্রম করা সম্ভব। কিন্তু অতিনৈকট্য অনতিক্রমণীয়। এই অতিনৈকট্যের কারণেই আল্লাহ অদর্শিত ও সংগুপ্ত। এই অদৃশ্যতা ও সংগুপ্তি ইলমে হুজুরী লাভের অন্তরায়। সুফিয়ায়ে কেরাম ইলমে লাদুন্নী লাভ করে থাকেন। এই ইলমে লাদুন্নী কিন্তু হুসুলিও নয় হুজুরীও নয় (অর্জনযোগ্য কিংবা অনুধাবনযোগ্য নয়)। তাঁদের জ্ঞান নিছক জাত কর্তৃক দন্ডায়মান। এর তত্ত্ব ও অবস্থা গবেষণাযোগ্য নয় বলে এক্ষেত্রে গবেষণা বৈধও নয়। তবে রূপকভাবে একে গবেষণা বলা যেতে পারে। যেমন কোনো কোনো সুফী বলেছেন। তাঁদের উক্তিসমূহ শরিয়তসম্মত ব্যাখ্যার পটভূমিতে উপস্থাপিত করতে হয়েছে।

হাদিস শরীফে এসেছে, রসুল স. সর্বক্ষণ আল্লাহর জিকিররত থাকতেন — এই জিকির হুসুলিও নয় হুজুরীও নয়। মুখের জিকির তো নয়ই। সার্বক্ষণিক মৌখিক জিকির অসম্ভব। সার্বক্ষণিক জিকিরই মূল জিকির। এই জিকিরের স্তর অত্যন্ত উচ্চ। তাফাক্কুর বা ফিকিরই কেবল ওই মূল জিকিরের স্তর পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে। এ জন্য আল্লাহ 'উলুল আলবাব' বা বোধশক্তিসম্পন্নদের বৈশিষ্ট্যকে সার্বক্ষণিক জিকিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। এর পরে উল্লেখ করেছেন চিন্তা গবেষণার কথা। চিন্তা গবেষণা ওই জিকির পর্যন্ত পৌঁছতে সহায়তা করে। ওই জিকির মূল প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ, যা অক্ষয়, অব্যয়। তাই দাঁড়িয়ে বসে এবং শুয়ে জিকির করা অর্থ সর্বক্ষণ জিকির করা। তাফাক্কুরের পূর্বে জিকিরের উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, কেবল জ্ঞান বা চিন্তা গবেষণা বিশুদ্ধ নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত

প্রণয়নে সক্ষম নয়, যদি না সে জ্ঞান জিকিরের নূর এবং আল্লাহ্‌র পথপ্রদর্শন দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হয়। গবেষণার ভিত্তি জিকির এবং জিকিরের নূর। আল্লাহর নূর ব্যতিরেকে যারা চিন্তা গবেষণায় লিপ্ত, তারা তাই পবিত্রতম সত্তা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত। তারা গবেষণাকারী, কিন্তু বিশ্বাসী নয়। যাদের অন্তরে জিকিরের জ্যোতি প্রতিভাসিত, সে রকম প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

বিশ্বাসী ও বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলেন, হে আল্লাহ! তোমার এই সৃষ্টি নিরর্থক নয়। অর্থপূর্ণতা ও নিরর্থকতা সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থপূর্ণতাই সত্য। তিনটি উপায়ে সত্যানুসরণ সম্ভব। ১. ওই অস্তিত্ব যা প্রকৃত অস্তিত্ব পর্যন্ত পৌঁছতে সচেষ্ট, যা অন্য কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহই জানেন, এর পূর্ণত্ব কতোদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ২. ওই বিদ্যমানতা, যা অনুমাণ ও ধারণারহিত। সৃষ্টিরহস্যের গবেষণা ওই ধারণারহিত অবস্থার প্রতি পথপ্রদর্শন করতে পারে। আকাশ, পৃথিবী, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রসলিল, বৃক্ষরাজি, প্রাণীকুল, মনুষ্যসমাজ এই পথপ্রদর্শনের সহায়ক ৩. ওই অস্তিত্বশীলতা, যার অবস্থান প্রজ্ঞাময়, রহস্যাচ্ছন্ন ও ফলদায়ক। যা নিরর্থক বঞ্চনাপ্রবণ, কৌশলরহিত কিংবা অর্জনহীন নয়। বাতিল বা নিরর্থকতারও তিনটি বিপরীত দিক রয়েছে। রসুল স. বলেছেন, উত্তম কথা লবীদ বিন রবীয়ার কথা। তিনি তাঁর কবিতায় বলেছেন,হুঁশিয়ার! আল্লাহ ছাড়া সকল কিছুই বাতিল (অর্থাৎ আপন অস্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্যাবলীর জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী। কোনোকিছুই প্রকৃত অস্তিত্বসম্পন্ন কিংবা স্বতিষ্ঠ নয়)। দ্বিতীয় দিকটির ইঙ্গিতও রয়েছে এই কবিতায়। বলা হয়েছে, যা স্বপ্রতিষ্ঠিত নয়,তার উপাসনা কেবলই ধারণা সম্ভূত — যার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। তৃতীয় দিকটিতে রয়েছে শয়তান। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন 'লা ইয়া'তিহিল বাতিলু মিম বাইনি ইয়াদাইহি ওয়া লা মিন খলফিহী।'

'রব্বানা মা খলাক্বতা হাজা বাতিলা' (তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করো নাই) — এই বাক্যটিতে বাতিল বা নিরর্থক বলতে কৃপণতা অথবা সংকীর্ণতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিরর্থক নয় অর্থ আকাশ ও পৃথিবী হকীকত বিহীন নয়। এ সমস্ত কিছু মায়া — এ রকম ধারণা মিথ্যা। আহলে হক (আশায়েরা সম্প্রদায়) আকাশ পৃথিবীর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বলেছেন, বস্তুপুঞ্জের হকীকত (তত্ত্ব) এই দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এই বস্তুপুঞ্জের হকীকত জানাই প্রকৃত জ্ঞান। অপর দিকে সুফেসতাইয়া সম্প্রদায় মায়াবাদকে আশ্রয় করেছে। তাদের মতে পৃথিবী একটি প্রতারণা ও ধারণা। এর কোনো হকীকত নেই। এর প্রেক্ষিতে সত্য পন্থীগণ বলেছেন, বাতিল বলতে যদি সংকীর্ণতাকে গ্রহণ করা হয়, তবে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম, হে আল্লাহ! তুমি একে কেবল উদ্দেশ্যহীন অথবা ক্রীড়াকর্মের উপকরণ স্বরূপ সৃষ্টি

করোনি। বরং সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে রয়েছে হিকমত বা অভিজ্ঞান, যা তোমার পরিচিতি লাভের উপকরণ। যা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আনুগত্যকে অপরিহারনীয় করে।

আয়াতের শেষে প্রার্থনার প্রকৃষ্ট ভঙ্গিটি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহতায়ালার পবিত্রতার স্বীকৃতি দেয়ার পর কামনা করা হয়েছে, আমাদেরকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাও। আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টি নিছক ক্রীড়াকর্ম নয়। উদ্দেশ্যবিহীনও নয়। সৃষ্টির রহস্যকে অবলম্বন করতে না পারলেও যেনো আমরা শাস্তিযোগ্য না হই। চিন্তাগবেষণা যেনো আমাদের পুন্য লাভের ইচ্ছাকে প্রবল করে। আর তোমার আযাবের আশংকাকে প্রবল করে। আমরা তো তোমার পবিত্রতাকে স্বীকার করে নিয়েছি। অতএব তুমি আমাদেরকে দোজখাগ্নি থেকে রক্ষা করো।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯২

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

❒ হে আমাদের প্রতিপালক! কাহাকেও তুমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে তো তুমি নিশ্চয়ই হেয় করিলে এবং সীমালংঘনকারীদের কোনো সাহায্যকারী নাই।

এখানে পূর্বাপর আয়াতগুলোতে পুনঃ পুনঃ রব্বানা (হে আমাদের প্রভুপালক) শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। এই শব্দটির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রভুপালকত্বের স্বীকৃতি, তাঁর প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা, তাঁর সমুচ্চ মহিমার ঘোষণা এবং বিনয়নম্রতার বহিঃপ্রকাশ। এভাবে 'রব্বানা' সম্বোধনের পর একথার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যে, যারা আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত, অপমাণিত। তারা জালিম। তাদের এই লাঞ্ছনা জুলুমের কারণেই। তারা সীমালংঘনকারী। আর সীমালংঘনকারীদের কোনো সহায় নেই। সহায়তাকারী নেই।

একটি ধারণা ঃ অন্য এক স্থানে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ নবীকে এবং ওই সমস্ত লোকদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না — যারা তাঁর সাথে ইমান এনেছে। আবার এই আয়াতে দোজখীরা যে লাঞ্ছিত, সে কথার স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। একথাও সত্য যে, কেবল কাফের নয়, কিছু কিছু মুমিনও দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে (সাময়িকভাবে হলেও)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুমিনরা কি লাঞ্ছিত?

উত্তর ঃ আমরা বলি যে, দোজখবাসী সে কাফের হোক অথবা মুমিন, উভয়েই লাঞ্ছিত। যতোক্ষণ তারা অগ্নিমধ্যে অবস্থান করে। লাঞ্ছনা থেকে পূর্ণ নিষ্কৃতির অঙ্গীকার করা হয়েছে কেবল তাঁদের জন্য যাঁরা কামেলে মুমিন (পূর্ণ ইমানদার)।

হজরত আনাস এবং হজরত কাতাদা বলেছেন, এখানে সেই সব লাঞ্ছিতদেরকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে যাদের দোজখবাস চিরস্থায়ী। সাঈদ বিন মানসুর বলেছেন, এই আয়াতে উল্লিখিত লাঞ্ছনার বাইরে রয়েছেন ওই সকল মানুষ যাঁরা কস্মিনকালেও দোজখে প্রবেশ করবেন না। হজরত জাবের বলেছেন, মুমিনদেরকে লাঞ্ছিত করার কথা ধরে নেয়া হলেও তাদের জন্য এই লাঞ্ছনা হবে সংশোধনমূলক, শাস্তিমূলক নয় (সংশোধন এবং শাস্তি এখানে ইমান ও কুফরের পার্থক্যকে চিহ্নিত করেছে)।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯৩

رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۚ
رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝

❒ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে বিশ্বাসের দিকে আহবান করিতে শুনিয়াছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।' সুতরাং আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করো, আমাদের মন্দ কার্যগুলি দুরীভূত কর, এবং আমাদিগকে সৎকর্মপরায়নদের মৃত্যুর মত মৃত্যু দাও।

হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস এবং অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, 'আহবানকারী' অর্থ রসুল স.। কুরতুবী বলেছেন, কোরআন। কারণ রসুল স. এর আহবান তো পরবর্তী সময়ের মানুষের পক্ষে শোনা সম্ভব নয়। আমি বলি এর অর্থ রসুল স. এর মাধ্যমে কোরআন শোনা। সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে। তাঁর সরাসরি আহবান মান্য করলে যেমন ইমানদার হওয়া যায়। তেমনি তাঁর প্রতিনিধিত্বের ধারাবাহিকতায় আগত পরবর্তী আহবানকারীদের আহবানকে মান্য করলেও ইমানদার হওয়া যায়। আয়াতে উল্লেখিত আহবানকারী নির্দিষ্ট নয়। তাই বলা হয়েছে 'এক আহবায়ককে'। শেষ আহবান হচ্ছে ইমানের প্রতি আহবান। আর এ রকম আহবানকারীরাই সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। আহবানকারীর আহবানই ইমানের ভিত্তি। ইমান বুদ্ধিবিবেচনাপ্রসূত নয়। শায়েখ আবুল মনসুর মাতুরিদি বলেছেন, ইমান জ্ঞাপনার্থে 'ইনশাল্লাহ আমি ইমানদার' এ

রকম বলা অনুচিত। এতে করে নিঃসন্দিগ্ধতা প্রমাণিত হয় না। বরং এ রকম বলা ওয়াজিব যে, 'নিশ্চিত আমি ইমানদার।'

ইমান ব্যতীত ফানা লাভ হয় না। তাই আহবানকারীর আহবানে বিশ্বাস স্থাপন করার পর প্রথমে 'জুনুবানা' শব্দের মাধ্যমে কবীরা গোনাহের জন্য এবং পরে 'সাইয়িআতিনা' শব্দটির মাধ্যমে সগীরা গোনাহের জন্য ক্ষমা যাচনা করা হয়েছে। সগীরা গোনাহের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে 'আমাদের মন্দ কার্যগুলোকে দূরীভূত করো'। শেষে বলা হয়েছে আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের মৃত্যুর মতো মৃত্যু দাও। এককভাবে নিজেকে সৎকর্মশীল হবার প্রার্থনা জানানো হয়নি – এই ভঙ্গিটিতে রয়েছে নম্রতা ও বিনয়। নম্রতা আল্লাহতায়ালার পছন্দনীয়। বিনয়াবনতদেরকে আল্লাহতায়ালা ভালোবাসেন। সৎকর্মপরায়নদের মৃত্যুর মতো — একথার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা যখন মৃত্যুবরণ করবেন তখন যেনো আমরা মৃত্যুবরণ করি। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মশীলদের যে দল, সেই দলে যেনো আমরা অন্তর্ভূত হই। এবং তাঁরা যেমন ইমানসহ পৃথিবী পরিত্যাগ করে থাকেন, আমাদেরও যেনো সে রকম অবস্থা হয়।

একটি ধারণা ঃ এটা তো মৃত্যুর অভিপ্রায় জ্ঞাপন ও মৃত্যুর জন্য দোয়া করার মতো। অথচ রসুল স. মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। ইতোপূর্বে সুরা বাকারার 'ফাতামান্নাউল মাউতা ইন কুনতুম সদিক্বীন' আয়াতের তাফসীরে একথা বলা হয়েছে।

সমাধান ঃ এই মাসআলাটি নিশ্চিত যে, মৃত্যুর জন্য, সম্পদ বিনষ্টির জন্য অথবা শারিরীক কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে জীবনাবসানের জন্য প্রার্থনা জানানো নাজায়েয। কিন্তু এই আয়াতটিতে মৃত্যু যাচনা করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে মৃত্যু যখনই আসুক – আমরা যেনো মৃত্যু পর্যন্ত পুণ্যময় ও সংশোধিত জীবন লাভ করতে পারি। আর যথাসময়ে মৃত্যু এলে যেনো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারি তেমনিভাবে, যেমন মৃত্যু লাভ করেন সৎকর্মশীলগণ। তাৎক্ষণিক মৃত্যু প্রার্থনা এখানে উদ্দেশ্য নয়। যেমন অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা আংতুম মুসলিমুন' (মুসলমান না বানিয়ে আমাদেরকে মৃত্যু দান কোর না)। এখানে ইসলামবিহীন মৃত্যুর প্রতি অনাকাঙক্ষা প্রকাশ করা হয়েছে। মৃত্যুকে বিলম্বিত করার প্রার্থনা এখানে জানানো হয়নি। নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু তো আসবেই। মানুষ তো জানে না সে সময়টি কখন। যখনই হোক না কেনো প্রার্থনা এই যে, তৎপূর্বে আমরা যেনো মুসলমান অবস্থায় থাকি এবং সে অবস্থাতেই মৃত্যুকে স্বাগত জানাই।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

❐ হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রসুলগণের মাধ্যমে আমাদিগকে যাহা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদিগকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে হেয় করিও না। তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।

আল্লাহতায়ালা অনুগ্রহ করে যা কিছু দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন, এই আয়াতে সে সমস্ত কিছু পাওয়ার আকুতি উপস্থাপন করা হয়েছে। চাওয়া হয়েছে আখেরাতের কল্যাণ এবং পৃথিবীতে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়। চাওয়া হয়েছে জান্নাত, আল্লাহতায়ালার নৈকট্য ও দীদার। বলা হয়েছে, পয়গম্বরদের মাধ্যমে আপনি যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন, তা দান করুন। আমাদেরকে তাদের দলভূত করুন। তাদেরকে যেমন প্রিয় করেছেন, আমাদেরকেও তেমনি করুন। পয়গম্বরদের সাহচর্যের বরকতে আমাদেরকেও আপনার বরকতের অন্তর্ভুত করে নিন।

একটি ধারণাঃ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করার অর্থ কী? প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কি কোনো আশংকা রয়েছে যে, প্রার্থনার মাধ্যমে তা পূরণ করতে হবে?

উত্তরঃ না। বরং এখানে রয়েছে ভয় এবং বিনয়। আল্লাহতায়ালা সম্পূর্ণ স্বাধীন, অমুখাপেক্ষী—একথা মেনে নিলে ভয় ও বিনয় স্বভাবতই এসে পড়ে। তাঁর নিছক অনুগ্রহ লাভের প্রতি আকুতি এই প্রার্থনায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আশংকা তো অবিশ্বাস। 'তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না' বলে সত্বর প্রতিফল লাভ করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমরা জানি এবং নিশ্চিত বিশ্বাসও করি, তুমি নিশ্চয়ই অঙ্গীকারবিচ্যুত নও। কিন্তু আমরা তো সহিষ্ণুতার অবসান চাই। সত্বর দেখতে চাই কাফেরদের লাঞ্ছনা, পরাজয় এবং প্রতিশ্রুত বিজয়। এটাও সত্বর দেখতে চাই যে, লাঞ্ছনা আমাদেরকে স্পর্শ করেনি আর আমরা দোজখেও প্রবেশ করিনি। আমরা বেঁচে থাকতে চাই ওই সমস্ত কর্মকান্ড থেকে যা কিয়ামতের দিন হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার কারণ হবে। আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যাচনা করছি ভুলত্রুটি সমূহের আড়াল।

হজরত আবু হোরায়রা বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর বান্দাকে আপন সান্নিধানে এনে তাকে অন্য সকলের আড়াল করবেন। তারপর তাঁর পবিত্র হস্ত স্থাপন করবেন তাঁর উপর। বলবেন, দেখো তোমার আমলনামা। বান্দা তার আমলনামা পড়তে থাকবে। পুণ্যসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে দেখে আনন্দে আন্দোলিত হবে তাঁর অন্তর। অবয়ব হবে সমুজ্জ্বল। আল্লাহ্‌ বলবেন, দেখলে তো। বান্দা বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ বলবেন, আমি তোমার পূণ্যকর্মসমূহ কবুল করেছি। বান্দা তৎক্ষণাৎ সেজদাবনত হবে। আল্লাহ বলবেন, মস্তক উত্তোলন করো। আরেকবার

দৃষ্টি নিবদ্ধ করো আমলনামায়। হুকুম মোতাবেক বান্দা তার আমলনামায় দৃষ্টি পুনঃনিবদ্ধ করলে সে দেখবে গোনাহ্ সমূহ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বান্দা তখন ভীত হবে। তাঁর চেহারা হবে অনুজ্জ্বল। আল্লাহ বলবেন, দেখেছো? বান্দা বলবে, হ্যাঁ, আল্লাহ বলবেন, আমলনামায় লিপিবদ্ধ না থাকলেও আমি তোমার গোনাহ্ সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। কিন্তু আমি তোমার গোনাহ্সমূহ মাফ করে দিলাম। এমনি করে বান্দা বারবার পড়তে থাকবে তার পুণ্যলিপি ও মন্দ সমূহের বিবরণ। আল্লাহ্ বারবার ক্ষমা ঘোষণা করতে থাকবেন এবং সে হতে থাকবে বারবার সেজাদাবনত। অন্যেরা এসবকিছু জানবেও না। দেখবেও না। তারা কেবল দেখবে বার বার সে সেজদাবনত হচ্ছে। তারা অনুচ্চ স্বরে বলাবলি করতে থাকবে, ওর কী সৌভাগ্য। আল্লাহর নাফরমানী বলতে ওর কিছু নেই। জাওয়ায়েদ পুস্তকে আবদুল্লাহ বিন আহমদ এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। আবু মুসার মাধ্যমে বায়হাকীও এ রকম উল্লেখ করেছেন। হজরত ইবনে ওমর সূত্রে বোখারী ও মুসলিমেও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই হাদিসটি।

জ্ঞাতব্য ঃ কিয়াম শব্দের অর্থ দাঁড়ানো বা উঠে দাঁড়ানো। বিচারের দিন সকল মানুষ উঠে দাঁড়াবে। সকল মানুষকে সেদিন উঠে দাঁড়াতে হবে। এই আয়াতে সেই কিয়ামতের কথাই বলা হয়েছে। আরেক অর্থে প্রতিটি মৃত্যুই কিয়ামত। কিন্তু এখানে সে কথা বলা হয়নি। কিয়ামতের পরিসর হচ্ছে কবর থেকে জান্নাত অথবা দোজখ। হিসাব কিতাব, মিজান, পুলসিরাত—এ সকলকিছুও কিয়ামতের অন্তর্ভূত

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯৫

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○

❒ অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের ডাকে সাড়া দিয়া বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মে নিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমাদের এক অপরের সমান। সুতরাং যাহারা দেশ ত্যাগ করিয়া পরবাসী হইয়াছে, নিজ গৃহ হইতে উৎখাত হইয়াছে, আমার পথে নির্যাতিত হইয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে ও

নিহত হইয়াছে আমি তাহাদের মন্দ কার্যগুলি অবশ্যই দূরীভূত করিব এবং অবশ্যই তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। ইহা আল্লাহের নিকট হইতে পুরস্কার; উত্তম পুরস্কার আল্লাহেরই নিকট।

আল্লাহপাক তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, পুরুষ অথবা নারী যে কেউ হোক না কেনো, কারো কর্মফলকে আমি ব্যর্থ করবো না। হজরত উম্মে সালমা বলেছেন, যখন একথা বলাবলি হতে লাগলো যে, আল্লাহ কেবল মোহাজির পুরুষদের প্রশংসায় আয়াত নাজিল করেছেন — এই আয়াত নাজিল হয়েছে তখনই। হাকেম, সিহাহ, তিরমিজি, ইবনে আবী হাতেম, আবদুর রাজ্জাক, সাঈদ বিন মানসুর।

বিশ্বাসবান পুরুষ এবং বিশ্বাসবতী নারী একই রকম। তারা একে অপরের সহায়তাকারী। সকলেই হজরত আদম এবং হজরত হাওয়ার সন্তান-সন্তুতি। প্রত্যেক পুরুষ যেমন নারীর উদরজাত। তেমনি প্রতিটি রমনীও পুরুষের ঔরসজাত। তাই সওয়াব প্রাপ্তির ব্যাপারে তারা উভয়েই সমান। কোনো তারতম্য এখানে নেই।

তারা তাদের গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। সত্যের পথে নির্যাতনকে বরণ করে নিয়েছে। জেহাদ করেছে, শহীদ হয়েছে। (আল্লাহ বলেন) এ সমস্ত করেছে কেবল আমার জন্যেই। আমি তাদেরকে ক্ষমা করবো। দান করবো বেহেশতে প্রবেশের অধিকার, যেখানে রয়েছে প্রবহমান স্রোতস্বিনী।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতে কেবল বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীর কর্মফল বিনষ্ট না করার প্রতিশ্রুতি এসেছে। অবিশ্বাসীদের সকল কর্মই বিনষ্ট। কারণ, সৎকর্মসমূহ গৃহীত হওয়ার শর্ত হচ্ছে ইমান। ইমান ব্যতীত কোনো আমলই (আখেরাতের জন্য) গ্রহনীয় নয়। এরপর বলা হয়েছে সওয়াব প্রদানের কথা। এই সওয়াবই জান্নাত লাভের কারণ। আর সওয়াব কেবল বিনিময় নয়। সওয়াব হচ্ছে আল্লাহতায়ালার নিছক মেহেরবানী। সওয়াব হচ্ছে আল্লাহর অপার মহিমা — অনুগ্রহসিক্ত পুরস্কার।

সবশেষে বলা হয়েছে, উত্তম সওয়াব প্রদাতা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ নয়। এই উত্তম সওয়াব অর্জন বান্দার ক্ষমতাবহির্ভূত। উত্তম সওয়াবের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর নৈকট্য। উত্তম সওয়াব জান্নাত এবং জান্নাতের নেয়ামতসমূহ অপেক্ষা উত্তম।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, মুসলমানেরা বলাবলি করছিলেন, দেখো মুশরিকেরা আল্লাহর দুশমন হওয়া সত্ত্বেও কেমন আরামে আছে। ঘর সংসার করছে, ব্যবসা বাণিজ্য করছে। আর আমরা ইমানদার হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রকম অনটন ও সমস্যায় জর্জরিত। এর প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ○ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, দেশে দেশে তাহাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।

❒ ইহা সামান্য ভোগ মাত্র; অতঃপর জাহান্নাম তাহাদের আবাস; আর উহা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

কাফেরদের নিরুপদ্রব জীবন দেখে প্রতারিত হওয়ার কিছু নেই। বাণিজ্য ব্যাপদেশে তাদের বাহ্যিক উৎকণ্ঠাহীনতা, স্বাভাবিক সংসার যাপন সাময়িক। এখানে 'তোমাকে' বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। কিন্তু হেদায়েত পেশ করা হয়েছে তাঁর উম্মতের জন্যে। কারণ, প্রতারিত হওয়ার সুযোগ তাঁর স. একেবারেই নেই। কিন্তু উম্মতের জন্য রয়েছে দ্বিধা সন্দেহের আশংকা। তাই এই হেদায়েত।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, পথভ্রষ্টদের উত্তম অবস্থা দেখে তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ কোর না। তোমরা জানো না, তাদের মৃত্যুত্তোর জীবন কীরকম। তাদের জন্য আল্লাহ এমন এক স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন, যেখানে আর কখনো তারা মরবে না (অর্থাৎ দোজখ)। শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে ইমাম বাগবী এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

কাফেরদের এই উপভোগ অতি সামান্যই (মহাজীবনের তুলনায়)। তাদের এই নিশ্চিন্ততা অত্যন্ত নিম্নস্তরের (কারণ পার্থিব জীবনের অবসানের সাথে সাথেই তা অবলুপ্ত হবে)। হজরত মোসাওয়ার বিন শাদ্দাদ বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আখেরাতের তুলনায় পৃথিবীর দৃষ্টান্ত এ রকম যেমন, সমুদ্র এবং সমুদ্রনিমজ্জিত হাতের আঙ্গুলের পানি। মুসলিম।

কাফেরদের চূড়ান্ত গন্তব্য জাহান্নাম। তাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতাই তাদেরকে ওই চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছতে সহায়তা করে যাচ্ছে।

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝

❐ কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। ইহা আল্লাহের পক্ষ হইতে আতিথ্য; আল্লাহের নিকট যাহা আছে তাহা সৎকর্মপরায়ণদিগের জন্য শ্রেয়ঃ।

বিশ্বাসীদের জন্য এখানে পুনরায় দেয়া হয়েছে স্বর্গোদ্যানের সুসংবাদ। স্বর্গের ওই বসতি চিরকালীন। সেখানকার নির্ঝরিণীও নিরন্তর। ওই অসীম প্রাপ্তি অবিশ্বাসীদের অদৃষ্টে নেই। তাদের পার্থিব আনন্দ শেষ হবে পৃথিবীতেই। ওই অন্তহীন সুখের অধিকার লাভ করবেন তাঁরাই, যাঁরা বিশ্বাসী ও বাধ্য। সুতরাং পার্থিব সীমাবদ্ধতা ও সংকটে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। অবিশ্বাসীরা অজ্ঞ বলেই মনে করে তারাই সফল এবং মুসলমানেরা ক্ষতিগ্রস্ত। বিশ্বাসীগণ আল্লাহ্র অতিথি। আল্লাহ্ তাঁর সীমাহীন অনুগ্রহের মাধ্যমে তাঁদের জন্য আতিথ্যের আয়োজন করবেন। ওই আয়োজনের অন্তর্ভূত থাকবে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ সম্ভারসমূহ — সওয়াব, আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর সন্তোষ ও রহমত। যাঁরা সৎকর্মপরায়ন (আবরার) — ওই সফলতা কেবল তাঁদের জন্যই। আয়াত শেষে তাই আবরারগণের প্রশংসা ও মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে।

হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেন, আমি একদিন রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে দেখলাম, তিনি স. খেজুরের চাটাইয়ের উপর বিশ্রাম গ্রহণ করছেন। তাঁর মাথার নিচে খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার বালিশ। পায়ের পাশে কিছু পাকা চামড়া স্তুপীকৃত। মাথার কাছেও রয়েছে পাকা চামড়ার স্তূপ। চাটাইয়ের দাগ মুদ্রিত হয়ে আছে তাঁর পবিত্র পৃষ্ঠদেশে। আমি কেঁদে ফেললাম। রসুল স. বললেন, কাঁদছো কেনো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! রোম ও পারস্যের সম্রাটেরা কী বিশাল আরাম আয়েশের মধ্যে আছে। আর আপনি আল্লাহর রসুল হওয়া সত্ত্বেও কষ্ট ভোগ করছেন! রসুল স. বললেন, তুমি কি এই সিদ্ধান্তে সম্মত নও যে, তাদের রয়েছে দুনিয়া আর আমার রয়েছে আখেরাত। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসুল! আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ যেনো আপনার উম্মতকে সম্পদশালী করে দেন। আল্লাহ পারস্য ও রোমবাসীদেরকে বিত্তাধিকারী করেছেন। অথচ তারা আল্লাহর উপাসনা বিমুখ। তিনি স. বললেন, হে ইবনে

খাত্তাব। তুমি কি জানো না, আল্লাহ তাদেরকে ওসব দিয়েছেন নিতান্ত স্বল্প সময়ের জন্য। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনে আস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্য কারাগার। পৃথিবী পরিত্যাগের মাধ্যমেই তাঁরা এই বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাবেন। বাগবী।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাকে পৃথিবীর অপপ্রভাব থেকে রক্ষা করেন, যেমন তোমরা পানি থেকে পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করো। আহমদ, তিরমিজি।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯৯

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

❐ কিতাবীদের মধ্যে অনেকে আছে যাহারা আল্লাহের নিকট বিনয়াবনত হইয়া তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করে; এবং আল্লাহের আয়াত স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে না; ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য আল্লাহের নিকট পুরস্কার রহিয়াছে। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

হজরত আনাস থেকে নাসাঈ এবং হজরত জাবের থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রসুল স. বলেছিলেন, তাঁর নামাজ পড়ো। একজন বললেন, হে রসুল! আমরা তবে একজন হাবসী গোলামের নামাজ (জানাযা) পড়বো? এ প্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

হজরত জোবায়ের বলেন, এই আয়াত নাজ্জাশীর শানে নাজিল হয়েছে। হাকেম।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, হজরত জিব্‌রাইল আ. নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ রসুল স. কে জানিয়েছিলেন। তিনি স. সাহাবীদেরকে তখন বলেছিলেন, তোমরা শহরের বাইরে একত্রিত হয়ে তোমাদের ভাই নাজ্জাশীর নামাজ পড়ো। তিনি দূর দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন। জানাযা পাঠের সময় রসুল স. এর দৃষ্টি থেকে দূরত্বের

অন্তরাল উঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তিনি নাজ্জাশীর মৃতদেহ স্বচক্ষে দেখে জানাযার নামাজ আদায় করেছিলেন। নামাজে তিনি চার তকবীর বলেছিলেন এবং নাজ্জাশীর মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। মুনাফিকরা বলাবলি করছিলো, দেখো দেখো এরা একজন হাবসী খৃষ্টান কাফেরের জানাযার নামাজ পড়ছে। এরা কোনোদিন তাকে দেখেইনি। মুনাফিকদের এই কথোপকথনের প্রেক্ষিতেই এই আয়াত নাজিল হয়েছে। আতা বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে চল্লিশজন নাজরানবাসী মুসলমানের জন্য। বত্রিশজন ছিলেন আবিসিনিয়ার এবং আটজন ছিলেন রোমের। প্রথম দিকে তারা সকলে হজরত ঈসা আ. এর ধর্মমতানুসারী এবং পরে রসুল স. এর প্রতি ইমান এনেছিলেন। ইবনে জারীর ইবনে জুরাইজ সূত্রে বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে আবদুল্লাহ বিন সালাম এবং তাঁর সাথীদের সম্পর্কে। মুজাহিদ বলেছেন, আহলে কিতাবীদের মধ্য থেকে যারা ইমান এনেছেন তাদের সকলের জন্যই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

আহলে কিতাবদের সকলেই অবিশ্বাসী নয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইমান এনেছেন। আল্লাহতায়ালার সত্তা এবং নাম-গুণাবলী সম্পর্কে তাঁদের ধারণা বিশুদ্ধ। তাঁরা কোরআনকে বিশ্বাস করেছে এবং ইতোপূর্বে অবতীর্ণ তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর সহ সকল আসমানী কিতাবেও বিশ্বাস রাখে। অবিশ্বাসী আহলে কিতাবেরা যেমন তওরাতে উল্লেখিত রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী গোপন করতে অভ্যস্ত, এঁরা সে রকম নন। আল্লাহ্‌র কালামকে পরিবর্তন করা, সুদ গ্রহণ করা — এ সমস্ত অসদভ্যাস থেকে এঁরা মুক্ত।

আল্লাহতায়ালার নিকট রয়েছে ওই সকল বিশ্বাসী আহলে কিতাবদের জন্য মহাপুরস্কার। অন্যান্য বিশ্বাসীদের চেয়ে অতিরিক্ত বিনিময় লাভ করবেন তাঁরা। যেমন অন্যস্থানে এরশাদ হয়েছে, 'তাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে।' হজরত আবু মুসা আশআরী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের মানুষ দ্বিগুণ বিনিময়ে ভূষিত হবেন। এর মধ্যে এক ধরনের মানুষ হচ্ছেন ওই সকল আহলে কিতাবী যাঁরা ইমান এনেছিলেন তাঁদের নবীগণের প্রতি এবং পরে ইমান এনেছিলেন মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. এর প্রতি।

আল্লাহ সকল কিছুর হিসাব গ্রহণকারী। তাঁর হিসাবগ্রহণ কর্মে শিথিলতার অবকাশ নেই। সদাসতর্কতা তাঁর হিসাবগ্রহণের বৈশিষ্ট্য। সকল কিছু সম্পর্কেই তিনি সম্যক অবগত। এই অবগতি তাঁর সহজাত। চিন্তাভাবনা নির্ভর নয়। বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহতায়ালা সকল সৃষ্টির হিসাব অর্ধ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করবেন। অর্ধদিন অর্থ পৃথিবীর একদিনের অর্ধেক। 'তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর' — এ কথার অর্থ বিশ্বাসীদের বিনিময় লাভ বিলম্বিত হবে না, সত্ত্বরই তাদেরকে পুরস্কার প্রদানে ধন্য করা হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর,ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক; আল্লাহকে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

বিশ্বাসীগণ তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। ধর্মনিষ্ঠ হও। আদেশ নিষেধ প্রতিপালনে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে, প্রেমময় প্রভু পালয়িতার প্রেম ভালোবাসাকে আশ্রয় করো। সংকটে ও শান্তিতে আল্লাহর প্রেমবিচ্ছিন্নতা থেকে নিঃসংশয় হও। আল্লাহর সন্তোষ লাভার্থে জেহাদে প্রবৃত্ত হও। আঘাতে প্রত্যাঘাতে অটল থাকো। বিপদ মুসিবতে মুক্ত থাকো উদাসীনতা ও আক্ষেপের প্ররোচনা থেকে। স্মরণ রেখো, কেবল তোমরাই নও ,অবিশ্বাসীরাও বিপদগ্রস্ত হয়। তাদেরকেও মেনে নিতে হয় মৃত্যু, রক্তপাত এবং ক্ষুৎপিপাসার আতংক। অথচ দেখো, প্রতিদান বলতে তাদের জন্য কিছু নেই। আর তোমরা সফলতার সুসংবাদ প্রাপ্ত। তোমাদের জন্য রয়েছে আখেরাত, জান্নাত এবং আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ। পৃথিবীর সফলতা লাভের জন্য দেখো অবিশ্বাসীদের কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। সফলতার জন্য তো শ্রম ও সাধনা অবশ্যই প্রয়োজন। তাদের দুশ্চেষ্টা পৃথিবীর জন্য, আর তোমাদের সৎপ্রচেষ্টা আখেরাতের জন্য। হে বিশ্বাসীরা, এই সৎপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তোমরা পরস্পরের প্রতিযোগী হও। যুদ্ধের জন্য অশ্ব ও অস্ত্রসম্ভার প্রস্তুত রাখো। ভিতর বাহির দু'দিকেই চলুক তোমাদের যুদ্ধযাত্রা। বাইরে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে এবং অভ্যন্তরে শয়তানী কুমন্ত্রণা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। অন্তরকে জাগ্রত রখো আল্লাহর নিরবচ্ছিন্ন স্মরণে। নামাজ শেষে প্রস্তুত থাকো পরবর্তী নামাজের জন্যে। মধ্যবর্তী সময়গুলোকে ভরে তোলো মোরাকাবায়, মোশাহেদায় এবং জিকিরের সমাবেশে।

বলা হয়েছে 'ওয়া সাবিরু ওয়া রবিতু' (ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সদা প্রস্তুত থাকো)। 'রবিতু' শব্দের অর্থ সদাপ্রস্তুত থাকা। এর আভিধানিক অর্থ বন্ধন, কোনোকিছুকে বেঁধে রাখা। এর উদ্দেশ্য যুদ্ধাশ্বকে বেঁধে রাখা, সদা প্রস্তুত রাখা। এ কথাটির গুরুত্ব এই যে, বিশ্বাসী ও স্থায়ী অধিবাসী যেনো যুদ্ধে সদা প্রস্তুত থাকে। সে অশ্বাধিকারী হোক অথবা না-ই হোক। এর আরো অধিকতর গুরুত্ব রয়েছে এ রকম — শত্রুরা তো রণসম্ভার নিয়ে প্রস্তুত। তোমাদের উচিত তাদের চেয়েও অধিক যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করা।

হজরত সহল বিন সা'দ সায়দী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, জেহাদের সময় মুসলিম ভুখন্ডের সীমানা রক্ষায় একদিনের পাহারা দুনিয়ার সমস্ত বস্তু অপেক্ষা উত্তম। আর জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ স্থান পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে শ্রেয়। যে বান্দা এক সকাল বা এক বিকাল আল্লাহর পথে সময় যাপন করে সে দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম মুনাফা অর্জন করে। বাগবী। এই হাদিসটির প্রথম অংশ বোখারী ও মুসলিমে হজরত সহলের বর্ণনাসূত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের বর্ণনা এসেছে হজরত আনাস থেকে।

হজরত সালমান বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন ও একরাত পাহারারত থাকে; সে একটানা একমাস রোজা পালনকারীর সওয়াব পাবে। পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার এই আমল জারি থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। শহীদগণের মতো সে রিজিকপ্রাপ্ত হবে এবং কবরের ফেতনা থেকে (ভয়াবহ অবস্থা থেকে) নিরাপদ থাকবে। বাগবী।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, একদিন একরাত মুসলিম রাজ্যের সীমানা সুরক্ষা করা, পূর্ণ একমাসের দিনের রোজা এবং রাতের নামাজ থেকে উত্তম। সীমানা সুরক্ষাকালে মৃত্যুবরণ করলে তার এই আমল কিয়ামত পর্যন্ত বহমান থাকবে। তার রিজিকপ্রাপ্তি হবে বন্ধকতাহীন এবং সে রক্ষা পাবে ফেতনা থেকে। আহমদ এবং ইবনে আবী শাইবা বর্ণিত হাদিসে এসেছে, সারাদিন সারা রাত আল্লাহর পথে পাহারারতদের আমল, রমজান মাসের দিনের রোজা এবং রাতের নামাজ আদায়কারীদের মতো — যে রোজায় বিরতি নেই এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত যে নামাজে নেই অপ্রতিপালনীয়তা।

হজরত ফোজালা বিন উবাইদ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মৃত্যু সকল আমলের অবসান ঘটায়, কিন্তু আল্লাহর পথে সীমানারক্ষীরা এর ব্যতিক্রম। তাঁদের আমল মৃত্যুর পরেও প্রবহমান থাকবে। কবরের বিপর্যস্ততা তাঁদেরকে স্পর্শ করবে না। হজরত উকবা বিন আমের থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, আবু দাউদ এবং দারেমী। হজরত ওসমান বর্ণিত হাদিসে রয়েছে রসুল স. বলেছেন, আল্লাহর পথের একদিনের প্রহরা অন্য স্থানের হাজার প্রহরা থেকে উত্তম। তিরমিজি, নাসাঈ।

ইমাম বাগবী, আবু সালমা আবদুর রহমানের উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম, রসুল স. এর জামানায় সীমানা রক্ষার প্রয়োজন হতো এমন কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তখন এক নামাজ শেষে অন্য নামাজের প্রতীক্ষায় থাকাই ছিলো প্রহরা। এই আয়াতের ইঙ্গিত সেদিকেই। এই ব্যাখ্যাটির প্রমাণ রয়েছে হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত একটি হাদিসে যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে এমন একটি আমলের বর্ণনা দিচ্ছি, যার কারণে আল্লাহ

তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করবেন। আমলটি হলো, পূর্ণরূপে অজু করা (শৈত্যপ্রাবল্য ও অসুস্থতা সত্ত্বেও), মসজিদের দিকে পদব্রজে অধিক পথ অতিক্রম করা এবং নামাজ শেষে পরবর্তী নামাজের প্রতীক্ষায় থাকা। এটাই তোমাদের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকা। এটাই তোমাদের জন্য সদাসতর্ক থাকা। এটাই তোমাদের জন্য সদাসাবধান থাকা। বাগবী। ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিজিও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। ধৈর্য ধারণ, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা এবং সদাপ্রস্তুতির নির্দেশ দানের পর এরশাদ হয়েছে, আল্লাহকে ভয় করো। তবেই সফলতা তোমাদের পদচুম্বন করবে।

সুরা আলে ইমরান পাঠের উপকার ঃ হজরত ওসমান বিন আফফান বলেন, যে ব্যক্তি আলে ইমরানের শেষ অংশ রাতে তেলাওয়াত করবে সে লাভ করবে সমস্ত রাত্রি নামাজে রত থাকার সওয়াব। দারেমী। হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সুরা বাকারা এবং সুরা আলে ইমরান আবৃত্তি করো। এই সুরা দু'টির আবৃত্তিকারীর মাথার উপর কিয়ামতের দিন পাখির দু'টি ডানার মতো ছায়া দান করবে মেঘমালা অথবা শামিয়ানা। সুরা দু'টি তখন হবে তার (আবৃত্তিকারীর) সহায়। মুসলিম।

হজরত নুয়াস বিন সাময়ান বর্ণনা করেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন কোরআন আবৃত্তিকারী এবং তদানুযায়ী আমলকারীদেরকে আল্লাহ্র সকাশে সমুপস্থিত করা হবে। পুরোভাগে থাকবে সুরা বাকারা ও আলে ইমরান। যেনো দুটি ভাসমান মেঘপুঞ্জ অথবা দু'টি কৃষ্ণ আচ্ছাদন কিংবা পাখির প্রসারিত পাখা। তা থেকে বিচ্ছুরিত হবে আলোকচ্ছটা। সুরা দু'টি হবে তার (আবৃত্তিকারের) সাহায্যকারী। মুসলিম। মাকহুল বলেছেন, জুমআর দিন যে ব্যক্তি সুরা আলে ইমরান পাঠ করবে, ফেরেশতারা রাত্রি আগমন পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকবে।

জ্ঞাতব্য ঃ (গ্রন্থকার বলেন) তিবরানী শিথিলসূত্রপরম্পরায় ইবনে মালিকের একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম, যে ব্যক্তি জুমআর দিন এই সুরা পড়বে, আল্লাহ্পাক সুর্যাস্ত পর্যন্ত তার উপর রহমত বর্ষণ করবেন এবং ফেরেশতাগণও তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকবেন।

হে আমাদের আল্লাহ্! হে রাজাধিরাজ! আমরা তোমারই স্তব ও স্তুতি জ্ঞাপন করি। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্যাধিকারী করো এবং যাকে ইচ্ছা রাজ্যচ্যুত করো। যাকে চাও তাকে করো মর্যাদাভূষিত এবং অপমানিত করো তাকে, যাকে চাও। তুমিই সকল কল্যাণাধিকারী। সমস্ত কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তোমার অপার

ক্ষমতা। হে আমাদের প্রিয়তম আল্লাহ! আমাদের বৃহৎ অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও। বিচ্যুতিসমূহ বিদূরিত করো এবং আমাদেরকে মৃত্যুদান করো পুন্যবানদের দলভুত অবস্থায়। অবতীর্ণ করো তোমার শান্তি, রহমত ও বরকত। তোমার হাবীব মোহাম্মদ স. আমাদের পরিচালক, সুপারিশকারী এবং সরদার। তাঁর পবিত্র নাম মোহাম্মদ স.। তাঁকে তুমি করেছো অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মী)। করেছো সকল মানুষের জন্য, সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত ও হেদায়েত। তাঁর উপর আল্লাহর রহমত এবং সালামত, তাঁর পবিত্র বংশধর, অন্তরঙ্গ সহচর বৃন্দ এবং তাঁদের পরবর্তী অনুসারীদের প্রতিও। আমিন।

সুরা নিসা

এই সুরার আয়াত সংখ্যা একশত ছেচল্লিশ। সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। ইমাম বায়হাকী হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেছেন, এই সুরা মদীনায় নাজিল হয়েছে। ইবনে মুনজির সূত্রে হজরত কাতাদাও এরকম বলেছেন। কাতাদা সূত্রে ইমাম বোখারীও বলেছেন একথা।

সূরা নিসা ঃ আয়াত ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

❒ হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার সঙ্গিনী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী পৃথিবীতে বিস্তার করেন; এবং আল্লাহকে ভয় করো যাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করো এবং ভয় করো জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করাকে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

'হে মানব' বলে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং যাঁরা পরে আসবেন — সকলকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো'-অর্থাৎ তার শাস্তির কথা স্মরণে রেখে তাঁর নির্দেশসমূহ পালনে ব্রতী হও। তিনি সেই প্রতিপালক, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। সেই ব্যক্তিটি হচ্ছেন হজরত আদম আ.। তিনিই সকল মানুষের প্রথম পিতা। আর তাঁর থেকে সৃষ্টি করেছেন হজরত হাওয়াকে। তিনিই সকল মানুষের প্রথম মাতা।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, মেয়েদেরকে হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বোখারী, মুসলিম।

আবু শায়েখ হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এরকম, হজরত হাওয়াকে হজরত আদমের পিছন দিককার হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মুজাহিদের বক্তব্যে এসেছে, হজরত আদম ঘুমন্ত ছিলেন। তখন হাওয়াকে সৃষ্টি করা হলো। জেগে উঠে তিনি হাওয়াকে দেখে বিস্মিত হলেন। এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন ইবনে আবী শাইবা, আব্‌দ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম।

হজরত আদম এবং হজরত হাওয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে মানুষের বংশধারা। পৃথিবীর সকল পুরুষ ও রমণী তাঁদের বংশেই এসেছেন, আসছেন, আসবেন। 'রিজালন কাছিরাও ওয়া নিসাআ'-বলতে বুঝানো হয়েছে বহুসংখ্যক পুরুষ ও রমণী। বর্ণনাভঙ্গিতে স্পষ্ট হয় যে, রমণীদের সংখ্যা হবে পুরুষদের চেয়ে অধিক। আর এই বিষয়টিকে স্বীকার করে নিলে প্রয়োজনবোধে একজন পুরুষের অধিক সংখ্যক স্ত্রী (সর্বোচ্চ চারজন) গ্রহণের বৈধতা সপ্রমাণিত হয়।

হজরত আদম — হজরত হাওয়া — তারপর মানুষের বংশস্রোতের এই বহমানতা আল্লাহতায়ালার অপার ক্ষমতা ও অসীম অনুগ্রহের স্পষ্ট নিদর্শন হয়েছে। এই সৃষ্টির রহস্য বিস্ময়কর, অভাবিত। তাই এরশাদ হয়েছে, তোমরা সেই পরম করুনাময় ও অসীম ক্ষমতাধারী আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর সৃষ্টি রহস্য অনুধাবন করতে সচেষ্ট হও। তাঁর দোহাই দিয়েই তোমরা তোমাদের অধিকার উপস্থাপন করো একে অপরের নিকট। একথা বলে 'হক্কুল ইবাদ' (মানুষের অধিকার) সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। এভাবে মানুষের হক আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, 'ভয় করো জ্ঞাতি বন্ধন ছিন্ন করাকে।' এতে করে আত্মীয়তা রক্ষা করার নির্দেশও এসেছে।

হজরত আয়শা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে পাক স. বলেছেন, আত্মীয়তা ঝুলন্ত রয়েছে আল্লাহর আরশের সঙ্গে। সে বলে, যে ব্যক্তি আমাকে সংযোজন

করবে (আত্মীয়তা বজায় রাখবে) আল্লাহ্ সংযোজিত হবেন তার সাথে। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তাকে সম্পর্কচ্যুত করবেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা 'বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সমস্ত সৃষ্টি সম্পাদনের পর আত্মীয়তা ফরিয়াদি হিসাবে দাঁড়ালো। আল্লাহ বললেন, কী চাও? আত্মীয়তা বললো, এই সন্নিধানস্থল নির্বাচিত হোক তার জন্য, যে বেঁচে থাকে আত্মীয়তার সম্পর্কবিচ্ছিন্নতা থেকে। আল্লাহ বললেন, তুমি কি এ কথায় সম্মত যে, আমি তার সঙ্গেই সদাচার করবো যে তোমাকে অটুট ও উন্নত রাখবে। আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছিন্ন করবো? আত্মীয়তা নিবেদন জানালো, হে আল্লাহ্, আমি এতে পুর্ণসম্মত। আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে। এই অঙ্গীকারই বলবত রইল। বোখারী, মুসলিম।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত ইবনে ইসহাক এবং ইবনে আসাকের হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এ রকম, হজরত আদমের সন্তান সন্তুতি ছিলেন চল্লিশ জন। বিশ জন পুত্র এবং বিশ জন কন্যা।

হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী সে নয়, যার সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করা হয়েছে (অর্থাৎ আত্মীয়তা রক্ষা করা হয়েছে বলে আত্মীয়তা রক্ষা করতে হবে এ রকম নয়)। বরং সেই ব্যক্তিই আত্মীয়তা রক্ষাকারী, যে ছিন্ন সম্পর্ককে পুনঃযোজন করে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। বোখারী।

হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে জীবিকার প্রাচুর্য এবং বিলম্বিত মৃত্যুর অভিলাষী সে যেনো আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে উত্তম আচরণে অভ্যস্ত হয়। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমার কতিপয় স্বজন এমন যে, আমি তাদের সঙ্গে সদাচার করতে চাইলেও তারা আমাকে এড়িয়ে চলে। আমি তাদের প্রতি অনুগ্রশীল হলেও তারা আমার ক্ষতিসাধনে লিপ্ত থাকে। আমি তাদের এহেন আচরণকে উপক্ষা করি এবং ধৈর্য ধারণ করি। কিন্তু তারা আমার প্রতি প্রদর্শন করে বর্বরতা। রসুল স. বললেন, তুমি যেন তাদের প্রতি ছাই নিক্ষেপ করছো। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি বর্নিত বৈশিষ্ট্যাবলীকে আশ্রয় করে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত থাকবে, যে তোমাকে তোমার অসৎ আত্মীয়দের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে যাবে। মুসলিম।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।' — এ কথার অর্থ আল্লাহ তোমাদের অবস্থা সম্যক অবগত। অতএব সাবধান হও। অন্যমনস্কতা থেকে বেঁচে থাকো।

মুকাতিল এবং কালাবী বর্ণনা করেছেন, গাতফান গোত্রের এক ব্যক্তি ছিলো তার এতিম ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিপুল বৈভবের রক্ষণাবেক্ষণকারী। প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাদের সম্পদের অধিকার চাইলে সে তাদের সম্পদ দিতে অস্বীকৃত হলো। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত রসুল স. এর গোচরীভূত করা হলে তিনি পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে ডেকে আনলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত —

সুরা নিসা ঃ আয়াত ২

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ○

❒ পিতৃহীনকে তাহাদের ধনসম্পদ সমর্পণ করিবে এবং ভালর সহিত মন্দ বদল করিবে না। তোমাদের সম্পদের সহিত তাহাদের সম্পদ মিশাইয়া গ্রাস করিও না; ইহা মহা পাপ।

এতিমদের সম্পদ সমর্পণের এই নির্দেশ শুনে পিতৃব্য বললেন, আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের অনুসারী। আমরা কবীরা গোনাহ থেকে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। একথা বলে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের সম্পদ সমর্পণ করলেন।

রসুল স. বললেন, যে ঐশ্বর্যলিপ্সা থেকে বিরত থাকে, তাকে আল্লাহ অবশ্যই জান্নাতের প্রবেশাধিকার দিবেন। ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাদের সম্পদ হস্তগত করার পর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করলেন। রসুল স. বললেন, ওদের পুণ্য পুর্ণ হলো। ওদের পিতার সম্পদার্জনও সার্থক হলো (তারও পুণ্য লাভ হলো)। সা'লাবী, বাগবী।

অভিধানগত অর্থে অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক — সকল পিতৃহীনদেরকেই এতিম বলা যেতে পারে। কিন্তু বিখ্যাত কবি উরফীর মতানুসারে এই আয়াতে কেবল অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকেই এতিম বলে নির্দেশ করা হয়েছে। রসুল স. বলেছেন, বালেগ হলে (পিতৃবিয়োগের সময় অথবা পরে) এতিম থাকে না। আর সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত নীরব থাকাকেও রোজা বলে না। এই হাদিসটি উত্তম সূত্রে হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে। কবি উরফীর মন্তব্যের ভিত্তিও এই হাদিস।

আভিধনিক অর্থ যাই হোক না কেনো, এখানে শরিয়তসম্মত অর্থই গ্রহণীয়। এতিমেরা বালেগ হলে নিজেদের সম্পদ নিজেরাই সংরক্ষণের যোগ্য হয়। তাই এ ব্যাপারে আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, যেহেতু এতিমেরা বালেগ হলে আর এতিম থাকে না, তাদের অভিভাবকত্বও হয়ে পড়ে নিষ্প্রয়োজন, তাই তাদের সম্পদ তাদেরকে প্রত্যর্পন করতে হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'নির্বোধদেরকে তাদের সম্পদ দিওনা।' নির্বোধদেরকে (পিতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে) তাদের সম্পদ না দেয়াই সমীচীন। কারণ, সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা তাদের নেই।

একটি সন্দেহঃ বালেগ হওয়ার পর এতিম তো আর এতিম থাকে না। কিন্তু এই আয়াতে বলা হয়েছে, পিতৃহীনকে (এতিমকে) তাদের সম্পদ সমর্পণ করো। তবে বালেগ হওয়ার শর্ত এলো কোত্থেকে?

সন্দেহের অপনোদনঃ আভিধানিক দিক থেকে নাবালেগ, বালেগ — সকল পিতৃহীনই এতিম। আয়াতের নির্দেশ এসেছে আভিধানিক দিক থেকেই। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, নাবালেগ ও বালেগের সীমারেখাতো সম্মিলিতই। বালেগ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তটি নাবালকত্ব। আয়াতের উদ্দেশ্য তাই এরকমই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, বালেগ হওয়ার সাথে সাথেই যেনো তাদের সম্পদ দিয়ে দেয়া হয়। ক্ষণকাল পূর্বেও যে এতিম ছিলো এখন সে আর এতিম নয়, প্রাপ্তবয়স্ক। সুতরাং সদ্য প্রাপ্তবয়স্কদের সম্পদ যেনো যথারীতি সমর্পণ করা হয়।

সম্পদ প্রত্যর্পণের পর নির্দেশ এসেছে, ভালোর সঙ্গে যেনো মন্দ মিশ্রিত না হয়। এতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত অভিভাবকের জন্য তাদের সম্পদ ভোগ করা হারাম। সুতরাং অভিভাবকদেরকে সতর্ক থাকতে হবে — তাদের বৈধ উপার্জিত সম্পদের সঙ্গে যেনো হারাম সম্পদ মিশ্রিত না হয়।

সাইদ বিন জোবায়ের থেকে জুহুরী ও সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, এতিমদের কোনো কোনো অভিভাবক এতিমদের উত্তম সম্পদ নিয়ে তাদের জন্য রেখে দিত নিজের অনুত্তম সম্পদ। কখনো তাদের মোটা তাজা ছাগল নিয়ে রেখে দিত নিজের রুগ্ন অথবা কৃশ ছাগল। ভালো দেরহাম নিয়ে রাখতো খারাপ দেরহাম। এই অসৎ অভ্যাসকে এই আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মুজাহিদ বলেছেন, আয়াতের অর্থ — তাৎক্ষণিকভাবে হারাম রিজিক গ্রহণ কোর না। হালাল রিজিক দানের যে অঙ্গীকার আল্লাহতায়ালা করেছেন, সেই রিজিক অধিকারে আসার পূর্বে হারাম গ্রহণের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ো না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে মন্দ বলতে এতিমদের ধনসম্পদ সংরক্ষণে অবহেলাকে বুঝানো হয়েছে। আর ভালো বলতে বুঝানো হয়েছে, এতিমদের মালামাল যথাসংরক্ষণ করাকে। সময়মতো সম্পদ সমর্পণে প্রস্তুত থাকাকে এবং সঠিক সময়ে আসল মালিকের সম্পদ সামগ্রী ফেরত দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হওয়াকে।

এরপর নির্দেশ এসেছে, এতিমের মাল নিজের মালের সঙ্গে মিশিয়ে আত্মসাৎ কোর না। এ রকম করা মহাপাপ — কবীরা গোনাহ। হজরত ইবনে আব্বাস এ রকমই অর্থ কচ্ছেন। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সাতটি বিধ্বংসী বিষয় থেকে বেঁচে থাকো। রসুল স. সাতটি বিধ্বংসী বিষয়ের মধ্যে এতিমের মাল ভক্ষণ করাকেও গন্য করেছেন। বোখারী, মুসলিম।

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ
مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝

❒ তোমরা যদি আশংকা করো যে, পিতৃহীনদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না তবে বিবাহ করিবে নারীদের মধ্যে যাহাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন অথবা চার; আর যদি আশংকা করো যে সুবিচার করিতে পারিবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। ইহাতেই পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।

ইমাম বোখারী বিশুদ্ধ সূত্রে জুহ্‌রীর বর্ণনা থেকে লিখেছেন, হজরত ওরওয়া বিন জোবায়ের বর্ণনা করেছেন, আমি হজরত আয়শাকে এই আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছেন, এই আয়াতের শুরুতে ওই নারীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে,যারা এতিম অবস্থায় তাদের মুহরিম নয় (যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়) এমন অভিভাবকের অধীনে থাকে - যেমন চাচাত ভাই, সেই অভিভাবক যদি ওই নারীর রূপ ও সম্পদ দেখে বিবাহ করতে চায় তবে মোহরানা হিসাবে মোহরে মেছেল (কমপক্ষে) দিতে সম্মত হতে হবে। (বোন ও ফুফুর বিবাহে যে মোহরানা নির্ধারণ করা হয় তাকে মোহরে মেছেল বলে)। এই আয়াতে অভিভাবকত্বের অধীন নারীকে বিবাহের শর্ত হিসাবে বলা হয়েছে, মোহর পূর্ণ করা ব্যতিরেকে বিবাহ করা যাবে না। এরকম আশংকা থাকলে অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করতে হবে। হজরত আয়শা আরো বলেছেন, যখন মানুষেরা এতিম রমণীদেরকে বিবাহ করার বিষয়ে জানতে চাইল,তখন আয়াত ইয়াসতাফতুনাকা ফিন্নিসা থেকে আনতানতিহু হুন্না পর্যন্ত অবতীর্ণ হলো। এই আয়াতে আল্লাহ পরিস্কার বিবরণ দিয়েছেন যে, রূপসী ও সম্পদশালিনী পিতৃহীনা নারীকে বিবাহ করতে আগ্রহী হয় অনেকেই,কিন্তু উপযুক্ত মোহরানা দিতে চায় না। আবার রূপবতী ও সম্পদবতী না হলে তারা পিতৃহীনাদেরকে বিবাহ করতে আগ্রহ দেখায় না। এরকম হওয়া ঠিক নয়। উভয় অবস্থায় বিবাহ বৈধ হবে কেবল তখনই, যখন তাদের অধিকার মেনে নেয়া হবে এবং যথোপযুক্ত মোহরানা পরিশোধ করা হবে।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, মদীনার কিছু কিছু অভিভাবক তাদের অধীনস্থ এতিমাদেরকে বিবাহ করতো সম্পদের লোভে। অন্য কারো সঙ্গে বিবাহ হলে সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার আশংকাতেই তারা এরকম করতো। অথচ এরকম করা শোভনীয় ছিলো না।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরামা বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আতা'র বক্তব্যে এসেছে, কোনো কোনো কুরাইশ দশটি, আবার কেউ দশের অধিক বিয়ে করতো। তারা যখন স্ত্রীদের ভরণ পোষণ দিতে অসমর্থ হতো তখন এতিমদের সম্পদ খরচ করতো। তাদের এই আচরণকে লক্ষ্য করেই আয়াতে এই নির্দেশ এসেছে যে, তারা যেনো চার জনের অধিক বিয়ে না করে যাতে অধিক খরচ বহন করতে যেয়ে এতিমদের সম্পদ ব্যয় থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়।

এরকমও বলা হয়েছে যে, যখন এতিমদের মাল খরচ করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হলো, তখন এতিমা রমণীদেরকে যথেচ্ছ বিবাহ করার প্রবণতা গেল বেড়ে। যাকে ইচ্ছা বিয়ে করে স্ত্রীদের সংখ্যা বাড়াতে লাগলো মানুষেরা। কিন্তু স্ত্রীদের প্রতি সমবিবেচনা বজায় রাখতো না তারা। তখনই অবতীর্ণ হলো, পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার না করতে পারলে ক্ষান্ত হও। আল্লাহকে ভয় করো। এমন নারীদেরকে বিয়ে কোর যাদেরকে সমবিবেচনায় রাখা সম্ভব। সাঈদ বিন জোবায়ের এই বিবরণটি দিয়েছেন। আরো বর্ণনা করেন ইবনে জারীর, জুহাক এবং সুদ্দী।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, লোকেরা এতিমদের অভিভাবকত্ব করতে কষ্ট অনুভব করতো, কিন্তু গোপনে চলতো অবৈধ প্রণয়। এই অবস্থা দৃষ্টে নির্দেশ এলো বিবেচনাহীনতা থেকে শংকিত হও, বন্ধ করো ব্যভিচার। বরং পছন্দ হলে উপযুক্ত মোহরানা দিয়ে বিবাহ করো। এরকম বক্তব্য রেখেছেন মুজাহিদ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'মা ত্বলাবা লাকুম মিনান্ নিসায়ি'- এর অর্থ এতিম নারীগণ সাবালিকা হয়ে গেলে তাকে বিবাহ করতে পারো। সাবালিকা অর্থ প্রচলিত আরবী ভাষায় খোরমা পাড়ার বয়সে পৌঁছানো। ইমাম বোখারী বলেছেন, এ ব্যাপারে হজরত আয়েশার বর্ণনাকে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এই মত গ্রহণ করলে অর্থ দাঁড়াবে এতিম মেয়েদের বিয়ে কোর না। অন্য সাবালিকাদেরকে বিয়ে করো। এরকমও ব্যাখ্যা করা যায় যে, মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্কা হলে তাদেরকে বিয়ে করো। প্রকাশ্যতঃ এই অর্থ ভুল। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে অর্থ হবে - যে রমণীগণ তোমাদের জন্য হালাল তাদেরকে বিয়ে করো। কিন্তু এ মতও গ্রহণীয় নয়। কেননা কাকে বিয়ে করা হালাল, কাকে বিয়ে করা হালাল নয় - এ সম্পর্কিত আয়াত পরে আসছে। এই মতটি অবশ্য মুজাহিদের তাফসীরেরও অনুকূল। তিনি

বলেছেন, ব্যভিচারকে ভয় করো। আর তোমাদের জন্য যারা হালাল তাদেরকে বিয়ে করো। কিন্তু এ ধরনের তাফসীর পূর্ণ অর্থবোধক নয়। উত্তম এই যে, 'যাকে তোমাদের পছন্দ হয় এবং যার দিকে তোমরা আকর্ষণ বোধ করো, তাকেই বিয়ে করো' — এই ব্যাখ্যাটি অধিকাংশ তাফসীরকারদের অনুকূল। হজরত আয়েশার মতও এরকম, যেমন তিনি এর ব্যাখ্যা হিসেবে বলেছেন, এতিম নারীরা অসহায়, তাদের সাহায্যকারী কেউ নেই। তাই তোমরা যদি তাদের হক আদায় করতে না পারো এবং সুবিচার করতে না পারো - তবে তোমাদের পছন্দানুসারে বিবাহের সিদ্ধান্ত নাও। চাই সে এতিম নাবালিকা হোক অথবা সাবালিকা। এরকম করলে তোমরা সুরক্ষিত থাকবে, জেনা ব্যভিচারের আশংকা থাকবে না। বিবাহের সর্বোচ্চ সংখ্যা চার। তাও শর্তসাপেক্ষ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মাসআলা ঃ বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর আগে কন্যার চেহারা দেখা দরকার। কুফুর বিষয়টিও দেখতে হবে (কুফু অর্থ সমতা, সামঞ্জস্যতা - সামাজিকতা, আর্থিক অবস্থা, রুচিগত অবস্থা ইত্যাকার ক্ষেত্রে)। এটা ঐকমত্য। দাউদ জাহেরী বিয়ের আগে কন্যার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে নেয়াকে বৈধ বলেছেন। হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে চাইলে, দেখে নেয়া জরুরী। যেনো বিবাহের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আবু দাউদ। হজরত মুগীরা বিন শোবা বর্ণনা করেন, আমি এক রমণীকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালাম। রসুল স. বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছো? আমি বললাম, না। রসুল স. বললেন, দেখে নাও। এই দেখাদেখি তোমাদেরকে সম্মিলিত করতে আগ্রহী করে তুলবে। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী।

দুই দুই তিন তিন চার চার পুনঃপৌনিক সংখ্যা থেকে গৃহীত। দুই দুই থেকে দুই। তিন তিন থেকে তিন। চার চার থেকে চার। শব্দগুলি রূপান্তরিত শব্দ। মূলতঃ গায়ের মুনসারিফ উদুল পদ্ধতিতে সিনতাইনি হতে মাসনা (দুই)। আবার সালাস থেকে সুলাসা (তিন)। আরবায়ু থেকে রুবায়া (চার) রূপান্তরিত শব্দ।

মাসআলা ঃ রাফেজীরা বলে একই সাথে নয়জন মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে রাখা বৈধ। আর এই আয়াতকেই তারা দলিল হিসেবে পেশ করে। এরকম বক্তব্যের সম্পর্ক রয়েছে নাখয়ী ও ইবনে আবী লায়লার সঙ্গে। তারা এই আয়াতের 'ওয়াও' কে বহুবচন ধরেছে। এভাবে অর্থ করলে দুই, তিন এবং চারের সম্মিলিত সংখ্যা হয় নয়। খারেজীরা বলে একসঙ্গে আঠারো জনকে বিবাহ বন্ধনে রাখা বৈধ। তাদের মতে যদিও এখানে সংখ্যাগুলো একবচন কিন্তু অর্থগত দিক থেকে তারা দ্বিগুণ ধরেছে। এভাবে নয় এর দ্বিগুণ আঠারো ধরা হয়েছে। রাফেজী ও খারেজীদের বক্তব্য ভুল। খারেজীদের ভুল এই যে, আয়াতের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। এখানে পুনপৌনিকতার অবকাশ নেই। কেউ যদি কতিপয় ব্যক্তিকে বলে এই

দেরহামগুলো থেকে দু'টো দু'টো করে নিয়ে যাও - এর অর্থ হবে প্রত্যেকেই দু'টা করে দেরহাম নাও। দু'টো দু'টো করে চারটি এরকম অর্থ কিছুতেই হবে না। এরকম অর্থ আয়াতের উদ্দেশ্যের বিপরীত। কেননা সকলের পক্ষে দুই, তিন, চার, নয় অথবা আঠারো জন স্ত্রী রাখা অসম্ভব। এ জন্যেই কাশ্‌শাফ প্রণেতা লিখেছেন, দুই, তিন, চার এই শব্দগুলোকে একাকার করে ফেললে কোনো অর্থই বোধগম্য হবে না।

রাফেজীদের মতও ভুল। ভাষা ও সাহিত্যের দিক থেকে নয় সংখ্যাকে নির্দেশ করতে দুই, তিন, চার এরকম বলা শোভনীয় নয়। তাদের মতানুসারে অর্থ দাঁড়ায় এরকম - দুইয়ের অধিক, তিনের অধিক, চারের অধিক বিবাহ করা বৈধ।

বায়যাবী আও এর পরিবর্তে ওয়াও উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করেছেন এরকম - 'আও' বললে সংখ্যাগত বৈধতা সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকতো না। কিন্তু এরকম সন্দেহ উত্থাপিত হতো যে, 'ওয়াও' এর কারণে একতা তাহলে কোথায়?

প্রকৃত কথা এই যে, 'ওয়াও' অথবা 'আও' যাই হোক না কেনো,এখানে ধারণা ও উদ্দেশ্য একই রকম। এমন যেনো মনে করা হয় যে, সমস্ত উম্মতকে দুই, তিন, চার - এই তিন প্রকারের কোনো এক প্রকারে একমত হবে। কিন্তু প্রকার এখানে বিভিন্ন। বহুবচনের পাশাপাশি উল্লেখিত হলে 'ওয়াও' বা 'এবং' শব্দ দ্বারা সংখ্যাগুলোকে সংযুক্ত করাই সমীচীন। হুকুমটি যখন সাধারণ, তখন একথা সহজেই অনুমেয় যে, সকলেই নয় - কেউ কেউ দু'টি, কেউ তিনটি এবং কেউবা চারটি পর্যন্ত বিবাহ করতে পারবে।

<u>মাসআলা</u> ঃ আয়েম্মায়ে আরবা (চার ইমাম- ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ) এবং জমহুরের অভিমত, একত্রে চার স্ত্রীর বেশী বিবাহ করা বৈধ নয়।

কেউ কেউ বলে, বৈধ বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। যতজনকে ইচ্ছা ততজনকেই বিবাহাধীনে রাখতে পারবে। কেননা আয়াতে চারের অধিক বিয়ে করতে পারবে না - এরকম নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়নি। যেমন, এরকম বলা হয়ে থাকে- এই সমুদ্র থেকে যতটুকু ইচ্ছা পানি সংগ্রহ করো, এক মশক, দুই মশক কিংবা তিন মশক। এক্ষেত্রে অধিক গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা নেই। এই আয়াতেও সেরকমই চারটি বিবাহের বৈধতা স্বীকৃত হয়েছে; কিন্তু চারের অধিককে অস্বীকার করা হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই আয়াতটি পেশ করা যায়, 'জায়িলিল মালাইকাতি রসুলান উলি আজনিহাতিন মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবায়া'- এই আয়াতটিতে আরবা অর্থাৎ চার শব্দটির উল্লেখের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট নয় যে, ফেরেশতাদের পাখা চারটির অধিক হবেই না। বরং রসুল স. হজরত জিব্‌রাইলের ছয়শত পাখা দেখেছিলেন বলে সহীহ্ হাদীসের বর্ণনায় এসেছে। আলোচ্য এই আয়াতটিতেও

সেরকমই সংখ্যাসীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, 'ওয়া উহিল্লা লাকুম মা ওয়া রাআ জালিকুম' (এই নারীরা ব্যতীত অন্য নারীদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে)। অন্য আরেক আয়াতে এরশাদ করেছেন, 'ওয়াল মুহসনাতি মিনাল মু'মিনাতি ওয়াল মুহসিনাতি মিনাল্লাজিনা উতুল কিতাব' (এবং নিজেদের মধ্য থেকে মুসলমান ক্রীতদাসীদেরকে ও আহলে কিতাবীদের সতীসাধ্বী রমণীদেরকে)। সহীহ্ হাদিসে একথাও প্রমাণিত হয়েছে রসুল স. এর বিবাহাধীনে নয় জন স্ত্রী ছিলেন। এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো দলিলের প্রয়োজন ছিলো। নতুবা বিশেষভাবে সংখ্যা নির্দিষ্ট করার যৌক্তিকতা নেই।

আমরা বলি যে, এই আয়াত নাজিল হয়েছে কায়েস বিন হারেস সম্পর্কে। বাগবী লিখেছেন, কায়েস বিন হারেসের আটজন স্ত্রী ছিলেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. তাকে বললেন, চার জনকে তালাক দিয়ে দাও এবং চার জনকে রাখো। কায়েস বলেছেন, আমি স্ত্রীদের মধ্যে যারা সন্তানবতী তাদেরকে রাখলাম এবং নিঃসন্তানদেরকে ছেড়ে দিলাম। রসুল স. বললেন, এই হলো আয়াতের বিবরণ। আল্লাহ্র কথা ও উদ্দেশ্য তিনিই সবচেয়ে ভালো বুঝতেন। এই ঘটনার দ্বারা বোঝা যায় যে, বিবাহ মূলে হালাল নয় হারাম। হ্যাঁ, ততোটুকু হালাল যতোটুকু আল্লাহ্ হুকুম করেছেন। যেমন, সুরা বাকারার এক আয়াতে এসেছে, 'যখন তারা উত্তমরূপে পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তোমরা গমন কোরওই পথে যে পথে যেতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন'- এই স্থানের তাফসীরে আমরা যথা স্থানে বলে দিয়েছি- বিবাহ আসলে হালাল নয়, আল্লাহ্র অনুমোদন ব্যতীত। 'ওয়া উহিল্লা লাকুম মা ওয়া রাআ জালিকুম' এই আয়াতের উদ্দেশ্য - উল্লেখিত হারাম নারী ব্যতীত অন্যদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। এখানে যেমন সংখ্যার নির্দিষ্টতা নেই তেমনি সকল নারী হালাল হওয়ার প্রমাণও নেই (বোঝা যায় না নিষিদ্ধ নারী ব্যতীত অন্য নারীদেরকে যতোখুশী ততো বিয়ে করা যাবে- আবার একথাও বোঝা যায় না যে, কেবল চার জনই হালাল)। 'ওয়াল মুহসিনাতি মু'মিনাত' এই আয়াতে বহুবচনের বিরুদ্ধে রয়েছে বহুবচনের ব্যবহার।

আলোচ্য আয়াতটি কেবল বিবাহ হালাল হওয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি। বরং অবতীর্ণ হয়েছে বিবাহের সংখ্যা নিরূপণ প্রসঙ্গে। বিবাহ হালাল হওয়ার বিষয়টি অন্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আর এই আয়াতটি কেবলই সংখ্যা নিরূপক।

চারের অধিক বিবাহ বৈধ না হওয়া প্রসঙ্গটি হজরত ইবনে ওমরের বর্ণিত হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। গায়লান বিন সালমায়ে সাকাফী যখন মুসলমান হলেন, তখন তার অধিকারে ছিলো দশজন স্ত্রী। তাঁরাও মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। রসুল স. বললেন, চারজনকে রেখে অবশিষ্টদেরকে ছেড়ে দাও। শাফেয়ী, আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত নওফেল বিন মুয়াবিয়া বলেন, ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে আমার ছিলো পাঁচজন স্ত্রী। বিষয়টি আমি রসুল স. এর গোচরীভূত করলাম। তিনি স. বললেন, চারজনকে রাখো, একজনকে ছেড়ে দাও। আমি তখন ছেড়ে দিলাম আমার সবচেয়ে প্রবীণা এবং বন্ধ্যা স্ত্রীটিকে। বাগবী শরহে সুন্নায় বলেছেন, সর্বাধিক চারজনকে বিবাহ করার ব্যাপারে রয়েছে উম্মতের ঐকমত্য। এই ঐকমত্যবিরোধী সকল অভিমত পরিত্যাজ্য।

মাসআলা ঃ ইসলাম গ্রহণের পর যদি দেখা যায় কারো চারের অধিক স্ত্রী রয়েছে এবং তাঁর স্ত্রীরাও যদি হয় মুসলমান কোনো আহলে কিতাবী - তবে তাকে চারের অতিরিক্ত স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে হবে। যদি দেখা যায় দুই সহোদরা বোন বিবাহাধীনে রয়েছে, তখন যে কোনো একজনকে রেখে অন্যজনকে ছেড়ে দিতে হবে। কন্যা ও মাতা একই সঙ্গে বিবাহাধীনে থাকলে যে কোনো একজনকে রেখে অন্যকে পরিত্যাগ করতে হবে। এরকম বলেছেন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম মোহাম্মদ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সকল স্ত্রীকে যদি একই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বিবাহ করা হয়ে থাকে, তবে সকলকেই ছেড়ে দিতে হবে (এরকম স্বীকারোক্তি অগ্রহণীয়)। একে একে বিবাহ করে থাকলে প্রথমজন স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। এভাবে চারজন পূর্ণ হওয়ার পর বাকীরা পরিত্যক্ত হবে। দুই বোনের ক্ষেত্রে প্রথমজন পরিত্যক্ত হবে। মা ও মেয়ের ক্ষেত্রে উভয়ের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।

বর্ণিত হাদিস সমূহে দেখা যায় রসুল স. দুই বোনের যে কোনো একজনকে বিবাহের জন্য নির্ধারণ করার অধিকার দিয়েছেন। এই বর্ণনা এবং নিম্নের বর্ণনা ইমাম আবু হানিফার অভিমতের বিরুদ্ধে যায়। জুহাক বিন ফিরোজ দায়লামী তার পিতার মাধ্যমে বলেছেন, জুহাকের পিতা বলেন, আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি মুসলমান হয়েছি। দুই বোন রয়েছে আমার বিবাহাধীনে। তিনি স. বললেন, যাকে পছন্দ করো তাকে রেখে অন্যজনকে ছেড়ে দাও।

মাসআলা ঃ তিন ইমামের মতে গোলামের জন্য স্ত্রী রাখা বৈধ নয়। ইমাম মালেকের মতে গোলামও সর্বোচ্চ চারজনকে একই সঙ্গে স্ত্রী হিসাবে রাখতে পারবে। কারণ এই আয়াতের সংখ্যা নির্দেশনায় আজাদ, গোলাম সবাই শামিল।

নির্দেশটি সাধারণ। স্বাধীন কিংবা ক্রীতদাস - কারো কথাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি। দাউদ জাহেরী এবং রবীয়াও এরকম বলেছেন।

আমরা বলি, এই আয়াতের নির্দেশটি স্বাধীন পুরুষদের জন্য। কেবল তারাই সর্বোচ্চ চারজনকে বিয়ে করতে পারবে। বলা হয়েছে, যদি সুবিবেচনা না করতে পারো, তবে একজনকে বিয়ে কোর, কিংবা অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসীকে। এখানে স্পষ্ট

হয়ে উঠেছে যে, নির্দেশটি কেবল স্বাধীন পুরুষদের জন্য।ক্রীতদাসীরা তাদেরই অধিকারে থাকে। ক্রীতদাসের কোনো অধিকার বা মালিকানা নেই।

ইবনে জাওজী নিশ্চিতির সঙ্গে লিখেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, গোলাম দুই স্ত্রী রাখতে পারবে। তালাক দিতে চাইলে দুই তালাক দিবে। তালাকপ্রাপ্ত বাঁদীর ইদ্দত পালনের সময় দুই হায়েজ বা দুই ঋতুস্রাব পর্যন্ত। বাগবীও এরকম লিখেছেন। আরো বলেছেন, হায়েজ না হলে দুই অথবা দেড় মাস ইদ্দত পালন করবে। ইবনে জাওজী হাকেমের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এরকম, সাহাবীগণের ঐকমত্য এই যে, ক্রীতদাস দুই এর অধিক স্ত্রী রাখতে পারবে না। ইবনে আবী শায়বা, বায়হাকী।

মাসআলা ঃ স্ত্রীদের সমঅধিকার নিশ্চিত করতে পারলে অধিক বিবাহ উত্তম। যৌনবাসনা অনিয়ন্ত্রণের আশংকা থাকলে অধিক বিবাহ ফরজ। তবে সমবিবেচনার নিশ্চিতি থাকতে হবে। যৌনাকাংখা চরিতার্থ করা একমাত্র উদ্দেশ্য না হলে অধিক বিবাহ হবে সুন্নত। এরকম ক্ষেত্রেও সমবিবেচনা জরুরী। ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, হে যুবক সম্প্রদায়- যারা বিবাহের যোগ্য তারা বিয়ে করে নাও। যদি অযোগ্য হও তবে রোজা থাকো। এটাই তোমাদের জন্য খাসী হওয়া (খাসী বা নপুংসক হওয়া বৈধ নয়; বিবাহের সুযোগবঞ্চিতদেরকে তাই রোজা প্রতিপালনের মাধ্যমে যৌনাকাংখাকে অবদমিত রাখতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে - এটাই ব্যাভিচারাশংকা থেকে বেঁচে থাকার উপায়)। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আমি রোজা রাখি এবং রোজা থেকে বিরতও থাকি। আর আমি বিবাহিতও। আমার এই আদর্শের বাইরের লোকেরা আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। হজরত আনাস আরো বলেছেন, রসুল স. বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। অবিবাহিত জীবনকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, ওই রমণীদেরকে বিয়ে কোর যারা স্বামীঅন্তপ্রাণ এবং অধিক সন্তানবতী। কিয়ামতের দিন আমি আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য নবীর উম্মতকে অতিক্রম করবো। আহমদ।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেন, রসুল স. উকাফ বিন খালেদকে বললেন, তোমার স্ত্রী আছে? তিনি বললেন, না। রসুল স. বললেন, ক্রীতদাসী? উকাফ বললেন, তাও নেই। তিনি স. বললেন, তুমি কি সম্পদশালী নও? উকাফ বললেন, হাঁ, আমি সম্পদশালী। তিনি স. বললেন, তুমি কি শয়তানের মতো হতে চাও? তোমার মতো স্ত্রী-পুত্রবিহীনরা আমাদের আদর্শানুসারী নয়। তোমরা জীবন বিমুখ। তোমরা শয়তানের জনক।

দাউদ জাহেরী বলেছেন, বিবাহ করা ফরজে আইন। তবে শর্ত হলো পৌরুষ থাকতে হবে। তার সঙ্গে থাকতে হবে স্ত্রীর প্রতিপালনযোগ্যতা। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

এই আয়াতের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে 'পক্ষপাতিত্ব' প্রসঙ্গটি। হজরত আয়শা থেকে ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, পক্ষপাতিত্ব না করা অর্থ হক বিন্না করা - বিশেষ কোনো দিকে ঝুঁকে না পড়া - সুবিবেচনা বিমুখ হওয়া - উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের যথাবন্টন নিশ্চিত না করা ইত্যাদি। মুজাহিদ বলেছেন, পক্ষপাতিত্ব না করার অর্থ পথভ্রষ্ট না হওয়া। ফারা বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহর নির্ধারিত ফরজ অতিক্রম না করা। আভিধানিক অর্থ এরকমই হয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এর অর্থ অধিক সন্তান যেনো না হয় (অধিক সন্তানসন্তুতির ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা বেশী)। এই অর্থটিও আভিধানসম্মত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এটা ইয়ামানীদের ভাষাভঙ্গিসম্মত অর্থ। বায়যাবী বলেছেন, ওই ব্যক্তি স্ত্রী ও সন্তান সন্তুতির ভার উত্তোলনকারী অর্থাৎ পরিবারের সদস্যসংখ্যা অধিক হওয়ায় তার ব্যয়ভারও অধিক। এরকম অবস্থায় সম্পদস্বল্পতাই শেষ পর্যন্ত পক্ষপাতিত্বহীনতাকে প্রতিহত করতে পারে। তাই এই আয়াতের শেষে অধিক বিবাহ থেকে বিরত থাকার সুপরামর্শ দেয়া হয়েছে। ক্রীতদাসী বিবাহের উৎসাহদানের কারণও তাই। ক্রীতদাসীরা স্বাধীন নারীদের তুলনায় কমসংখ্যক সন্তান ধারণ করে। আর তাদের সঙ্গে আজল করাও (সঙ্গমস্থলের বাইরে বীর্যপাত ঘটানো) বৈধ। দুই, তিন কিংবা চারটি বিয়ে করলে পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক হবার সম্ভাবনা। আর এরকম ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বহীনতা বজায় রাখা দুষ্কর। তাই এক স্ত্রী অথবা দাসী বিবাহের মাধ্যমে সংযত হতে বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, 'ইহাতেই পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।'

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا ○

❒ এবং তোমরা নারীদিগকে তাহাদের মোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করিবে; সন্তুষ্টচিত্তে তাহারা মোহরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলে তোমরা তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবে।

কালাবী ও আলেমদের একটি দল বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মেয়েদের অভিভাবকদেরকে লক্ষ্য করে। ইবনে আবী হাতেম, আবু সালেহ এর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এরকম, কোনো কোনো অভিভাবক কন্যাদের বিয়ের

মোহরানা নিজেদের অধিকারভূত করতো। কন্যারা মোহরানা বঞ্চিত হতো। অভিভাবকদের এই মোহরানা আত্মসাৎ নিষিদ্ধ করতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, বিয়ের পর যে মেয়েরা অভিভাবকের গৃহে বসবাস করতো - তাদের মোহরানা অভিভাবকেরাই আত্মসাৎ করতো। আর যারা স্বামীর ঘরে যেতে চাইতো তাদেরকে একটি উটে চড়িয়ে স্বামীগৃহের দিকে রওয়ানা করিয়ে দেওয়া হতো। ওই উটটিই পেতো তারা। মোহরানার অর্থ পেতো না।

হজরত খাজরামী রা. বলেছেন, কোনো ব্যক্তি বা ওলী কোনো মেয়েকে এভাবে বিয়ে দিতো যে, যার সঙ্গে বিয়ে করানো হলো, তার পরিবারভূত কাউকে সেই ব্যক্তি বা ওলী বিয়ে করে নিতো - যা বদলী বিয়ে হিসেবে স্বীকৃত হতো এবং কোনো পক্ষেই মোহরানা আদায় করা হতো না। পরে এটা নিষেধ করা হয়েছে এবং মোহর নির্ধারিত হয়েছে।

মাসআলা ঃ ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের নিকট বদলী বিবাহ নিষি্দ্ধ। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বিবাহের স্বীকারোক্তির সময় যদি বলা হয় - যে কন্যাদের বদলী করা হবে তাদের লজ্জাস্থান একে অপরের মোহর তাতে উভয় বিবাহই বাতিল হবে। আর যদি বলে, আমি আমার কন্যার বিবাহ তোমার সাথে এই শর্তে দিচ্ছি যে, তোমার কন্যার বিবাহ আমার সাথে মোহর ব্যতীতই দিবে। দ্বিতীয় জন যদি তার উত্তরে বলে - আমি আমার কন্যার বিবাহ তোমার সঙ্গে দিলাম। এরকম করলে উভয় বিবাহই বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু উভয়কেই মোহরে মেসাল পরিশোধ করতে হবে। অবশ্য ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন- এরকম করলেও বিবাহ বাতিল হবে। প্রকৃতপক্ষে এরকম বিবাহ বদলী বিবাহ বলে গণ্য। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এরকম অবস্থাকে বদলী বিবাহ বলেন না। আর ইমাম আবু হানিফা বলেন, লজ্জাস্থান বদল অথবা মোহর ব্যতীত কন্যা বদল উভয় প্রকার স্বীকারোক্তিতেই বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই মোহরে মেসাল অবশ্যম্ভাবী হবে। যদি কেউ বলে আমি আমার কন্যার বিবাহ তোমার সাথে এই শর্তের উপর দিচ্ছি যে, তুমি তোমার কন্যার বিবাহ আমার সঙ্গে দিবে। যদি তার কথায় মোহর ব্যতীত অথবা মোহর সহ কোনো কিছুরই উল্লেখ না থাকে, তবে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে — এ ব্যাপারে চার ইমামই একমত। এরকম বিয়ে বদলী বিয়ে নয়। এরকম যদি কেউ বলে যে, আমার কন্যার গুপ্তস্থান তোমার কন্যার মোহর। তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় জন যদি মুখে কিছু না বলে প্রথম জনের সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ মোহরের উল্লেখ ব্যতীত সম্পন্ন করে, তবে দ্বিতীয় জনের বিয়ে বিশুদ্ধ হবে বলে ইমামগণ একমত হয়েছেন। কিন্তু মোহরের উল্লেখ না থাকলেও মোহরে মেসাল দিতেই হবে। হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিস দ্বারা

একথা প্রমাণিত যে, বদলী বিবাহ নিষিদ্ধ। এই হাদিস উল্লেখ করেছেন বোখারী ও মুসলিম। আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাও এরকম বলেছেন। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, ইসলামে বদলী বিবাহ নেই। এই হাদিস দৃষ্টে একথা স্পষ্ট যে, বদলী বিবাহ সম্পূর্ণতঃই নিষিদ্ধ (এরকম বিবাহের পর মোহরে মেসাল পরিশোধ করলেও শুদ্ধ হবে না)। বিষয়টি যৌক্তিকতাবিরোধী। মোহরানা কন্যাদের প্রাপ্য, কিন্তু এক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের মালিক তাদের স্বামীরা। লজ্জাস্থানকে মোহর ধরা হলে স্বামীরাই মোহরের (লজ্জাস্থানের) অধিকারী হয় — কন্যারা থাকে বঞ্চিত। তাই এ ধরনের বিবাহ বাতিল।

এর উত্তরে হানাফীগণ বলেছেন, বদলী বিবাহের দু'টি অংশ। ১. মোহরের অনুপস্থিতি ২. গুপ্তস্থানকে মোহর সাব্যস্ত করা। দু'টি অংশই বিবাহের বৈধতা বিরোধী। কিন্তু মোহরে মেসাল পরিশোধ করলে আর অবৈধতার সুযোগ থাকে না। কারণ, তখন নিষিদ্ধতার রূপটি অপসৃত হয়। প্রকৃত অর্থে বিবাহ সবসময়ই বৈধ। কন্যা বদল করা হলেও। বদলী নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো মোহরানা উল্লেখ না থাকার কারনে। তাই মোহরে মেসাল পরিশোধের পর বিবাহের অশুদ্ধতা থাকে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরো বলা যায় - কোনো বিবাহে শরাব এবং শুকরকে যদি মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়, তবুও বিবাহ বাতিল হবে না; যদি মোহরে মেসাল পরিশোধ করা হয়। বরং বিবাহের বৈধতা দিতে গেলে এক্ষেত্রে মোহরে মেসাল ওয়াজিব। সুতরাং বোঝা গেলো, বদলী বিবাহের ধরন দু'রকমের। প্রথম ধরনটি লজ্জাস্থানকে মোহর নির্ধারণ করা এবং মোহরের উল্লেখ মাত্র না করা, এরকম বিবাহ অবশ্যই বাতিল। আমরা কখনো বলি না যে, এরকম বিবাহ বৈধ। বৈধ বলি দ্বিতীয় ধরনটিকে, যেখানে মোহরে মেসাল পরিশোধ করাকে অপরিহার্য বলা হয়েছে। এই আয়াতে পুরুষদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেনো তারা তাদের স্ত্রীদের মোহরানা পরিশোধ করে।

মোহরানা দিতে বলা হয়েছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, আনন্দচিত্তে। যে সম্পদ অনুগ্রহ করে আল্লাহ দিয়েছেন, সেই সম্পদ থেকে। অন্য কারো সম্পদ থেকে নয়। অথবা সন্দেহজনক সম্পদও নয়। আবু ওবাদা বলেছেন, এই দান হয় সুনির্দিষ্ট । কেউ কেউ বলেছেন, এই দান উপহার স্বরূপ। অর্থাৎ বিবাহিতাদের প্রতি এ হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার মেহেরবাণী। আর আল্লাহ্‌তায়ালার নির্ধারিত এ দান (মোহর) পরিশোধ করা বিবাহিতদের জন্য ফরজ। তাই হজরত কাতাদা বলেছেন, আয়াতের নিহ্‌লাতান শব্দের অর্থ ফরজ। ইবনে জারীর বলেছেন, মোহারানা নির্ধারণ করা ফরজ। জুযাজ বলেছেন, এ হচ্ছে কর্জ বা দায়- যা পরিশোধ করতেই হবে। অতএব, অর্থ দাঁড়াচ্ছে এরকম - যেহেতু এটা আল্লাহ্‌তায়ালার নির্ধারিত নিয়ম,তাই তোমরা স্ত্রীদেরকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মোহরানা প্রদান করো।

স্ত্রীগণ মোহরানার পূর্ণ হকদার একথা প্রমাণের পর বলা হয়েছে, স্ত্রীরা যদি স্বেচ্ছায় মোহরানার কিছু অংশ ছাড় দেয়, তবে তাকেই যথেষ্ট মনে করতে হবে। এর বেশী আশা করা সিদ্ধ নয়। এর অধিক অথবা সম্পূর্ণ মোহর ক্ষমা পাবার আশা করা যাবে না। ছাড় দেয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণতঃই পাওনাদারের ইচ্ছাধীন। সুতরাং পাওনাদারের ইচ্ছাকেই মান্য করতে হবে। ছাড়কৃত অংশ ভোগ করতে অবশ্য কোনো বাধা নেই। এটা ক্ষতিকর নয়, অবৈধও নয়।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ○

❒ তোমাদের সম্পদ, যাহা আল্লাহ্ তোমাদের উপজীবিকা করিয়াছেন, তাহা নির্বোধদিগের হাতে অর্পণ করিওনা; উহা হইতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে।'

নির্বোধদেরকে সম্পদ অর্পন না করার এরশাদ হয়েছে এই আয়াতে। নির্বোধ বলে বোঝানো হয়েছে স্ত্রী ও শিশুদেরকে। কারণ, শরিয়তের দৃষ্টিতে মেয়েরা ও শিশুরা বুদ্ধিগত দিক থেকে দুর্বল। জুহাক, মুজাহিদ, জুহুরী এবং কালাবী এরকমই বর্ণনা দিয়েছেন। সম্পদ হচ্ছে জীবনের প্রয়োজনীয় উপজীবিকা। এই নিয়ম নির্ধারণ করেছেন আল্লাহ্ই। জীবনের বিভিন্নমুখী প্রয়োজন মেটাতে সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জুহাক বলেছেনে, সম্পদ প্রয়োজনীয় জীবিকা এই অর্থে যে, হজ, জেহাদ এবং দোজখাগ্নি থেকে পরিত্রাণের জন্য দান-সদকা সম্পদের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

হজরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে সম্পদ আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন, জীবন ধারনের উপকরণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা স্ত্রী ও সন্তানদের অধিকারে দিয়ো না। অন্যথায় তারা তোমার বিরুদ্ধবাদী হবে। সুতরাং তোমার হাতকে সংযত রাখো এবং একে আপন অধিকারে রাখো এবং একে ব্যবহার কোর যথাপ্রয়োজন মেটাতে। পরিবার পরিজনদের পানাহার ও পরিচ্ছদের প্রয়োজন পূর্ণ করো। তাদের সঙ্গে কোর সঙ্গত আচরণ। তাদের সন্তোষ সাধন কোর ও সদালাপী হয়ো।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের এবং ইকরামা বলেছেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য ওই সমস্ত এতিম যারা তোমাদের প্রতিপালনাধীন, তাদেরকে ধনসম্পদ দিয়ো না। তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ কোর নিজ দায়িত্বে। আয়াতে 'তোমাদের সম্পদ'

বলে এতিমদের সম্পদ বোঝানো হয়েছে, যা বর্তমানে তোমাদের অধিকারাধীন। বর্তমানে তোমরাই তাদের সম্পদের সংরক্ষক এবং এক হিসেবে সাময়িক মালিক। এখানে আরেকটি উদ্দেশ্য এই হয়েছে যে, মূল সম্পদ তাদেরকে হস্তান্তর কোরনা অথবা তাদের জন্য খরচ কোর না। অন্যথায় সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই তাদের সম্পদকে ব্যবসায় বিনিয়োগ কোর এবং তার মুনাফা দ্বারা তাদের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ করো।

জ্ঞাতব্য ঃ বায়হাকী এবং হাকেম বিশুদ্ধ সূত্র পরম্পরায় উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিন প্রকার ব্যক্তি এমন, তারা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবে কিন্তু তাদের দোয়া কবুল করা হবে না। ১. ওই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতা সম্পর্কে নিঃসন্দিহান হয়েও তাকে পরিত্যাগ করে না। ২. ওই লোক, যার কাছে অন্যের আমানত গচ্ছিত আছে কিন্তু গচ্ছিত সম্পদ ফেরত চাইলে সে অস্বীকার করে। ৩. ওই ব্যক্তি যে নির্বোধদেরকে সম্পদ অর্পণ করে। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন, নির্বোধদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ো না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝

❒ পিতৃহীনদিগের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহ-যোগ্য হয় এবং তাহাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখিলে তাহাদের সম্পদ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবে। তাহারা বড় হইয়া যাইবে বলিয়া অন্যায়ভাবে উহা তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিও না। যে অভাবমুক্ত সে যেন যাহা অবৈধ তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাহাদিগকে তাহাদের সম্পদ সমর্পণ করিবে তখন সাক্ষী রাখিও। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

লক্ষ্য রাখতে হবে এতিমেরা প্রাপ্তবয়স্ক হলো কিনা। প্রথমে অল্প কিছু সম্পদ দিয়ে দেখতে হবে তাদের সম্পদ ব্যবহারের প্রকৃতি কী; ব্যবসায়িক লেনদেন তারা

কীভাবে করছে। এর মধ্যে তাদের বুদ্ধিমত্তা ধরা পড়বে। একথা বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ব্যবসায়িক পরীক্ষা নেয়ার প্রয়োজন নেই, এই আয়াতে লক্ষ্য রাখা বলতে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, বিয়ে করার পূর্বেই যেনো তাদের সম্পদ ফেরত দেয়া হয়। এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফার অভিমতই অধিক গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়েছে।

লক্ষ্য রাখতে হবে এতিমেরা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা। ছেলেদের জন্য যৌনউত্তেজনা ও বীর্যস্খলন শুরু হয়েছে কিনা। আর মেয়েদের জন্য ঋতুস্রাব এবং গর্ভধারনের যোগ্যতা এসেছে কিনা। ছেলে ও মেয়ে এ অবস্থায় না পৌঁছলেও তাদের বয়স যদি পনের বছর হয়, তবে তাদেরকে সাবালক সাবালিকা ধরতে হবে। এরকম বলেছেন ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবু ইউসুফ। একটি বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম। এর উপর ফতোয়াও হয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার অধিক বিদিত অভিমতটি এই যে, মেয়েদের জন্য সতের এবং ছেলেদের জন্য আঠার বা উনিশ হলে প্রাপ্ত বয়স্ক ধরতে হবে। জমহুর মাসআলার প্রমাণ স্বরূপ হজরত আনাস থেকে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, ছেলে মেয়েদের বয়স পনের বছরে পৌঁছলে তাদের পাপপুণ্য লেখা হয় এবং প্রয়োজন হলে তাদের প্রতি শরিয়তসম্মত শাস্তি আরোপ করা যায়। এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। হাদিসের সনদ অবশ্য শিথিল। সহীহাইনে হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, উহুদ যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিলো চৌদ্দ। তখন যুদ্ধে যেতে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও রসুল স. আমাকে অনুমতি দেননি। পরে খন্দক যুদ্ধে অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন আমি পনের পেরিয়েছি।

ইমাম আহমদ বলেছেন, যৌনকেশ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার একটি আলামত (মুশরিক ও মুমিন উভয়ের জন্য)। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মুশরিকদের এই আলামত দেখতে যাওয়া মুসলমানদের দায়িত্ব নয়। এই দুই ধরনের বর্ণনাই এসেছে ইমাম শাফেয়ী থেকে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যৌনকেশ পরীক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের পক্ষে রয়েছে ওই হাদিসটি যার বর্ণনা এসেছে সুনান গ্রন্থে, ইবনে হাব্বান, হাকেম এবং জুহাকের মাধ্যমে। তিরমিজি হাদিসটিকে সহীহ্ বলেছেন। বর্ণিত হয়েছে, আতীয়া কারজী বলেছেন, বনু কোরায়জাদের যে দিন বন্দী করে হত্যার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আমি বালক মাত্র। আমি সাবালক না নাবালক তা নিয়ে সন্দেহ উত্থাপিত হয়েছিলো। রসুল স. তখন হুকুম দিলেন পরীক্ষা করে দেখো, তার যৌনকেশ উদগত হয়েছে কিনা। আমাকে তখন পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিলো। আমি তখন যৌনকেশবিহীন ছিলাম বলে হত্যা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলাম। ঠাঁই পেয়েছিলাম বন্দীদের দলে।

এতিমদের ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান হলো কিনা তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আয়াতের 'রুশদা' শব্দটির অর্থ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ এরকমই বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী অর্থ করেছেন, তাদের বিষয় সম্পত্তির উন্নতি করার চেষ্টা আছে কিনা এবং দ্বীনধর্ম প্রসঙ্গে তাদের সহায়তা চিন্তা আছে কিনা।

বায়হাকী, আলী বিন তালহার সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যানুযায়ী শব্দটির অর্থ উপস্থাপন করেছেন এরকম - তাদের মধ্যে দ্বীনের পূর্ণতা এবং সম্পদ সংরক্ষণের ন্যূনতম যোগ্যতা আছে কিনা। ইমাম সাওরী মানসুরের বর্ণনা এবং মুজাহিদের বক্তব্য থেকে এরকমই অর্থ গ্রহণ করেছেন। বায়হাকী এই অভিমতকে সম্পৃক্ত করেছেন ইয়াজিদ বিন হারুন এবং হিশাম বিন হাস্সানের বর্ণনা সূত্রে হাসান বসরীর বক্তব্যের সঙ্গে। এখানে মতবিরোধের কারণ এই যে, ইমাম শাফেয়ীর অভিমতানুসারে যারা ফাসেক (ধর্মপ্রাণ নয়), তারা ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান রাখে না। অন্যেরা বলেন, ফাসেকরাও ভালোমন্দের জ্ঞানসম্পন্ন।

আয়াতের নির্দেশে এসেছে, সাবালক হলে এতিমদের সম্পত্তি দিতে দেরী কোরনা। তবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে তাদের প্রাপ্তবয়স্কতা নিশ্চিত কিনা। প্রাপ্তবয়স্কতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার বিষয়টিও রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ এবং সাহেবাইন (ইমাম ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ) বলেছেন, জ্ঞানম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তি হস্তান্তর কোর না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, পঁচিশ বছরে পৌছলে সম্পত্তি দিতেই হবে। জ্ঞানানুভুতি জাগ্রত হোক কিংবা না হোক। কেননা নিষিদ্ধতা ছিলো শৈশবস্থার জন্য। যৌবনে পৌছলে আর নিষিদ্ধতা থাকে না। ইমাম সাহেবের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এরকম — শৈশব থেকে যৌবনে পৌছলে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়াই নিয়ম। তারপর যদি জ্ঞানানুভুতি লোপ পায় (অসুস্থতার কারণে) — তবু তাকে প্রাপ্তবয়স্ক বলেই মেনে নিতে হবে। কারণ, এই জ্ঞানস্বল্পতার কারণে সে আর শৈশবে ফিরে যায় না। যুবকই থাকে। তিনি আরো বলেছেন, রুশদান শব্দটির শেষ অক্ষরের তানবীন্ (দুই যবর) ন্যূনতম জ্ঞানকে নির্দেশ করেছে। সুতরাং এর অর্থ হবে, জ্ঞানের উন্মেষকালেই সম্পদ প্রত্যর্পণ কোর। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা কোর না। আর পঁচিশ বছরে পৌছলে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া নিশ্চিত। এই বয়সে কম হোক বেশী হোক জ্ঞানলাভ হবেই। কাজেই এর বেশী কিছুতেই অপেক্ষা কোর না। বিষয়সম্পত্তি অর্পণের নিষিদ্ধতা ছিলো আদবজ্ঞানের অভাবে। কিন্তু এই বয়সে আদবজ্ঞানের অভাব থাকে না। তাই সম্পদ প্রত্যর্পণ করা জরুরী।

মাসআলা ঃ জ্ঞানসম্পন্ন না হলে তাকে সম্পদ দেয়া যাবে না। সে ক্রয়-বিক্রয়, গোলাম আজাদ - কোনোকিছুই করতে পারবে না। এই অভিমত দিয়েছেন ইমাম

শাফেয়ী। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, যে জ্ঞান সম্পন্ন নয় তার ক্রয়-বিক্রয় বাতিলযোগ্য নয়। কিন্তু তার অভিভাবক তার ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করতে পারবে। কিন্তু ইমাম ইউসুফ ও অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, কাযীর নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত জ্ঞান না হওয়া এতিমদের অধিকার বলবত থাকবে। কাযী তার সকল অধিকারকে স্থগিত রাখতে পারবে। কিন্তু গোলাম আজাদের ব্যাপারকে রহিত করতে পারবে না। কিন্তু আজাদ না করা গোলাম তার শ্রমলব্ধ অর্থ তার অপরিণতবয়স্ক মালিককে দিতে বাধ্য থাকবে। ইমাম মোহাম্মদ থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক — দুই ধরনের অভিমতই বর্ণিত হয়েছে। একটি বর্ণনা ইমাম ইউসুফের অনুরূপ। অন্যটিতে বলা হয়েছে, গোলাম তার উপার্জন তার নাবালক মালিককে দিতে বাধ্য নয় (এমতাবস্থায় সে তার উপার্জন জমা করবে নাবালক এতিমের অভিভাবকের নিকট)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কাযীর এই অধিকার নেই যে, তিনি জ্ঞানসল্পতা ও ধর্মীয় শিথিলতার প্রসঙ্গ তুলে কারো অধিকারকে স্থগিত রাখেন। কারণ মানুষের হক স্বীকার না করলে তাকে চতুষ্পদ জন্তুতুল্য মনে করা হয়। সম্পদবিনষ্টির আশংকার চেয়ে কাউকে অধিকারবঞ্চিত করা অধিকতর মারাত্মক। এরকম করলে ছোটো ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা যাবে ঠিকই, কিন্তু বড় ক্ষতিকে স্বীকার করা হবে।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, যারা জ্ঞানবান নয় তাদের অধিকার স্থগিত রাখা বৈধ। তাঁদের সমর্থনে রয়েছে - 'নির্বোধদেরকে সম্পদ দিও না' এই নির্দেশটি। কেবল তাদের হাতকে বাধা দিলেই চলবে না - মুখকেও বাধা দিতে হবে। (কারণ বেচাকেনা কেবল হাত দ্বারা হয় না, কথার মাধ্যমেও হয়)। তাই কাযী তাকে সবদিক দিয়েই বাধা দিবেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, তাদের খরচকে (কেবল হাতকে) বাধা দেয়া যাবে। মৌখিক অনুদান বা বেচাকেনাকে বাধা দেয়া যাবে না। হজরত আনাস বর্ণিত হাদিসটি তাঁর দলিল যেখানে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও এবং ধর্মীয় শিথিলতা সত্ত্বেও ক্রয়-বিক্রয় করতো। তার পরিবার পরিজনেরা রসুল স. এর কাছে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করার আবেদন জানালেন। রসুল স. তাকে নিষেধ করলেন। ওই ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি ক্রয়-বিক্রয় না করে থাকতেই পারি না। রসুল স. বললেন, ঠিক আছে। তবে বলে দিও ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যেনো তোমাকে ধোকা না দেয়া হয় (প্রয়োজনবোধে আমার বাতিল করার ক্ষমতা থাকবে)। তিরমিজি, আহমদ। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি সহীহ্। এই হাদিসটিতে ক্রয়-বিক্রয়কে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওই ব্যক্তি এমন ইচ্ছা করে না যে, তার সম্পদ নষ্ট হোক। কিন্তু তার জ্ঞানের স্বল্পতাই ক্ষতি ডেকে আনে। রসুল স. তাই বলেছেন,

যেনো ধোকাবাজি না হয়। আমাদের আপত্তি এই কারণেই। বাগবী লিখেছেন, যে জ্ঞানসম্পন্ন নয় তার সমস্ত অধিকারকে স্থগিত রাখার ব্যাপারটিতে সাহাবীগণ একমত ছিলেন।

ওরওয়া — হিশাম — কাযী ইউসুফ — ইমাম মোহাম্মদ — ইমাম শাফেয়ী— এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ বিন জাফর ষাট হাজার দেরহাম মূল্যে একটি বালুকাময় স্থান ক্রয় করলেন। হজরত আলী বললেন, আমি ওসমানের নিকট অভিযোগ করে তোমার এই ক্রয়কে বন্ধ করে দিবো। তখন হজরত আবদুল্লাহ হজরত জোবায়েরকে এই কথা জানালে তিনি বললেন, আমি এই ক্রয়ে শরীক। হজরত আলী হজরত ওসমানকে বললেন, আপনার ভাতিজার সম্পত্তির অধিকার নিষিদ্ধ করুন। হজরত ওসমান বললেন, কীভাবে নিষিদ্ধ করি। তার সঙ্গে যে রয়েছেন জোবায়ের। আবু উবাইদা কিতাবু আমওয়ালে নিজস্ব সূত্রে ইবনে শিরীন থেকে লিখেছেন, হজরত ওসমান হজরত আলীকে বললেন, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাধা দিবেন না কেন? সে ষাট হাজার দেরহাম দিয়ে কি রকম অনুপযুক্ত জমি কিনেছে। আমি তো ওই জমি আমার জুতার বিনিময়েও নিতাম না (বর্ণনাটিতে অসাবধানতাবশতঃ হজরত ওসমান হজরত আলীকে বললেন উল্লেখ রয়েছে। আসলে এ কথাটি আলীই ওসমানকে বলেছিলেন)। বাগবী লিখেছেন, এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নির্বোধদের বেচাকেনা বন্ধ করার ব্যাপারে সাহাবীগণ একমত ছিলেন। হজরত জোবায়েরও তাই বেচাকেনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আমি এই বেচাকেনায় অংশগ্রহণ করবো। এই অসিলায় তিনিও চেয়েছিলেন, নির্বোধদের বেচাকেনার অধিকার ক্ষুণ্ন হোক।

মাসআলা ঃ সাবালক ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার পর কারো মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে তার অধিকার অস্বীকৃত হবে বলে একদল আলেম মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মনে করেন, কেবল সাবালক হলেই চলে না। অধিকারপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানসম্পন্ন হওয়াও জরুরী। এই মতেরই পোষকতা রয়েছে আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের ঘটনায়।

এবার ঋণ গ্রহণ প্রসঙ্গ। ঋণের অধিকারকেও বন্ধ করে দিতে হবে। কাব বিন মালেক তাঁর পিতা থেকে বলেছেন, রসুল স. হজরত মুআজের ঋণনির্ভর বেচাকেনাকে নিষেধ করে দিলেন। এবং তাঁর সম্পদ বিক্রি করে তাঁর ঋণ পরিশোধ করলেন। দারা কুতনী, হাকেম, বায়হাকী।

আবু দাউদ মুরসাল পদ্ধতিতে আবদুর রাজ্জাক থেকে সাঈদ তাঁর সুনানে এবং ইবনে জাওজী, ইবনে মোবারক মা'মার-জুহুরী-আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত মুআজ বিন জাবাল ছিলেন দানশীল যুবক। তিনি ডান বাম চিন্তা না করে একাধারে ঋণ গ্রহণ করতেন। এভাবে ঋণভারে জর্জরিত হলেন তিনি। শেষে পাওনাদারদেরকে শান্ত করার

সুপারিশ নিয়ে হাজির হলেন রসুল স. এর দরবারে। বললেন, ওদেরকে কিছু বলুন। রসুল স. সুপারিশ পেশ করলেন। কিন্তু পাওনাদারেরা নাছোড়বান্দা। তখন মুআজের সম্পত্তি বিক্রয় করে পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধ করলেন রসুল স.। হজরত মুআজ দাঁড়িয়ে রইলেন নির্বিকার চিত্তে। আবদুল হক বলেছেন, ওই হাদিসটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

ইবনে সালাহ তাঁর আহকাম গ্রন্থে লিখেছেন, এই ঘটনাটি নবম হিজরীর। রসুল স. পাওনাদারদেরকে তাদের প্রাপ্য পাওনার সাত ভাগের পাঁচ অংশ পরিশোধ করেছিলেন। পাওনাদারেরা বললেন, বাকি সাত ভাগের দুই অংশ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হোক। রসুল স. বললেন, অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধের আর উপায় নেই।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কাযী ঋণ গ্রহণকারীর অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারেন না। তার সম্পত্তিও বিক্রয় করতে পারেন না। সম্পত্তি বিক্রয়ের হুকুম জারীও অধিকার ক্ষুণ্নতার পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়া পারস্পরিক সম্মতি ব্যতীত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেছেন, কিন্তু তোমাদের ব্যবসা পারস্পরিক অনুমোদনসাপেক্ষ হতে হবে। 'ইল্লা আনতাকুনা তিজারাতান আন তারাজিন।' কাযী বরং এই কাজটি পারেন, তিনি ঋণী ব্যক্তিকে বন্দী করবেন, যাতে সে বাধ্য হয়ে তার সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণ শোধ করে। কাযীর দিক থেকে জুলুম বৈধ নয়। হজরত মুআজের উল্লেখিত ঘটনা থেকে একথা আমরা স্বীকার করি না যে, তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে তাঁর সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়েছিলো। আবার রসুল স. এর এমত অধিকার ছিলো না — তাও বলা যাবে না। বরং ব্যাপারটি আসলে ছিলো এরকম, যেমন কোনো ব্যক্তির প্রতিনিধি তার মাল বিক্রয় করলো, পরে সে এই বিক্রয়ে সম্মতি দিল। হজরত মুআজ সম্পর্কিত এই হাদিসটির শেষে উদ্ধৃত হয়েছে, রসুল স. সান্ত্বনা প্রদানার্থে হজরত মুআজকে ইয়ামনের গভর্নর করে পাঠালেন। বায়হাকী এই হাদিসটিকে বর্ণনা করেছেন ওয়াকেদীর নিয়মে। রসুল স. সরাসরি হস্তক্ষেপ করে হজরত মুয়াজের ঋণ পরিশোধ করলেন — এটি বর্ণনাকারীর নিজস্ব ধারণা (ওয়াকেদীর বর্ণনায় সাধারণতঃ এরকম নিজস্ব ধারণার সংযোজন পরিদৃষ্ট হয়)।

তিবরানী তাঁর কবীর পুস্তকে লিখেছেন, যখন রসুল স. হজ সমাপন করলেন তখন তিনি মুআজকে ইয়ামনের হাকিম হিসাবে নিযুক্তি দিলেন। তিনিই হলেন সর্বপ্রথম আজীর (পারিশ্রমিক সহ নিযুক্ত জাকাত ও রাজস্ব আদায়কারী)। তাঁর এই ঘটনাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তিনি স. মুআজকে তাঁর আচরনের জন্য অভিযুক্ত করেন নি।

মাসআলা ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে গেলে কাযী তার সম্পত্তি বিক্রয় করে পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। এরপরও পাওনা বাকি থাকলে কাযী তাকে গায়ে খেটে পাওনা পরিশোধের হুকুম দিবেন। ইমাম আহমদ বলেছেন এরকম। অন্য বর্ণনায় এসেছে তাঁর বিরুদ্ধ মত। অন্যান্য ইমাম গায়ে খেটে পাওনা পরিশোধের হুকুম জারীর বিরুদ্ধে।

ইমাম আহমদের প্রথম বর্ণনার পোষকতায় রয়েছে এই হাদিসটি — দারা কুতনী জায়েদ বিন আসলাম থেকে লিখেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ইস্কান্দারিয়ায় এক বয়োবৃদ্ধকে দেখেছি। তার নাম সারাক। আমি বললাম, এ কি রকম নাম। তিনি বললেন, রসুল স. এই নাম রেখেছেন। এ নাম আমি কখনোই পরিত্যাগ করবো না। আমি বললাম, কেন তিনি স. এই নাম রেখেছেন? তিনি বললেন, আমি আমার বাণিজ্যসামগ্রী পৌঁছানোর আগেই মদীনায় গিয়ে আগাম বিক্রয়ের ঘোষণা দিলাম। আগাম ক্রয় করলেন অনেকেই। পণ্যমূল্য গ্রহণ করে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু পণ্যসামগ্রী এলো না। পথিমধ্যে সে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। পাওনাদারেরা তখন রসুল স. এর দরবারে আমাকে হাজির করলেন। তিনি স. সব শুনে বললেন, তুমি সারাক (চোর)। এরপর তিনি চারটি উটের মূল্যে আমাকে বিক্রয় করে দিলেন। যিনি আমাকে কিনলেন, তাঁকে পাওনাদারেরা জিজ্ঞেস করলেন, একে নিয়ে তুমি কী করবে? তিনি বললেন, মুক্তি দিবো। পাওনাদারেরা বললেন, পুণ্যান্বেষী হিসেবে আমরাই বা পশ্চাতবর্তী হবো কেনো? একথা বলে পাওনাদারগণই আমাকে আজাদ করে দিলেন। কিন্তু আমার সারাক নামটি রয়েই গেল।

ইবনে জাওজী লিখেছেন, এই ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে রসুল স.ওই ব্যক্তিকে বিক্রয় করেননি। বিক্রয় করেছেন তার শ্রমকে। ওই ব্যক্তি ছিলেন আজাদ। আজাদকে গোলাম হিসাবে বিক্রয় করা যায় না। এখানে তাকে আজাদ করে দেয়ার অর্থ হবে তাকে শ্রমের উপার্জন থেকে অব্যাহতি দেয়া।

আমি বলি, এখানে ওই ব্যক্তি অথবা তার শ্রম কোনোটিকেই বিক্রয় বুঝানো হয়নি। এরকম ধারণা কষ্টকল্পনা বৈ কিছু নয়। কারণ, এরকম ধারণা আলেমগণের সর্ববাদীসম্মত অভিমতবিরুদ্ধ (আজাদকে গোলাম বানানোর অবৈধতা সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে)। রসুল স. এর আমল জীবনের বিনিময়েও গ্রহণ করার সুযোগ আছে। কিন্তু অন্য কেউ এরকম অধিকার রাখে না।

হজরত আবু সাঈদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর সময়ে এক লোক বাকিতে অনেক মাল খরিদ করলো। কেনার পর তার মালগুলো লুণ্ঠিত হলো। অনেক ঋণের বোঝা চাপলো তার মাথায়। রসুল স. সকলকে বললেন, একে দান করো। যে যা পারলেন চাঁদা দিলেন। এতেও তার ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করা গেলো না।

রসুল স. পাওনাদারদের বললেন, তোমরা যা পেয়েছো তাতেই সন্তুষ্ট হও। আর পাবার সম্ভাবনা নেই। এই হাদিসের ঘটনায় এ কথা পরিস্কার যে, দেনাদারের উপর পাওনার দাবী ছাড়া পাওনাদারের আর কোনো হক নেই। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবরোধ করা অথবা মজুরী বা চাকুরী কোনোটিতেই বাধ্য করা যাবে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

এরপর নির্দেশ এসেছে, এতিমের মাল ভক্ষণ কোর না। এ ব্যাপারে সীমালংঘন কোর না। তারা বড় হয়ে গেলে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে হবে। এ কথা মনে করে তাড়াতাড়ি তাদের সম্পদ তসরুফ কোর না। সীমালংঘন অন্যায়। এই অন্যায়কে এখানে 'সারাফুন' শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে এই শব্দটি ইনসাফ শব্দের বিপরীত অর্থবোধক। সিহাহ্ কিতাবে রয়েছে, 'সারাফ' অর্থ যে কোনো বিষয়ে সীমা অতিক্রমণ। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, 'লা তুসরিফু ফিল কতলি' — হত্যাকান্ডে সীমা অতিক্রম কোর না। আরেক আয়াতে রয়েছে, 'ইয়া ইবাদিইয়াল্লাজিনা আসরাফু আলা আনফুসিহুম' — হে আমার বান্দারা, যারা আত্মঅত্যাচারে সীমালংঘন করেছো। বিষয় সম্পত্তির ক্ষেত্রেই সীমালংঘন প্রবণতা বেশী দেখা যায়। সীমালংঘন হয় কখনো অবস্থাগত, কখনো পরিমাণগতভাবে। এ জন্য সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, আল্লাহর পথ থেকে সরে গিয়ে যা কিছু খরচ করা হয় তাই ইসরাফ বা সীমা অতিক্রমণ - তার পরিমাণ নিতান্ত কম হলেও। অন্যত্র আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন, পানাহার করো এবং সীমালংঘন থেকে সুরক্ষিত থাকো। আর এক জায়গায় বলেছেন, নিশ্চয় সীমালংঘনকারী দোজখী। এই আয়াতের অর্থ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যের অনুকূল। কেননা তিনি সীমালংঘনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে গিয়ে এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সুতরাং সীমালংঘনকারী বলতে তাকেই নির্দেশ করা হবে যে নাফরমান, পাপী, আনুগত্যস্খলিত। কর্মগত, দৃষ্টিগত, সম্পদগত - সকল ক্ষেত্রের সীমালংঘনকারীরাই দোজখী।

আমি বলি, এতিমের প্রতিপালক সম্পদশালী হলে যেনো সে এতিমের মাল মোটেও না নেয়। বেশী কম কোনটাই না। আর দরিদ্র হলে প্রচলিত নিয়মানুসারে খোরপোষ নিতে পারবে। হজরত আমর বিন শোয়ায়েব তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, এক লোক রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি অভাবী। আমি এক এতিমের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তার সম্পদের রক্ষক। রসুল স. বললেন, তুমি তার মাল থেকে কিছু খাও। কিন্তু সীমা অতিক্রম কোর না। তাড়াহুড়াও কোর না। পারিশ্রমিক বাঁচিয়ে খেও না। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, একজন রসুল স. এর নিকট নিবেদন করলেন, এক এতিম রয়েছে আমার প্রতিপালনাধীনে। আামি কি তার মাল থেকে খেতে পারবো? তিনি স. বললেন, পারবে। তবে তোমার সম্পদ বাঁচিয়ে খেতে

পারবে না। সা'লাবী। এ কথার অর্থ এই যে, এতিমের রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময়ে খেতে পারবে। হজরত আয়েশা এরকম বলেছেন। আমরাও এ কথার সমর্থক। আতা এবং ইকরামা বলেছেন, এ কথার অর্থ আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে খাও। সীমা অতিক্রম কোর না। এতিমের অর্থে বস্ত্র ক্রয় কোর না। নাখয়ী বলেছেন, এতিমের টাকায় ভালো কাপড় ও কম্বল কিনো না। তার অর্থে কেবল ক্ষুধা নিবৃত্ত কোরএবং ছতর ঢাকার জন্য অপরিহার্য বস্ত্রের ব্যবস্থা কোর। এরকম নিতান্ত আবশ্যকীয় খরচ ফেরত দেয়া জরুরী নয়। হাসান বসরী এবং একদল আলেমের মত — এতিমের বৃক্ষের ফল খেতে পারবে, পশুর দুধ পান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে প্রচলিত নিয়ম। এর বিনিময় পরিশোধ করা অত্যাবশ্যকীয় নয়। তবে সোনারূপা গ্রহণ করলে বিনিময় দিতে হবে। এটা জরুরী। কালাবী বলেছেন, এতিমের সওয়ারীতে আরোহন করা, তাদের খাদেমের নিকট থেকে খেদমত নেয়া এবং তার সম্পদ থেকে কিছু খাওয়া জায়েয নয়।

বাগবী তাঁর নিজস্ব সূত্রে কাসেম বিন মোহাম্মদ থেকে লিখেছেন, লোকটি বললো, আমি কি তাদের উট থেকে দুধ পান করতে পারবো? তিনি স. বললেন, পারবে যদি তার হারানো উট খোঁজাখুঁজির কাজ করো, উটের পানি পান করার স্থান প্রস্তুত করো এবং নির্ধারিত সময়ে পানি পান করাও অথবা তার উটের ক্ষতস্থানে মলম লাগাও। আরো দেখতে হবে উটের বাচ্চার যেনো ক্ষতি না হয়। ওলান থেকে সম্পূর্ণ দুধ বের কোর না (যাতে বাচ্চা তার প্রয়োজনীয় দুধ পায়)। শা'বী বলেছেন, মুর্দার গোশত খেতে বাধ্য হতে হয় — এরকম নাচার না হওয়া পর্যন্ত এতিমের মাল খেও না।

মুজাহিদ এবং সাইদ বিন জোবায়ের ভক্ষণ করার অর্থ করেছেন, কর্জ করা। অর্থাৎ যদি প্রয়োজন হয় তবে এতিমের মাল থেকে ধার নিতে পারবে। পরে অভাবমুক্ত হলে পরিশোধ করবে। হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন, আমি আল্লাহর মাল (বায়তুল মাল) সংরক্ষিত রেখেছি এতিমদের অভিভাবক হয়ে (হে অভিভাবকেরা) ধনী হলে বেঁচে থেকো, আর দরিদ্র হলে ইনসাফের সঙ্গে খাও (ঋণ গ্রহণ করো)। যখন অনটনমুক্ত হও তখন ঋণ পরিশোধ কোর।

এতিমেরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদেরকে সম্পদ অর্পণের সময় সাক্ষী রাখতে হবে। আয়াতের শেষে এসেছে এই নির্দেশ। নির্দেশটি ওয়াজিব নয়। তবে এরকম করা উত্তম। এরকম করলে পরবর্তীতে অপবাদ অথবা দ্বিধা-সন্দেহ কিংবা বচসার সুযোগ থাকে না। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক এই আয়াতের দলিল পেশ করে বলেছেন, এতিমেরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই তাদের সম্পদ দাবী করলে সাক্ষী ব্যতীত তাদের দাবী গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। ইমাম আজম বলেছেন, তখন তারা সাক্ষী পেশ করতে না পারলে তাদের দাবীকে কসমের সঙ্গে

গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা তারা সম্পত্তির ক্ষতি হওয়ার আশংকাকে অস্বীকার করে (অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে কসম কবুল করা যায়।)।

সবশেষে বলা হয়েছে, হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। এর অর্থ প্রতিদান দেয়ার ক্ষেত্রে এবং সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহই যথেষ্ট। অন্য সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। সুতরাং প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্র উপরেই ন্যস্ত করতে হবে।

আবু শায়েখ বিন হাব্বান কিতাবুল ফরায়েজে কালাবী আবু সালেহ্'র মাধ্যমে ইবনে আব্বাসের বক্তব্য উপস্থিত করেছেন এরকম, মূর্খতার যুগে মানুষেরা নারী ও নাবালকদের উত্তরাধিকার স্বীকার করতো না। আওস বিন ছাবেত নামক এক আনসারী দুই কন্যা এবং এক নাবালক পুত্র রেখে মারা যান। তাঁর দুই চাচাত ভাই — খালেদ ও আরফাজাহ্ পরিত্যক্ত সম্পত্তি অধিকার করে বসে। তখন তাঁর বিধবা পত্নী রসুল স. এর নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেন। রসুল স. সব শুনে বললেন, কী বলবো — এই বিষয়ে তো আমাকে কিছু জানানো হয়নি। তখন এই বিষয়ে জানানো হলো। অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াতটি-

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৭

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ○

❒ পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, উহা অল্পই হউক অথবা বেশীই হউক, এক নির্ধারিত অংশ।

কেবল পুরুষ নয়, নারীদেরও অংশ রয়েছে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে। নারীদের গুরুত্ব প্রতিভাত করার জন্যই এখানে পুরুষদের অধিকার সম্বলিত বাক্যের পুনারাবৃত্তি করা হয়েছে রমণীদের ক্ষেত্রেও। অল্প অধিক - সকল সম্পত্তিতেই মীরাস (উত্তরাধিকার) জারী থাকবে। এক্ষেত্রে সম্পত্তির সকল পরিমাণই সমান গুরুত্ববহ। উত্তরাধিকারের এই অংশ সমূহ যথাপাত্রে প্রদান করা ফরজ। এই নির্ধারণ পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। এখানকার 'মাফরুদা' এর উদ্দেশ্য, অংশীদারের বৈমুখ্য অথবা অনিচ্ছা তার মালিকানাকে রহিত করে না।

এই আয়াতের দু'টি বিষয় নির্ধারিত। ১. অংশের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি ২. আক্বরাবূনা (আত্মীয়স্বজন) শব্দটির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। অবশ্য এর ব্যাখা দেয়া হয়েছে হাদিস শরীফের মাধ্যমে। পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনরা পৃথকভাবে উল্লেখিত হয়েছে এই আয়াতে। উদ্দেশ্য, সর্বাপেক্ষা নিকটস্বজন পিতামাতাকে গুরুত্ববহ করে তোলা। এদের সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আগেই। তাই এখানে অন্যান্য স্বজনকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আওস বিন ছাবেত আনসারী দুই কন্যা এবং এক পুত্র রেখে মারা গেলেন। তাঁর দুই চাচাতো ভাই সুয়ায়েদ ও আরফাজাহ্ তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করে নিলো। বিধবা ও এতিমেরা হলো বঞ্চিত। তখন নারী ও এতিমদেরকে মীরাস দেয়া হতো না। মীরাস দেয়া হতো কেবল প্রাপ্তবয়স্কদেরকে। তারা বলতো, আমরা শুধু তাদেরকেই অংশ দিবো যারা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে এবং গনিমত নিয়ে ফিরবে। আনসারী সাহাবীর বিধবা পত্নী রসুল স. এর নিকটে যেয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আওস বিন ছাবেত মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর তিনজন সন্তানসন্তুতি সহ আমি এখন বিধবা। তাঁর সম্পত্তি সম্পূর্ণ দখল করে নিয়েছে সুয়ায়েদ এবং আরফাজাহ্। এখন আমার কাছে এমন কিছুই নেই যা দিয়ে সন্তানদের পানাহারের ব্যবস্থা করতে পারি। রসুল স. সুয়ায়েদ এবং আরফাজাহ্কে ডেকে আনলেন। তারা বললো, এই মহিলার সন্তানেরা উপযুক্ত নয়। তারা অশ্বারোহন করতে পারবে না। ক্ষতিপূরণ বা বিনিময় দিতে পারবে না। শত্রুর সাথে যুদ্ধও করতে পারবে না। তখন এই আয়াত নাজিল হলো। রসুল স. তাদেরকে বললেন, দেখ। তোমরা অংশ দিতে চাওনি। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে অংশীদার বানিয়েছেন। কিন্তু এখনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। আমি এ সম্পর্কিত হুকুমের অপেক্ষায় আছি। আল্লাহ আয়াত নাজিল করেলেন 'ইউসিকুমুল্লাহ ... 'শেষ পর্যন্ত। তখন রসুল স. বললেন, তোমরা আট ভাগের এক অংশ উম্মে কোহাকে (আওস বিন ছাবেতের বিধবা পত্নীকে) এবং তিন ভাগের দুই অংশ তার সন্তানদেরকে দিয়ে দাও। অবশিষ্ট অংশ তোমাদের।

আমি বলি, যখন 'লিররিজালি নাসিবুন ...'এই আয়াতের পরে 'ইউসিকুমুল্লাহ ...' এই আয়াত নাজিল হয়েছে, এখন সময়ের হেরফের সম্পর্কে অনুযোগ করার সুযোগ এখানে নেই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সুদ্দী লিখেছেন, গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাবলীর বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, হজরত আওস বিন ছাবেত হাস্সান বিন ছাবেতের ভাই ছিলেন। তিনি শহীদ হয়েছিলেন উহুদ যুদ্ধে। এই বর্ণনাটিতে আপত্তি তুলেছেন আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি। তিনি বলেছেন, আপন ভাইয়ের উপস্থিতিতে চাচাতো ভাইয়েরা পরিত্যক্ত সম্পত্তি

অধিকার করতে পারে না। তাঁর আপন ভাই হাস্‌সান তখনো জীবিত। বাগবী লিখেছেন, ইবনে হাজার তাঁর 'আছাবা' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, বর্ণিত শানে নুজুলের ঘটনাটি ভুল। কেননা হাস্‌সানের কোনো ভাইয়ের নাম আওস ছিলো না এবং খালেদ বা আরফাতা বলে তাঁর চাচতো ভাইও কেউ ছিলেন না। (সম্ভবত এ স্থানে লেখক ভুল করে আরফাজাহ্‌কে আরফাতা লিখেছেন। আসল বর্ণনায় আরফাজাই রয়েছে — আরফাতা নয়)। আল্লামা সুয়ুতী পরে লিখেছেন, আওস নামে বেশ কয়েকজন সাহাবী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন বংশভুত। তাঁদের কোনো একজনের ঘটনায় নাজিল হয়েছে এই আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

❒ সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, পিতৃহীন এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে উহা হইতে কিছু দিবে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে।

সম্পদের ভাগ বাটোয়ারার সময় উত্তরাধিকারী নয় এমন আত্মীয় উপস্থিত হলে তাদেরকেও কিছু না কিছু দিতে হবে। হাসান বলেছেন, পুরনো কাপড় অথবা এ ধরনের সামগ্রী যা তেমন মূল্যবান না হওয়ায় বন্টনযোগ্য বলে বিবেচনা করতে লজ্জাবোধ হয় - তাই দিয়ে দাও। সাঈদ বিন জোবায়ের এবং জুহাক বলেছেন, পরবর্তী আয়াত ইউসিকুমুল্লাহ্‌ (আয়াত নং ১১) দ্বারা এই আয়াতটি রহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইবনে আব্বাস, শা'বী, নাখয়ী, জুহুরী, মুজাহিদ এবং আলেমদের একটি দল এই আয়াত রহিত নয় বলেছেন। হজরত ইয়াহিয়া বিন ইয়ামার রা. এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, মদীনায় অবতীর্ণ তিনটি সুস্পষ্ট (মোহকাম) আয়াতকে মানুষেরা আমলে আনেনি। একটি হচ্ছে এই আয়াত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'ইয়া আইয়্যুহাল লাজীনা আমানু লিইয়াসতা'জিন কুমুল্লাজীনা মালাকাত আইমানুকুম' এবং তৃতীয়টি হচ্ছে 'ইয়া আইয়্যুহান নাসু ইন্না খলাক্বনাকুম মিন জাকারিউ ওয়া উনসা ....' শেষ পর্যন্ত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, উত্তরাধিকারী নয় এমন আত্মীয়কে দান করা ওয়াজিব। প্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তবয়স্ক সকল অংশীদারের জন্যই এতিম, মিছকীন ও দূরবর্তী আত্মীয়কে দান করা জরুরী। অংশীদার প্রাপ্তবয়স্ক হলে নিজেই দিবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের পক্ষ থেকে দান

করবে তাদের অভিভাবক। মোহাম্মদ বিন শিরিন বলেছেন, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতেই ওবায়দা সালমানী রা. এতিমের সম্পদ বন্টন শেষে কিছু অংশ রেখে দিয়েছিলেন। তা দিয়ে একটি ছাগল কিনে নিয়ে তার গোশত রান্না করে এই আয়াতে উল্লেখিতদেরকে খাইয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এই আয়াত না হলে এই সম্পদ হতো আমার। তবে এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত এই যে, এই আয়াতের হুকুমটি ওয়াজিব নয়। বরং মোস্তাহাব।

ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রাপ্তবয়স্ক অংশীদার নিজে দান করবে, দানকে সামান্য মনে করবে এবং এর জন্য গ্রহীতাদেরকে খোঁটা দিবে না। আর অংশীদার নাবালক হলে তার অভিভাবক দান করতে অস্বীকৃত হবে। বলবে, এই সম্পত্তির মালিক নাবালেগ- আমি নই। আমার হলে অবশ্যই আমি কিছু দিতাম। এই নাবালেগ বড় হলে তোমাদেরকে দান করতে পারবে - যখন বুঝবে। এখন তো নির্বোধ। এই আয়াতের শেষে এরকমই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে।'

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

❒ তাহারা যেন ভয় করে যে অসহায় সন্তান পিছনে ছাড়িয়া গেলে তাহাদের সম্বন্ধে তাহারাও উদ্বিগ্ন হইবে। সুতরাং তাহারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।

অসমর্থ সন্তানদেরকে পরিত্যাগ করা অন্যায়। তাদের যথাঅধিকার নিশ্চিত না করা উদ্বেগের কারণ। এখানে সমর্থ অংশীদারকে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যেন তারা মহিলা ও নাবালকদের উত্তরাধিকারের অংশ দিতে কুণ্ঠিত না হয়। দূরের আত্মীয় এবং ফকির মিছকিনদেরকেও যেনো কিছু দিয়ে দেয়। যেনো লক্ষ্য রাখে অসহায়দের প্রতি। তাদের অবর্তমানে তাদের স্ত্রী-পুত্র পরিজনের কী অবস্থা হবে - একথা স্মরণে রেখেই যথাবন্টন নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে নিজের মৃত্যুর পর স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিরাও হয়ে পড়বে এমনি সহায়হীন। সুতরাং এখন যারা দুর্বল অংশীদার তাদের প্রাপ্য নিশ্চিত করো। আল্লাহকে ভয় করো। মনে রেখো, তাঁর নিকট জবাবদিহি করতেই হবে। 'খশিয়া' শব্দের চূড়ান্ত অবস্থা হচ্ছে তাকওয়া। 'খশিয়া' অর্থ ভয় করা এবং তাকওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে

ভয়ে সাবধান হয়ে যাওয়া। আয়াতের প্রথম খশিয়া শব্দের মাধ্যমে আপন বিপদাশংকার তুলনা দিয়ে দুর্বল অংশীদারদের বিপদ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হতে বলা হয়েছে। আর শেষে দেখানো হয়েছে জবাবদিহির ভয়।

কালাবী বলেছেন, এই হুকুমটি আরোপিত হয়েছে এতিমের অভিভাবকের প্রতি। অথবা যাদের প্রতি অছিয়ত করা হয়েছে — তাদের প্রতি। নির্দেশের মর্ম এই যে, এতিম প্রসঙ্গে আল্লাহকে ভয় করো। তাদের প্রতি উত্তম আচরণশীল হও। যেমন আচরণ তুমি পছন্দ করো পৃথিবীতে রেখে যাওয়া তোমার এতিম সন্তান সন্ততিদের প্রতি। এই আয়াতকে ৬ ও ৭ নং আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করলে অর্থ হবে এরকম, যতোক্ষণ না তোমরা জাহেলিয়াতের নিয়ম থেকে বেরিয়ে আসবে। মুর্খতার যুগের নিয়ম ছিলো, নারী ও নাবালকদেরকে উত্তরাধিকার অর্পণ করা হবে না। অংশ দিতে হবে কেবল যুদ্ধযাত্রায় সক্ষমদেরকে। এই অসমীচীন আচরণ থেকে বেরিয়ে না এলে অশুভ পরিণাম নিশ্চিত। এরকমও অর্থ হওয়া সম্ভব যে, এখানে উত্তরাধিকারহীন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়, এতিম ও সম্বলহীনদের প্রতি করনীয় আচরণ নির্দেশ করে বলা হয়েছে 'এবং সংগত কথা বলে।' যেনো সামর্থশীল অংশীদারেরা মনে করে, এরা যদি আমাদের সন্তানসন্তুতি হতো — তবে কি আমরা তাদেরকে এমত অসহায় দেখতে পছন্দ করতাম।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য ওই ব্যক্তি, যে মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী। তার পাশে জড়ো হওয়া মানুষেরা যখন বলে, তোমার উত্তরাধিকারীরা কোনো কাজে আসবে না। অমুক গোলামকে আজাদ করে দাও। অমুক অমুকদেরকে বেশী বেশী করে দান করো। বরং তোমার উচিত সমস্ত সম্পত্তি দান করে যাওয়া। এরকম উপদেশ প্রদানকারীদেরকে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন, আল্লাহকে ভয় করো। এই মৃত্যুপথযাত্রীর সন্তানসন্তুতিদেরকে আপন সন্তান মনে করো। এরকম পরামর্শ দিওনা যাতে কেউ অধিকারবঞ্চিত হয়।

অথবা এই নির্দেশ অর্পিত হয়েছে অছিয়তকারীদের উপর। তাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে তারা যেনো অংশ আদায়ে অসমর্থ উত্তরাধিকারীদের বিপন্ন অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে। অছিয়ত প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যেনো সীমা বজায় রাখা হয়। যেনো (আল্লাহর পথে) দানের অছিয়ত কার্যকর করা হয় মোট সম্পদের সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশের উপর। এর বেশী করা উত্তরাধিকারের বিধানকে অকার্যকর করার নামান্তর।

ক্ষমতাশালী অংশীদার তার দুর্বল অংশীদের সঙ্গে নম্র আচরণ করবে। ভদ্রজনোচিত কথা বলবে যেমন কথা বলা হয় আপন সন্তানদের সঙ্গে। আর মৃত্যুপথযাত্রীদেরকে এই পরামর্শ দিবে, যেনো দান করা হয় সর্ব্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ। সম্পদ বন্টনকালে উত্তরাধিকারবিবর্জিত আত্মীয় ও সহায় সম্বলহীনদের

সঙ্গেও যেনো শিষ্ট আচরণ করা হয়। কিছু দান করে তাদের আক্ষেপকেও যেনো প্রশমিত করা হয়। অছিয়ত প্রতিপালনের উদ্দেশ্য যেনো হয় আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১০

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝

❑ যাহারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাহারা তাহাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তাহারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলিবে।

মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন,মারসাদ বিন জায়েদ গাতফানী যখন তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের সম্পদ ভক্ষণ করলো, তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। বলা হলো, এতিমের সম্পদ আত্মসাৎকারী তার উদরকে পূর্ণ করেছে আগুন দিয়ে। অর্থাৎ এমন জিনিস দিয়ে সে উদরপুর্তি করেছে যা তাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মেরাজ রাত্রিতে আমি এরকম কিছু লোককে দেখেছি যাদের ওষ্ঠ উটের মতো। তাদের উপরের ঠোঁট সংকোচিত ও নাসিকা সংলগ্ন আর নিচের ঠোঁট ঝুলছে বুক অবধি। তাদের মুখে প্রবেশ করানো হচ্ছে দোজখের অঙ্গার ও পাথর। আমি জিব্‌রাইলকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরা অন্যায়ভাবে এতিমের মাল ভক্ষণকারী। এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম আবু সাইদ খুদরী থেকে।

ইবনে আবী শাইবা মসনদ গ্রন্থে, ইবনে আবী হাতেম তাঁর তাফসীরে এবং ইবনে আবী হাব্বান সহীহ্ পুস্তকে হজরত আবু বোরদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কবর থেকে এমন কতিপয় ব্যক্তিকে উঠানো হবে যাদের মুখ থেকে বের হবে লেলিহান আগুন। নিবেদন করা হলো, এরা কারা? তিনি স. বললেন, তোমার কি জানা নেই আল্লাহ বলেছেন, যারা এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদর পূর্ণ করে আগুন দিয়ে। তারা প্রবিষ্ট হবে জ্বলন্ত আগুনে।

বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা লিখেছেন, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ বলেছেন, মক্কার বনু সালমায় একবার অসুস্থাবস্থায় আমাকে দেখতে এসেছিলেন রসুল স. এবং হজরত আবু বকর । আমি ছিলাম বস্ত্রাবৃত, প্রায় অচেতন। তিনি স. পানি চেয়ে নিয়ে অজু করলেন।

তারপর আমার উপর কিছু পানি ছিটিয়ে দিলেন। আমার চেতনা ফিরে এলো। আরজ করলাম, আমি কি আমার সম্পদ থেকে কিছু অছিয়ত করতে পারি? এ ব্যাপারে বিধান কী? তখন নাজিল হলো পরবর্তী আয়াতটি।

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা এবং হাকেম হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন, হজরত সা'দ বিন রবীর স্ত্রী রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে রসুল। সা'দ আপনার সঙ্গে উহুদে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। এখন তাঁর দু'টি কন্যা নিয়ে আমি বড়ই বিপাকে পড়েছি। কারণ, তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ অধিকার করে নিয়েছে কন্যাদ্বয়ের চাচা। কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। সম্পত্তি ছাড়া তো তাদের বিয়েও দেয়া যাবে না। রসুল স. বললেন, আল্লাহই এর সিদ্ধান্ত দান করবেন। এরপর অবতীর্ণ হলো উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত। রসুল স. তখন এতিম কন্যাদ্বয়ের চাচাকে ডেকে জানিয়ে দিলেন, তিন ভাগের দুই ভাগ কন্যাদের, আট ভাগের এক ভাগ তাদের মায়ের এবং অবশিষ্ট তোমার।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, যাঁরা এই হাদিসটিকে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াতের শানে নুজুল বলেন, তাঁরা ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত জাবেরের হাদিসটিকে সঠিক বলেন না। তাঁদের দলিল এই যে, মক্কাবাসের সময় তো হজরত জাবেরের সন্তান সন্ততিই ছিলো না। জবাবে বলা যায়, উপরোক্ত দুটি বর্ণনাই এই আয়াত নাজিলের কারণ। এরকমও হতে পারে যে, আয়াতের প্রথম অংশ সা'দের কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে এবং শেষ অংশ (সে নিঃসন্তান হলে) হজরত জাবেরের সঙ্গে সম্বন্ধিত। হজরত জাবের সম্পূর্ণ আয়াত উদ্ধৃত করেছেন (ইউসিকুমুল্লাহু থেকে শেষ পর্যন্ত)। কিন্তু তিনি নিজে সংশ্লিষ্ট ছিলেন শেষ অংশের সঙ্গে (যেখান থেকে 'সে নিঃসন্তান হলে' শুরু হয়েছে)। কারণ তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াতগুলোর শানে নুজুল সম্পর্কে আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর। তিনি সুদ্দী'র বর্ণনাসূত্রে লিখেছেন, মুর্খতার যুগের মানুষেরা মহিলা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে উত্তরাধিকার দিতো না। যারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে সমর্থ কেবল তারাই উত্তরাধিকার পেতো। হজরত হাস্‌সান বিন সাবেতের ভাই আবদুর রহমান মারা গেলে তাঁর পত্নী উম্মে কোহা তাঁর পাঁচ কন্যা নিয়ে অসহায় হয়ে পড়লেন। পরিত্যক্ত সম্পত্তি অধিকার করে নিলো অন্যান্য অংশীরা। উম্মে কোহা অভিযোগ পেশ করলেন রসুল স. এর কাছে। তখন পরবর্তী আয়াতটি নাজিল হয়েছে। এর সঙ্গে উম্মে কোহা এবং সা'দ বিন রবী'র বিধবা পত্নী ওমরা বিনতে হারাম উভয়েই সংশ্লিষ্ট। কাযী ইসমাইল তাঁর আহকামুল কোরআন পুস্তকে আবদুল মালেক বিন মোহাম্মদ বিন হাজমের নিয়মে বর্ণনা করেছেন, ওমরা ছিলেন সা'দ বিন রবী'র স্ত্রী। তিনি

ছিলেন সা'দের এক কন্যা সন্তানের গর্ভধারিণী। তিনিও উত্তরাধিকার লাভের জন্য রসুল স. এর শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১১

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

❑ আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন ঃ এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; কিন্তু দুই এর অধিক থাকিলে তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকিলে তাহার জন্য অর্ধাংশ। তাহার সন্তান থাকিলে তাহার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যাক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হইলে এবং শুধু পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হইলে তাহার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ; তাহার ভাইবোন থাকিলে মাতার জন্য এক ষষ্ঠাংশ; এ সবই সে যাহা অসিয়ৎ করে তাহা দেওয়ার পর ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নহ। ইহা আল্লাহের বিধান; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

এক ছেলের অংশ দুই মেয়ের সমান। এই নিয়ম ছেলে ও মেয়ে থাকলে। এক পুত্র এবং এক অথবা একাধিক কন্যা কিংবা এক কন্যা এবং এক বা একাধিক পুত্র। পুত্র কন্যা উভয়েই সন্তান। তাই কেউ অধিকারবঞ্চিত হবে না। কিন্তু ছেলেরা পাবে মেয়েদের দ্বিগুণ। এতে করে পুরুষদের অধিকতর মর্যাদা সপ্রমাণিত হয়েছে।

ছেলে না থাকলে দুই বা ততোধিক মেয়েদের জন্য নির্ধারিত অংশ হচ্ছে মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। কেবল এক কন্যার বেলায় অর্ধাংশ। আয়াতে দুই কন্যার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দুই কন্যা মিলে ওই অংশই পাবে যা এক কন্যার বেলায় নির্ধারিত হয়েছে। কেননা (দুই তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধেক — এ বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও) মেয়েদের ন্যূনতম অংশ নিশ্চিত। তাই সন্দেহকে পরিত্যাগ করে ন্যূনতম অংশকেই ধরে নিতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত এই যে, দুই বা দুইয়ের অধিক — উভয় অবস্থাতেই দুই তৃতীয়াংশ নির্ধারিত হয়েছে। এই মতের উপরই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গের বর্ণনায় আয়াতে 'ফাওকা' শব্দটি এসেছে। এই শব্দটির অর্থ অতিরিক্ত বা অধিক (দুই বা ততোধিক — সকল সংখ্যাই একের অধিক)। এই মতের পোষকতায় রয়েছে সা'দ বিন রবী সম্পর্কিত হাদিসটি। তাঁর ছিলো দুই কন্যা। কোনো কোনো আলেম দুই কন্যার অংশ দুই বোনের অংশের মতো বলেছেন। আল্লাহ এক বোনের অংশ তার ভাইয়ের অংশের অর্ধেক নির্ধারণ করেছেন। এরকম কেবল এক কন্যা থাকলে নির্ধারণ করেছেন মোট সম্পত্তির অর্ধেক। ভাই ও বোনের অংশের অনুপাত ২ ঃ ১। এক বা একাধিক ভাই বোনদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বোন পাবে প্রত্যেক ভাইয়ের অর্ধেক। ভাই না থেকে শুধু দুই বোন থাকলে পাবে দুই তৃতীয়াংশ। ভাই না থাকলে দুইয়ের অধিক বোনেরাও ওই দুই তৃতীয়াংশই পাবে। বিষয়টি কোরআন, সুন্নাহ ও এজমার (ঐকমত্যের) সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কেবল এক কন্যার আইনে দুই কন্যাও সম্মিলিতভাবে মোট সম্পত্তির অর্ধেক পাবে — এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই।

একজন ছেলে এবং একজন মেয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের অংশ এক তৃতীয়াংশের কম হলে চলবে না। এমতাবস্থায় দুই তৃতীয়াংশ ছেলের আর এক তৃতীয়াংশ মেয়ের। মেয়ে দু'জন হলেও এই নিয়ম- প্রত্যেকেই হবে এক তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী (এর কম নয়)। আয়াতে 'পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান' বলা হয়েছে। কিন্তু কন্যা যদি আদৌ না থাকে তবে পুত্রের কি হবে তা বলা হয়নি। এতে করে পুত্রের অধিকারবঞ্চিত হওয়ার সন্দেহ অমূলক। এরকম অবস্থায় পুত্র আসাবা সূত্রে লাভ করবে পুরো সম্পত্তির অধিকার। কারণ আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, পুত্র পাবে কন্যার দ্বিগুণ। আর এক কন্যা পাবে মোট সম্পত্তির অর্ধেক। এই বর্ণনাভঙ্গিতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এক কন্যা অর্ধেক পেলে এক পুত্র পাবে পুরোটাই। কন্যার অধিকার যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে পুত্রের অধিকার এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত (উল্লেখ না থাকলেও)। আর এক পুত্র পুরো সম্পত্তির মালিক না হলে তার অংশ কতখানি তা বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিলো। সুতরাং সে যে পুরো সম্পত্তির মালিক হবে তা অনুল্লেখ থাকাতেই যেনো নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছে। আর

স্বতঃপ্রতিষ্ঠ বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন সম্পূর্ণতই যুক্তিযুক্ত। এক কন্যার অধিকার নিশ্চিত না করা পর্যন্ত যেমন অন্য আসাবার (মূল ওয়ারিশের অংশ সুসাব্যস্ত হওয়ার পর যারা অংশ পায়) অংশ লাভের প্রশ্ন ওঠেনা, তেমনি এক পুত্রের বেলাতেও। এক কন্যা অর্ধেক এবং এক পুত্র সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী। নাতিপুতিদের কোনো অংশ এখানে নেই।

মাসআলা ঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, সন্তান জীবিত না থাকলে তার ছেলেমেয়েরা সেই সন্তানের স্থলবর্তী হবে। তার একজন ছেলে (নাতি) এবং কয়েকজন মেয়ে (নাতনী) থাকলে সমস্ত সম্পদ তারাই পাবে। শুধু একজন নাতনী অর্ধেক পাবে। একাধিক হলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে। নাতি নাতনী সবাই থাকলে প্রত্যেক নাতি পাবে প্রত্যেক নাতনীর দ্বিগুণ। যদি মৃত ব্যক্তির এক বা একাধিক কন্যা থাকে এবং তার সাথে নাতি নাতনী থাকে, তবে কন্যা অথবা কন্যাদের অংশ দেয়ার পর বাকি অংশ বন্টন করা হবে নাতি নাতনীদেরকে (ছেলের অংশ মেয়ের অংশের দ্বিগুণ- এই নিয়মে)। তাহাবী বলেছেন হজরত আয়েশা দুই কন্যা ও নাতি নাতনীদের (অন্য মৃত সন্তানের ছেলেমেয়েদের) অংশ বন্টন করেছেন এভাবে — দুই তৃতীয়াংশ দুই কন্যার এবং বাকি এক তৃতীয়াংশ নাতি নাতনীদের। নাতি নাতনীদের অংশ বন্টন করেছেন নাতনী একগুণ নাতি দ্বিগুণ এই নিয়মে। এক পিতা ও দুই মায়ের সন্তানদের মধ্যে এই নিয়মে বন্টন করতে হবে। আর যদি এক বা একাধিক কন্যার সঙ্গে এক নাতি অথবা কয়েকজন নাতনী থাকে, তবে কন্যাদের অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট অংশ দিতে হবে নাতি নাতনীদেরকে। বোখারী ও মুসলিমে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন রসুল স. বলেছেন, ফরজ অংশ আহলে ফারায়েজকে দাও (কোরআন ও হাদিস দ্বারা যাদের অংশ নির্ধারিত, তাদেরকে আহলে ফারায়েজ বলে)। আহলে ফারায়েজদেরকে দেয়ার পর অবশিষ্ট অংশ দিতে হবে নিকটতমদেরকে। এক কন্যা এবং এক বা একাধিক নাতি নাতনী থাকলে প্রথমে কন্যা পাবে অর্ধেক। তারপর নাতি নাতনীদের ছয় ভাগের এক ভাগ। কন্যাদের, নাতনীদের এবং বোনদের প্রাপ্য দুই তৃতীয়াংশ এর বেশী নয়। এজন্য প্রথমে দুই তৃতীয়াংশ দিয়ে পরে এক ষষ্ঠাংশ নাতনীদেরকে দিতে হবে।

বোখারী, হুজাইল বিন শারাহবিলের বর্ণনা থেকে লিখেছেন, এক ব্যক্তি হজরত আবু মুসা ও সালমান বিন রবীয়া সকাশে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, মৃত ব্যক্তির এক কন্যা, এক নাতনী এবং এক সহোদরা থাকলে, পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের নিয়ম কী? তার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবীদ্বয় সিদ্ধান্ত দিলেন যে, কন্যাকে অর্ধেক এবং বোনকে অর্ধেক দিতে হবে- নাতনী কিছু পাবে না। তারপর বললেন, তুমি ইবনে মাসউদ কে এই বিষয়ে প্রশ্ন কোর- দেখো, আমরা যা বলেছি

তিনিও তাই বলবেন। ওই ব্যক্তি যখন হজরত ইবনে মাসউদের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে জানতে চাইলেন তিনি বললেন, আমি এরকম সিদ্ধান্ত দিলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো। তিনি তখন ওই সিদ্ধান্তই দিলেন যা রসুলে পাক স. দিয়েছেন। বললেন, মেয়ে অর্ধেক, নাতনী ছয়ভাগের একভাগ এবং বাকি এক তৃতীয়াংশ পাবে বোন। ওই ব্যক্তি পুনরায় আবু মুসার নিকট গিয়ে ইবনে মাসউদের এই অভিমত জানালো। তাঁরা বললেন, যতোদিন ওই প্রজ্ঞাবান বেঁচে থাকবেন, ততোদিন আমাদের কাছে ফতোয়া অন্বেষণ কোর না। হজরত ইবনে মাসউদের ফতোয়ার মর্ম এই যে, মৃত ব্যক্তির বংশ অপেক্ষা তার পিতার বংশ অধিকতর নিকটে নয়, তাই কন্যা ও নাতনীর উপস্থিতিতে বোনের অংশ ফরজ নয়। বোন পাবে আসাবা হিসেবে। কন্যা ও নাতনী দুই তৃতীয়াংশ, অবশিষ্টাংশ বোনের।

দুই সহোদরার উপস্থিতিতে নাতনীগণ কোনো অংশ পাবে না। কেননা দুই কন্যাই পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ। মেয়েদের অংশ সম্মিলিতভাবে তিন ভাগের দুই ভাগের বেশী নয়। নাতনীদের সঙ্গে সমসংখ্যক নাতি থাকলে অথবা নাতনীদের নিচের স্তরের নাতি থাকলে তখন তারা সবাই আসাবা হবে। তখন তারা নিজের সমস্তরের নাতনীদেরকেও আসাবা বানিয়ে নেবে। এরকম অবস্থায় উপরের স্তরের নাতনীরাও আসাবা হবে।

মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার (মৃত ব্যক্তির) পিতামাতা প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। সম্মিলিতভাবে ছয় ভাগের এক ভাগ নয়। অর্থাৎ প্রত্যেকে বার ভাগের এক ভাগ নয়। পিতাও ছয় ভাগের এক ভাগ। মাতাও ছয় ভাগের এক ভাগ। ছেলে অথবা মেয়ে অথবা ছেলের সন্তান (ছেলের সন্তান কন্যা হলে) থাকলে পিতা পাবে ষষ্ঠাংশ ফরজ হিসাবে। তারপর অন্যদের ফরজ অংশ বন্টনের পর অবশিষ্ট অংশ পাবে আসাবা হিসাবে। কেননা মেয়েদের ও নাতনীদের পর পিতাই নিকটতম আসাবা।

মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে পিতামাতাই তার উত্তরাধিকারী। এরকম অবস্থায় মা পাবে এক তৃতীয়াংশ যদি অন্য কোনো অংশী না থাকে। আর বিপত্নীক পুরুষ অথবা বিধবা নারী থাকলে তাদের অংশ দেয়ার পর যা থাকবে তার এক তৃতীয়াংশ পাবে। সন্তান ও নাতনী না থাকলে পিতামাতা উপস্থিত থাকলে বিপত্নীক স্বামী অথবা বিধবা স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ উত্তরাধিকার পাবে না।

বোন, ভাই এবং দাদা- পিতার উপস্থিতিতে ওয়ারিশ নয়। মাতার দাদী, নানী থাকলেও তারা কোনো অংশ পাবে না। অর্থাৎ ওয়ারিশ যদি কেবল পিতামাতা হয় তবে মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ। আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, এরকম অবস্থায় মা পাবে এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু মা ও বাবা দুজনই যদি বেঁচে থাকে, তবে মা কতো পাবে — তা কিন্তু আয়াতে উল্লেখ নেই। তবে একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি

পরিস্কাররূপে প্রতিভাত হয় যে — এ অবস্থায়ও মা পাবে তিন ভাগের একভাগ এবং পিতা পাবে বাকি দুই ভাগ। আর মৃতের পতি অথবা পত্নী বেঁচে থাকলে তার অংশ দিয়ে দেয়ার পর যা থাকবে তার এক তৃতীয়াংশ পাবে মা।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, আমরা মনে করি হজরত ওমর যে পথে চলেছেন, সেই পথই সবচেয়ে সহজ পথ। আমরা ওই পথই অনুসরণ করি। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, মৃত ব্যক্তির এক স্ত্রী ও পিতামাতা বেঁচে থাকলে কী হুকুম? তিনি বললেন, প্রথমে এক চতুর্থাংশ দিতে হবে স্ত্রীকে। তারপর অবশিষ্ট অংশের তিন ভাগের একভাগ মায়ের এবং দুই ভাগ বাপের। এ ব্যাপারে জায়েদ বিন ছাবেতের বক্তব্য এই যে, মৃতের মা-বাবা ও স্বামী কিংবা মা-বাবা ও স্ত্রী ওয়ারিশ হলে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর বাকি সম্পদকে তিন ভাগ করে একভাগ মাকে এবং দুই ভাগ বাবাকে দিতে হবে। এটাই ঐকমত্য। মৃতের পিতা বেঁচে না থেকে যদি দাদা বেঁচে থাকে, তবুও তার মা পাবে এক তৃতীয়াংশ।

বায়হাকী ইকরামার বক্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন, ইবনে আব্বাসের মতে উপরে বর্ণিত দুই অবস্থাতেই সমস্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশের অধিকারিণী হবে মা। শোরাইহ্‌ও এরকম মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইবনে শিরীন বলেছেন, মৃতের স্ত্রী ও পিতামাতা ওয়ারিশ হলে মা যে এক তৃতীয়াংশ পাবে এ কথা ঠিক। কিন্তু মৃতের স্বামী ও মাতাপিতা থাকলে তাদের অংশ সাব্যস্ত করা সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস যে অভিমত দিয়েছেন, সেটি খেলাফ। তাঁর মতটি ফারায়েজ বিরুদ্ধ। এই আয়াতে পিতার অংশ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এই না বলাই প্রমাণ করে যে পিতার দুই তৃতীয়াংশ (যেহেতু মাতার এক তৃতীয়াংশ)। পিতার বর্তমানে অন্য কোনো আসাবার অংশ নেই। কারণ তিনিই নিকটতম আসাবা। আয়াতের বিবরণে অবশ্য একথাটি স্পষ্ট যে, পিতা না থাকলে মা পাবে এক তৃতীয়াংশ। এর বেশী নয়।

মৃতের ভাই বোন (বৈপিত্রেয় অথবা বৈমাত্রেয়) থাকলে মা পাবে এক ষষ্ঠাংশ। এটাই ঐকমত্য। কিন্তু ইবনে আব্বাস বলেছেন, ভাই বোনের সংখ্যা হতে হবে কমপক্ষে তিনজন। তিনজনের কম হলে মায়ের অংশ এক তৃতীয়াংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশ করা যাবে না। হাকেম এই বক্তব্যটিকে বিশুদ্ধ প্রমাণিত করেছেন এভাবে - ইবনে আব্বাস হজরত ওসমানের নিকট গিয়ে বললেন, আপনি দুই ভাইয়ের কারণে মায়ের অংশ এক তৃতীয়াংশ থেকে কমিয়ে এক ষষ্ঠাংশ করলেন কী ভাবে? কারণ, দুই ভাই দ্বিবচনবোধক। কিন্তু আয়াতে বহুবচন উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত ওসমান বললেন, এই নিয়মটি আগে থেকেই অনুসৃত হয়ে আসছে। আর এটাই সকলে মান্য করে চলে। আমি আর এই নিয়মকে পরিবর্তন করতে চাই না। হজরত ওসমান এই ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্যকে দলিল হিসাবে

পেশ করেছেন। জায়েদ বিন ছাবেত কে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, আরববাসীগণ দুই ভাইকেও বহুবচন হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। (তিনি আরবী অভিধান সূত্রে এ কথা বলে ইশারা করেছেন যে, আমাদের অভিমত অভিধানবহির্ভূত নয়)।

মৃতের ভাই ও বোন থাকলে মা পাবে এক ষষ্ঠাংশ - এ কথা ঠিক । কিন্তু শুধু এক ভাই থাকলে পাবে এক তৃতীয়াংশ। শুধু এক বোন থাকলেও এক তৃতীয়াংশ। এটাই উত্তম পন্থা। পিতা থাকলে মা পায় এক তৃতীয়াংশ। সুতরাং শুধু এক ভাই এবং শুধু এক বোন থাকলেও এক তৃতীয়াংশ পাবে।

মাসআলা ঃ মাতা পিতা এবং কয়েকজন ভাই বোন থাকলে পিতা পাবে দুই তৃতীয়াংশ। মা পাবে এক ষষ্ঠাংশ। ভাইবোন কিছুই পাবে না। এই অভিমত জমহুরের। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পিতাকে দুই তৃতীয়াংশ এবং মাকে এক ষষ্ঠাংশ দেয়ার পর যা বাকি থাকবে তা ভাইবোনদেরকে দিতে হবে। ভাইবোনেরা বঞ্চিত হবে না।

মাসআলা ঃ দাদা ও পরদাদা - এভাবে উর্ধতনরা অংশ পাবে পিতা না থাকলে। নানা কিছু পাবে না। নানা পিতার স্থলাভিষিক্ত নয়। মাতার স্থলবর্তীও নয়, কেননা উভয়ের জাত ভিন্ন। তাই সম্পর্কটি এখানে জাদ্দে ফাসেদ (মাতামহ এবং তার উর্ধতন পুরুষেরা জাদ্দে ফাসেদ)। মৃত নিঃসন্তান হলে দাদা আসাবা হবে। অর্থাৎ আসহাবে ফারায়েজদেরকে দেয়ার পর যা থাকবে তা হবে দাদার। মৃতের পুত্র থাকলে দাদা পাবে সমস্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ। কন্যা থাকলেও ওই এক ষষ্ঠাংশ পাবে। যথাবন্টনের পর যা থাকবে তাও শেষ পর্যন্ত আসাবা হিসাবে দাদা পাবে।

পিতা ও দাদা সম্পর্কিত মতবিরোধ ঃ দাদার কারণে মায়ের অংশ এক তৃতীয়াংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশে নেমে আসে না। দাদা, মা ও স্বামী থাকলে- মাতার অংশ হবে এক ষষ্ঠাংশ। বিশুদ্ধ মাসআলা হচ্ছে - এমতক্ষেত্রে সম্পত্তিকে ছয় ভাগ করে তিন ভাগ স্বামীকে, এক ভাগ দাদাকে এবং দুই ভাগ মাতাকে দিতে হবে। আর যদি পিতা, মা ও স্বামী ওয়ারিশ হয় তবে স্বামী তিন, পিতা দুই এবং মাতা এক ভাগ পাবে (ষষ্ঠ অংশ ভাগ করতে হবে এভাবে)। পুরুষের বেলায় মৃতের দাদা, মা ও স্ত্রী পাবে এরকম- সম্পত্তি বারো ভাগ করতে হবে। তারপর স্ত্রীকে তিন, মাকে চার এবং দাদাকে পাঁচ ভাগ দিতে হবে। দাদার স্থলে যদি পিতা থাকে তবে সম্পত্তি হবে চার ভাগ - এক ভাগ পাবে স্ত্রী, এক ভাগ মা এবং দুই ভাগ পিতা। পিতার মতো দাদার ক্ষেত্রেও সহোদর, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভাইবোনেরা কিছুই পাবে না। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। হজরত আবু বকর এবং অধিকাংশ সাহাবী এই অভিমতের অনুসারী। অন্য তিন ইমাম এবং সাহেবাইন

(ইমাম ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ) বলেছেন, দাদা বৈমাত্রেয় ভাইবোনদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। এমতক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় ও সহোদর ভাইবোনেরাও অধিকারবঞ্চিত হয়।

ইবনে জাওজী বলেছেন তারা অধিকারবঞ্চিত হবে না। কারণ এদের অধিকারবঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারে কোরআনে দলিল থাকা উচিত। কিন্তু দাদা সম্পর্কিত স্পষ্ট কিছু কোরআনে নেই।

আমরা বলি, দাদা পিতার স্থলবর্তী। বৈমাত্রেয়দের ওয়ারিশ হওয়ার কথা কোরআনে রয়েছে ঠিকই, কিন্তু নাতি তাদেরকে অধিকারবঞ্চিত করে এ কথাও সঠিক। দাদাও তেমনি উর্ধতন পুরুষ হিসেবে পিতার স্থলাভিষিক্ত। ইমাম আবু হানিফার দলিল ওই হাদিসটি যেখানে রসুল স. বলেছেন, ফারায়েজ নির্ধারিত অংশীদারকে দিয়ে দাও। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ দাও মৃতের নিকটতম পুরুষদেরকে। এ কথাও মানতে হবে যে, নাতির চেয়ে দাদা অধিকতর শক্তিশালী। কারণ নাতির অস্তিত্ব এসেছে দাদা থেকেই। ভাইদের এরকম বংশগত নৈকট্য নেই।

দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, দাদা ও ভাইবোনদের নৈকট্য ভিন্ন রকমের। ভাইয়ের কারণে দাদাকে বঞ্চিত করার কথা কেউ বলেননি। কারণ দাদা ভাইবোনদের চেয়ে নিকটতম। কিন্তু দাদার কারণে ভাইবোনদেরকে বঞ্চিত করা যায়। কারণ তারা দাদার চেয়ে কম নিকটের।

শায়েখ ইবনে হাজার এ ব্যাপারে আপত্তি তুলে বলেছিলেন, ইবনে হাজম কতিপয় ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ভাইবোনেরাই দাদার তুলনায় অগ্রগণ্য। তাহলে দাদা বঞ্চিত না হওয়ার ব্যাপারটিতে ঐকমত্য আর রইল কোথায়?

আমরা বলি যে, ঐ ব্যক্তিরাতো দুনিয়া থেকে চলেই গিয়েছেন। এখন তাদের অনুসারী কেউ নেই। সুতরাং বলা যায় উম্মতের এজমা এ কথার উপর হয়ে গিয়েছে যে, ভাইবোন বঞ্চিত হবে অথবা হবে বণ্টনকারী। কাজেই ঐকমত্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত।

হজরত জায়েদ বিন ছাবেতের নিকট সহোদর অথবা বৈপিত্রেয় ভাইবোন দাদার সাথে যদি থাকে তবে দাদার জন্য সমস্ত মালের এক তৃতীয়াংশ বন্টন করা যাবে। যা দাদার জন্য উত্তম হবে তা তাকে দিতে হবে, তবে শর্ত হলো কোনো ফরজ অংশীদার যেনো না থাকে। বন্টন করার ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে - বন্টন করার সময় দাদাকে এক ভাইয়ের মত মেনে নিতে হবে এবং যতটুকু এক ভাইয়ের অংশ হয় ততটুকু দাদাকেও দিতে হবে। ওই সময় দাদার অংশ কম করার জন্য বৈপিত্রেয়, সহোদর ভাইবোনেরা সাথে শরীক হয়ে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিবে,

যেনো দাদার অংশ পরিমানে এক ভাইয়ের চেয়ে কম হয়ে যায় এবং দাদা যখন আপন অংশ পাবেন তখন বৈপিত্রেয়রা বন্টন থেকে বাদ পড়ে যাবে, শুধু সহোদর ভাইবোন অংশীদার হবে, বৈপিত্রেয়রা পাবে না। কিন্তু যদি এক বোন ব্যতীত অন্য কোন সহোদর ভাইবোন না হয় এবং দাদার সাথে বৈপিত্রেয় ভাইবোন উপস্থিত থাকে তখন দাদার অংশ এবং সহোদর বোনের অংশ (অর্থাৎ সমস্ত মালের অর্ধেক) দেয়ার পর যা কিছু বাকি থাকবে, বৈপিত্রেয়দেরকে দুই এবং এক গুণ হিসাব করে দিতে হবে। আর যদি বাকি না থাকে তবে কিছুই দিতে হবে না। যেমন - দাদা, এক সহোদর বোন এবং দুই বৈপিত্রেয় বোন—এ অবস্থায় দাদাকে এক ভাইয়ের মতো মনে করতে হবে এবং এক ভাই দুই বোনের সমান হয়, যেন পাঁচ বোন হয়ে গিয়েছে। আসল মাসয়ালা দশ দিয়ে হবে, দাদা যেহেতু দুই বোনের স্থানে এজন্য তাকে চার এবং সহোদর বোনকে সমস্ত সম্পদের অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচ দেয়ার পর এক বাকি রইল,যা দুই বৈপিত্রেয় বোনের হবে। কিন্তু এক দুই জনের উপর বন্টন করা সহীহ্ নয়। এজন্য মাসয়ালা বিশুদ্ধকরনের জন্য বিশ (২০) দিয়ে করতে হবে। আট (৮) দাদাকে, দশ(১০) সহোদর বোনকে এবং দুই(২) বৈপিত্রেয় বোন পাবে। কিন্তু যদি এ মাসয়ালায় দুই আল্লাতী বোন না হয় (বৈপিত্রেয় বোনকে আল্লাতী বোন বলে) শুধু এক আল্লাতী বোন যদি হয় তখন মীরাস চার বোনের হবে। দাদা দুই বোনের স্থানে হবে। এজন্য দশ(১০) ভাগ তার জন্য হবে এবং সহোদর বোন দশ(১০) ভাগ পাবে, আল্লাতী কোনোকিছুই পাবে না।

যদি দাদা এবং ভাইবোনদের সাথে অন্য কোনো অকাট্য ফরজ উত্তরাধিকারী থাকে তখন দাদাকে সমস্ত মালের এক ষষ্ঠাংশ অথবা ফরজ অংশ দেয়ার পর বাকি মালের এক ষষ্ঠাংশ অথবা বন্টনকৃত অংশ তিনজনের মধ্যে যা উত্তম, তাকে দিতে হবে। যেমন, দাদা-দাদী, কন্যা এবং দুই ভাই থাকলে আসল মাসয়ালার বন্টন ছয় দ্বারা হবে। তিন কন্যাকে এক, দাদীকে এক, দাদাকে এক এবং এক দুই ভাইকে দিতে হবে। এই মাসআলায় দাদাকে সমস্ত মালের ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ এক দেয়াই ভাল কেননা বন্টনের প্রেক্ষিতে সে তিন ভাই হয়ে গিয়েছে এবং দুই অংশকে তিন ভাইয়ের মধ্যে বন্টন করায় এক এক অংশের মধ্যে এক অংশের তিন ভাগের দুই অংশ এসে যায়, পুরো অংশ আসে না এবং বাকি মালের ষষ্ঠাংশের কম হয়ে যায়।

এভাবে বন্টন করলে ব্যাপারটি এরকম দাঁড়ায় যে, ফরজ অংশ দেয়ার পর কিছুই বাকি থাকে না। নিরুপায় হয়ে মাসআলায় আওল করতে হবে (আওল হলো মীরাসের অংশ নিরুপণকারী সংখ্যা বর্ধিতকরণ)। অর্থাৎ সংখ্যা বৃদ্ধি করে দাদাকে ষষ্ঠাংশ দিতে হবে। যেমন — যদি দুই কন্যা, মা, স্বামী এবং দাদা (তখন কন্যাদেরকে দুই তৃতীয়াংশ, স্বামী চার এবং মা ষষ্ঠাংশ পাবে। কিন্তু কম করার

অনুমতি নেই। কাজেই বাধ্য হয়ে বারোকে পনের এর দিকে আওল করতে হবে) এবং পনের এর বন্টন এভাবে করতে হবে — কন্যাগণ আট, স্বামী তিন, মা দুই এবং দাদা দুই।

কখনো জাবিল ফুরুজুকে (কোরআন হাদিসে যাদের অংশ নির্ধারিত তারা হলেন জাবিল ফুরুজ) দেয়ার পর কিছু বাকি থাকে; কিন্তু এক ষষ্ঠাংশ থেকে কম যেমন — যদি দুই কন্যা এবং স্বামী — এ অবস্থায় আসল তাসীহ্ বারো দ্বারা হবে। কন্যাগণ আট এবং স্বামীকে তিন দেয়ার পর এক অবশিষ্ট থাকে যা বার ভাগের এক ভাগ হবে, ছয় ভাগের এক ভাগ হবে না। কাজেই আওল করে তের দিয়ে তাসীহ্ বর্ধিত করে বিশুদ্ধ করতে হবে এবং দাদাকে দুই অংশ দিতে হবে। কোনো সময় ষষ্ঠাংশ বাকি থাকে। যেমন — যদি দুই কন্যা এবং মা এবং দাদা বর্তমান থাকে তখন(তাসীহ্ এর আভিধানিক অর্থ বিশুদ্ধকরণ। আর পারিভাষিক অর্থ যখন অংশীদারের অংশ সমূহে ভগ্নাংশ হয় তখন যথাসম্ভব অপেক্ষাকৃত ছোট সংখ্যা দ্বারা এমনভাবে অংশ বের করতে হবে যেনো সকল অংশীদারের মধ্যে শরিয়তের নির্ধারিত অংশ ভগ্নাংশ ব্যতিরেকে বন্টিত হয়ে যায়) তাসীহ্ ছয় দ্বারা করে কন্যাদেরকে চার, মাকে এক এবং দাদাকে এক দিবে। তিন অবস্থাতেই ভাই থাকলে বঞ্চিত থাকবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, দাদার জন্য সম্পদের ষষ্ঠাংশ দিবে (অথবা বন্টন করে অংশ দেয়ার চেয়ে অবশিষ্ট মালের ষষ্ঠাংশ বেশী উপকারী হবে) যদি দাদা, দাদী, দুই ভাই ও এক বোন থাকে, তবে আসল তাসীহ্ ছয় দিয়ে হবে। ছয় অংশ দাদীকে দেয়ার পর পাঁচ থাকবে এবং পাঁচের তৃতীয়াংশ ভগ্নাংশ ব্যতীত বের করা যায় না। কাজেই তিন বের করতে আসল তাসীহ্ ছয়ের মধ্যে ধাক্কা দিতে হবে অর্থাৎ তিনের আসল তাসীহ্ ছয় এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে আঠারো হয়ে যাবে। আঠারো হতে তিন দাদীকে দেয়ার পর বাকি পনেরো এর এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ পাঁচ দাদাকে, প্রত্যেক ভাইকে চার এবং বোনকে দুই দিয়ে দেবে। যদি দাদাকে সমস্ত সম্পদের ছয় দেয়া হয়, তবে আসল মাসআলা ছয় দ্বারা হবে। এক দাদাকে দেবে এবং এই এক পনেরো এর এক তৃতীয়াংশ পাঁচ থেকে বেশী এবং বন্টন থেকেও দাদার এই পাঁচ অতিরিক্ত হবে। কেননা যখন দাদাকে এক ভাইয়ের স্থানে মেনে নেয়া হয়, তখন তিন ভাই এবং এক বোন এবং এক দাদী অংশীদার হবে এবং দাদার অংশ এক ভাইয়ের সমান হবে, অর্থাৎ এক সমস্ত সাত ভাগের তিন। আর যদি দাদীর অংশ আদায় করার পর বাকি মালের এক তৃতীয়াংশ দাদাকে দেয়া হয়, তবে এক সমস্ত তিন ভাগের দুই হবে এবং প্রকাশ থাকে যে, এক সমস্ত তিন ভাগের দুই বেশী হবে এক সমস্ত সাত ভাগের তিন থেকে।

আকদারীয়ার মাসআলা ঃ হজরত জায়েদ বিন ছাবেতের নিকট দাদার বর্তমানে সহোদর অথবা বৈপিত্রেয় বোন অংশীদার নয়। শুধু নিচের ধারণাটি পৃথক। এর মধ্যে বোন অংশীদার। মাসআলা এই যে, স্বামী, মা, দাদা, বোন (আসল মাসআলা ছয় দিয়ে হবে)। স্বামীকে অর্ধেক, মাকে এক তৃতীয়াংশ, দাদাকে ষষ্ঠাংশ। ছয় পূর্ণ হয়ে গেল। বোনের জন্য কিছুই রইল না। কিন্তু হজরত জায়েদ বোনকে অংশীদার করা জরুরী মনে করেন এবং এক বোনের জন্য সম্পত্তির অর্ধেক হওয়া দরকার। (আওল শব্দের আভিধানিক অর্থ উঁচু করে দেয়া কোন এক দিকে ঝুঁকে পড়া। পারিভাষিক অর্থ অংশ নির্ণয়ের সংখ্যাটি যদি অংশ প্রদানের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ হয়ে যায়, তখন অংশ নির্ণয়ের সংখ্যাটিকে অংশ থেকে কিছুটা বাড়িয়ে দেয়ার নামই আওল)। তখন আওল করে ছয়কে নয় করে দেয়া যায়। অতঃপর দাদার জন্য এক এবং বোনের জন্য তিন হবে। এভাবে দাদার অংশ বোন থেকে কম হয়ে যায়। এজন্য দাদার অংশ বোনের অংশের সাথে দিতে হবে এবং একত্রে চার হয়ে যাবে এবং দাদা যেহেতু ভাইয়ের স্থানে এবং ভাইয়ের অংশ দুই বোনের সমান, এজন্য দাদা দুই বোনের পর্যায়ে হয়ে গিয়েছে এবং মাসআলায় তিন বোন হয়ে গেলো, যাদেরকে চার অংশ দিতে হবে এবং গণনার সংখ্যা অর্থাৎ তিন অংশ অর্থাৎ চার এর মধ্যে পৃথক পৃথক হয় এজন্য তিন আওলের সংখ্যায় অর্থাৎ নয় এর মধ্যে যদি প্রবেশ করানো যায়, তবে তিন নয় সাতাশ হয়ে যাবে। তখন এবং সাতাশকে তাসীহ্ এর মাসআলায়, স্বামীকে নয়, মাকে ছয়, দাদাকে আট এবং বোনকে চার দিতে হবে। কিন্তু যখন এক বোনের পরিবর্তে এক ভাই অথবা দুই বোন হয় তখন না আওল হবে না মাসআলায়ে আকদারীয়া থাকবে। আসল তাসীহ্ ছয় দ্বারা হবে। স্বামী তিন, মা দুই, দাদা এক, ভাই আসাবা হবে। কিন্তু এখানে কিছু অবশিষ্ট না থাকার কারণে বঞ্চিত হবে। আর যদি ভাইয়ের স্থলে দুই বোন হয়, তখন মায়ের অংশ এক তৃতীয়াংশ হবে না। বরং ছয় হবে। স্বামী তিন, মা এক, দাদা এক, দুই বোনকে এক। কেননা এক এর বন্টন দুইয়ের উপর টুকরা ব্যতীত হতে পারে না। এজন্য দুইকে আসল সংখ্যা অর্থাৎ ছয় এর তাসীহ্ অর্থাৎ ছয় দ্বারা করবে এবং মূলতঃ হবে বারো। এখন বন্টন এরূপে হবে যে, স্বামী ছয়, মাতা দুই, দাদা এক, বোন দুই, দ্বিতীয় বোন দুই। বনী আকাদার গোত্রের এক মহিলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘটনাকে মাসআলায়ে আকদারীয়া বলা হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ দাদা, বোন অথবা ভাই এর বন্টনপদ্ধতি সম্পর্কে সাহাবীগণের মতবিরোধ রয়েছে। বায়হাকী লিখেছেন, হাজ্জাজ, শা'বীর নিকট জিজ্ঞেস করলেন — এক মা, এক বোন এবং এক দাদার মধ্যে কীভাবে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে। শা'বী বললেন, এ সম্পর্কে পাঁচজন সাহাবার ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। হজরত

ওসমান বলেছেন, এমতো ক্ষেত্রে আমি সমস্ত সম্পত্তিকে তিনভাগ করে প্রত্যেককে একভাগ করে দিয়ে দেবো। হজরত আলী বলেছেন, আমি ভাগ করবো এভাবে - সমস্ত সম্পত্তিকে ছয় অংশে ভাগ করে তিন অংশ বোনদেরকে, দুই অংশ মাকে এবং এক অংশ দাদাকে দেবো। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমিও ছয় ভাগ করবো এভাবে- বোন তিন, দাদা দুই এবং মা এক। হজরত জায়েদ বিন সাবেত বলেছেন, আমি সমস্ত সম্পত্তিকে নয় ভাগে ভাগ করবো। বোনকে তিন, দাদাকে চার এবং মাকে দুই অংশ দেবো। এ বিষয়ে হাজ্জাজ শা'বীর নিকট হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমত জানতে চাননি। শা'বীও বর্ণনা করেননি। বায়হাকী ইব্রাহিম নাখয়ীর সূত্রে বর্ণনা করেন, হজরত ওমর এবং হরজত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ ভাইকে দাদার উপর অগ্রাধিকার দেননি। কিন্তু ইবনে হাজম তাঁর নিজস্ব বর্ণনা পদ্ধতিতে বলেছেন, হজরত ওমর বোনকে অর্ধেক , মাকে এক ষষ্ঠাংশ এবং দাদাকে অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ দিতেন। তিনি ভাইকে গুরুত্ব দেননি, কিন্তু বোনকে দাদার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এমতো ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মাসআলা নস্ (কোরআন ও হাদিস) এবং কিয়াসের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফার নিকট প্রকৃত দাদী তিনি, যিনি মৃত ব্যক্তির আত্মীয়া হয়েছেন কোনো অপ্রকৃত দাদার কারণে নয়। তিনি বলেছেন, সকল প্রকৃত দাদী-ই ওয়ারিশ। তবে তাদেরকে সমস্তরের হতে হবে এবং প্রকৃতই দাদী হতে হবে। ইমাম মালেক এবং দাউদ জাহেরীর অভিমত এই যে, শুধু দুই দাদী ওয়ারিশ হবে পিতার মা, দাদীর মা, তার মা এবং তার মা অর্থাৎ দাদীর উপর স্তরের সমস্ত দাদীগণ এবং নানী, নানীর মা, তার মা — এভাবে উপরের স্তরের সমস্ত নিকটতম নানী দূরবর্তীদেরকে অধিকারবঞ্চিত করবে। ইমাম শাফেয়ীর একটি মতও এরকম। তাঁর দ্বিতীয় মতটি ইমাম আহমদের অভিমতের অনুরূপ। অভিমতটি এই, পিতা ও মাতার উপরের স্তরের তিন মহিলা ওয়ারিশ হবে — নানী, দাদী এবং দাদার মা। ঐকমত্য এই যে, গুণগত দিক থেকে এক বা একাধিক দাদী সকল অবস্থায় এক ষষ্ঠাংশ পাবে। মৃত ব্যক্তির দাদী যদি এক বংশের হয় — যেমন, দাদীর মা। অথবা অন্য বংশের হয় — যেমন, মায়ের নানী এবং দাদার মা। এমতাবস্থায় প্রথম ও দ্বিতীয় বংশের মধ্যে বিভেদ নেই। ইমাম ইউসুফ একথা বলেছেন। এখানে উভয়কে এক ষষ্ঠাংশ সমভাবে বন্টন করে দিতে হবে। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, আত্মীয়দের গুরুত্ব বিবেচনা করতে হবে। এভাবে প্রথম পর্যায়ের যারা, তাদেরকে প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের যারা তাদেরকে দ্বিতীয় অংশ দিতে হবে।

দাদীদের বন্টন সম্পর্কিত ঘটনা কুবাইসার বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এক দাদী তার মীরাসের দাবী নিয়ে হজরত আবু বকরের খেদমতে হাজির হলেন। হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহর কিতাবে আপনার কোনো অংশ নেই। রসুল স. এর সুন্নতেও নেই। আপনি চলে যান। দেখি আমি এ বিষয়ে মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। বৃদ্ধার সাথে অঙ্গীকার অনুযায়ী হজরত আবু বকর এ ব্যাপারে বিভিন্নজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। প্রশ্ন শুনে হজরত মুগিরা বিন শোবা বললেন, আমি জানি এক দাদী উত্তরাধিকারের দাবী নিয়ে রসুল স. এর দরবারে এসেছিলেন। রসুল স. তাঁকে এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছিলেন। আবু বকর বললেন, ওই সময় তোমার সঙ্গে আর কে ছিলেন? মুগীরা বললেন, মোহাম্মদ বিন মোসলেমা ছিলেন। তিনি (হজরত আবু বকর) মোহাম্মদ বিন মোসলেমাকে ডাকলেন। তিনিও একই কথা বললেন। তখন হজরত আবু বকর ওই মহিলার জন্যও একই হুকুম জারী করলেন।

আর একটি ঘটনা। হজরত ওমরের নিকট এক দাদী দাবী করলেন তাঁর উত্তরাধিকার। হজরত ওমর বললেন, ওই এক ষষ্ঠাংশ হবে আপনাদের দুজনের। দুজনকে সমান সমান দেয়া হবে। আর যদি আপনি একা হন তবে পুরো এক ষষ্ঠাংশ হবে আপনারই। মালেক, আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, দারেমী ও ইবনে মাজা। ইবনে ওহাব বর্ণনা করেন, যে দাদীকে রসুল স. অংশ দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন মৃতের নানী। হজরত আবু বকরের নিকট যিনি এসেছিলেন, তিনিও ছিলেন নানী। আর যে মহিলা হজরত ওমরের কাছে এসেছিলেন, তিনি ছিলেন পিতার মা অর্থাৎ দাদী। হজরত ওমর তাঁর অংশ সম্পর্কে মাসআলা অন্বেষণ করলেন। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলো না। হঠাৎ বনু হারেসার এক ছেলে বললো, আমীরুল মোমেনীন, আপনি ওই মহিলার অংশ দিচ্ছেন না কেন? এই মহিলা মরে গেলে মীরাস পেতো এই মৃত, কেননা তার পৌত্র আছে, ছেলে নেই - এ কথা শুনে হজরত ওমর ওই মহিলার অংশ দিয়ে দিলেন।

মুয়াত্তা ও বায়হাকীতে রয়েছে, নানী ও দাদী (দুই দাদী) মিরাস নিতে এলেন হজরত আবু বকরের কাছে। তিনি এক ষষ্ঠাংশ দিতে চাইলেন নানীকে। এক আনসারী বললেন, আপনি এমন মহিলাকে ওয়ারিশ করছেন না কেন, যিনি মরে গেলে এবং এই মৃত জীবিত হলে তাঁর ওয়ারিশ হবেন। এ কথা শুনে হজরত আবু বকর এক ষষ্ঠাংশ দাদী ও নানীকে সমান অংশে ভাগ করে দিলেন। এই পদ্ধতিটি দারা কুতনী ইবনে আইনিয়ার নিয়মে বর্ণনা করেছেন এবং এ কথাও লিখেছেন যে, আনসারী সাহাবী ছিলেন হজরত আবদুর রহমান বিন সহল বিন হারেসা।

ফকীহ্গণ বলেছেন, নানী মায়ের স্থলবর্তী। তাই মায়ের মতো এক ষষ্ঠাংশ দেয়া হয়েছিলো এবং দাদী নানীর তুল্য ধরে নিয়ে তাকে অংশী বানানো

হয়েছিলো। আর তিনি ছিলেন পিতার মা। নতুবা দাদী মায়ের স্থলবর্তী হন না। মায়ের কারণে ওই মৃতের বংশও তিনি নন। এবং তিনি পিতার স্থলবর্তীও নন। পিতার বংশ তো পৃথক বংশ। ইমাম আবু হানিফার দলিল এই যে, রসুল স. তিন দাদীকে একত্রে এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছিলেন। দুজন ছিলেন মায়ের দিক থেকে। আর একজন ছিলেন পিতার দিক থেকে। দারাকুতনী এই হাদিসকে মুরসাল সা'দ সহ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ মুরসাল হিসাবে অন্য সনদে ইব্রাহিম নাখয়ী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। দারা কুতনী ও বায়হাকী মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন হাসান বসরী থেকে। বায়হাকী বলেছেন, মোহাম্মদ বিন নছর এ ব্যাপারে সাহাবী এবং তাবেয়ীনের ঐকমত্যের কথা বলেছেন। কিন্তু সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস একে স্বীকার করেননি। কিন্তু সা'দের এই অস্বীকৃতি সম্পর্কে কোনো বিশুদ্ধ সনদ নেই।

মাসআলা ঃ মা সকল দাদীকে (পিতার দিক থেকে হোক কিংবা মাতার দিক থেকে) অধিকার বঞ্চিত করে দেন। কেননা হজরত আবু বোরায়দার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. দাদীর জন্য সমস্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যদি মা না থাকে। আবু দাউদ, নাসাঈ। এই হাদিসের এক বর্ণনাকারীর নাম ওবায়দুল্লাহ আতাকী। তাঁর সম্পর্কে আলেমগণের রয়েছে মতানৈক্য। আবার ইবনে সাকান এই হাদিসকে সহীহ্ বলেছেন।

পিতা তাঁর সকল দাদীর অধিকার লাভের প্রতিবন্ধক। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদের দুটি বক্তব্য রয়েছে। একটি বক্তব্য অস্বীকৃতিমূলক। অন্যটি সমর্থনসূচক। অস্বীকৃতিসূচক বক্তব্যের অনুকূলে তিনি হজরত ইবনে মাসউদের এই বর্ণনাটি পেশ করেছেন যে, রসুল স. মৃতের পিতার জীবিত দাদীর জন্য এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছিলেন। তিরমিজি, দারেমী।

আমরা বলি, তিরমিজি বলেছেন, এই হাদিসটি দুর্বল। জমহুরের বক্তব্যের প্রমাণ রয়েছে এই ব্যাখ্যাটিতে যাতে বলা হয়েছে, নিকটতম আত্মীয়রা দূরবর্তীদের প্রতিবন্ধক।

এরকম বন্টনপদ্ধতি সম্পর্কে আয়াতে বলা হয়েছে, বন্টন করতে হবে মৃতের অছিয়ত পূর্ণ করার পর। অর্থাৎ মায়ের এক ষষ্ঠাংশ দেয়ার পর। এই আয়াতের শুরু থেকে বন্টনের যে নিয়ম সমূহ বলা হয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ করার পর শেষ বন্টন পদ্ধতিটি কার্যকর বলে বিবেচিত হবে। ধারাবাহিকভাবে এর বিবরণ হচ্ছে, ছেলের জন্য দুই অংশ এবং মেয়ের জন্য এক অংশ। ছেলে না থাকলে শুধু দুই মেয়ের জন্য দুই তৃতীয়াংশ। এক মেয়ের জন্য অর্ধাংশ এবং পিতামাতার প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। আর পিতা না থাকলে শুধু মায়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ।

অছিয়ত তো পূর্ণ করতে হবেই, ঋণ থাকলে বন্টনের পূর্বে পরিশোধ করতে হবে। সকল বন্টন শুরু হবে অছিয়ত পূর্ণ করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার

পর। আয়াতে অছিয়তকে উল্লেখ করা হয়েছে ঋণের পূর্বে। আহলে সুন্নতের অভিমত, ঋণ ক্ষমাপ্রাপ্তির (মাগফেরাতের) প্রতিবন্ধক। কেউ আকস্মিক মৃত্যুবরণ করতে পারে। তাই অছিয়তকে আগে এবং ঋণকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত কাতাদা বলেছেন, এক ব্যক্তি রসুল স. এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে রসুল! আমি পুণ্য লাভের ইচ্ছা নিয়ে আল্লাহর পথে ধৈর্য্যের সঙ্গে যদি কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হই, যুদ্ধে কিছুতেই যদি পশ্চাদপসরণ না করি, তবে কি আল্লাহ আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন? তিনি স. বললেন, হাঁ যদি তোমার ঋণ না থাকে। ঋণ ব্যতীত শহীদদের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করা হবে। মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, শহীদদের অন্য সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। মুসলিম।

মাসআলা ঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, প্রথমে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর পরিশোধ করতে হবে ঋণ। তারপর তার মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে পূর্ণ করতে হবে অছিয়ত। এরপর অবশিষ্ট সম্পত্তি বন্টন করতে হবে ওয়ারিশদের মধ্যে। হজরত আলী বলেছেন, তোমরা তো এই আয়াত পাঠ করছোই। রসুল স. কিন্তু অছিয়ত পূর্ণ করার আগেই ঋণ পরিশোধ করতে বলেছেন। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

জ্ঞাতব্য ঃ এই তাফসীরকার বলেছেন, কাফন দাফনের আগেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু এখানে আরো একটি ব্যাপার প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ফারায়েজের আলেমগণ বলেছেন, ঋণ পরিশোধ করতে হবে কাফন দাফনের আগেই। যেমন — জায়েদ দুই শত দেরহাম দিয়ে একটি ঘোড়া কিনলো কিন্তু মূল্য পরিশোধ না করতেই হঠাৎ মারা গেলো। এমতাবস্থায় ঘোড়াবিক্রেতা তার ঘোড়াটি ফেরত নিয়ে যাবে। কাফন দাফনের আগেই এ কাজটি হতে হবে। এ ধরনের ঋণ পরিশোধ হতে হবে কাফন দাফনের আগেই। অন্য ধরনের ঋণ পরিশোধ করতে হবে কাফন দাফনের পর। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মাসআলা ঃ অছিয়ত কার্যকর হবে এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির উপর। এ ব্যাপারে আলেমগণের ঐকমত্য রয়েছে। হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লাম। মনে হলো আর বাঁচবো না। রসুল স. আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমার অনেক সম্পদ। আমার তো এক কন্যা ব্যতীত আর কেউ নেই। আমি কি আমার সমস্ত সম্পত্তি অছিয়ত করতে পারি? তিনি স. বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি দুই তৃতীয়াংশ অছিয়ত করবো? তিনি স. বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক? তিনি স. বললেন, তাও না। বললাম, তবে কি এক তৃতীয়াংশ? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ তা করতে পারো। তবে সন্তানকে যদি সম্পত্তির অধিকারী করে যাও তবে তাই হবে উত্তম। তাদেরকে নিঃস্ব কোর না। আল্লাহর সন্তোষ্টির

জন্য তুমি যা ব্যয় করবে তার সওয়াব তো অবশ্যই পাবে, কিন্তু মনে রেখো স্ত্রীর মুখে যে আহার তুলে দিবে তার জন্যও রয়েছে সওয়াব। বোখারী, মুসলিম।

তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এরকম, রসুল স. বলেন, এক দশমাংশ অছিয়ত করতে পারো। আবার অছিয়তের অনুমতির জন্য বার বার নিবেদন করাতে তিনি স. বলেছিলেন, মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ অছিয়ত করতে পারো। আর এক তৃতীয়াংশই অনেক।

হজরত মুআজ মারফু পদ্ধতিতে বর্ণনা করেন, মৃত্যুকালে এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি অছিয়ত করার ব্যাপারে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। এভাবে তিনি তোমাদের সম্পদকে পবিত্র করেছেন। তিবরানী এই হাদিসকে উত্তম সনদ সহ বিবৃত করেছেন। মারফু সূত্রে আবু দা র দা থেকে উল্লেখ করেছেন তিবরানী ও আহমদ। ইবনে মাজা, বায্যার এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। আর উকাইলী বর্ণনা করেছেন হজরত আবু বকর থেকে।

এই আয়াতের শেষে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন, তোমাদের পিতামাতা,না সন্তান সন্তুতি,কে যে বেশী উপকারী হবে তা তোমরা জানো না। অর্থাৎ তোমরা একথা অবগত নও যে, দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের উপকার লাভ হবে কোন বংশধারা দ্বারা। মূলগত না শাখাগত — কোন ধারার মাধ্যমে।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের সময় মানুষেরা তাদের পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের অবস্থা জানতে চাইবে। তখন তাদেরকে বলা হবে,তারা তোমার অবস্থায় উন্নীত হতে পারেনি (এ কারণেই তারা এ স্থানে নেই)। বেহেশ্‌তবাসী তখন নিবেদন করবে, হে আমার প্রভু প্রতিপালক! আমি তো আমার আমলের সাথে সাথে তাদের জন্যও আমল করেছি। তার এই নিবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দেশ হবে, তার নিকটতমদেরকে তার সঙ্গী করে দাও। কবীর পুস্তকে তিবরানী এই বর্ণনাটি করেছেন। ইবনে মারদুবিয়াও তাঁর তাফসীরে এরকম লিখেছেন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আনুগত্যশীল ব্যক্তিরাই কিয়ামতের দিন সর্বোচ্চ মর্যাদাধারী হবে। আর আল্লাহ্ এক মুমিনের জন্য অন্য মুমিনের সুপারিশ কবুল করবেন। পিতা জান্নাতের উচ্চস্তর লাভ করলে পুত্রকেও সেখানে পৌঁছানো হবে। সন্তান উচ্চস্তরের অধিকারী হলে পিতাকেও দেয়া হবে উচ্চস্তরের অধিকার, যেনো তাদের চক্ষু শীতল হয়। কাজেই এ কথা কেউ জানে না যে, ওয়ারিশদের মধ্যে কে অধিক উপকারী। তাই সম্পদ বন্টনের নিয়ম তাদের অভিমতানুসারে করা হয়নি। মানুষ যদি জানতো, তবে অধিক উপকারীর দিকেই ঝুঁকে পড়তো। তাই ওয়ারিশদেরকে নিজ অভিমতানুসারে গুরুত্ব দেয়া অনুচিত।

রসুল স. বলেছেন, ওয়ারিশদের মতের বাইরে কোনো বিশেষ ওয়ারিশদেরকে অছিয়ত করা বৈধ নয়। দারা কুতনী এই হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস থেকে। মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, আতা খোরাসানী থেকে এবং ইউনুস, আতা থেকে, তিনি ইকরামা থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে। দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন আমর বিন শোয়াইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে।

হজরত আবু উমামা থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু উমামা বলেছেন, আমি রসুল স. এর বিদায় হজ্জের ভাষণে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, আল্লাহ্ প্রত্যেক হকদারকে তার হক দান করেছেন। কাজেই কোনো বিশেষ ওয়ারিশকে অছিয়ত করা যাবে না। অর্থ এই যে, ওয়ারিশদের মধ্যে তোমাদের জন্য কে বেশী উপকারী তা তোমরা জানো না। তাই বিশেষ কোনো ওয়ারিশকে অছিয়ত করে যেও না। বরং আল্লাহর বিধানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হও।

বিধান আল্লাহতায়ালার। সম্পত্তি বন্টন বিষয়ক বিধান সমূহও আল্লাহ তায়ালার। তিনি সর্বজ্ঞ। কিসে কল্যাণ তা তিনি সম্যক অবগত। তাই পরম প্রজ্ঞাধিকারী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর বিধান নির্বিবাদে মান্য করো।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১২

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِيْنَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ○

❒ তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাহাদের কোনো সন্তান না থাকে, এবং তাহাদের সন্তান থাকিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ। ইহা তাহারা যাহা অসিয়ৎ করে তাহা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ; এই সব তোমরা যাহা অসিয়ৎ করিবে তাহা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতামাতাহীন অবস্থায় কাহাকেও উত্তরাধিকারী করে এবং তাহার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নী থাকে তবে প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। তাহারা ইহার অধিক হইলে সকলে অংশীদার হইবে এক তৃতীয়াংশের; ইহা যাহা অসিয়ৎ করা হয় তাহা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি ইহা কাহারো জন্য হানিকর না হয়। ইহা আল্লাহের নির্দেশ, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

নিঃসন্তান স্ত্রী মারা গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে স্বামী। স্ত্রী সন্তান রেখে মারা গেলে স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ। তবে প্রথমে পূর্ণ করতে হবে অছিয়ত এবং পরিশোধ করতে হবে ঋণ।

স্বামী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তার স্ত্রী পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ। স্ত্রী একাধিক হলেও সকলে মিলে এই এক চতুর্থাংশই পাবে। সন্তান থাকলে এক স্ত্রী অথবা একাধিক স্ত্রী সম্মিলিতভাবে পাবে এক অষ্টমাংশ। কিন্তু প্রথমেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে অছিয়ত পূর্ণ করতে হবে। তারপর সমস্ত সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তারপর বণ্টন কার্যকর হবে।

তালাকে রেজয়ী অবস্থায় থাকা স্ত্রীও অংশ পাবে। কিন্তু বায়েন তালাকের ইদ্দতে থাকলে পাবে না। মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তালাকে রেজয়ী দিলেও স্ত্রী অংশ পাবে। এটা ঐকমত্য। অবশ্য এই মাসআলাটির একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা হওয়া আবশ্যক। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এ ধরনের মহিলা স্বামীর মৃত্যুকালে ইদ্দত পালনরত থাকলে অংশ পাবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, ইদ্দত পালনের সময় শেষ হয়ে গেলেও অংশ পাবে যদি সে নতুন কোনো বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয়। ইমাম মালেক বলেছেন, স্বামীর মৃত্যুর আগে ইদ্দত পালন শেষ করে অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে বসলেও ওয়ারিশ হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ীর তিন ধরণের বক্তব্য জানা যায়। এক এক বক্তব্য এক এক রকমের। মৃত্যুরোগে আক্রান্ত স্বামী তালাকে বায়েন দিলে তবুও স্ত্রী তার মীরাস পাবে। এই মত পোষণ করেন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ। তবে ইমাম আবু হানিফার শর্ত হচ্ছে মহিলা যেনো নিজে তালাক না চায়। নিজে তালাক চাইলে বুঝা গেলো সে তার হক বিনষ্ট করতে রাজী (তাই অংশ পাবে না।)। ইমাম শাফেয়ীর শক্তিশালী বক্তব্য এই যে, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ওয়ারিশ হবে না।

ইমাম আহমদ মুয়াম্মার থেকে লিখেছেন, ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে গায়লান বিন সালমার দশটি স্ত্রী ছিলো। রসুল স. বললেন, মনমতো চারজনকে রেখে বাকিদেরকে ছেড়ে দাও। হজরত ওমরের খেলাফতের সময় গায়লান সকল স্ত্রীকে রেজয়ী তালাক দিয়ে তাঁর সমস্ত সম্পদ ছেলেদেরকে বন্টন করে দিলেন। এই সংবাদ পেয়ে হজরত ওমর বললেন, আমার ধারণা, যে শয়তান ফেরেশ্তাদের কথা চুরি করে শোনে, সেই শয়তানই তোমার মৃত্যুর কথা শুনে নিয়ে তোমার অন্তরে ঢেলে দিয়ে বলেছে, তুমি আর বেশী দিন বাঁচবে না। আল্লাহর কসম! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে ফেরত না নিলে আর ছেলেদের কাছ থেকে সম্পত্তি ফেরৎ নিয়ে না এলে আমি তোমার স্ত্রীদেরকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিবো। হুকুম দিবো, আবু রেগালকে মাটিতে পুঁতে যেভাবে পাথর মারা হয়েছিলো তোমাকেও যেনো তেমনি করে প্রস্তর নিক্ষেপ (সঙ্গেসার) করা হয়। (আবু রেগাল ছিলো, মূর্খতার যুগের এক ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক)। এই হাদিসটি জমহুরের ওই অভিমতটিকে ভিত্তি দিয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, রেজয়ী তালাকের ইদ্দত পালনরতারাও ওয়ারিশ। আর তালাকে বায়েনের ইদ্দতপালনরতাদের ওয়ারিশ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে এই ঘটনাটিতে - হজরত আবুদর রহমান বিন আউফের স্ত্রী ছিলেন তামাজুর বিনতে আছবাগ বিন জিয়াদ। তিনি ছিলেন কোলাব বংশদ্ভুত। তিনি তাঁর এই স্ত্রীকে বায়েন (অকাট্য) তালাক দিলেন এবং ইদ্দতের সময় শেষ হওয়ার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তখন হজরত ওসমান ওই স্ত্রীকে ওয়ারিশ বলে গণ্য করলেন। এই ঘটনাটি ঘটেছিলো সকল সাহাবীর উপস্থিতিতে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেউ আপত্তি তোলেন নি। তাই এটা ঐকমত্য। হজরত ওসমান আরো বলেছিলেন, আমি আবদুর রহমানের প্রতি অসুন্দর ধারণা রাখি না। আমার উদ্দেশ্য শুধু সুন্নত প্রতিপালন করা। আমাদের মতামতের পোষকতা রয়েছে হজরত ওমর, হজরত আবুদল্লাহ বিন ওমর, হজরত ওসমান, হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত মুগিরার বর্ণনায়। এ প্রসঙ্গে হজরত আলী, হজরত উবাই বিন কাব, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হজরত আয়েশা এবং হজরত জায়েদ বিন ছাবেতের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন আবু বকর রাজী। পরবর্তীদের মধ্যে নাখয়ী, শা'বী, সাঈদ বিন মোসাইয়েব, ইবনে শিরিন, ওরওয়া, শোরাইহ্, রবিয়া বিন আবদুর রহমান, তাউস বিন শুবরামা, সাওরী, হারেস এবং হাম্মাদ বিন আবী সোলায়মানের মাসআলাও এরকম।

এরপর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ওই পুরুষ ও নারীর প্রসঙ্গ যাদের বংশধর বলতে কেউ নেই। উর্ধস্তরের বাবা, দাদা অথবা নিচের স্তরের ছেলে, নাতি - এরকম যার কোনো মূল বা শাখাগত বংশ বলতে কিছু নেই। এরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন বায়যাবী। বাগবী বলেছেন, এখানে উদ্দেশ্য ওই ব্যক্তি যার সন্তান

সন্তুতিও নেই, পিতামাতাও নেই। হজরত আলী ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, যার বংশ দুদিক থেকেই দুর্বল। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, যার বাপ, দাদা, পরদাদা নেই, সন্তানও নেই। এরকম মৃত ব্যক্তি পরিবেষ্টিত হয় বংশবিহীন লোকের দ্বারা যেমন শাহী পট্টি, যে সুসজ্জিত কাপড় মাথার চতুর্দিক বেষ্টন করে রাখে কিন্তু মাথার মধ্যভাগ থাকে নগ্ন। এরকম ব্যক্তিকে এই আয়াতে কালালা বলা হয়েছে। হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসে কালালা শব্দের অর্থ এসেছে এরকম- রসুল স. বলেছেন, আমার ওয়ারিশ কালালা। আমার না সন্তান বেঁচে আছে, না বাপ দাদা বেঁচে আছে। হজরত আবু বকর কে কালালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি আমার অভিমত ব্যক্ত করছি। যদি সঠিক হয় তবে আল্লাহ্‌র দিক থেকে। আর ভুল হলে শয়তানের দিক থেকে হবে। আমার অভিমতানুসারে কালালা ওই ব্যক্তি যার বাপ দাদা নেই, সন্তানও নেই। হজরত ওমর খলিফা হওয়ার পর এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, হজরত আবু বকরের বিরুদ্ধে বলতে আমি লজ্জা অনুভব করি। শা'বী থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। এর উদ্ধৃতি ইবনে আবী হাতেম তার তাফসীরেও দিয়েছেন। আর হাকেম হজরত ওমরের উক্ত বক্তব্যটিকে ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে লিখেছেন। হজরত আবু হোরায়রার মারফু বর্ণনায় রয়েছে, কালালা বলতে ওই সকল ব্যক্তিবর্গকে বুঝায় যারা মৃতের বাপ দাদা নন, সন্তানও নন। হাকেম। আবু শায়েখ বর্ণনা করেন, হজরত বারা বলেছেন, আমি রসুল স. এর নিকট কালালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, বাপ দাদা ও সন্তান ছাড়া অন্য ওয়ারিশরাই কালালা। আবু দাউদ মারসীলের মধ্যে আবু সালমা বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার পিতা, দাদা, মা ও সন্তান না রেখে মারা যায় তাকেই কালালা বলে।

আমি বলি, বাপ, দাদা, সন্তান এর অর্থ হলো বংশের মূল ও শাখা। তাই মৃতের মাতা অথবা কন্যা থাকলেও সে কালালা হবে যদি পিতা ও ছেলে না থাকে। এই বক্তব্যের প্রমাণ রয়েছে হজরত জাবেরের হাদিসে। এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়,তখন হজরত জাবেরের কেবল এক কন্যা ছিলো। দাদা ছিলেন না। পিতাও শহীদ হয়েছিলেন উহুদ যুদ্ধে। এমত ক্ষেত্রে বোন ও ভাই, মা ও কন্যার উপস্থিতিতে ওয়ারিশ হন। সাধরণভাবে এতে নাতিও অন্তর্ভুক্ত। এমনকি এরকম ক্ষেত্রে নাতনীর সঙ্গে ভাইও ওয়ারিশ হয়। এ ব্যাপারে কোনো ভিন্নমত নেই। আয়াতের 'ওয়ালাদ' শব্দটির মধ্যে পিতা, দাদা ও পুত্র সকলেই শামিল। আয়াতের এই অংশে ভাই বোন বলতে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন বুঝানো হয়েছে। এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই। হজরত উবাই বিন কাব এবং সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস সম্পর্কে বায়হাকী বর্ণনা করেন, সা'দ (সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস) পড়তেন

'ওয়ালাহু আখুন আওউখতুন লিউম্মি' (এখানে 'লিউম্মি' শব্দটি তিনি অতিরিক্ত পাঠ করতেন)। ইবনে মুনজিরও একথা লিখেছেন। জমখশরী দুজনের ক্বেরাতই উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদের ক্বেরাত এরকমই ছিলো। কিন্তু ইবনে হাজার লিখেছেন, আমি ইবনে মাসউদ সম্পর্কে এরকম কোনো বর্ণনা পাইনি। এখানে এ কথাটিও জানা গেলো যে, ধারাক্রমচ্ছিন্ন ক্বেরাতের উপর আমল করা বৈধ। তবে শর্ত হলো তার সনদ বিশুদ্ধ হতে হবে। ইমাম আবু হানিফাও তাই মনে করেন। কিন্তু শাফেয়ী এই মতের বিরুদ্ধে। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, শুনুন। আল্লাহ তায়ালা সুরা নিসার প্রথমে মীরাস সম্পর্কিত যে আয়াত নাজিল করেছেন তা ছিলো পিতা-মাতা ও সন্তান সম্বন্ধে। দ্বিতীয় আয়াত নাজিল হয়েছে স্বামী-স্ত্রী এবং বৈমাত্রেয় ভাই-বোন সম্পর্কে এবং শেষে বলা হয়েছে সহোদর ভাই-বোন সম্পর্কে। আর সূরা আনফালে বলা হয়েছে ওই সকল আত্মীয়দের কথা, যারা আহলে ফারায়েজ নয়। আল্লাহর কিতাবে বিভিন্নজনের সঙ্গে বিভিন্নজনের লঘু গুরু সম্পর্ক সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে।

বৈমাত্রেয় ভাই অথবা বোন পাবে এক ষষ্ঠাংশ। তারা একাধিক হলে সম্মিলিতভাবে পাবে এক তৃতীয়াংশ। সবারই অংশ হবে সমমাপের।

<u>মাসআলায়ে-হেমারিয়া</u> ঃ স্বামী, মা, দুই বৈমাত্রেয় ভাই, এক প্রকৃত (সহোদর) ভাই- এমতক্ষেত্রে ছয় দ্বারা তাসীহ্ করতে হবে। প্রকৃত ভাই আসাবা। আসহাবে ফারায়েজ থেকে কিছুই বাঁচে না, তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, প্রকৃত ভাই কিছুই পাবে না। প্রকৃত ভাই একজন হোক অথবা একের অধিক হোক। ওদিকে ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী সহোদর ভাইকে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সমঅংশী করেছেন।

তাহাবী বর্ণনা করেন, হজরত ওমর সহোদর ভাইকে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সমঅংশী মনে করতেন না। কিন্তু একবার এক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন। এক সহোদর ভাই একবার তাঁকে বললেন, আমিরুল মুমিনীন। মনে করুন আমার পিতা ছিলেন গাধা। আর আমরাও এক মায়ের সন্তান নই। একথা শুনে হজরত ওমর সহোদর ভাইকে বৈমাত্রেয় ভাইদের সমঅংশী করে দিলেন। এই ঘটনাটির কারণেই এই মাসআলাটিকে হেমারিয়া (গাধা) বলা হয়। জায়েদ বিন সাবেতের সঙ্গে সম্পর্কিত করে হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে এবং বায়হাকী তাঁর সুনানে এই মাসআলাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। কিন্তু এই সূত্রের একজন বর্ণনাকারী আবু উমাইয়া বিন ইয়া'লী সাকাফী দুর্বল। হাকেম শা'বী এর মাধ্যমে হজরত আলী, হজরত ওমর এবং হজরত জায়েদ বিন ছাবেতের যে বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে অতিরিক্ত এই

কথাগুলো রয়েছে, পিতা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সহোদর ভাইদেরকে অধিক নৈকট্যশীল করেছে। (অর্থাৎ বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সঙ্গে প্রকৃত ভাইয়ের মতো পেটের দিক থেকেও নৈকট্য রয়েছে)।

দারা কুতনী ওহাব বিন মোনাব্বাহ ও মাসউদ বিন হেকাম সাকাফী থেকে লিখেছেন, কতিপয় লোক হজরত ওমরের খেদমতে হাজির হয়ে এই মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলো, কোনো মহিলা মৃত্যুকালে স্বামী, মা, কয়েকজন বৈপিত্রেয় ভাই এবং কয়েকজন সহোদর ভাই রেখে গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করতে হবে কী ভাবে? তিনি তখন সহোদর ভাইদেরকে বৈমাত্রেয় ভাইদের সঙ্গে এক তৃতীয়াংশের মধ্যে শরীক করে দিলেন। একজন প্রশ্ন করলো, অমুক বছর তো আপনি এরকম অবস্থায় সহোদরদেরকে বৈমাত্রেয়দের সঙ্গে শরীক করেননি। তিনি বললেন, ঠিক আছে। আগে যা করেছি তাও এবং এখন যা করলাম তাও সঠিক। আবদুর রাজ্জাকও এই ঘটনাটিকে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী লিখেছেন মুয়াম্মারের বর্ণনা থেকে। কিন্তু সেখানে বর্ণনাকারীদের মধ্যে মাসউদ বিন হাকামের নাম নেই। বরং হাকামের স্থলে ইবনে মাসউদের নাম উল্লেখ করলে ঠিক হতো। বায়হাকী লিখেছেন, হজরত ওমর সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাইদেরকে সম্মিলিত করেছিলেন। হজরত আলী এমন করেননি।

মাসআলা ঃ যদি মৃতের ছেলে, নাতি, পিতা অথবা দাদা থাকে তবে বৈমাত্রেয় ভাইবোনেরা কোনো অংশ পাবে না। এটা ঐকমত্য। এই মাসআলাটিতে অবশ্য মতবিরোধ রয়েছে যে, দাদা থাকলে বৈপিত্রেয় অথবা সহোদর ভাইবোনেরা অংশ পাবে কিনা। অনুমিত হয় যে, মা বর্তমান থাকলে বৈমাত্রেয় ভাইবোন বাদ পড়ে যাবে। কেননা যিনি আত্মীয়তার সূত্র, তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর মাধ্যমের আত্মীয়রা অবশ্য বঞ্চিত হবে। কিন্তু সলফে সালেহীনের ঐকমত্য এরকম অনুমানের বিরোধী। তাই আমরা কিয়াস (অনুমান)কে বাদ দিয়ে এজমাকে (ঐকমত্যকে) ধরেছি। কিয়াস বাদ দেয়ার আর একটি কারণ এই যে, মা-ই যখন সম্পূর্ণ সম্পত্তির মালিক হলো না তখন বৈমাত্রেয় ভাইয়ের বঞ্চিত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে কী ভাবে?

পুনরায় বলা হচ্ছে, বন্টনের পূর্বে অছিয়ত পূর্ণ করতে হবে। ঋণও পরিশোধ করতে হবে। এ সমস্ত ব্যাপারে যেনো কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা না দেখা দেয়। যেমন অছিয়ত অপেক্ষা বেশী দান করা, ভিত্তিহীন ঋণের প্রশ্ন তুলে ওয়ারিশদের সম্পত্তি কমিয়ে দেয়া ইত্যাদি। উদ্দেশ্য হতে হবে কেবল আল্লাহর সন্তোষ সাধন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো কোনো পুরুষ-রমণী এমন যে, ষাট বছর আল্লাহর আনুগত্যশীল থাকার পর অছিয়তের দ্বারা ওয়ারিশদের ক্ষতিসাধন করে। আর ওই কারণে দোজখ তাদের জন্য হয়ে যায় অনিবার্য। এই হাদিস বর্ণনা করার পর হজরত আবু হোরায়রা এই আয়াতের

শেষ অংশ থেকে পরবর্তী আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। তিরমিজি, ইবনে মাজা, আবু দাউদ, আহমদ।

হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়ারিশদের মীরাস কেটে দিবে, আল্লাহ তার জান্নাতের অংশও কেটে দিবেন। ইবনে মাজা, বায়হাকী।

হজরত আলী বলেছেন, চতুর্থাংশ অছিয়ত করা অপেক্ষা পঞ্চমাংশ অছিয়ত করা আমার নিকট উত্তম। আবার এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ অছিয়ত করাই আমার পছন্দনীয়। বায়হাকী।

জ্ঞাতব্য ঃ এই আয়াতের শেষ বক্তব্যে অছিয়ত ও ঋণের মাধ্যমে ক্ষতি না করার কথা বলা হয়েছে। প্রথমদিকে এরকম বলা হয়নি। এর কারণ এই যে, জন্মসূত্রের এবং বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়দের আকাংখা এই থাকে যে, ঋণের কারণে যেনো তাদেরকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয়। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাইবোনেরা দূরবর্তী হওয়ার কারণে এই ব্যাপারে সাধারণতঃ উদাসীন থাকে। তাদের উদাসীনতার সুযোগ যাতে গ্রহণ না করা হয়, তাই এখানে ক্ষতি করার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট ঃ অছিয়ত কয়েক প্রকারের। যেমন- ওয়াজিব, মোস্তাহাব, মোবাহ, হারাম এবং মাকরূহ। ঋণগ্রস্থ হলে, জাকাত ফরজ হলে, মান্নত করলে, হজ্জ ফরজ হয়ে থাকলে, কাজা নামাজ, রোজা থাকলে - এ সমস্ত ব্যাপারে অছিয়ত করে যেতে হবে। অতএব, ঋণ পরিশোধ করতে হবে মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ থেকে। একথা বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, প্রত্যেক প্রকার ঋণই সমগুরুত্বসম্পন্ন। তার কারণ জানা থাকুক বা না থাকুক। ঋণ ছাড়া অন্যান্য অছিয়ত এক তৃতীয়াংশের উপর কার্যকর হবে (এর অধিক অছিয়ত গ্রহণীয় নয়)। এরকম ওয়াজিব অছিয়তে গাফিলতি করা নাজায়েয।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মুসলমানের উপর কারো কোনো হক থাকলে এ সম্পর্কে লিখিত অছিয়ত না করে দুই রাত কাটানো উচিত নয়। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায় দুই রাতের বদলে তিন রাতের কথা বলা আছে। যার উপর কারো কোনো ওয়াজিব হক না থাকে, তার জন্য এক দশমাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ দান করার অছিয়ত করা মোস্তাহাব। তবে শর্ত হলো তার ওয়ারিশগণ ধনী হতে হবে। ওয়ারিশরা দরিদ্র হলে দান করা মাকরূহে তানযীহী হবে। এরকম অবস্থায় অছিয়ত অমান্য করাই উত্তম। এমত অবস্থায় নিকটতম আত্মীয়রা মীরাসও পাবে। আর এই মীরাস দান বলেও গণ্য হবে।

রসুল স. বলেছেন, অনাত্মীয় মিসকিনকে দান করা কেবলই দান। কিন্তু অভাবী আত্মীয়কে দেয়া একই সঙ্গে দান এবং আত্মীয়তা সুদৃঢ়করণ। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী। যে অছিয়ত ওয়ারিশদের ক্ষতিসাধন করে সে অছিয়ত হারাম। লক্ষ্য রাখতে হবে — ১. যেনো সর্বাধিক এক তৃতীয়াংশের উপর অছিয়ত করা হয় ২. সন্তান, স্ত্রী ও আত্মীয়দের জন্য অছিয়ত করা না হয় ৩. ভিত্তিহীন ঋণ যেনো প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে ৪. এ ব্যাপারে শরিয়ত অতিক্রম করার চেষ্টা যেনো না থাকে।

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। এটা তাঁর ভলো করেই জানা আছে যে, কে ওয়ারিশদের জন্য স্বার্থহানিকর। কে শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণকারী। কিন্তু তিনি যে সহনশীল। তাই অপরাধের শাস্তিদানে দ্রুততাকে প্রশ্রয় দেন না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৩, ১৪

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ ع

❒ এই সব আল্লাহের নির্ধারিত সীমা। কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; যেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহা মহাসাফল্য।

❒ এবং কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের অবাধ্য হইলে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমা লংঘন করিলে তিনি তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হইবে, এবং তাহার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

এতিমদের সম্পর্কে, অছিয়ত সম্পর্কে এবং ওয়ারিশদের সম্পর্কে বর্ণিত বিধানাবলী আল্লাহর। এই বিধান কারো জন্যই অমান্য করা বৈধ নয়। যারা এ বিধান মান্য করে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যকে আশ্রয় করবে তাদেরকে আল্লাহ এমন অক্ষয় স্বর্গোদ্যানের প্রবেশাধিকার দিবেন, যার নিম্নদেশে রয়েছে স্রোতবতী নদী। এটাই হচ্ছে সফলতা। মহা সফলতা। আর যে আল্লাহর বিধানাবলীর সীমানা অতিক্রম করে অবাধ্যতাকে নির্বাচন করবে, তাকে তিনি

নিক্ষেপ করবেন আগুনে। এই অগ্নিবাস হবে চিরস্থায়ী। সেখানে রয়েছে আরো অনেক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

এই সুরার শেষে রয়েছে সহোদর ও বৈপিত্রেয় ভাইবোনদের আলোচনা। তার আগেই আমরা ফারায়েজের মাসআলাকে স্পষ্ট করে দেখাতে চাই।

মাসআলায়ে আওল ঃ আওল শব্দের আভিধানিক অর্থ উঁচু করে দেয়া, একদিকে ঝুঁকে পড়া ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে ভগ্নাংশবিহীন অংশ নির্ণয়ার্থে সংকীর্ণ অংশগুলোকে সংখ্যাগত দিক থেকে বাড়িয়ে দেয়া। এই নিয়মটি ঋণ পরিশোধের বেলাতেও ব্যবহৃত হতে পারে। একাধিক পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করতে গিয়ে যদি দেখা যায়, পরিত্যক্ত সম্পত্তি যথেষ্ট হচ্ছে না, তখন পাওনাদারদেরকে কিছু কিছু করে কম দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

হজরত ওমরের জামানায় আওল সম্পর্কে ঐকমত্য হয়েছিলো। একটি সমস্যা উপস্থিত হয়েছিলো তাঁর সামনে। সমস্যাটি হচ্ছে —এক মহিলা তার স্বামী ও দুই বোনকে রেখে মারা গেছেন। এখন সম্পদ বন্টনের পদ্ধতিটি হবে কেমন? এর সমাধান দেয়া হলো এভাবে—স্বামী অর্ধেক এবং দুই বোন দুই তৃতীয়াংশ পাবে। কিন্তু এভাবে ভাগ করলে অংশ যায় বেড়ে। যেমন ছয় ভাগে ভাগ করে স্বামীকে অর্ধেক (তিন ভাগ) দিলে বাকি থাকে তিন। এক্ষেত্রে ভগ্নাংশকে এড়াতে চাইলে দুই বোনের অংশ নির্ণীত হওয়া দরকার দুই যোগ দুই সমান সমান চার। এভাবে স্বামীর তিনের সঙ্গে বোনদের চার যোগ দিলে তিন আর চারে হয় সাত। এভাবে এক অংশ যায় বেড়ে। হজরত ওমর এ ব্যাপারে সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। বললেন, এক লোক মরার পর দেখা গেল তার সম্পত্তি বলতে রয়েছে শুধু ছয়টি টাকা। তার দুজন ওয়ারিশ। একজন পাবে তিন টাকা। অপরজন পাবে চার টাকা। এমতাবস্থায় কি সমস্ত সম্পদকে সাতভাগে ভাগ করতে হবে না? সাহাবীগণ এ ব্যাপারে সম্মত হলেন। এই আমলটি মেনে নিলেন সবাই। হজরত ওমরের ইন্তেকালের পর হজরত ইবনে আব্বাস এই মাসআলাটির বিরুদ্ধাচরণ করে বসলেন। কেউ কেউ বললো, আপনি হজরত ওমরের সামনে এরকম বলেননি কেন? তিনি বললেন, তাঁর তেজস্বীতার কারণে। লোকেরা বললো, আপনার একক অভিমত অপেক্ষা ওই সম্মিলিত সিদ্ধান্তই উত্তম। বায়হাকী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে মানুষ বালু গণতে পারে সে অর্ধেক অংশকে এক তৃতীয়াংশও করতে পারবে। এটা কেমন হিসাব যে, অর্ধেক অর্ধেক করার পর এক তৃতীয়াংশ বাটোয়ারা করা যাবে না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, মীরাসের ব্যাপারে আওলের প্রথম প্রবর্তক কে? তিনি বললেন, হজরত ওমর । এরপর তিনি আওলের সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললেন। পুনরায় বললেন, আল্লাহর কসম। মীরাসের ব্যাপারে আল্লাহ পাক যা আগে রেখেছেন তাকে আগে এবং যা

পশ্চাতে রেখেছেন তাকে পশ্চাতে রাখলে আওলের প্রশ্নই উঠবে না। ইবনে আব্বাসের এরকম বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন হাকেম। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো, ফারায়েজের প্রথমে কে? পরে কে? তিনি বললেন, আল্লাহ যাকে প্রথমে রেখেছেন, তার অংশ যেমন নির্ধারিত তেমনি পরবর্তীদের অংশও নির্ধারিত। প্রথম ফরজকৃত ব্যক্তি হচ্ছেন স্বামী, স্ত্রী এবং মা (স্বামীর আসল অংশ হচ্ছে অর্ধেক। স্ত্রীর এক চতুর্থাংশ। মায়ের এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু মৃতের সন্তান থাকলে অর্ধেকের বদলে এক চতুর্থাংশ, এক চতুর্থাংশের স্থলে এক অষ্টমাংশ এবং এক তৃতীয়াংশের স্থলে এক ষষ্ঠাংশ হবে)। পরবর্তী ফরজ ওয়ারিশ হচ্ছে কন্যাকুল ও বোনেরা। এক কন্যা ও এক বোনের জন্য অর্ধেক এবং দুই কন্যা ও দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ হবে। এক কন্যা ও এক বোন থাকলে কন্যা পাবে অর্ধেক। বোন পাবে এক ষষ্ঠাংশ। কিন্তু দুই কন্যা, দুই বোন ও ভাই থাকলে তাদের নির্দিষ্ট কোনো অংশ থাকে না। তখন তারা হয়ে যায় আসাবা। এরকম অবস্থায় প্রথমে ফরজকৃতদের অংশ বন্টনের পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে কন্যা ও বোনদেরকে দিতে হবে। অবশিষ্ট না থাকলে কিছুই দিতে হবে না। এই মাসআলাটিতে মোহাম্মদ বিন হানাফিয়ার অভিমতও হজরত ইবনে আব্বাসের অনুকূল।

মাসআলা ঃ সাহাবীগণের ঐকমত্য এই যে, আহলে ফারায়েজদের সম্পত্তি নির্ধারিত নিয়মে বন্টনের পর যা থাকবে তা ওই পুরুষকে দিতে হবে যে মৃতের অধিক নৈকট্যধারী। একটু আগেই এ সম্পর্কিত হাদিস বলা হয়েছে। এধরনের যারা তাদেরকে বলা হয় আসাবা। আহলে ফারায়েজ কেউ না থাকলে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে আসাবারা। মৃতের নিকটতম আত্মীয় হলেন পুত্র, তারপর পৌত্র এমনি করে অধস্তন পুরুষেরা। এর পরের নিকটতমরা হলেন পিতা, দাদা, পরদাদা —এভাবে উর্ধতন পুরুষেরা। তারপর সহোদর, তারপর বৈপিত্রেয় ভাই, তারপর সহোদর ভাইদের পুত্র, তারপর বৈপিত্রেয় ভাইদের পুত্র। এভাবে অধস্তনদের শাখা প্রশাখা। অতঃপর দাদা — সহোদর ভাইয়ের, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের, তারপর সহোদর ভাইদের পুত্রদের, তারপর দাদার বৈপিত্রেয় ভাইদের পুত্রের- এভাবে পরদাদাদের অধস্তন বংশ ইত্যাদি।

হজরত আলী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সহোদর ভাই একে অপরের ওয়ারিশ হয়ে থাকে (অর্থাৎ আসাবা হয়ে থাকে)। তাদের বর্তমানে বৈপিত্রেয় ভাই ওয়ারিশ হয় না। তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম। এই সিলসিলায় মতোবিরোধ নেই। তবে দাদাদের বন্টনে মতোবিরোধ আছে।

মাসআলা ঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, যে মহিলা একজন হলে অর্ধেক, দুইজন হলে দুই তৃতীয়াংশ পায়, সে তার আপন ভাইয়ের সাথে মিললে আসাবা

হয়ে যায়। আহলে ফারায়েজ আর থাকে না। কেননা সন্তানসন্ততি একত্রে থাকলে তাদের সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেছেন, 'এক ছেলের অংশ দুই মেয়ের সমান।' মহিলারা তাদের আসাবা ভাইয়ের সঙ্গে মিলে গেলেও আসাবা হবে না। যেমন ফুফী, ভাতিজি।

মাসআলা ঃ এটা ঐকমত্য যে, আহলে ফারায়েজের শেষ আসাবা হলো মাওলায়ে আতাকা (যে মনিব গোলামকে আজাদ করে দেয় তাকে মাওলায়ে আতাকা বলে। আজাদ করা গোলাম মারা গেলে সর্বপ্রথম তার ওয়ারিশ হবে আহলে ফারায়েজ, তারপর হবে আসাবা আত্মীয়েরা, তারপর বংশীয় আসাবা, তারপর মাওলায়ে আতাকা বা আসাবায়ে সববী)।

বায়হাকী ও আবুদর রাজ্জাক লিখেছেন, এক ব্যক্তি সাথে করে একজনকে নিয়ে রসুল স. এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, আমি একে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিয়েছি। তার মীরাসের হুকুম কী? রসুল স. বললেন, যদি সে বংশীয় আসাবা রেখে যায় তবে (আহলে ফারায়েজের পর) আসাবা সবচেয়ে বেশী হকদার হবে। অন্যথায় মনিবের হক (অর্থাৎ তার মীরাস পাবে তুমি)। সহীহাইনে রয়েছে, সে তার হকদার যে তাকে আজাদ করেছে। তারপর মনিবের (মাওলায়ে আতাকা) আসাবারা। মহিলারা পাবে গোলামের মালিকানা সম্পর্কিত হক, যাকে তারা আজাদ করেছে অথবা আজাদ করা গোলামেরা যাদেরকে আজাদ করেছে।

নাসাঈ ও ইবনে মাজা বিনতে হামজা এর হাদিসের সিলসিলায় লিখেছেন, বিনতে হামজা এক গোলামকে আজাদ করেছিলেন। আজাদ করার পর সে মরে গেলো। তার ছিলো এক কন্যা। রসুল স. তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক কন্যাকে এবং বাকি অর্ধেক বিনতে হামজাকে দিলেন। এই হাদিসটিকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী ও তাহাবী। বায়হাকী লিখেছেন, ঐকমত্য এই যে, গোলাম আজাদ করেছিলেন বিনতে হামজা। তাঁর পিতা নন। ইবনে আব্বাসের এ সম্পর্কিত একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন দারাকুতনী।

মাসআলা ঃ আহলে ফারায়েজদের প্রাপ্য দেয়ার পর আসাবার অংশ দিতে হবে। যদি আসাবা না থাকে তবে পুনরায় আহলে ফারায়েজদেরকে দিতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয়বারের এই বন্টনে স্বামী অথবা স্ত্রীকে কিছু দেয়া যাবে না। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আসাবা না থাকলে তাদের অংশ বায়তুল মালে জমা করে দিতে হবে। আহলে ফারায়েজদের মধ্যে পুনঃবন্টন করা যাবে না। শেষ জামানার শাফেয়ী আলেমগণ অবশ্য ইমাম আবু হানিফার অভিমতকে মেনে নিয়েছেন। কারণ বায়তুল মাল ব্যবস্থাটি উঠে গিয়েছিলো। আবদুল ওহাব মালেকীর বক্তব্যও ছিলো

এরকম। আবুল হাসান বর্ণনা করেন, হজরত আলী, হজরত ওসমান, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে মাসউদ অবশিষ্ট সম্পত্তি আসাবা না থাকলে যাবিল আরহাম (নিকটতম আত্মীয়দের)কে দিতেন না। আহলে ফারায়েজদেরকে পুনঃবন্টন করতেন। আবুল হাসান বলেন, তাহাবী তাঁর নিজস্ব সনদে ইব্রাহিম নাখয়ীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন এরকম, হজরত ওমর ও হজরত আবদুল্লাহ যাবিল আরহামকে ওয়ারিশ করে দিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বলি, হজরত আলীও এরকম করতেন। ইব্রাহিম নাখয়ী আরো বলেন, হজরত আলী এ ব্যাপারে দৃঢ় ছিলেন।

তাহাবী দুটি পদ্ধতিতে সুয়াইদ বিন গাফলাহ'র বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। সুয়াইদ বলেন, এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে রেখে গেলেন এক কন্যা, এক স্ত্রী এবং প্রাক্তন মনিব (যিনি তাঁকে আজাদ করে দিয়েছিলেন)। হজরত আলীর নিকট এব্যাপারে সম্পদ বন্টনের বিধান জানতে চাওয়া হলো। আমি তখন তাঁর পাশেই ছিলাম। হজরত আলী কন্যাকে দিলেন অর্ধেক এবং স্ত্রীকে দিলেন এক অষ্টমাংশ। এরপর যা অবশিষ্ট রইলো তা পুনরায় কন্যাকে দিলেন। প্রাক্তন মনিবকে কিছুই দিলেন না। আবু জাফরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী আহলে ফারায়েজদের অংশ দেয়ার পর বাকি অংশ পুনরায় আহলে ফারায়েজদেরকেই দিতেন।

তাহাবী স্ব সনদে মাসরুকের ওই বিবরণটিও লিপিবদ্ধ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহর নিকট প্রশ্ন করা হলো, কয়েকজন বৈমাত্রেয় ভাই এবং মায়ের মধ্যে মীরাস বন্টনের নিয়ম কী? তিনি ভাইদেরকে এক তৃতীয়াংশ, বাকি সমস্ত সম্পত্তি মাকে দিলেন এবং বললেন, যার আসাবা নেই, তার জন্য মা-ই আসাবা। তিনি মা থাকলে বৈমাত্রেয় ভাইদেরকে অবশিষ্ট সম্পদের কিছুই দিতেন না। সহোদরা কন্যার বর্তমানে পৌত্রীকেও দ্বিতীয় বন্টনে শামিল করতেন না। দ্বিতীয়বারে সহোদর বোনের সঙ্গে বৈমাত্রেয় বোনদেরকে দিতেন না। স্ত্রী, স্বামী ও দাদাকেও দিতেন না। তাহাবী আরো বলেছেন, আমাদের ধারণায় হজরত আলীর মাসআলাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। এ ব্যাপারে ইবনে মাসউদের বক্তব্য আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় বন্টনে আহলে ফারায়েজই অন্তর্ভূক্ত হবে। দূরবর্তী আত্মীয়দেরকে নিকটবর্তীদের তুলনায় প্রাধান্য দেয়া যাবে না। সকলকে তাদের নির্ধারিত প্রাপ্য পরিশোধ করতে হবে। আমরা দেখি, বিভিন্ন সম্পর্কসূত্রে আত্মীয়রা ওয়ারিশ হন। নিকটবর্তীরা অধিকারবঞ্চিত করে দেন দূরবর্তীদেরকে। এই আদর্শ হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের (ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম ইউসুফের)।

<u>মাসআলা</u> ঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, যখন কেউ দুই দিক থেকে অংশী হয় অর্থাৎ একই সঙ্গে আহলে ফারায়েজ ও আসাবা হয় তবে উভয় দিকই রক্ষা

করতে হবে। যেমন এক মহিলা তিনজন চাচাতো ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই এবং স্বামী রেখে মারা গেলো। তার চাচাতো ভাইয়েরা শুধু আসাবা। এ ক্ষেত্রে বন্টন করতে হবে এভাবে — বৈমাত্রেয় ভাই তার ফরজ অংশ এক ষষ্টাংশ পাবে। স্বামী পাবে অর্ধেক। অবশিষ্ট সম্পত্তি তিন আসাবা (চাচাতো ভাই) কে সমান অংশে ভাগ করে দিতে হবে। প্রথমে ছয় ভাগ করতে হবে। তাসীহ্ করতে হবে ১৮। এর মধ্যে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ৫, স্বামীর ১১ এবং আসাবার ২। স্বামীর ফরজ হিসাবে প্রাপ্য ১৮ এর অর্ধেক ৯ এবং আসাবা হিসাবে ২। মোট ১১। বৈমাত্রেয় ভাই ফরজ হিসাবে ৩ এবং আসাবা হিসাবে ২। মোট ৫। আর চাচাতো ভাইয়েরা কেবল আসাবা হিসাবে পাবে ২। এভাবেই সম্পন্ন করতে হবে মোট ১৮ অংশের বন্টন।

যদি কোনো ব্যক্তি দুই দিক থেকেই আহলে ফারায়েজ হয়, তবে তার প্রাপ্যের পরিমাণ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে ওই ব্যক্তির শক্তিশালী আত্মীয়তার দিকটি ধরতে হবে। দুর্বল দিকটি বাদ দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, তার আত্মীয়তার উভয় দিকই গ্রহণীয়। তাকে উভয় সম্পর্কের অংশই দিতে হবে। এরকম বন্টনের প্রকৃতি দু'ধরনের। একটি হচ্ছে — যদি কোনো মুসলমান কোনো মাহ্‌রাম মহিলার সঙ্গে সন্দেহজনক সহবাস করার পর মৃত্যুবরণ করে তবে সহবাসকৃতা মহিলা দু'বার অংশ পাবে। আরেকটি প্রকার হচ্ছে — এক অগ্নিপূজক মাহ্‌রাম মহিলার সঙ্গে বিয়ে করলো। তারপর মুসলমান হয়ে মারা গেলো। যেমন, সে বিয়ে করলো নিজ কন্যাকে। সেই কন্যার আবার সন্তানও হলো। এরকম সম্পর্কবিভ্রাটের কারণে সে বিভিন্ন দিক থেকে আহলে ফারায়েজ হবে।

মাসআলা ঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, স্বামী ও স্ত্রী ছাড়া যদি অন্য একজনও আহলে ফারায়েজ অথবা আসাবা থাকে, তবে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়েরা কিছুই পাবে না। আর কোনো আহলে ফারায়েজ ও আসাবা না থাকলে রক্তের সম্পর্কধারীদের পাওয়া না পাওয়া সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সাঈদ বিন মুসাইয়েব বলেছেন, কন্যার বর্তমানে মামা মীরাস পাবে।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদের মতে রক্তের সম্পর্কধারীরা মীরাস পাবে। এরকম মাসআলা বর্ণিত হয়েছে হজরত আলী, ইবনে মাসউদ এবং ইবনে আব্বাস থেকেও। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক যাবিল আরহাম অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কের মীরাস স্বীকার করেননি। তাঁরা বলেছেন, তারা আসাবা না হওয়ায় অবশিষ্ট সম্পত্তি বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। আলেমগণ বলেছেন, এই মাসআলা বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক, হজরত ওসমান, জায়েদ বিন ছাবেত, জুহুরী ও আওজায়ী থেকে। শেষ জামানায় আবার শাফেয়ীগণের ফতোয়া হানাফীগণের অনুকূলে এসেছ। আমাদের দলিল হচ্ছে — আল্লাহ তায়ালা এরশাদ

করেছেন, উলুল আরহামি বায়দুহুম আউলা বি বাদিন ফি কিতাবিল্লাহি। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু বকর তাঁর ভাষণে বলেছেন, যাবিল আরহামদের সম্পর্কে অবর্তীণ হয়েছে যে, তারা একে অন্যের চেয়ে অধিক হকদার। এই মতের বিরুদ্ধাচরণকারীরা বলেছেন, তোমাদের কোনো দলিল নেই। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুর্খতার যুগে ছেলেদেরকেই মীরাস দেয়া হতো। যেমন রসুল স. হজরত জায়েদ বিন হারিসাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করেছিলেন। এরকম কিছু লোক পরস্পরের সঙ্গে ওয়ারিশ হওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হতো। তাদের এহেন আচরণ প্রতিহত করতেই আল্লাহপাক এই আয়াত নাজিল করেছেন যেনো মীরাস যাবিল আরহামদের দিকে চলে যায়। অন্য আয়াতে উলুল আরহাম বলতে নির্দেশ করা হয়েছে যাবিল ফুরুজ এবং আসাবাগণকে।

আমরা বলি, আয়াত নাজিলের এই ধারাবাহিকতার কথা যদি মেনে নেয়া হয় তবুও শব্দগত দিক থেকে তা হবে সাধারণ অর্থবোধক। উলুল আরহাম বলতে আহলে ফারায়েজ, আসাবা এবং অন্যান্য আত্মীয় — সকলকেই বুঝায়। আমাদের বক্তব্যের পক্ষে অনেক হাদিস রয়েছে। উমামা বিন সহল বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তীরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলো। মামা ছাড়া তার নিকটজন বলতে কেউ ছিলো না। এ ব্যাপারে হজরত আবু ওবাদা হজরত ওমরের নিকট লিখিতভাবে জানতে চাইলেন। হজরত ওমর লিখলেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যার ওয়ারিশ জীবিত নেই, তার ওয়ারিশ মামা। আহমদ, বায্যার। তাহাবীর বর্ণনাটি এরকম, যার অভিভাবক নেই তার অভিভাবক আল্লাহ ও তাঁর রসুল। আর যার ওয়ারিশ নেই তার ওয়ারিশ মামা (যদি থাকে)।

হজরত মেকদাম বিন মাদি কারব বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, যার ওয়ারিশ নেই তার ওয়ারিশ মামা। দিয়ত বা হত্যার বিনিময়ও তিনি দিবেন। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, হাকেম বিন হাব্বান। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি সহীহ্। ইবনে আবী হাতেম আবু জুরআর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন এরকম, হাদিসটি হাসান। কিন্তু বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি মুজতারেব। (ধারাবহিকতা ক্ষুণ্ন সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসকে বলা হয় মুজতারেব। যেমন, এক বর্ণনাকারীর বদলে অন্য বর্ণনাকারীর উল্লেখ অথবা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বর্ণনাকারীর অদল বদল)।

তাহাবীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, মানুষ সম্পদ রেখে যায় তার ওয়ারিশদের জন্যই। আর আমি ওই ব্যক্তির ওয়ারিশ যার কোনো ওয়ারিশ নেই। আমি তার মালের অংশীদার হবো। দিয়ত দিব (যদি থাকে)। মামা থাকলে মামাই ওয়ারিশ হবে। মামা তখন দিয়তও দিবে। দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে, আমি তার অংশীদার হবো এবং তাকে ঋণমুক্ত করবো —যার ওয়ারিশ নেই। যদি মামা থাকে তবে মামাই অংশ পাবে। সে তার জান ও মাল বন্ধকমুক্ত করবে।

আমি বলি, রসুল স. এর 'আমি তার ওয়ারিশ হবো' — এ কথার অর্থ তার মাল বায়তুল মালে জমা করবো। তিনিই স. ছিলেন বায়তুল মালের রক্ষক।

হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মামাই তার ওয়ারিশ যার অন্য ওয়ারিশ নেই। তিরমিজি, নাসাঈ, তাহাবী। এই হাদিসটিকে নাসাঈ মুজতারেব, দারা কুতনী রাজেহ (অগ্রগণ্য) এবং বায়হাকী মওকুফ বলেছেন। হজরত ওয়াছে' বিন হাব্বান বর্ণনা করেছেন, ছাবেত বিন দায়াহ্দা ইন্তেকাল করলেন। তিনি ছিলেন বহিরাগত। তাঁর বংশ পরিচয়ও ছিলো অপরিচিত। রসুল স. আছেম বিন আদীকে বললেন, তুমি কি তার বংশ পরিচয় জানো? আছেম বললেন, না। রসুল স. তখন ছাবেতের ভ্রাতুষ্পুত্র আবু লুবাবা বিন মুনজিরকে ডেকে ছাবেতের মীরাস দিয়ে দিলেন। তাহাবী।

তাহাবী হজরত ওমর বিন খাত্তাবের কয়েকটি বর্ণনা লিপিব্দ্ধ করেছেন যাতে বলা হয়েছে, রসুল স. ফুফু ও খালার মধ্যে বন্টন করেছেন এরকম — ফুফু দুই তৃতীয়াংশ আর খালা এক তৃতীয়াংশ। ফুফুর নিকটবর্তী পিতার দিক দিয়ে তাই তাকে দ্বিগুণ আর মায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার কারণে খালাকে দিয়েছেন একগুণ।

হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, ফুফু এবং খালার মীরাস সম্পর্কে রসুল স. জিজ্ঞাসিত হয়ে জবাব দিলেন,জিব্‌রাইল না আসা পর্যন্ত বলতে পারবো না। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? প্রশ্নকর্তা হাজির হলে তিনি স. বললেন, জিব্‌রাইল আমাকে চুপিসারে জানালেন, তাদের জন্য কিছুই নেই। এই হাদিসের বর্ণনাকারী দারা কুতনী মন্তব্য করেছেন, হাদিসটি দুর্বল। কারণ, এই হাদিসের একজন রাবী (বর্ণনাকারী) মাসআদা দুর্বল। বরং মিথ্যা হাদিস বানানোর ব্যাপারে তার অখ্যাতি আছে। কিন্তু বিশুদ্ধমত এই যে, হাদিসটি মুরসাল। আহমদ বলেছেন, আমি তার হাদিসে আগুন লাগিয়েছি। হাকেম এই হাদিসকে আবদুল্লাহ বিন দীনারের মাধ্যমে ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। এই সনদের আর একজন রাবী মদীনাবাসী আবদুল্লাহ বিন জাফর দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত। হাকেম অন্য একটি হাদিসকে এই হাদিসের সাক্ষ্যস্বরূপ পেশ করেছেন। শরীফ বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, হারেস বিন আবী আবীদ আমাকে বললেন, রসুল স. কে একবার ফুফু ও খালার মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। এই সনদের সোলায়মান বিন দাউদ ছিলেন মাতরুক (পরিত্যক্ত)। দারাকুতনী এই সনদ ছাড়াও অন্য নিয়মে এই হাদিসখানি মুরসাল হিসেবে সংকলিত করেছেন।

জায়েদ বিন আসলাম থেকে আতা বিন ইয়াসার বর্ণনা করেন, এক আনসারী রসুল স. এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এক ব্যক্তি মরার সময় কেবল

তার এক ফুফু এবং এক খালা রেখে গিয়েছে। ওই সময় তিনি স. গাধায় আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন। থেমে পড়লেন। দু'হাত তুলে প্রার্থনা জানালেন, হে আল্লাহ!ওই ব্যক্তি কেবল ফুফু ও খালা রেখে গেছে। প্রশ্নকারী পুনরায় প্রশ্ন করলেন। দ্বিতীয়বারও একই কথা বললেন রসুল স.। তৃতীয়বারের প্রশ্নের জবাবও দিলেন একইভাবে। শেষে বললেন, ওই দুইজনের জন্য কিছুই নেই। কয়েকটি পদ্ধতিতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাহাবী। দারা কুতনী ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন মুরসাল হিসেবে। এই বর্ণনা আবু দাউদও তাঁর পুস্তক মুরাসীলে লিপিবদ্ধ করেছেন। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে আবু সাঈদের বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেছেন। এর সনদ অবশ্য অশক্ত। তিরমিজি তাঁর ছগীর পুস্তকে মোহাম্মদ বিন হারেস মাখজুমীর ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে আবু সাঈদের বর্ণনা থেকে লিখেছেন। এই সিলসিলার অন্য কোনো বর্ণনাকারীই আবু সাঈদের সমতুল্য নন।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য আনা সম্ভব যে, এ সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হওয়ার আগেই রসুল স. এর নিকট ফুফু ও খালার মীরাস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিলো। তাই তিনি স. ঐরকম জবাব দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে যখন যাবিল আরহাম সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হলো তখন তিনি বললেন, মামা তার ওয়ারিশ,যার ওয়ারিশ নেই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মাসআলা ঃ যাবিল আরহাম অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির রক্তের সম্পর্কধারী আত্মীয় চার ধরনের। ১. সন্তানগণ ২. আসল বংশ ৩. নিকটতম বংশ ৪. দূরবর্তী বংশ। প্রথম প্রকার ওয়ারিশ না থাকলে দ্বিতীয় প্রকার, দ্বিতীয় প্রকার ওয়ারিশ না থাকলে তৃতীয় এবং তৃতীয় প্রকার না থাকলে চতুর্থ প্রকারের আত্মীয়রা ওয়ারিশ হবে। অর্থাৎ নিকটবর্তীরা দূরবর্তীদেরকে অধিকারবঞ্চিত করবে। নিকটবর্তীতায় সকলে সমান হলে ওয়ারিশরা শুধু আত্মীয়দের তুলনায় অগ্রগণ্য হবে। ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, মামা ও খালার বংশ নৈকট্যের দিক দিয়ে শক্তিশালী। নৈকট্যের সীমানায় সকলকে সমান্তরাল হতে হবে। যেমন প্রকৃত চাচার কন্যা বৈপিত্রেয় ভাই থেকে নিকটবর্তী। নৈকট্যের গন্ডি ভিন্ন হলে তারতম্য করা যাবে না। যেমন পিতার বৈপিত্রেয় বোন এবং মাতার প্রকৃত বোন কেউ কাউকে দূরবর্তী করতে পারে না। পরিত্যক্ত সম্পত্তি তিন ভাগ করে দুই ভাগ পিতার নিকটতমদেরকে, এক ভাগ মাতার নিকটজনদেরকে দিতে হবে। তাহাবী হজরত ওমরের বর্ণনায় এরকমই উল্লেখ করেছেন।

যার নৈকট্য দুদিক থেকেই আছে, সে একদিকের নৈকট্যশীলদের তুলনায় দ্বিগুণ পাবে। রক্তের সম্পর্কধারীদের বেলায় সংখ্যা নয়, ব্যক্তিত্ব ধর্তব্য। —এ কথা বলেছেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম ইউসুফ এবং হাসান বিন জিয়াদ। ইমাম মোহাম্মদ মনে করেন, ব্যক্তির সঙ্গে বংশও গুরুত্ব লাভের যোগ্য এবং তা অনুপাত

সাপেক্ষ হবে। (যেমন, একজন মৃতের সঙ্গে দুই দিক থেকে সম্পর্ক রাখেন আর একজন এক দিক থেকে —এমতাবস্থায় সম্পত্তি ওই দুজনকে অর্ধেক অর্ধেক করে দিতে হবে। ইমাম মোহাম্মদের মতে তিনভাগ করে দুই ভাগ দুই দিকের সম্পর্কধারীকে এবং এক ভাগ এক দিকের সম্পর্কধারীকে দিতে হবে)।

মাসআলা ঃ ঐকমত্য এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যা হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির মীরাস থেকে বঞ্চিত করে দেয়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের মতে ভুলক্রমে হত্যাও হত্যাকারীকে অধিকারবঞ্চিত করে। ইমাম মালেক বলেছেন,ভুলবশতঃ হত্যাকারীর নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ হতে বাধা নেই। কিন্তু সে দিয়ত বা রক্তপন থেকে ওয়ারিশ হবে না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও ইবনে মাজা। কিন্তু এই সনদের এক রাবী ইসহাক বিন আবদুল্লাহ হারবী মাতরুকুল হাদিস। নাসাঈ ও দারাকুতনী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আমর বিন শোয়ায়েব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে। আর ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন বায়হাকী ও দারাকুতনী।

ইমাম মালেক তাঁর মতের সমর্থনে হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বর্ণিত হাদিসটি পেশ করছেন যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, ভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা কেউ কারো ওয়ারিশ নয়। স্ত্রী তার স্বামীর রক্তপনের এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। তবে শর্ত এই যে, তারা যেনো একে অপরের হত্যাকারী না হয়। স্বামী, স্ত্রী — যেই হন্তারক হোক না কেন, নিহতের মীরাস পাবে না (হত্যাকান্ড যদি পরিকল্পিত হয়)। দারাকুতনী। এই সনদের এক রাবী হাসান বিন সালেহ্ মাজরুহ (বিতর্কিত)।

ইমাম মালেক হিশাম বিন ওরওয়াহ ও ওরওয়াহ এর মাধ্যমে অন্য হাদিসটি পেশ করেছেন এরকম, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আপন ওলীকে (যার ওয়ারিশ হবে এমন নিকটাত্মীয়কে) ভুলক্রমে হত্যা করবে, সেও ওয়ারিশ পাবে। কিন্তু তার দেয়া দিয়তের অংশ পাবে না। এই সনদের এক বর্ণনাকারী মুসলিম বিন আলীকে ইয়াহিয়া মোটেই আমল দেননি। দারাকুতনী ওই রাবীর হাদিসকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। আর দারাকুতনী মুরসালরূপে সাইয়েদ বিন মুসাইয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পরিকল্পিত অথবা অপরিকল্পিত — সকল ক্ষেত্রেই হত্যাকারী দিয়তের অংশীদার হবে না। আবু দাউদ।

আমরা বলি, এ সমস্ত হাদিসের বিষয়বস্তু দ্বারা বুঝা যায়, ভুলক্রমে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। কিন্তু বিষয়বস্তু আমাদের নিকট দলিল নয়। আর এ কথাটিও অযৌক্তিক যে, হত্যাকারী সম্পত্তির অংশীদার হবে অথচ দিয়তের অংশ পাবে না (দিয়তও তো ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ)।

মাসআলা ঃ ঐকমত্য এই যে, মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হবে না। রসুল স. বলেছেন, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ নয়। কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিশ নয়। উসামা বিন জায়েদ থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম এবং সুনানে আরবায়া। হজরত মুআজ, ইবনে মুসাইয়েব এবং নাখয়ীর বক্তব্যে এসেছে, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে। কিন্তু কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হবে না। যেমন কোনো মুসলমান কিতাবী (ইহুদী ও খৃষ্টান) রমণীকে বিয়ে করলে তার ওয়ারিশ হবে। কিন্তু স্ত্রী তার ওয়ারিশ হবে না।

ইমাম আহমদ ওয়ারিশ না হওয়া সম্পর্কে দুইটি নিয়ম নির্দিষ্ট করেছেন। একটি এই—যদি আজাদ করে দেয়া গোলাম কাফের হয়,তবে তার মরার পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার মুসলমান মনিব পাবে। হজরত জাবেরের মারফু হাদিসে এসেছে, মুসলমান খৃষ্টানের ওয়ারিশ হবে না। তবে গোলাম বা বাঁদী খৃষ্টান হলে ওয়ারিশ হবে। দারাকুতনী। তিনি আরো লিখেছেন, এই হাদিসটি ওয়ারিশ নির্ধারণ করেছে। আমরা বলি, এখানে ওই সমস্ত বাঁদী বা গোলামের কথা বলা হয়েছে,যারা ব্যবসা করার অনুমতিপ্রাপ্ত। তাদের ওয়ারিশ তাদের মুসলমান মনিবই হবে। ব্যবসার মালকে রূপক অর্থে এখানে মীরাস বলা হয়েছে। কেননা মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম তো গোলামই নয়।

ইমাম আহমদ কর্তৃক নির্ধারিত দ্বিতীয় নিয়মটি এই যে, মৃত্যুবরণকারীর কাফের আত্মীয় যদি সম্পদ বন্টন করার আগেই মুসলমান হয়ে যায় তবে ওয়ারিশ পাবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, পাবে না। এই মতটি জমহুরের মতের অনুকূল।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মুর্খতার যুগের বন্টন হয়েছ তৎকালীন প্রচলিত নিয়মে। আর ইসলামী জামানার বন্টন হবে ইসলামী নিয়মে। আবু দাউদ।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিসের কথাগুলো হচ্ছে, জাহিলিয়াত যুগের বন্টন জাহেলিয়াতের উপরেই থাকবে। আর ইসলামী যুগের বন্টন থাকবে ইসলামী বন্টনের নিয়মে। ইবনে মাজা। বর্ণিত হাদিস দুটি ইমাম আহমদের বক্তব্যের সমর্থক নয়। কেননা হাদিস দুটোতে এ কথা পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে যে, ইসলামী জামানার অনুসরণীয় বন্টনপদ্ধতি হচ্ছে ইসলামী পদ্ধতি। জাহেলিয়াতের নিয়ম এখানে অচল।

ওরওয়া বিন জোবায়ের বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মুসলমান হওয়ার সময় যে বস্তু তার অধিকারে থাকবে সে বস্তু তারই। ইমাম আহমদের পক্ষে কোনো কোনো আলেম এই হাদিসটিকে দলিল করতে চেয়েছেন। কিন্তু একে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করা যায় না। ইবনে জাওজী।

মাসআলা ঃ ইহুদীরা নাসারাদের এবং নাসারারা ইহুদীদের ওয়ারিশ হবে — তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও। কেননা সকল কাফের একই। এ কথা বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন, কাফেরদের এক দল অন্য দলের ওয়ারিশ হবে না। রসুল স. বলেছেন, দুই ভিন্ন ধর্মের লোক একে অপরের ওয়ারিশ হবে না। আহমদ, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারাকুতনী। সনদ হচ্ছে, আমর ইবনে শোয়ায়েব - তাঁর পিতা- তাঁর দাদা। এই সনদের পরবর্তী এক রাবী ইয়াকুব বিন আতা দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত। ইবনে হাব্বান এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। তিরমিজি হজরত জাবের থেকে। তিরমিজির মন্তব্য হচ্ছে, হাদিসটি গরীব। এই সনদের ইবনে আবী লায়লাও দুর্বল হিসেবে পরিচিত। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বায্যার বর্ণনা করেছেন, এক ধর্ম অন্য ধর্মের ওয়ারিশ নয়। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন নাসাঈ, হাকেম ও দারাকুতনী হজরত উসামা বিন জায়েদ থেকে। কিন্তু দারাকুতনী বলেছেন, এই হাদিসের শব্দাবলী সুনির্ধারিত নয়। আবদুল হকের অভিমত, তাঁরা এই হাদিসকে কেবল মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কিত ভেবেছেন। ওদিকে হজরত উসামা থেকে বায়হাকী লিখেছেন, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে না। কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিশ হবে না। দুই ভিন্ন ধর্মের লোকও একে অপরের ওয়ারিশ হবে না। এই সনদের খলিল বিন মাররাহও রাবী হিসেবে দুর্বল। শেষে এ কথাটিও বর্ণিত হয়েছে যে, দুই ধর্ম হচ্ছে ইসলাম ও কুফর। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মাসআলা ঃ ঐকমত্য এই যে, নবী ও রসুলগণের ওয়ারিশ নেই। তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পদ দান করে দিতে হবে। দান সামগ্রীর ওয়ারিশ হয় না। শিয়া সম্প্রদায় এই মতের বিরোধী। তারা হজরত আবু বকর সিদ্দীক কে এ কারণে অভিসম্পাত করে যে, তিনি রসুল স. এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হজরত ফাতেমা কে দেননি। 'আমরা আম্বিয়া সম্প্রদায়। আমরা আমাদের সম্পত্তির ওয়ারিশ রাখি না। আমরা যা কিছু রেখে যাই তা ছদকা'— এই হাদিসটি খবরে ওয়াহেদ (এককবর্ণিত)। তাই শিয়া সম্প্রদায় বলে, এই হাদিস 'নাহনু মায়াশিরুল আম্বিয়ায়ি লা নূরিছু মা তারাকনাহু সদাক্বাতুন' আয়াতের বিরুদ্ধে। এখানে আয়াতের চেয়ে খবরে ওয়াহেদের মূল্য দেয়া হয়েছে। এছাড়া এই হাদিসটি আরো দুটি আয়াতের বিরুদ্ধে। একটি হচ্ছে, 'ওয়া ওয়ারিছা সুলাইমানু দাউদা,' — 'সোলায়মান দাউদের ওয়ারিশ ।' আর একটি - 'রব্বি হাবলি মিল্লাদুনকা ওলীয়ান ইয়ারিছুনী ওয়া ইয়ারিছু মিন আলী ইয়া'কুব।' কিন্তু এ বিষয়ে খবরে ওয়াহেদই অধিকতর শক্তিশালী। কারণ, এ কথাটি হজরত আবু বকর সিদ্দীক নিজ কানে রসুল স. কে বলতে শুনেছিলেন। তাই বহুবিদিত হাদিস অপেক্ষা এর গুরুত্ব

বেশী। আর এটি প্রকৃতপক্ষে খবরে ওয়াহেদও নয়। এর বর্ণনাকারী ছিলেন সাহাবীগণের একটি দল, যে দলে ছিলেন হজরত হোজায়ফা, হজরত আবু দারদা, হজরত আয়েশা এবং হজরত আবু হোরায়রা ।

বোখারী বর্ণনা করেন, হজরত আলী, হজরত আব্বাস, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হজরত জোবায়ের বিন আওয়াম এবং হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস সহ সাহাবীগণের একটি দলের সামনে হজরত ওমর বললেন, যাঁর হুকুমে আসমান ও জমিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই আল্লাহর কসম দিয়ে আমি বলছি, আপনারা কি এ কথা জানেন না যে,রসুল স. এরশাদ করেছেন, 'আমরা কাউকে ওয়ারিশ বানাবো না। আমরা যা রেখে যাবো তা দান করে দিতে হবে।' এ কথা তিনি নিজের সম্পর্কেই বলেছিলেন —এই পবিত্র ঘোষণাটি কি আপনাদের জানা নেই? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, আমরা জানি তিনি স. এমনিই বলেছেন। এরপর হজরত ওমর বিশেষভাবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন হজরত আলী এবং হজরত আব্বাসের দিকে। বললেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি। জবাব দিন। দুজনেই জবাব দিলেন, জানি। অবশ্যই জানি।

হাদিসের কিতাব সমূহে এ বিষয়টি বিশুদ্ধতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের নিকট এই বিষয়টি একটি প্রসিদ্ধ বিষয়। সকলেই এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একমত। শিয়াদের কিতাবেও এই হাদিসের সমর্থনসূচক হাদিস রয়েছে। মোহাম্মদ বিন ইয়াকুব রাজী আবুল বোখতারীর বর্ণনা থেকে হজরত আবু আবদুল্লাহ জাফর বিন মোহাম্মদ সাদেক এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এরকম, তিনি বলেছেন,ওলামাগণই আম্বীয়াগণের ওয়ারিশ। আম্বীয়া সম্প্রদায় দেরহাম বা দিনারের (পার্থিব সম্পত্তি) মীরাস রেখে যাননি। তাঁদের মীরাস হচ্ছে এলেম। যারা এই এলেমের অংশ পেয়েছে,তারা যেনো পূর্ণ মীরাস লাভ করেছে (নবীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি মীরাস হিসাবে বন্টন করা যাবে না)।

এখন ওই আয়াতটির বিষয়ে কিছু বলা যাক যেখানে বলা হয়েছে, 'ওয়া ওয়ারিসা সোলাইমানু দাউদা - সোলায়মান দাউদের ওয়ারিশ।' এখানেও ওয়ারিশ বলতে এলেমের ওয়ারিশ হওয়া বুঝানো হয়েছে। হজরত সোলায়মান বলেছেন, 'হে মানবমন্ডলী। আমাকে পাখিদের ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়েছে।' হজরত যাকারিয়া আ. তাঁর ছেলের জন্য এমনই দোয়া করেছিলেন যেনো তাঁর এলমী মীরাস লাভ হয়। আর এ কথা তো বিশ্বাসযোগ্য হতেই পারে না যে, যাকারিয়াপুত্র ইয়াহহিয়া সমস্ত বনী ইসরাইলীদের সম্পত্তির ওয়ারিশ হবেন। ওয়ারিশ হতে পারেন তিনি কেবল এলেমের। আর তিনি তা হয়েছিলেনও।

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ۝

❐ তোমাদের নারীদিগের মধ্যে যাহারা ব্যভিচার করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চার জন সাক্ষী তলব করিবে; যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাহাদিগকে গৃহে অবরুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাহাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।

এখানে ব্যভিচার বোঝাতে 'ফাহেশা' শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। 'ফাহেশা' বলতে রমণী-পুরুষ, রমণী-রমণী এবং পুরুষ-পুরুষ — সকল অবৈধ যৌন চরিতার্থতাকে বোঝায়। এ ধরনের সকল অশ্লীলতাকেই ব্যভিচার বলা যায়। ব্যভিচারিণীদেরকে শাস্তি দিতে গেলে চারজন পুরুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন। তাদেরকে সাক্ষ্য দিতে হবে যে তারা স্বচক্ষে স্পষ্ট এই পুরুষ ও রমণীকে ব্যভিচারলিপ্ত দেখেছে যেমন সুরমাদানীর সঙ্গে সুরমাদন্ড। সাক্ষীগণ খাঁটি ইমানদার হবেন। ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। এ সমস্ত ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্যও গৃহীত হবে না। এটা ঐকমত্য।

চারজন ইমানদার সাক্ষ্য দিলে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে গৃহবন্দী করতে হবে। এই অন্তরীণ অবস্থা চলতে থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত। অর্থাৎ হজরত আজরাইল আ. কর্তৃক তার জান কবজ করা পর্যন্ত।

অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা করে দিবেন —এর অর্থ শরিয়তের হুকুম জারী করে দিবেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের জন্য নতুন কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে বন্দী করে রাখো। হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করলেন, আমার কাছ থেকে নাও। আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো। মেয়েদের জন্য আল্লাহ উপায় করে দিয়েছেন। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের ব্যভিচারের শাস্তি একশত দোররা এবং এক বছরের দেশান্তর। আর বিবাহিত ও বিবাহিতাদের জন্য একশত বেত্রাঘাত এবং প্রস্তর নিক্ষেপ।

জ্ঞাতব্যঃ গৃহবন্দী রাখার বিধান কি কোনো শাস্তি,না শাস্তিদানের পূর্ব পর্যন্ত আওতাভূত রাখার ব্যবস্থা,এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় না। তবে এটা ঠিক যে, গৃহবন্দী

রাখার বিধান রহিত (মনসুখ) হয়নি। কারণ অপরাধীকে না আটকালে শাস্তিদানও সম্ভব নয়। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, বিচারক তাকে আটকে রেখে সাক্ষ্যদাতাদের সম্পর্কে তদন্ত করে নিশ্চিত হতে পারবেন যে,তারা সত্যিকার মুমিন না ফাসেক। ইনশাআল্লাহ সুরা নূরের তাফসীরে ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৬

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○

❐ তোমাদের মধ্যে যে দুইজন ইহাতে লিপ্ত হইবে তাহাদিগকে শাসন করিবে; যদি তাহারা তওবা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন করিয়া লয় তবে তাহাদিগকে রেহাই দিবে। আল্লাহ ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।

নির্দেশ হচ্ছে, ব্যভিচার ও সমকামে লিপ্তদেরকে শাস্তি দাও। নারী ও পুরুষ উভয়কেই শাস্তি দাও। আতা ও কাতাদা বলেছেন, তাদেরকে কড়া কথা দ্বারা শাস্তি দাও। বলো, তোমরা জঘন্য, ঘৃণ্য। আল্লাহ কি তোমাদেরকে লজ্জা দেয়নি? তোমাদের অন্তরে কি আল্লাহর ভয় নেই? হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কড়া কথায় লজ্জা দাও, হাত দিয়ে প্রহার করো। জুতা পেটা করো।

এখানে একটি দ্বিধা জেগে উঠতে পারে যে,পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে তাদেরকে এখানে কেবল কড়া শাসনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে কেন? এই দুই ধরনের নির্দেশের সামঞ্জস্য সাধনের উপায় কী? গুরুশাস্তিদানের নির্দেশের পর লঘু শাসনের কথা বিসদৃশ নয় কি? এর উত্তরে আলেমগণ বলেছেন, আগের আয়াতে বিবাহিত নারীপুরুষদের ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে, অবিবাহিতদের সম্পর্কে। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতটিই আগে নাজিল হয়েছে।

আমাদের নিকট এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াত ছিলো নারীপুরুষের অবৈধ সঙ্গম সম্পর্কে। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে সমকামের অপরাধ প্রসঙ্গে। মুজাহিদের বক্তব্য এরকমই। এবার বিরোধাভাস রইলো না। জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, সমকামের শাস্তি শরিয়ত নির্ধারণ করে দেয়নি। এ ব্যাপারে শাসক ও বিচারকই শাস্তি নির্ধারণ করতে সক্ষম।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এ ব্যাপারে প্রশাসক যা ভালো মনে করেন করবেন। বার বার শাস্তিদান সত্বেও নিবৃত্ত না হলে শাসক সমকামীদ্বয়কে মৃত্যুদন্ড

দিতে পারেন। এমতক্ষেত্রে বিবাহিত অবিবাহিতদের শাস্তির কোনো পার্থক্য নেই। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, ইমাম আজমের মতে এ ক্ষেত্রে শাস্তির কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। মৃত্যু পর্যন্ত বন্দী করে রাখা যাবে। যারা এ অপরাধে অনড় তাদেরকে হত্যা করতে হবে।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম ইউসুফের মতে সমকামীদেরকে শরিয়তসম্মত শাস্তিদান ওয়াজিব। ইমাম আহমদের চূড়ান্ত বক্তব্য এবং ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমকামের শাস্তি সঙ্গেছার (প্রস্তর বর্ষণ)। এ শাস্তিতে বিবাহিত অবিবাহিতদের কোনো পার্থক্যরেখা নেই। ইমাম শাফেয়ীর অন্য আর একটি বক্তব্য রয়েছে এরকম- তাদেরকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করতে হবে। ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম ইউসুফ, ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে, সমকামের শাস্তি ব্যভিচারের শাস্তির অনুরূপ। অবিবাহিতদেরকে দোররা মারতে হবে, আর বিবাহিতদেরকে পাথর মারতে হবে। সমকামও এক রকম ব্যভিচার (জেনা)। বরং তার চেয়েও ভয়াবহ। ব্যভিচারী নারীপুরুষ বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে শুদ্ধ হতে পারে। কিন্তু সমকামের শুদ্ধতা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। আর কোরআনের দলিলে অপরাধ দুটি সমান্তরালবর্তী অবস্থায় উল্লেখিত হয়েছে। এ ছাড়া আবু মুসা থেকে মারফু হাদিসে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, এই অশ্লীলতায় লিপ্ত পুরুষেরা ব্যভিচারী। অবশ্য এই হাদিসের সনদে মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান নামে একজন রাবী রয়েছে, আবুল হাতেম যাকে মিথ্যুক বলেছেন। আর আবুল ফাতাহ্ বলেছেন দুর্বল। হজরত আবু মুসা থেকে অন্য একটি সনদে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী। এই সনদের এক বর্ণনাকারী বশীর বিন ফজল বাজালী আবার অপরিচিত। আবু দাউদ তাঁর মসনদেও এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আভিধানিক অর্থে জেনা ও সমকাম সমার্থক নয়। তাই সাহাবীগণ এ ব্যাপারে শরিয়তের হদ জারী করার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। জেনা অপেক্ষা সমকামের অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু। কেননা সমকামে দুজনের অভিলাষ পূর্ণ হয় না। হয় একজনের। তাই জেনা ও সমকাম অবিকল একই প্রকৃতির নয়। যারা সমকামের জন্য শরিয়তের শাস্তি জারী করার পক্ষপাতি তাদের দলিল হচ্ছে হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিসটি। তিনি বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যাকে লুত আ. এর কওমের মতো অশ্লীলতালিপ্ত দেখতে পাবে, তাকে হত্যা করবে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম এবং বায়হাকী। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ইকরামা থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। তিরমিজি বলেছেন, ইকরামার মাধ্যমেই ইবনে আব্বাসের বর্ণনা ভালো বোঝা যায়। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। বোখারী বলেছেন,

ইকরামার ছাত্র আমর বিন আবী আমর নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি ইকরামার মাধ্যমে অনেক দুর্বল হাদিসও এনেছেন। নাসাঈও তাঁকে দুর্বল বলেছেন। ইবনে মুঈন বলেছেন, তিনি সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য)। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত এই হাদিসটি অত্যধিক দুর্বল। তিনি ছাড়াও বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছেন এই বর্ণনাটির সঙ্গে। হাকেম অন্য এক পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন এবং এর শুদ্ধাশুদ্ধ সম্পর্কে তিনি নিশ্চুপ। জাহাবী বলেছেন, আবদুর রহমান ওমরী নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভূত। ইবনে মাজা এবং হাকেম আবার এই হাদিসটি এনেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। কিন্তু এর সনদ প্রথমোক্তটি অপেক্ষাও দুর্বল। হাফেজ বলেছেন, হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হাদিসটি বিশুদ্ধ নয়। বায্যারও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বর্ণনা করেছেন আছেম বিন ওমর ওমারী থেকে। কিন্তু আছেম মাতরুক বলে গণ্য। ইবনে মাজা'র বর্ণনাটি এরকম — উপরের এবং নিচের জনকে পাথর মারো। ইবনে সালাহ তার আহকামে লিখেছেন, রসুল স. এর কথায় সমকামীদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ করার হুকুম পাওয়া যায় না। তবে তিনি স. বলেছেন, দুজনকেই হত্যা করে ফেলো। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, একক বিশুদ্ধ বর্ণনাও কিতাবুল্লাহ্র চেয়ে অগ্রগণ্য নয়। তাই এখানে কোরআনের নির্দেশই পালনীয়। কোরআনে কষ্ট দেয়ার কথা আছে। হত্যার কথা নেই।

একটি ধারণা ঃ এটা সর্ববাদীসম্মত নয় যে, এই আয়াতটি সমকাম সংক্রান্ত। বরং অধিকাংশ তাফসীরকার এই আয়াতটিকেও পুরুষ রমণীর ব্যভিচার বিষয়ক বলেছেন।

সমাধান ঃ তাফসীরকারগণ ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আয়াতে উল্লেখিত 'ফাহেশা' শব্দটি ব্যাপক অর্থসম্পন্ন। ব্যভিচার, সমকাম ॥ সব রকম অশ্লীলতাই ওই শব্দটির আওতায় পড়ে। আল্লাহ্তায়ালা নবী লুতের সম্প্রদায়ের লোকদের লক্ষ্য করে বলেছেন, 'তোমরা এমন এক অশ্লীল (ফাহেশা) কাজে লিপ্ত হয়েছো, যা আগে কেউ করেনি'। সমকাম সম্পর্কে সাহাবীগণের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। বায়হাকী তাঁর শোয়াবুল ইমান গ্রন্থে ইবনে আবী দ্দুনিয়ার নিয়মে মোহাম্মদ বিন মুনকাদের থেকে বর্ণনা করেন, একবার হজরত খালেদ বিন ওলিদ হজরত আবু বকর সিদ্দীককে লিখে জানালেন, আরবে এমন এক পুরুষ আছে যে, মহিলাদের মতো যৌনসঙ্গমে রত হয়। হজরত আবু বকর সাহাবীগণকে একত্র করে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। কঠিন পরামর্শ দিলেন হজরত আলী। তিনি বললেন, এই অশ্লীলতায় লিপ্ত ছিলো লুত আ. এর সম্প্রদায়। আমরা জানি আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে কী ভয়াবহ শাস্তি দিয়েছিলেন। আমি মনে করি ওই ঘৃণ্য ব্যক্তিটিকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হোক। সকল সাহাবী হজরত আলীর এ কথায় একমত হলেন।

ইবনে আবী শায়বা তাঁর মোছান্নেফ গ্রন্থে এবং বায়হাকী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, এ ধরনের গোনাহগারকে ওই লোকালয়ের সবচেয়ে উঁচু অট্টালিকার উপরে উঠিয়ে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিতে হবে। তারপর তার উপর নিক্ষেপ করতে হবে পাথর। এই বক্তব্যটির মর্ম এই যে, হজরত লুতের কওমকেও এমনি করেই ধ্বংস করা হয়েছিলো। তাদের সমস্ত জনপদকে শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে উল্টো করে মাটিতে আছড়ে ফেলা হয়েছিলো। তাদের সাথে সাথে সুদৃশ্য অট্টালিকাগুলোও মৃত্তিকাপ্রোথিত হয়েছিলো।

হজরত ইবনে জোবায়ের বলেছেন, চরম দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে সমকামীদেরকে বন্দী করে রাখতে হবে যেনো তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়। বায়হাকী একাধিক নিয়মে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী এক সমকামীকে প্রস্তরবর্ষণ করে হত্যা করেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাসের মারফু হাদিস ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, বার বার কঠোর শাসন সত্বেও যদি কেউ এই কুঅভ্যাস ত্যাগ না করে, তবে তাকে হত্যা করতে হবে। হাদিস শরীফের মর্মও এরকম। বলা হয়েছে, তোমরা যদি কাউকে লুত সম্প্রদায়ের মতো আমল করতে দেখো– অর্থাৎ তাদের মতো অশ্লীলতায় অটল পাও। তাদেরকেও বার বার সতর্ক করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা সংশোধিত হয়নি বলেই শাস্তি দেয়া হয়েছিলো। এরকম বক্তব্য পেশ করেছেন ইমাম আবু হানিফা।

তাওবাকারীদের প্রতি আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ। তওবা অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। বান্দার তওবা হচ্ছে অপরাধ স্থগিত রাখা। আর আল্লাহ্র তওবা হচ্ছে আযাবের সিদ্ধান্ত কার্যকর না করা, বান্দার তওবা কবুল করা, বান্দাকে তওবার সুযোগ প্রদানে ধন্য করা। অপরিসীম দয়ার কারণেই আল্লাহ্পাক ক্ষমার অঙ্গীকার করেছেন। সুতরাং যারা অজ্ঞ, অপরিণামদর্শী তারা যেনো তওবা করে। ফিরে আসে ক্ষমার সীমানায়। এ সম্পর্কে নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে —

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৭

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

❐ আল্লাহ্ অবশ্যই সেই সব লোকের তওবা গ্রহণ করিবেন যাহারা ভুলবশতঃ মন্দ কার্য করে এবং সত্বর তওবা করে; ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

বাগবী লিখেছেন, হজরত কাতাদা বলেন, রসুল সঃ-এর সাহাবীগণের সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত সকল গোনাহ্র ভিত্তিই অজ্ঞতা। আল্লাহ্তায়ালার অবাধ্য যারা তারা অবশ্যই মূর্খ। ইবনে জারীর আবুল আলীয়ার বক্তব্যকেও এরকমভাবে উপস্থাপন করেছেন। কলবী 'বিজাহালাতিন' শব্দটির তাফসীরে বলেছেন, গোনাহ্ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে তারা অজ্ঞ নয়, তবে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে অজ্ঞ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, চিরস্থায়ী শাস্তির চিন্তা পরিত্যাগ করে অস্থায়ী আনন্দে মত্ত হওয়ার নামই জাহালাত বা অজ্ঞতা। আমি বলি, পশুপ্রবৃত্তির প্রভাবে আনন্দোম্মত্ত হয়ে আল্লাহ্র আযাবাশংকা বিস্মৃত হওয়ার নামই জাহালাত।

পাপীষ্ঠেরা যেনো অনতিবিলম্বে তওবা করে নেয়। পাপের শিকল অন্তরে প্রোথিত হওয়ার আগেই তওবা করতে হবে। তওবা করতে হবে পূণ্যকর্মসমূহ বিনষ্ট হওয়ার আগেই। পাপে পূর্ণনিমজ্জনের পূর্বেই। সুদ্দী ও কালাবী বলেছেন, মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার আগেই সুস্থাবস্থায় তওবা করতে হবে। প্রকৃত কথা এই যে, ত্বরিৎ তওবার অর্থ জীবিত থাকতেই তওবা করে নেয়া। আযাবের ফেরেশতা সম্মুখবর্তী হওয়ার আগেই তওবা করা। ইকরামা এবং জুহাকও এরকম বলেছেন। অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে, মৃত্যু সমুপস্থিত হলে তওবা কবুল হয় না। রসুল স. বলেছেন, মৃত্যুকষ্টের (সাখরাতুল মউতের) আগে আল্লাহ্র বান্দারা তওবা করে নেন। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, হাকেম।

বায়হাকী হজরত ওমর থেকে হাদিস বর্ণনা করে বলেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। তিনি আর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাইদ খুদ্রী থেকে যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, শয়তান আরজ করলো, তোমার মর্যাদা ও মহত্ত্বের শপথ! আমি মানুষকে সব সময় বিভ্রান্ত করতে থাকবো যতক্ষণ তারা জীবিত থাকবে। আল্লাহ্ বললেন, আমার মর্যাদা ও মহিমার শপথ! আমিও সবসময় তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকবো, যখনই তারা ক্ষমাপ্রার্থী হবে। আহমদ, আবু ইয়ালা। হজরত আবু মুসা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা নিশীথে তাঁর বাহুবিস্তৃত করেন যেন দিনের গোনাহ্গারেরা তওবা করে (ফিরে আসে) এবং দিবসেও হাত বাড়িয়ে দেন যেন প্রত্যাবর্তন করে রাতের পাপীরা। বিরামহীন ভাবে এই নিয়মই চলতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন না পশ্চিমাকাশে সূর্য উদিত হবে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সূর্য পশ্চিমাকাশে উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তওবাকারীদের তওবা কবুল করবেন আল্লাহ্পাক। মুসলিম।

এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। আখেরাতের অন্তহীনতার তুলনায় এখানের জীবন মুহূর্ত মাত্র এবং তাও সম্ভবত নয়। তাই তওবা করা বুদ্ধিমত্তার দাবী।

আল্লাহ্‌পাক তওবাকারীদের তওবা কবুল করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি সবকিছুই জানেন। মহাজ্ঞানী তিনি। পরমতম প্রজ্ঞাময় তিনি। তিনি ভালো করেই জানেন, কে খাঁটি তওবাকারী, কে শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের যোগ্য।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৮

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰۤى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

❒ তওবা তাহাদের জন্য নহে যাহারা আজীবন মন্দ কার্য করে এবং তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে সে বলে, 'আমি এখন তওবা করিতেছি' এবং তাহাদের জন্যও নহে যাহাদের মৃত্যু হয় সত্য প্রত্যাখানকারী অবস্থায়। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি।

যারা পাপাভ্যাসে নিরবচ্ছিন্ন, তাদের তওবার অবকাশ হয় না। মৃত্যুকষ্ট শুরু হলে যখন আযাবের ফেরেশতারা পরিদৃষ্ট হন, তখন তওবা করলে কাজ হবে না। ওই সময় কাফেরদের ইমান এবং পাপিষ্ঠদের তওবা কোনোটিই গৃহীত হয় না। সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এবং পাপী অবস্থায় পৃথিবী পরিত্যাগকারীদের জন্য শাস্তি অবধারিত। তারা আখেরাতে গিয়ে তওবার ঘোষণা দিবে। বলবে, 'হে আল্লাহ্ আমরা তোমার আযাব দেখেছি ও শুনেছি। এখন পুনরায় আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। পুনরায় পৃথিবীতে পাঠালে আমরা উত্তম আমল করবো এবং ইমানদার হয়ে যাবো।' তাদের ওই তওবাও গৃহীত হবে না। যারা পৃথিবীর জীবনে পাপ থেকে তওবা করেছে বটে, কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছে অবিশ্বাসের সঙ্গে — তাদেরকে গুনাহ ও কুফর উভয়ের জন্যই আযাব দেয়া হবে। আর আযাব হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, মর্মন্তুদ।

বোখারী, আবু দাউদ ও নাসায়ী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে লিখেছেন, (মুর্খতার যুগের) দস্তুর ছিলো এরকম — কেউ মরে গেলে তার বিধবা স্ত্রীকে অধিকার করে নিত ওই মৃত ব্যক্তিরই কোনো প্রিয়জন। ইচ্ছে করলে সে তাকে বিয়ে করতো। ইচ্ছে না হলে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দিত। এমতাবস্থায় বিধবার

মতামতের মূল্য থাকতো না। এই প্রসঙ্গটিকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৯

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كُرْهًا ۖ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ
بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ
أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

❒ হে বিশ্বাসিগণ! নারীদিগকে জবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নহে; তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ তাহা হইতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিও না। যদি না তাহারা প্রকাশ্য ব্যভিচার করে তাহাদের সহিত সৎভাবে জীবনযাপন করিবে; তোমরা যদি তাহাদিগকে ঘৃণা কর তবে এমন হইতে পারে যে আল্লাহ্ যাহাতে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন তোমরা তাহাকে ঘৃণা করিতেছ।

এরশাদ হয়েছে, মেয়েদেরকে বলপ্রয়োগে বশে রাখা বৈধ নয়। তাদেরকে মীরাসের সম্পত্তির মতো মনে করাও অনুচিৎ। বিবাহের ব্যাপারে তাদেরকে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। 'কুরহান' অর্থ যদি তারা না চায়। ক্বারী হামজা ও ক্বারী কুসাই এ স্থানে ও সুরা তওবায় এই শব্দটিকে 'কুরহান' পড়তেন। অন্যান্য ক্বারী সকল স্থানেই 'কারহান' উচ্চারণ করতেন। ফাররা বলেছেন, 'কুরহান' অর্থ কাউকে বাধ্য করা। আর 'কারহান' অর্থ নিজ ইচ্ছা অনুসারে জবরদস্তি কোনো কাজ করা। কুসাই বলেছেন, উভয় শব্দের অর্থ একই। বাগবী লিখেছেন, জাহেলিয়াতের জামানায় নিয়ম ছিলো কেউ মারা গেলে তার বড় ছেলে, ছেলে না থাকলে কোনো নিকটতম আত্মীয় মৃতব্যক্তির স্ত্রীর উপর অথবা তার তাঁবুর উপর আপন পরিধেয় রেখে দিতো। এভাবেই বিধবার উপর প্রতিষ্ঠিত হতো তাদের অধিকার। বিধবারা কিছুই বলতে পারতো না। এরপর ছেলে কিংবা আত্মীয় বিয়ে করতে চাইলে মোহরানা ছাড়াই বিয়ে করতো। পূর্বে প্রদত্ত পিতা বা মৃত আত্মীয়ের মোহরানাকেই যথেষ্ট মনে করতো তারা। আর নিজে বিয়ে না করে বিধবাদের অন্যত্র বিয়ে দিলে মোহরানার টাকা নিয়ে নিতো নিজেরাই। বিধবা

হতো মোহরানাবঞ্চিত। কখনো এরকম হতো — নিজেরাও বিয়ে করতো না। অন্যস্থানেও বিয়ে দিতো না, যেনো বিধবা তার প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া অর্থসম্পদ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এভাবে সম্পত্তি সম্প্রদান করে বিধবারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো।

এই আয়াতে এ সকল অনাচার নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। এর সঙ্গে বগবী সংযোজন করেছেন, ওই বিধবার মৃত্যু হলে যে তার ওপর কাপড় ফেলে দিতো, সেই হতো ওয়ারিশ। আর একটা ব্যাপার ছিলো এই যে, সদ্য বিধবা নারীর উপর ছেলে বা নিকটাত্মীয়ের কেউ কাপড় ফেলে দেয়ার পূর্বেই যদি সে পিত্রালয়ে চলে যেতে পারতো তবে বেঁচে যেতো। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। এ সমস্ত ছিল অন্ধকার যুগের নিয়ম।

ইসলামী যুগের একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে নাজিল হয়েছে এই আয়াত। ঘটনাটি এই — আবু কায়েস বিন আসলত আনসারী মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর স্ত্রী কাবিসা বিনতে মাআজ বিধবা হলেন। কাবিসার উপর কাপড় ফেলে দিলো তাঁর ছেলে হোসাইন। মুকাতিল বিন হাব্বান তার নাম কায়েস বিন কায়েস বলেছেন। কাবিসার অধিকার লাভ করার পর তার ছেলে তাকে সকল প্রকার খরচপত্র দেয়া বন্ধ করে দিলো। উদ্দেশ্য, তিনি যেনো তাকে সম্পত্তি দিতে বাধ্য হন। এভাবে কিছু ফিদিয়া নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেয়াই ছিলো ছেলের অভিসন্ধি। কাবিসা তখন রসুল স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আবু কায়েস ইন্তেকাল করেছেন। এখন তার ছেলে আমাকে অধিকার করে নিয়েছে। সে খবচপত্র দেয় না। কাছে আসেনা। পথও ছাড়ে না। তিনি স. বললেন, তুমি তোমার ঘরে বসে আল্লাহ্র নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকো। কাবিসা অপেক্ষায় রইলেন। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। আয়াতে বলা হলো, তাদের বিবাহে বাধাদান বৈধ নয়। তাদের ওয়ারিশি সম্পত্তি কুক্ষিগত করার চেষ্টাও বৈধ নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত ওই ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যে তার স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করতো না। যে স্ত্রীসহবাসকে ঘৃণা করতো। সে চাইতো প্রদত্ত মোহরানা ফেরত নিয়ে স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে। আল্লাহ্ তার এই অসৎ উদ্যোগকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

আয়াতের শেষ দিকে বলা হয়েছে, স্ত্রী যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারিণী হয়, তবে মোহরানা ফেরত নেয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু জরিমানা আদায়ের চেষ্টায় তাদের পথরোধ করা যাবে না। বাধা প্রদান বৈধ হবে কেবল অশ্লীলতালিপ্ত দেখলে।

হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত কাতাদা বলেছেন, এখানে 'বি ফাহেশা' শব্দটির অর্থ হবে স্বামীর অবাধ্যতা। হাসান বসরী বলেছেন, অর্থ হবে ব্যভিচার

(জেনা)। অর্থাৎ স্ত্রী যদি অবাধ্য হয় অথবা ব্যভিচার করে তবে তাকে খোলা তালাক দেয়া বৈধ হবে (স্ত্রীর তালাকের প্রস্তাবে স্বামী সম্মত হলে খোলা হয়। এ ক্ষেত্রে মোহরানার দাবী থাকে না)। হজরত কাতাদা আরো বলেছেন, স্ত্রী ব্যভিচারিণী হলে তাকে দেয়া সম্পদ ফিরিয়ে নেবে এবং তাকে বের করে দেবে।

এরশাদ হয়েছে, তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। সদাচারী হবে। হাসান বসরী বলেছেন, এই নির্দেশটি ওই আয়াতের সমার্থক যেখানে বলা হয়েছে, আনন্দচিত্তে মোহর পরিশোধ করো এবং তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।

আরো এরশাদ হয়েছে, রূপহীনতা অথবা চরিত্রহীনতার কারণে তারা যদি তোমাদের ঘৃণাভাজন হয়,তবুও ধৈর্য ধারণ করাই শ্রেয়। ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে এই ভেবে যে, হয়তো এতেই রয়েছে কল্যাণ। এতে লাভ হবে আখেরাতের সওয়াব । দুনিয়াতে সৎ সন্তানও লাভ হতে পারে। তোমরা যা পছন্দ করো না, তা মন্দ নাও হতে পারে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ২০

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

❐ তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাহাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়া থাক তবুও তাহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা উহা গ্রহণ করিবে?

অবাধ্যতা অথবা ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পুনঃ বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ অশোভন হলেও নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর নিকট থেকে কোনোকিছু গ্রহণ করা যাবে না। মোহরানা হিসাবে প্রচুর অর্থ দেয়া সত্ত্বেও না। 'কিনতরা' অর্থাৎ প্রচুর অর্থের ব্যাখ্যা হিসাবে হাদিস শরীফে এসেছে, ইবনে জারীর হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কিনতরা হলো বারোশ' উকিয়া। এই আয়াত দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয়েছে, মোহরের কোনো সীমা নির্দ্ধারণ নেই। এটাই ঐকমত্য। একবার হজরত ওমর অধিক মোহরানা নির্ধারণ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তখন এক রমণী এই দলিল পেশ করেছিলেন। হজরত তখন বলেছিলেন, প্রত্যেকেই দেখছি দ্বীন সম্পর্কে ওমরের চেয়ে অধিক ওয়াকিফহাল। পর্দানশীন ললনারাও।

জ্ঞাতব্য ঃ আবদুর রহমান সালমী বর্ণনা করেন, হজরত ওমর নির্দেশ জারী করলেন, অধিক মোহর নির্ধারণ কোর না। এক মহিলা বললেন, আপনি এমত

নির্দেশ দানের অধিকার রাখেন না। কেননা আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন, 'ওয়া আতাইতুম ইহদাহুন্না কিনতরান মিন জাহাব' বর্ণনাকারী বললেন, ইবনে মাসউদের ক্বিরাত এরকমই ছিলো অর্থাৎ 'কিনতরান' এর পরে 'মিন জাহাব' ছিলো।

হজরত ওমর বলেছেন, এক মহিলা ওমরের সঙ্গে বিতর্ক করে বিজয়িনী হয়েছে। বকর বিন আবদুল্লাহ মাজানী রা. বর্ণনা করেন, হজরত ওমর রা. বলেছেন, আমি অধিক মোহর নির্ধারণ করার পক্ষপাতি নই। কিন্তু আমি নিরুপায়। কারণ কোরআনের আয়াত রয়েছে আমার সামনে।

ঐকমত্য এই যে, অত্যধিক মোহর নিধারণ না করাই মোসতাহাব। হজরত ওমর বলেছেন, মোহর অধিক কোর না। অধিক মোহর যদি সম্মানজনক কিছু হতো এবং আল্লাহর নিকট তাকওয়া হিসেবে গৃহীত হতো তবে রসুল স. তাই করতেন। আমি অবগত নই যে, তিনি স. তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং কন্যাগণের জন্য বারোশ' উকিয়ার অধিক মোহরানা নির্ধারণ করেছেন। আহমদ, আসহাবে সুনানে আরবা ও দারেমী।

খাত্তাবী ও ইবনে হাব্বান ' সহীহ' এর মধ্যে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই রমণীই উত্তম যার মোহরানা অত্যধিক নয়। ইবনে হাব্বান হজরত আয়শা থেকে আরো লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, স্ত্রীর খরচপত্র সহজ হওয়া এবং মোহর কম হওয়া তার জন্য বরকত। আহমদ ও বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, ওই রমণীরাই সবচেয়ে কল্যাণময়ী যার মোহরানা সহজ অর্থাৎ অনধিক। এই বর্ণনাটির সনদ উত্তম। আবু সালমার বর্ণনায় রয়েছে. হজরত আয়শাকে জিজ্ঞেস করলাম রসুল স. এর স্ত্রীগণের মোহরানা কতো ছিলো? তিনি বললেন, তাঁর স্ত্রীগণের মোহর ছিলো বার আউকিয়া এবং নশ। তোমরা কি জানো নশ কাকে বলে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন নশ অর্থ অর্ধেক আউকিয়া। মুসলিম। বারো আউকিয়া এবং এক নশ মিলে হয় পাঁচ শ' দেরহাম। উম্মে হাবিবা রা. ছাড়া অন্য স্ত্রীদের মোহরানার পরিমাণ ছিলো এই। উম্মে হাবিবার মোহরানা ছিলো চার হাজার দিরহাম। রসুল স. এর পক্ষ থেকে এই মোহর পরিশোধ করেছিলেন নাজ্জাশী। আবু দাউদ, নাসাঈ। ইবনে ইসহাক আবু জাফর রা. এর বর্ণনা থেকে লিখেছেন, তাঁর মোহরানা ছিলো চারশ' দীনার।

খুলাসাতুস্ সিয়ার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, রসুল স. হজরত খাদিজার মোহর নির্ধারণ করেছিলেন বারো আউকিয়া সোনা। এক আউকিয়ার পরিমাণ সাত মিছকাল। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, হজরত খাদিজার মোহর ছিলো বিশটি উটনি এবং চারশ' আশরাফী। খুলাসাতুস্ সিয়ার। আহমদ ও আবু দাউদ হজরত আয়শার বর্ণনা থেকে লিখেছেন, হজরত জুয়াইরিয়ার মিলিত অধিকার লাভ করেছিলেন সাবেত বিন কায়েস বিন সাম্মাস এবং তাঁর চাচাতো ভাই। মদীনায়

সাবেতের ছিলো কিছু খেজুর গাছ। ওই গাছগুলি তাঁর চাচাতো ভাইকে দিয়ে তিনি জুয়াইরিয়ার একক অধিকার লাভ করলেন এবং তাঁকে মুকাতাব বানিয়ে দিলেন। (নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে যাকে মুক্তি দানের ঘোষণা দেয়া হয় তাকে মুকাতাব বলে)। রসুল স. সেই নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধ করে দিয়ে জুয়াইরিয়াকে মুক্তি দিলেন এবং বিবাহ করলেন। ওই অর্থকেই তিনি তাঁর মোহরানা সাব্যস্ত করলেন। সাবিলুর রাশাদের মধ্যে আছে, সাবেত এবং তাঁর চাচাতো ভাই জুয়াইরিয়াকে মুকাতাব করেছিলেন। বিনিময় মূল্য ছিলো নয় আউকিয়া সোনা।

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, অনেকের মধ্যে তখন এই কুঅভ্যাসটি প্রচলিত ছিলো যে, তারা পূর্ব স্ত্রী পরিত্যাগ করে নতুন বিবাহ করতে চাইলে প্রথমাকে ব্যাভিচারের অপবাদ দিতো, যেনো সে কিছু অর্থ সম্পদ দিয়ে স্বইচ্ছায় সরে যায়। এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে আল্লাহ পাক এই অন্যায় আচরণটিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এরশাদ করেছেন, তার নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ কোর না। যদি করো তবে তা হবে মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপাচারের অর্জন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ২১

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ○

❐ কিরূপে তোমরা উহা গ্রহণ করিবে, যখন তোমাদের এক অপরের সহিত সংগত হইয়াছ এবং তাহারা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি লইয়াছে?

নির্ধারিত মোহরানা পরিশোধ করা ওয়াজিব। মোহরানা ফেরত নেয়ার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া নির্জন মিলনও সম্পন্ন হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কেবল একত্রে রাত্রি যাপন করলেই মোহরানার দাবী মজবুত হয় না। যৌনসহবাস হতে হবে। যৌনসহবাস ছাড়া রাত্রি যাপনের পর তালাক দিলে অর্ধেক মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, একত্রে রাত্রি যাপন করলে পূর্ণ মোহর পরিশোধ করতে হবে। যৌনসহবাস হলো কিনা সে সংবাদ নেয়ার প্রয়োজন নেই। ইমাম মালেক বলেছেন, নির্জনে মিলিত হলে যৌনসহবাস ছাড়াই মোহর পরিশোধ ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে নির্জন মিলনের সময় হতে হবে দীর্ঘ। ইবনে কাসেম বলেছেন, দীর্ঘ সময় অর্থ এক বৎসর। ইমাম শাফেয়ীর দলিল ওই আয়াতটি যেখানে বলা হয়েছে, ' তোমরা যদি রমণীদের মোহর নির্ধারণ করে থাকো আর সহবাসের পূর্বে

তালাক দাও তবে পরিশোধ করতে হবে নিধারিত মোহরের অর্ধেক। ওয়া ইন ত্বল্লাকতু মুহুন্না মিন ক্ববলি আন তামাসসুহুন্না ওয়া ক্বদ ফারাজতুম লাহুন্না ফরিদাতান ফা নিসফু মা ফারাজতুম।

ইমাম শাফেয়ী এই আয়াতের 'মাস' শব্দটির অর্থ গ্রহণ করেছন সহবাস। আমরা বলি, এ রকম অর্থ রূপক হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু 'মাস' শব্দটির প্রকৃত অর্থ সহবাস নয়, যদিও সহবাস অর্থ এর অর্ন্তভূত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী সাধারণ অর্থবোধক এই শব্দটিকে বিশেষ অর্থে নিয়েছেন।

আমরা কিন্তু নির্জন মিলন সংঘটিত হলেই সম্পূর্ণ মোহরানা পরিশোধ্য বলি। ইসলামের প্রথম যুগের ঐকমত্য এই যে, নির্জন মিলনকেই সহবাস সহ মিলন ধরে নিতে হবে – সহবাস হোক আর না হোক। আর এমন ক্ষেত্রে মোহরানার অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হবে। শায়েখ আবু বকর রাজী তাঁর 'আহকাম' পুস্তকে এ বিষয়টির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাহাবী বলেছেন, এ ব্যাপারে সাহাবীগণ একমত। ইবনে মুনজির লিখেছেন, এ রকম কথা হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত জায়েদ বিন সাবেত, হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর, মুয়াজ বিন জাবাল এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। বায়হাকী বর্ণনা করেন, হজরত ওমর ও হজরত আলী বলেছেন, যদি দরজা বন্ধ করা হয় অথবা যবনিকাবৃত করা হয় তবে সম্পূর্ণ মোহরই দিতে হবে এবং এরপর তালাক দিলে ইদ্দতও জরুরী হবে।

মোয়াত্তা গ্রন্থে ইয়াহিয়া বিন সাঈদের মাধ্যমে হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়েবের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, যখন পর্দার অন্তরাল করে দেয়া হয় তখন পুর্ণ মোহরানা ওয়াজিব হয়ে যায়। আবদুর রাজ্জাক তাঁর 'মোছান্নেফ' পুস্তকে হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে হজরত ওমরের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

হজরত আলী থেকে দারা কুতনী বর্ণনা করেন, কপাট বন্ধ করলে, পর্দার আড়াল করে দিলে এবং স্ত্রীকে নগ্ন অবস্থায় দেখে নিলে স্বামীর উপর পূর্ণ মোহর পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। এর পর তালাক দিলে স্ত্রীকে ইদ্দতও পালন করতে হবে। দারা কুতনী এক মারফু হাদিসে মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন সাওবানের বর্ণনা থেকে মুরসাল হিসাবে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি (নির্জনে) স্ত্রীর ওড়না খুলে তাকে একান্তে দেখে নিয়েছে তার উপর মোহরানা (সম্পূর্ণ) ওয়াজিব হবে। সহবাস করুক কিংবা নাই করুক। এই সনদের এক বর্ণনাকারী ইবনে লেহিয়া দুর্বল বলে গণ্য। কিন্তু ইবনে জাওজী বর্ণনা করেন, আলেমগণ আবার ইবনে লেহিয়ার বর্ণনাকে গ্রহণও করেছেন। আবু দাউদও মুরসাল হিসাবে ইবনে সাওবান থেকে এরকম লিখেছেন। এই সনদের সকল বর্ণনাকারীরাই সিকা (নির্ভরযোগ্য)। আর মুরসাল আমাদের নিকট দলিল হিসাবে গ্রাহ্য।

শাফেয়ী মাজহাবের অভিমতের সমর্থনে ইবনে মাসউদ এবং ইবনে আব্বাস থেকে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। কিন্তু বর্ণনাগুলো সহীহ্ নয়। শা'বীর বর্ণনাকে ইবনে মাসউদের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বায়হাকী লিখেছেন, যে মহিলা বিনা সহবাসে নির্জনে মিলিত হয় সে অর্ধেক মোহর পাবে। শাফেয়ীও ইবনে আব্বাস রা. থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সনদ দুর্বল। ইবনে আবী শায়বা এবং বায়হাকীও অন্য সনদে এরকম বলেছেন। কিন্তু এই সনদটিও নির্ভুল নয়।

তারা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে–এ সম্পর্কে হাসান, ইবনে শিরিন, জুহাক এবং কাতাদা রা. বলেছেন, দৃঢ় প্রতিশ্রুতির অর্থ মেয়েদের অভিভাবকের এই কথা — আমি আমার অভিভাবকাধীনাকে এই শর্তে বিবাহ দিচ্ছি যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়মশৃঙ্খলার সঙ্গে বিবাহাধীনে রাখবে অথবা ছেড়ে দিতে মনস্থ করলে উত্তম পদ্ধতিতে ছেড়ে দিবে।

শা'বী এবং ইকরামা বলেছেন, দৃঢ় প্রতিশ্রুতির অর্থ বর্ণিত হয়েছে মুসলিম শরীফের ওই হাদিসে যেখানে রসুল স. এরশাদ করেছেন, নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহে আস্থা রেখে তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছো। তাদের লজ্জাস্থান তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে আল্লাহর হুকুমেই। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের। ইবনে ওমর থেকে ইবনে জারীরও এ রকম বর্ণনা করেছেন। এ সকল হাদিসের মর্ম এই যে, বিবাহের মাধ্যমে তোমরা পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই অঙ্গীকারকে সম্মান করতে হবে।

ইবনে সা'দ, মোহাম্মদ বিন কাব কারাজীরী বর্ণনায় লিখেছেন, (জাহেলিয়াত যুগের নিয়ম ছিলো) মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর অধিকার লাভ করতো তার বড় ছেলে। আপন মা না হলে বড় ছেলে তাকে বিয়ে করতো। অথবা অন্য কারো সাথে বিয়ে দিয়ে দিতো। আবু কায়েস বিন সালমার ইন্তেকালের পর তার বড় ছেলে তার পিতার স্ত্রীর অধিকার লাভ করলো। আবু কায়েসের বিধবা স্ত্রীকে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ দিলো না। বিধবা তখন রসুল স.কে সব কথা জানালেন। রসুল স. বললেন, এখন তুমি যাও। সম্ভবতঃ তোমার বিষয়ে কোনো হুকুম অবতীর্ণ হবে।

ইবনে আবী হাতেম, ফারইয়ানী এবং তিবরানী হজরত আদীবিন সাবেতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, আবু কায়েস বিন সালমা আনসারী রা. ছিলেন বড়ই পূণ্যবান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করতে চাইলো তাঁরই বড় ছেলে। বিধবা বললেন, তুমি আমার সন্তান তুল্য। তাছাড়া তুমি পূণ্যবানও (তাহলে কিভাবে বিবাহ হবে)। এরপর তিনি রসুল স.কে আনুপূর্বিক ঘটনা বিবৃত করলেন। রসুল স. বললেন, ঘরে যাও (এবং হুকুমের প্রতীক্ষায় থাকো)। তারপর অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

❒ নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিওনা; পূর্বে যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। ইহা অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।

পিতা ও পিতামহদের স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা যাবে না। এ কাজটি অতিশয় অশ্লীল; ঘৃণ্য এবং চরম লজ্জাজনক। অতীতেও কোনোদিন একাজের অনুমতি ছিলো না। তবে যারা ইতোপূর্বে এরকম করে ফেলেছে তাদেরকে আল্লাহপাক ক্ষমা করে দিচ্ছেন। কিন্তু এই ঘোষণার পর এই ধরনের অপরাধ আর ক্ষমা করা হবে না। এ কাজটিকে যেমন আল্লাহতায়ালা অপছন্দ করেন, তেমনি অপছন্দ করেন অভিজাতজনেরাও।

হজরত বারা ইবনে আজিব রা. বর্ণনা করেন, আমার মামা ঝান্ডা হাতে নিয়ে আমার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, এক লোক তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। রসুল স. আমাকে তাঁর মস্তক কর্তন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী। দারেমীর বর্ণনায় এসেছে এরকম, আমাকে রসুল স. এ জন্য পাঠাচ্ছেন যেনো আমি তার গর্দান কেটে ফেলি এবং তার সম্পদ অধিকার করি। এই বর্ণনায় মামা'র স্থলে চাচার শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, পিতৃপুরুষ অর্থ বাপ, দাদা ও নানা। কেউ কেউ বলেছেন, পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছেন – একথার প্রকৃত অর্থ পিতৃপুরুষ যে রমণীদের সঙ্গে সঙ্গম করেছেন। এই অর্থটি গ্রহণ করলে উদ্দেশ্য হবে এরকম, তোমাদের পিতৃপুরুষ শুদ্ধ বিবাহের পর অথবা অশুদ্ধ বিবাহের পর কিংবা বিবাহ ছাড়াই যাদেরকে সম্ভোগ করেছে।

'কামুস' গ্রন্থে 'নিকাহ' (বিবাহ) শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'সহবাস'। আরেক অর্থ স্বীকারোক্তি (আকদ)। 'সিহাহ্' গ্রন্থে জাওহারী লিখেছেন, রূপক অর্থ সহবাস। ' যৌনসম্ভোগ' কথাটি সরাসরি ব্যবহার লজ্জাজনক। তাই যৌনসম্ভোগের বৈধতাকে বিবাহ এবং অবৈধতাকে অশ্লীলতা বা ব্যভিচার (ফাহেশা) বলা হয়। যেমন আল্লাহপাক বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদেরকে বিবাহ দিয়ে দাও।' একথার উদ্দেশ্য হবে, অবিবাহিতদেরকে বৈধ যৌন চরিতার্থতার সুযোগ করে দাও।

আমাদের নিকট এটাই বিশুদ্ধ যে, এই আয়াতে উল্লেখিত 'নিকাহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বীকারোক্তি (আকদ)। সহবাস এখানে উদ্দেশ্য হয়নি। কেননা ঐকমত্য অনুসারেই পিতার স্ত্রী ছেলের জন্য হারাম। সহবাস হোক কিংবা নাই হোক।

একটি আপত্তি ঃ যদি এই আয়াতে বিবাহ (নিকাহ) বলতে স্বীকারোক্তিই (আকদ) বোঝানো হয়ে থাকে, তবে তাকে বিবাহ করা ছেলের জন্য হারাম হবে কেন? কারণ সে তো আর তার পিতার বিবাহিত স্ত্রী নয়।

উত্তর ঃ এই নিষিদ্ধতা কোরআনের উল্লেখের দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। সহবাসই বিবাহের উদ্দেশ্য। সুতরাং বিবাহের স্বীকৃতির (আকদের) পর সহবাসের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর তাকে স্ত্রী বলেই গণ্য করতে হবে। সহবাস হোক কিংবা নাই হোক। কেবল পিতার স্ত্রী নয়, তার (পিতার স্ত্রীর) কন্যা এবং মাতাকেও বিবাহ করা ছেলের জন্য হারাম।

মাসআলা ঃ ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেকের মতে জেনা (ব্যভিচার) দ্বারা হুরমতে মোছাহেরাত হয় না (জেনাকারীণির মা কিংবা মেয়েকে বিবাহ করা হারাম হয় না)। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, জেনা দ্বারা জেনাকারীণির মা ও মেয়ে হারাম হওয়া নিশ্চিত। ইমাম মালেকের একটি বক্তব্যও এই অভিমতের অনুকূল। ইমাম আহমদ আরো বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নারীকে সম্ভোগ করে তবে তার মা অথবা কন্যাকে বিবাহ করা তার জন্য হারাম হবে। আমরা বলি, এই আয়াতকে হুরমতে মোছাহেরাতের সরাসরি দলিল হিসাবে উপস্থাপন করা যায় না। অবশ্য বৈধ সহবাসকে জেনার সঙ্গে তুলনীয় করা যেতে পারে। এই দুই ক্ষেত্রে একই রকম নিষিদ্ধতার কারণ এই যে, হালাল ও হারাম উভয় প্রকার সহবাসের পরে সন্তান জন্ম লাভ করে। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, অন্যের বাঁদী, ছেলের বাঁদী, মুকাতাব বাঁদী (যে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত হবে), জেহারওয়ালী স্ত্রী, নেফাস গ্রস্তা রমণী, ইহরাম পালনরতা কিংবা রোজা পালনকারীনি — সকলের সঙ্গে সহবাস হারাম। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, নিষিদ্ধতা বলবত হয়েছে সহবাসের কারণেই। সে সহবাস হালাল হোক কিংবা হারাম হোক। উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে নিষিদ্ধতার বিধান।

ইবনে হুম্মাম বর্ণনা করেন, আমাদের আলেম সম্প্রদায় এই অভিমতের সমর্থনে কিছুসংখ্যক হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন — এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, হে আল্লাহ রসুল! ইসলাম পূর্ব যুগে আমি এক মহিলাকে সম্ভোগ করেছি। এখন তার কন্যাকে বিয়ে করতে পারবো কি? রসুল স. বললেন, না। যার গোপন অঙ্গের দিকে তুমি ধাবিত হয়েছিলে, তার কন্যার গোপন অঙ্গের দিকে ধাবিত হতে পারো না। বর্ণনাটি মুরসাল ও মুনকাতে। এই সনদের এক বর্ণনাকারী আবু বকর বিন আবদুর রহমান বিন হাকিম।

ইবনে ওহাব, আবু আইয়ুব সূত্রে বিন জারীহ্ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে কোনো রমণীকে হাত দ্বারা স্পর্শ করেছে,সে যেনো তার কন্যাকে বিবাহ না করে। এই বর্ণনাটিও মুরসাল ও মুনকাতে। (যে হাদিসের শেষ দিকের বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে সে হাদিসকে মুরসাল এবং যে হাদিসের ধারাবাহিকতা মাঝখানের বর্ণনাকারী বাদ পড়ার কারণে ক্ষুণ্ন হয়েছে সে হাদিসকে মুনকাতে বলে)। মুরসাল ও মুনকাতে গ্রহণ করাতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই, যদি সনদে উল্লেখিত বর্ণনাকারীগণ সিকা (নির্ভরযোগ্য) হন। এরকম মন্তব্য করেছেন ইবনে হুম্মাম।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর মতের সমর্থনে দুটি হাদিস পেশ করেছেন। একটি হচ্ছে, হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, হারাম হালালকে নষ্ট করতে পারে না। দারা কুতনী। এই সনদের এক রাবী ওসমান বিন আবদুর রহমান ওক্কাসীকে ইয়াহিয়া বিন মুঈন মিথ্যুক বলেছেন। ইবনে মাদিনী বলেছেন, দুর্বল। বোখারী, নাসাঈ, রাজী এবং আবু দাউদ বলেছেন, সে কিছুই ছিলো না। তার বর্ণনা দলিল হিসাবে গ্রহণীয় নয়।

অপর হাদিসটি হজরত আয়েশার হাদিসের মতোই ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী এবং ইবনে মাজা। এই সনদের এক রাবী ত্রুটি ও অশ্লীলতাদুষ্ট বলে গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। সে ওবায়দুল্লাহর ভাই আবদুল্লাহ বলে পরিচিত। আর এক রাবী ইসহাক বিন মোহাম্মদ আরুবী সম্পর্কে ইয়াহিয়া বলেছেন, সে কিছুই নয়, মিথ্যুক। বোখারী বলেছেন, আলেমগণ তার বর্ণনাকে পরিত্যাগ করেছেন।

মাসআলা ঃ যে নারীর সঙ্গে জেনা করা হয়েছে তার পুত্র জেনাকারীর স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারবে না। তেমনি সেই পুরুষ সেই রমণীর কন্যাকেও বিয়ে করতে পারবে না। জেনাকারীনি জেনাকারীর স্ত্রী তুল্য। আরবী আভিধানিক অর্থে জেনাকারীণি নারীর ছেলে মেয়েরা আপন ছেলে মেয়ের মতোই। শরিয়তসম্মত অর্থ অভিধানের খেলাফ না হওয়া পর্যন্ত আভিধানিক অর্থেই গ্রহণীয়। যেমন সালাত শব্দটির শরিয়তগত অর্থ হচ্ছে বিশেষ ধরনের ইবাদত। এক্ষেত্রে অভিধান যাই বলুক তা ধর্তব্য হবে না। শরিয়তের ব্যাখ্যাই গ্রহণীয় হবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে শরিয়তের নিজস্ব কোনো ব্যাখ্যা নেই সেক্ষেত্রে অভিধানই ধর্তব্য। যদি জায়েদ নামক ব্যক্তি তার হিন্দা নাম্নী স্ত্রীর সঙ্গে লেয়ান (শপথ) করে বলে যে, তোমার ছেলে ওমর আমার ছেলে নয় — কাজীও যদি তার এ কথাকে গ্রহণ করে, তবে ওমরের জন্য জায়েদের বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ হবে না। এবং জায়েদের জন্যও ওই মহিলার কন্যাকে বিবাহ করা হারাম হবে। কেননা এক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে, জায়েদ তার শপথে ঘোষিত দাবী থেকে সরে যাবে। তখন কাজীর সমর্থনও অনর্থক বলে বিবেচিত হবে।

মাসআলা ঃ কামতাড়নার সঙ্গে কোনো পুরুষ নারীকে অথবা কোনো নারী পুরুষকে স্পর্শ করলে তা সহবাস তুল্য হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম করলে হুরমতে মোছাহেরাত হবে অর্থাৎ ওই নারীর মাতা অথবা কন্যাকে বিবাহ করা ওই পুরুষের জন্য হারাম হবে। আবার কোনো পুরুষ কোনো মহিলার অথবা কোনো মহিলা পুরুষের লজ্জাস্থানকে কামতাড়নার সঙ্গে দেখলেও হুরমতে মোছাহেরাত হবে। নারীকে স্পর্শ করার কারণে অথবা তার লজ্জাস্থান দেখার কারণে পুরুষের বীর্য স্খলিত হলে কিংবা নারীর সঙ্গে পায়ুসঙ্গম করার কারণে বীর্যপাত হলেও হুরমতে মোছাহেরাত হয়। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফার অভিমত এরকমই। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী হুরমতে মোছাহেরাত হয় না। অন্য তিন ইমামের অভিমত, স্পর্শ করলে অথবা লজ্জাস্থান দেখলে হুরমতে মোছাহেরাত হয় না। ইমাম আবু হানিফার নিকট স্পর্শ করা অথবা গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সহবাস তুল্য। তাই এরকম অবস্থাকে সহবাসের স্থলাভিষিক্ত ধরে নেয়া হয়েছে। বীর্য স্খলনের পরক্ষণে স্পর্শ করলে অথবা দেখলে হুরমতে মোছাহেরাত হবে না। কারণ তখন কামোত্তেজনা থাকে না। কামতাড়নার সঙ্গে স্পর্শ করা ও দেখা বলা যাবে তখনই যখন লজ্জাস্থানে কামোত্তেজনা অনুভূত হবে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ২৩

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْأَخِ وَبَنٰتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَإِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَآئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

❑ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধমাতা, দুগ্ধ-ভগিনী, শাশুড়ী ও তোমাদের

স্ত্রীদিগের মধ্যে যাহার সহিত সংগত হইয়াছ তাহার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভজাত কন্যা, যাহারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে; তবে যদি তাহাদের সহিত সংগত না হইয়া থাক তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগ্নিকে এক সঙ্গে বিবাহ করা; পূর্বে যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মাতা অর্থ মাতৃবর্গ। যেমন মা, দাদী, পরদাদী, নানী, পরনানী। আলেমগণ বলেন মা অর্থ মূল। এটাই উম্মাহাত এর (মা এর) আভিধানিক অর্থ। কামুস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, মা-ই প্রত্যেক বস্তুর মূল। যেমন উম্মুল কিতাব অর্থ সুরা ফাতিহা অথবা লাওহে মাহফুজ। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, উম্মাহাত বা মাতৃবর্গ বলতে বোঝায় গর্ভধারিণী মা সহ পিতা ও মাতার দিকের উর্ধ্বস্তরের সকল দাদী ও সকল নানীকে।

কন্যা অর্থ কন্যাবর্গ অর্থাৎ সকল কন্যা তুলনীয়াগণ। যেমন নাতনী, পুতনী, এভাবে সকল অধস্তনাগণ।

ভগ্নি অর্থ সহোদরা ভগ্নি এবং বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভগ্নি সকল।

ফুফু ও খালা বলতে বোঝাবে বাপ ও মায়ের সহোদরা সহ বাপ ও মায়ের বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় বোন সকল। এটা ঐকমত্য। এর মধ্যে আরো রয়েছেন, মা ও বাপের ফুফু সকল ও খালা সকল। তাঁরা দূরবর্তী হলেও নিকটবর্তীদের সমান্তরাল। কিন্তু যারা তাদের শাখা তাদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ। যেমন চাচা, ফুফু, মামা অথবা খালাদের কন্যাগণ।

ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভাগিনেয়ী অর্থ ভাইয়ের ও বোনের কন্যাগণ এবং তাদের সূত্রের পৌত্রী ও দৌহিত্রীগণ। বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভাই বোনের কন্যারাও ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভাগিনেয়ী। তারা এবং তাদের সূত্রের পৌত্রী ও দৌহিত্রীরাও হারাম।

বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা সাত প্রকার বংশগত নিষিদ্ধতার বিবরণ দিয়েছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, চার প্রকার মহিলা হারাম। বৈবাহিক সূত্রের মূল শাখা, বংশগত উর্ধ্বতন ও অধস্তন শাখা। এমন দুইজন নারী ও পুরুষের একে অপরের সাথে বিবাহ হারাম যাদের মধ্যে একে অপরের বংশগত সন্তান হবে। কিংবা একজন অপরজনের পিতা অথবা মায়ের শাখা হবে।

দুগ্ধমাতা ও দুগ্ধবোনও হারাম। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, দুগ্ধ ফুফুবর্গ, খালাবর্গ, ভ্রাতুষ্পুত্রীবর্গ ও ভাগনেয়ীবর্গও হারাম। অর্থাৎ বংশগত কারণে যাদের সাথে বিবাহ হারাম, দুধ পান করার কারণে তেমনি দুধ মাতার সম্পর্কীয়াদের সঙ্গেও বিবাহ হারাম। রসুল স. বলেছেন, দুধ পান করার কারণে ওই সকল বিবাহ হারাম যা বংশগত কারণে হারাম হয়েছে। আরেকটি বর্ণনায় বংশগত শব্দটির স্থলে জন্মগত শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। হজরত আয়েশা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা

করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হজরত আলী বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসুল! আপনি কি আপনার চাচা হামজার কন্যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক? সে তো কোরাইশদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রূপবতী। তিনি স. বললেন, তুমি কি জানো না হামজা আমার দুধ ভাই। আর আল্লাহ যে সকল বংশীয় আত্মীয়াদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন, দুধ সম্পর্কীয় সে সকল আত্মীয়াদেরকেও তেমনি নিষেধ করেছেন। মুসলিম।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, আমার দুধ চাচা এলেন এবং আমার ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। আমি অনুমতি দিলাম না। তখনও আমি এই মাসআলাটি জানতাম না। এমন সময় রসুল স. এলেন। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, তিনি তো তোমার চাচা। অনুমতি দাও। আমি বললাম, হে রসুল! আমাকে তো দুধপান করিয়েছে এক নারী। পুরুষ তো পান করায়নি। তিনি স. বললেন, নিঃসন্দেহে তিনি তোমার চাচা। তাকে ভিতরে আসতে দাও। এ ঘটনাটি ঘটেছিলো পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আয়েশা আরো বর্ণনা করেন, রসুল স. আমার কাছে ছিলেন, এমন সময় আমি এ রকম শুনতে পেলাম, কে যেনো তাঁর অন্য স্ত্রী হাফসার গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইছেন। আমি বললাম, হে রসুল! কে যেনো আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইছেন। তিনি স. বললেন, মনে হয় হাফসার দুধ চাচা। একথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমার দুধ চাচা যদি এখনো জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি কি আমার ঘরে আসতে পারতেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। জন্মগত কারণে যা নিষিদ্ধ, দুধ সম্পর্কের কারণেও তা নিষিদ্ধ। বাগবী।

জ্ঞাতব্য ঃ ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের মতে দুধ পানের পরিমাণ কম হোক অথবা বেশী হোক — সকল অবস্থায় নিষিদ্ধতা বলবৎ হবে। কেননা এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ওই হাদিসটির মতোই, যেখানে বলা হয়েছে, বংশগত কারণে যা হারাম দুধ পান করার কারণে তাই হারাম। এই আয়াত ও হাদিসে কম অথবা বেশীর উল্লেখ নেই। ইমাম আহমদের মাধ্যমে এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে পাঁচবার পেট ভরে দুধ পান করলেই কেবল নিষিদ্ধতা প্রযোজ্য হবে। এক বর্ণনা অনুসারে ইমাম আহমদের বক্তব্যও এরকম। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আহমদ পাঁচবারের পরিবর্তে তিনবারের কথা বলেছেন। এ ধরনের আরো বর্ণনা করেছেন আবু সাওর, ইবনে মুনজির, দাউদ এবং আবু ওবাইদ। তিনবার নির্দিষ্ট করা হয়েছে হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসানুসারে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বর্ণনা করেন, এক বার চুষলে অথবা দুই বার চুষলে নিষিদ্ধতা অপরিহার্য হয় না। উম্মে

ফজলের বর্ণনায় একবার চুষা ও দুইবার চুষার পরিবর্তে একবার পান করা ও দুইবার পান করার কথা এসেছে। অবশ্য এ সমস্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য একই। মুসলিম। এই হাদিসটিই হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের মাধ্যমে হজরত আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন আহমদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, এবং তিরমিজি। কিন্তু তাবারী একে মোজতারেব বলেছেন (যে হাদিসের সনদ সুশৃঙ্খলিত নয় তাকে মোজতারেব বলে)। কখনো বর্ণনা এসেছে হজরত আবদুল্লাহ এবং হজরত জোবায়েরের মাধ্যমে রসুল স. থেকে। কখনো বর্ণনায় এসেছে হজরত আবদুল্লাহ — হজরত আয়েশা — রসুল স. এরকম। আবার কখনো রসুল স. থেকে হজরত আবদুল্লাহর বর্ণনা চলে এসেছে সরাসরি। ইবনে হাব্বান সনদের এই বিভিন্নতা সম্পর্কে বলেছেন, সম্ভবতঃ এই হাদিসটি হজরত আবদুল্লাহ তাঁর পিতা হজরত জোবায়ের থেকে শুনেছেন। হজরত আয়েশা থেকেও শুনেছেন। আবার সরাসরি রসুল স.-এর নিকট থেকেও শুনেছেন।

বোখারী লিখেছেন, হজরত আয়েশার মাধ্যেমে হজরত আবদুল্লাহ — এই মাধ্যমটি বিশুদ্ধ। হজরত জোবায়েরের মাধ্যম সম্পর্কে কেবল মোহাম্মদ বিন দিনারের বক্তব্য রয়েছে এরকম — এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, মতবিরোধও রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় হজরত আয়েশার উল্লেখ মাত্র নেই। স্মর্তব্য যে, সনদ মুরসাল হলে ক্ষতি নেই। নাসাঈ এই হাদিসটি হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, এই হাদিসটিতে মারফু প্রকৃতির বিশুদ্ধতা নেই। ওলামাগণ এ হাদিসকে তাদের অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন। কেননা এখানে একবার বা দুইবার দুধ পান করলে বিবাহ হারাম হবে না বলা হয়েছে। তাহলে তিনবার পান করলে হারাম হবে — এ কথাটি ধরে নেয়া যায়। যারা কমপক্ষে পাঁচ বার দুধ পান করলে হারাম হবে বলেন, তাঁদের দলিল হলো – হজরত আয়েশার ওই হাদিসটি যেখানে তিনি বলেছেন, কোরআনে দশবার পান করার কথা বলা হয়েছে। তারপর পাঁচবারের কথা বলে পূর্বের আয়াতটি রহিত করে দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচবারের বর্ণনাটি। এরপর রসুল স. এর ইন্তেকাল পর্যন্ত এভাবেই পাঠ করা হয়েছে। আমরা বলি, কোরআনের হুকুম সর্বজনবিদিত। এর প্রতিকূলে হাদিসে আহাদ (এককবর্ণিত হাদিস) গ্রহণীয় নয়। আর নিয়ম হচ্ছে, দ্বিধাসন্দেহের ক্ষেত্রে হারামকেই অধিকতর গুরুত্ব দিতে হয়। হজরত আয়েশা বর্ণিত এই হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে সহীহ্ হলেও এর শেষ অবস্থা হচ্ছে মাতরুক। একথা না মানলে এটাই প্রমাণিত হবে যে, রসুল স. এর ইন্তেকাল পর্যন্ত পাঁচবার দুধ পানের বিষয়টি পাঠ করা হতো (অর্থাৎ তাঁর স. এর ইন্তেকালের পর কোরআন একত্রিত করার সময় ওই আয়াতটিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে)। এতে করে রাফেজীদের মতের পোষকতা অবশ্যম্ভাবী হয়।

যেমন তারা বলে, রসুল স. এর পরে কোরআনের অনেক কিছু ধ্বংস করা হয়েছে। এ ধরনের কথা কুফরী। একথার দ্বারা 'ওয়া ইন্না লাহু লা হাফিজুন' (আমিই ইহা হেফাজত করবো) — আল্লাহর এই অঙ্গীকার মিথ্যা প্রমাণিত হয়। হজরত আয়েশার বক্তব্যকে এরকম ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, রসুল স. এর ইন্তেকাল পর্যন্ত অর্থ ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত। দশবারের কথাতো পাঁচবারের ঘোষণা দ্বারা আগেই রহিত হয়ে গিয়েছে। এরপর ইন্তেকালের অব্যবহিত পূর্বে পাঁচবারের হুকুমটিও রহিত হয়ে গিয়েছে। বিশুদ্ধ বর্ণনাটি হচ্ছে এই যে, হজরত ইবনে আব্বাসকে যখন বলা হলো, একবার দুধপান করায় নিষিদ্ধতা আসে না, তখন তিনি বললেন, প্রথমে এমনই ছিলো পরে এ নিয়ম রহিত হয়েছে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, দুধ পান প্রসঙ্গটির শেষ সিদ্ধান্তটি এরকম – অল্প পান করুক কিংবা বেশী , সকল অবস্থায় নিষিদ্ধতা অপরিহার্য। হজরত ইবনে ওমর বলেন, অল্প পান করাও নিষিদ্ধতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। যখন তাকে বলা হলো, হজরত ইবনে জোবায়ের যে বলেন, একবার বা দুইবার পান করলে হারাম হয় না। তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর সিদ্ধান্ত ইবনে জোবায়েরের সিদ্ধান্ত থেকে উত্তম। আল্লাহর কালামে একবার দুইবার এরকম উল্লেখ নেই। অতএব, শেষ পর্যন্ত পাঁচবার দুধ পানের হুকুমটি বলবৎ ছিলো — হজরত আয়েশার এমতো উক্তিটি ভুল। কারণ, আবৃত্তি শব্দনির্ভর। হুকুম কখনো শব্দবিহীন এবং আবৃত্তিবিহীন হয় না।

<u>মাসআলা</u> ঃ দুধ পান করার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দুধপান করলে তা ধর্তব্য নয়। কারণ, এর দ্বারা প্রবৃদ্ধি এবং প্রতিপালন প্রমাণিত হয় না। দুধ পানের সময় অতিবাহিত হবার পর দুগ্ধ দানকারীকে মা বলা যায় না। দাউদ জাহেরীর মতে, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে যে কোনো সময় দুধ পান করলেই হারাম প্রমাণিত হবে। হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, আবু হোজায়ফার পত্নী সাহলা বিনতে সুহাইল রসুল স. এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, সালেম (যিনি হোজায়ফার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ ছিলেন) আসার কারণে হোজায়ফার চেহারায় অসন্তুষ্টির ছায়া দেখলাম। তিনি স. বললেন, সালেমকে যদি তুমি পাঁচবার দুধ পান করিয়ে দাও তবে সে মুহরিম (নিষিদ্ধ) হয়ে যাবে। শাফেয়ী। মুসলিমের বর্ণনায় সংখ্যার উল্লেখ নেই। আমাদের উত্তর এই যে, আলেমদের ঐকমত্য অনুযায়ী এই হদিসটি মনসুখ (রহিত)। রসুল স. এরশাদ করেছেন, হারাম হওয়া ওয়াজিব হয় স্তনের দুগ্ধ পান করা থেকে। এই হাদিসটি হজরত উম্মে সালমা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদিসটি সহীহ্। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, ওই দুধ পানই হুরমতকে ওয়াজিব করে, যার কারণে গোশত ও হাড় পরিপুষ্টতা পায়। বোখারী ও

মুসলিমের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আয়েশা বলেন, একবার রসুল স. আমার নিকট এলেন। ওই সময় আমার কাছে একজন উপবিষ্ট ছিলেন যাকে দেখে তিনি বললেন, আয়েশা, ইনি কে? আমি বললাম, আমার দুধ ভাই। তিনি বললেন, আপন ভাই দেখে নাও। ক্ষুধার্ত হয়ে দুধ পান করলে নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয় (যদি দুধ পান করা হয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে)।

মাসআলা ঃ দুধ পান করার সময় সীমা দুই বৎসর। একথা বলেছেন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম মালেক, সাঈদ বিন মুসাইয়েব, ওরওয়া এবং শা'বী। দারা কুতনী, হজরত ওমর এবং ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবী শায়বা, হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত আলী থেকেও এরকম অভিমত পাওয়া যায়। ইমাম মালেকের বক্তব্য সম্পর্ক রয়েছে তিনটি বর্ণনা। প্রথম বর্ণনায় দুই বৎসর এক মাস এবং দ্বিতীয় বর্ণনায় এক বৎসর দুই মাস এর কথা এসেছে। তৃতীয় বর্ণনায় সময়ের কোনো উল্লেখ নেই। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর প্রয়োজন হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুধ পান করতে পারবে। ইমামে আজম বলেছেন, দুগ্ধ পানের সময়সীমা দুই বৎসর ছয় মাস। ইমাম জোফরের মতে তিন বৎসর। আল্লাহপাক এক আয়াতে বলেছেন, 'আর জননীরা সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য দান করবে। এ নির্দিষ্ট সময় তার জন্য যে নির্ধারিত সময়সীমা পূর্ণ করতে চায়।' অন্য এক আয়াতে এসেছে, 'ওয়াফিছালুহু ফি আমাঈনে।' আর একটি আয়াতে এসেছে, 'আর তাকে গর্ভধারণ করা ও দুধ ছাড়ানো মোট তিরিশ মাস।' গর্ভধারণের সময় ছয় মাস ধরলে দুধ পানের সময় থাকে দুই বৎসর। এভাবে ছয় মাস আর চব্বিশ মাস মিলে তিরিশ মাস পূর্ণ হয়। রসুল স. এরশাদ করেন, দুধ পানের সময়সীমা দুই বৎসর। এর বাইরে ধর্তব্য নয়। দারা কুতনী এই হাদিস হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাইসাম বিন জামিল এই হাদিসকে মারফু বলে মেনে নিয়েছেন (বর্ণনা পরম্পরায় রসুল স. পর্যন্ত সংযুক্ত হাদিসকে মারফু বলে)। হাইসাম ছিলেন সিকা ও হাফেজ। আহমদ এবং আজালীও তাঁকে সিকা বলেছেন। ইবনে আদী বলেছেন, তিনি ভুল করতেন ইবনে উয়াইনীয়ার সাঈদ বিন মানসুর মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন।

গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময় তিরিশ মাস — এই আয়াতটিই ইমামে আজমের দলিল। তাঁর অভিমত, তিরিশ মাস অর্থ গর্ভধারণের জন্য তিরিশ মাস এবং দুধ ছাড়ানোর জন্যও তিরিশ মাস। এরকম অর্থ করা অযৌক্তিক নয়। যেমন এক ব্যক্তি দুই জন ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করবে। ঋণ পরিশাধের সময়সীমা নির্ধারিত হলো তিরিশ মাস। এর মানে এরকম হয় না যে, একজনকে পনের মাস এবং আর এক জনকে পনের মাস সময় দেয়া হয়েছে। বরং অর্থ হবে দুজন

ঋণদাতাই তিরিশ মাস তিরিশ মাস করে সময় দিয়েছেন। কিন্তু এখানে গর্ভধারণের সময়সীমাকে আমরা তিরিশ মাসের বদলে চব্বিশ মাস বলার পক্ষপাতি। কারণ হজরত আয়শার বর্ণনায় এসেছে, বাচ্চা মায়ের পেটে দুই বৎসরের বেশি থাকে না। কিন্তু সময় নির্ধারণ তো ব্যক্তিগত অভিমতে করা চলে না। তাই মেনে নিতে হবে যে, হজরত আয়শা রসুল স.-এর নিকট শুনেই উপরোক্ত বর্ণনাটি করেছেন। আর আয়াত অনুসারে তো দুধ ছাড়ানোর সময়সীমা স্পষ্টতই তিরিশ মাস বলা হয়েছে।

এই দলিল কয়েকটি কারণে ভুল ১. রসুল স. বলেছেন, দুই বছর পর দুধ পান করানোর হুকুম নেই। আয়াতে এসেছে, 'ইউরদ্বি'না আউলাদাহুন্না হাউলাইনি কামিলাইনি লিমান আরাদা আইয়ুতিম্মার রদ্বাআ'হ্। হাদিসে ও আয়াতে দুধ পানের সীমানা তিরিশ মাস অর্থাৎ আড়াই বৎসর থেকে কমিয়ে দুই বৎসর করা হয়েছে। অতঃপর একথা বলা যায় যে, হজরত আয়শাও গর্ভধারণের সময়সীমাকে এভাবেই কমিয়ে দিয়েছেন। তিরিশ মাসকে চব্বিশ মাস করেছেন। এটা ধর্তব্য নয়। এমত ক্ষেত্রে প্রকৃত ও রূপক উদ্দেশ্য একত্রিত হওয়া জরুরী। গর্ভধারণের ক্ষেত্রে রূপক অর্থে চব্বিশ মাস আর দুধ ছাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে তিরিশ মাস ধরতে হবে। প্রকৃত পক্ষে ফালাসিনা থেকে 'চব্বিশ' অর্থটিই নিতে হবে। কেননা গণনার সংখ্যার বেলায় অন্য অর্থ করার সুযোগ নেই। সংখ্যা তো সুনির্দিষ্ট অর্থবোধকই হয়। অধিকাংশ আহলে তাহকীক বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন।

ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যের আর একটি কারণ এই যে, দুই বৎসর পর্যন্ত দুধের মাধ্যমেই শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সুগঠিত হতে থাকে। এরপর অন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এবং অতিরিক্ত আরো কিছু সময় দেয়ার প্রয়োজন এজন্য যাতে শিশু খাদ্যভ্যাস পরিবর্তনের জন্য কিছুটা সময় পায়। তাই তিনি আরো ছয় মাস যোগ করে আড়াই বৎসর (চব্বিশ মাস) বলেছেন।

ইমাম মালেক সময়সীমা নির্ধারণের পক্ষপাতি নন। ইমাম জোফার নির্ধারণ করেছেন এক বৎসর যেনো বৎসরের চারটি ঋতুই দুধ পান অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায়।

গর্ভধারণের সময় ইমাম আজম এরকমই নির্ধারণ করেছেন। কারণ এটাই গর্ভধারণের নিম্নতম সময়সীমা। আমরা বলি, দুই বৎসরের ভিতরে শিশুকে মাতৃদুগ্ধ ছাড়া অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত করে তোলার ব্যাপারে শরিয়তে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। অতএব, দুধপানের ক্ষেত্রে দুই বৎসরের অতিরিক্ত সময় সংযোজন করার প্রয়োজন থাকে না। দুই বছরে পৌঁছার আগেই দুধের পাশাপাশি অন্য খাদ্যদ্রব্যও অবলীলায় গ্রহণ করতে পারে শিশুরা। ইবনে হুম্মাম এবং তাহাবী তাই সাহেবাইনের (ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম ইউসুফের) অভিমতটিই গ্রহণ করেছেন।

তাফসীরে মাযহারী/৫১৩

শাশুড়ী অর্থ স্ত্রীর আপন মা এবং স্ত্রী কিংবা স্ত্রীগণের মাতৃকুল। এভাবে স্ত্রীর নিকটবর্তী ও দুরবর্তী (উর্ধস্তরের) নানী ও দাদীকুল সকলেই শামিল। এছাড়াও রয়েছেন স্ত্রী বা স্ত্রীগণের দুধমাতা এবং দুধমাতা সম্পর্কীয় অন্যান্য নানী ও দাদীরা। মালিকানাভুক্ত হওয়ার কারণে যে সকল ক্রীতদাসীর সঙ্গে সহবাস করা হয়েছে তাদের মা, নানী ও দাদীরাও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে। ইমাম আবু হানিফার অভিমত, যে মহিলার সাথে জেনা করা হয়েছে তার মাতৃকুলও (মা, দাদীকুল, নানীকুল) এই আইনের আওতাভুত। যদি অপরিচিতা কোনো রমণীকে কামোত্তেজনার সঙ্গে স্পর্শ করে তবে তার মাতৃকুল নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

তোমাদের স্ত্রীগণের পূর্ব স্বামীর কন্যা অর্থ কন্যাকুল। অর্থাৎ পূর্ব স্বামীর কন্যা, তার কন্যা এভাবে সমস্ত কন্যাকুল নিষিদ্ধ। যে সমস্ত রমণী মালিকানাধীন অথবা মালিকানাধীনের মতো হওয়ার কারণে যাদের সঙ্গে সহবাস করা হয়েছে তাদের প্রতিও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। ইমাম আবু হানিফার মতে যাদের সঙ্গে জেনা করা হয়েছে তাদের কন্যাকুলও নিষিদ্ধ।

'যাহারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে' — অর্থ বিধবা রমণীদের এতিম কন্যারা সাধারণতঃ পরবর্তী স্বামীর অভিভাবকত্বেই পালিত হয়। এই ধরনের প্রতিপালিতারাও হারাম। তারা যদি প্রতিপালনাধীনা না হয় তবে হালাল হবে। দাউদের অভিমত এরকমই। আবদুর রাজ্জাক এবং ইবনে আবী হাতেম বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে হজরত আলীর বক্তব্য এরকমেই বর্ণনা করেছেন। হজরত আলীর এই বক্তব্যটি বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলেও একে সাহাবা কেরামের ঐকমত্য (এজমা) বলা যাবে না। এজমা অর্থ পূর্ববর্তীদের (সাহাবীগণের) এজমা। পরবর্তীদের এজমা এ বিষয়ে ধর্তব্য নয়।

যে সকল স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা হয়েছে, তাদের কন্যাবর্গ হারাম। সহবাস না করা হলে তাদের কন্যাকুল হারাম হবে না।

তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, কোনো ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার স্ত্রীর মাকে বিয়ে করবে। স্ত্রীর সঙ্গে সে সহবাস করে থাকুক অথবা নাই করে থাকুক। তিরমিজী নিজেই এই হাদিস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, সনদের দিক থেকে এই হাদিস বিশুদ্ধ নয়। এই হাদিসের দুজন বর্ণনাকারী ইবনে লেহিয়া এবং মোছান্না বিন সাবাহ দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত।

শায়েখ ইবনে হাজার লিখেছেন, ইবনে আবী হাতেম তাঁর তাফসীরে সুদৃঢ় সনদে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে লিখেছেন, সহবাসের আগেই যদি কারো স্ত্রী মারা যায়, অথবা তাকে তালাক দেয়া হয় তবু তার মাকে ওই ব্যক্তি বিয়ে করতে পারবে না। তিবরাণী বলেছেন, এই মাসআলাটির ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু হজরত জায়েদ বিন সাবেতের বর্ণনা রয়েছে এর প্রতিকূলে। ইবনে আবী

শায়বা বলেছেন, সহবাস না করে স্ত্রীকে তালাক দিলে হজরত জায়েদের মতে তার মাকে বিয়ে করা যাবে। কিন্তু সহবাসের আগে স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে তার মাকে বিবাহ করা মাকরূহ হবে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। ইয়াহিয়া বিন সাঈদ থেকে মালেক লিখেছেন, হজরত জায়েদকে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি সহবাসের আগেই কারো স্ত্রী মারা যায় তবে সেকি তার মাকে বিয়ে করতে পারবে? তিনি জবাব দিলেন, না। ইবনে আবী হাতেম হজরত আলী থেকে লিখেছেন, উভয়ের (মা ও কন্যার) নিষিদ্ধতা সহবাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। মুজাহিদের বক্তব্যও এরকমই। ইবনে আবী শায়বা ও অন্যান্যরা জায়েদ বিন সাবেত এবং ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনাই দিয়েছেন। হজরত আলী এবং মুজাহিদের উল্লিখিত বক্তব্য সহীহ্ প্রমাণিত হলে তিরমিজি কথিত ঐক্যমত্যের অর্থ হবে সাহাবা এবং তাবেয়ীদের পরবর্তী আলেমগণের ঐক্যমত্য। এই ঐক্যমত্যানুসারে কোনো অবস্থাতেই শাশুড়ীর সঙ্গে বিবাহ বৈধ নয়, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা হোক অথবা নাই হোক।

জ্ঞাতব্য ঃ বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর মাকে দেখে পছন্দ করলো। তখন সে স্ত্রীসহবাস করেনি। এমতাবস্থায় সে হজরত ইবনে মাসউদের নিকটে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বললেন, স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার মাকে বিয়ে করতে পারো।

স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না হয়ে থাকলে পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করা যাবে। যে কন্যারা অভিভাবকহীনা তাদের বেলায় নিষিদ্ধতার কথা প্রথমে বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে প্রতিপালনবহির্ভুত পূর্বস্বামীর কন্যাদের কথা। সহবাস করা হয়নি এমন স্ত্রীর মৃত্যু হলে অথবা তালাক হয়ে গেলে তার পূর্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যা হালাল হবে।

ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী হারাম। পুত্র অর্থ পুত্রকুল। পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র, দৌহিত্রের পুত্র — এরকম সকল অধস্তন পুরুষের স্ত্রীরাও নিষিদ্ধ। তাদের মালিকানাভুক্তা অথবা মালিকানাভুক্ততুল্যা — যাদের সাথে তারা সহবাস করে ফেলেছে — তারাও হারাম। এই মাসআলাটি ঐক্যমতনির্ভর। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ছেলেরা যাদের সঙ্গে জেনা করে ফেলেছে — তারাও হারাম।

পালিত পুত্রদের স্ত্রীদের বেলায় এই নিষিদ্ধতা নেই। আরববাসীরা পালিত পুত্রদেরকেও আপন পুত্র মনে করতা। ইবনে জারীর লিখেছেন, জারীহ বলেন, আমি আতা কে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রসুল স. তাঁর পালিত পুত্র জায়েদ বিন হারেসার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করলেন। এই ব্যাপারটি নিয়ে অবিশ্বাসীরা নিন্দাবাদ করে যাচ্ছিলো। আমরাও বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। তখন নাজিল হলো, 'আল্লাহ্ তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে প্রকৃত পুত্র

করেননি।' আরো নাজিল হলো, 'মোহাম্মদ স. তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন...।'

দুগ্ধপুত্রও পুত্র। হাদিস শরীফে এসেছে, বংশীয় কারণে যারা হারাম স্তন্যদানের কারণেও তারা হারাম। সুতরাং দুগ্ধপুত্রকুলের স্ত্রীরাও নিষিদ্ধ। এই মাসআলাটিও ঐকমত্যসিদ্ধ।

দুই বোনকে একত্রে বিবাহ বন্ধনে রাখা হারাম। মালিকানার কারণে দুই বোনকে একত্রিত করা এবং সহোদরা ও দুধবোনদেরকে একত্রে স্ত্রী হিসাবে রাখাও হারাম। তেমনি বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় বোন, দুধ বোনদের বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় বোনও একই নিষিদ্ধতার আওতায় পড়ে। তবে যদি এক বোনের সঙ্গে জেনা করে ফেলে তবে অপর বোনকে বিয়ে করা হারাম নয়। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা হবে একরকম যেমন এক বোনের মৃত্যু হলো কিংবা এক বোনকে তালাক দিয়ে অন্য বোনকে বিবাহ করলো– এরকম করা হালাল।

ফুফু-ভাতিজিকে অথবা খালা ভাগ্নিকেও একত্রে বিবাহে রাখা হারাম। পিতা মাতার ফুফু অথবা খালা কিংবা দাদা, নানা, দাদী, নানীর ফুফু এরকম উর্ধ্বস্তরের সকলেই এই নিষিদ্ধতার পর্যায়ভূত। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, স্ত্রীকে তার ফুফুর সঙ্গে একত্রিত কোর না এবং খালার সঙ্গেও মিলিয়োনা। বোখারী, মুসিলম।

আবু দাউদ, তিরমিজি এবং দারেমীর বর্ণনায় এসেছে, ফুফুর সাথে ভাতিজিকে বিবাহ কোর না। ভাতিজির সঙ্গে ফুফুকেও না। তেমনি খালার সঙ্গে তার বোনঝিকে কিংবা বোনঝির সঙ্গে খালাকে একত্রিত কোর না। কনিষ্ঠাদের সঙ্গে জ্যেষ্ঠাদেরকে কিংবা জ্যেষ্ঠাদের সঙ্গে কনিষ্ঠাদেরকে মিলিয়োনা। নাসায়ীর বর্ণনায় শেষ বাক্যটি নেই। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি সহীহ্! হজরত জাবের থেকে বোখারীও এরকম হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে আবদুল বার বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান। শিথিল সনদের সঙ্গে হজরত আবু সাইদ খুদরী থেকে ইবনে মাজা, হজরত আলী থেকে বায্যার এবং ইবনে ওমর থেকে ইবনে হাব্বানের বর্ণনাও এরকমই। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হজরত ইবনে মাসউদের স্ত্রী জয়নাব, হজরত আবু উমামা, হজরত আয়শা, হজরত আবু মুসা এবং হজরত সামুরা বিন জুনদুবও এই হাদিসের বর্ণনাকারী। ইবনে আদী, ইবনে হাব্বান ইকরামার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সম্পূর্ণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। শেষে একথাগুলোও রয়েছে, যদি তোমরা এরকম করতে যাও তবে ওই মহিলাদেরকে আত্মীয়তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

আবু দাউদ তাঁর মারাসীলে   ইসা বিন তালহার বর্ণনা থেকে লিখেছেন, রসুল স. আত্মীয়তা ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কাতেই কোনো মহিলাদের সাথে তাদের আত্মীয়দের (মূল অথবা ঔরসজাতদের) বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। ইবনে হাব্বানও তাই তাঁর বর্ণনার শেষ অংশে লিখেছেন, এরকম করতে চাইলে ওই মহিলাদের আত্মীয়তা ছিন্ন হয়ে যাবে।

দুই দুধ বোন একত্রে রাখার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে সলফে সালেহীনের ঐকমত্য রয়েছে। বংশভুত আত্মীয়াকে বিচ্ছিন্ন করা যেমন হারাম, তেমনি দুধসম্পর্কীয় আত্মীয়তাকে কেটে দেয়াও হারাম। হজরত আবু তোফায়েল বলেন, আমি রসুল স. এর কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় এক মহিলা এলেন। রসুল স. তাঁর গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়ে ওই মহিলার বসবার ব্যবস্থা করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি চলে গেলে আমি জানলাম, ইনি রসুল স. এর দুধমা। আবু দাউদ।

এ ব্যাপারে আসল কথাটি এই যে, বংশগত এবং দুধ সম্পর্কগত আত্মীয়তা একই সমান্তরালবর্তী। উভয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে হালাল হারামের আইন একই রকম। এই দুই সম্পর্কের মূলপ্রবাহ ও শাখাপ্রবাহকে একত্রিত করা হারাম। এমতাবস্থায় একটি প্রবাহ অপর প্রবাহটিকে মিটিয়ে দেয়। তাই হারাম। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এরকম কিছু ঘটে থাকলে তা ক্ষমার্হ। কারণ তখন তো এ সম্পর্কিত বিধানই ছিলো না। এখন বিধান বলবত হলো। সুতরাং এই নিষিদ্ধতা আর অমান্য করা যাবে না।

নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ। পরমতম দয়ালু। তাই তিনি তাঁর স্পষ্ট বিধান জারীর পূর্বের অপরাধ মাফ করে দিবেন। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, 'আল্লাহ্ এমন নন যে, কোনো সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করার পর পথচ্যুত করে দেন, যে পর্যন্ত না তাদেরকে সকল বিষয় সম্পর্কে পরিস্কারভাবে বলে দেন, যাতে তারা সতর্ক থাকে।' আল্লাহ্ আরো বলেছেন, 'আর আমি কখনো শাস্তি দান করি না, যতক্ষণ না রসুল প্রেরণ করি।'

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত ওমর কে জিজ্ঞাসা করা হলো, দুই সহোদরা বাঁদীর একজনকে সম্ভোগ করার পর অপরজনকে সম্ভোগ করা কি বৈধ হবে? তিনি বললেন, না। আমি এরকম পছন্দ করি না। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী কুবায়সা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হজরত ওসমানের নিকট দুই বোনকে মালিকানায় শামিল করা এবং তাদের সঙ্গে সহবাস করা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, এক আয়াতে উভয়কে একত্রিত করাকে হালাল বলা হলেও অন্য আয়াতে হারাম বলা হয়েছে। তাই আমিও একে হারামই বলি। প্রশ্নকারী তখন অন্য এক সাহাবীকে (সম্ভবত হজরত আলীকে) এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তিনি বললেন, আমি যদি কাউকে এমন করতে দেখি তবে তাকে কঠিন শাস্তির

উপযোগী মনে করবো। আবার আবু সালেহ বর্ণনা করেন, হজরত আলী এ সম্পর্কে বলেছেন, এক আয়াতে উভয়কে হালাল করা হয়েছে। অন্য আয়াতে করা হয়েছে হারাম। এখন আমি একে হালাল ও বলতে পারি না। হারামও না। আর আমি নিজে এরকম করতে পারি না। আমার বংশধরেরাও না। ইবনে আবী শায়বা, বায়হাকী। ইবনে মুনজির এবং বায়হাকী হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এরকম, স্বাধীনা রমণী ও ক্রীতদাসী — সকলের জন্য রয়েছে একই ধরনের নিষিদ্ধতা। সংখ্যাগত ব্যাপারটি অবশ্য ভিন্ন। স্বাধীনা রমণী চারজনের অধিক বিবাহ করা হারাম। কিন্তু ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যাসীমাবদ্ধতা নেই। হজরত আম্মার বিন ইয়াসির থেকে আবদুর রাজ্জাকও এরকম লিখেছেন। আমি বলি, হজরত ওসমান ও হজরত আলীর মন্তব্যে যে হালাল হারাম সমপর্কিত দোদুল্যমানতার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা কিন্তু আয়াতের প্রতি সন্দিহানতা নয়। বরং আয়াতের প্রতি পুর্ন আস্থার কারণেই তাঁরা মনে করেছেন, সতর্কতার দাবী অনুসারেই হারামকে হালালাপেক্ষা অধিক গুরুত্বশীল স্বীকার করতে হবে। ইবনে আবদুল বার তাঁর ইসতিজকার পুস্তকে লিখেছেন আয়াস বিন আমের রসুল স. এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আমি গনিমত হিসাবে পেয়েছি দুই সহোদরা ক্রীতদাসী। একজন আমার সন্তান ধারণ করেছে। এখন আমি দ্বিতীয় জনকে যৌন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চাই। এটা কি আমার জন্য সঙ্গত হবে? রসুল স. বললেন, আগের জনকে মুক্তি দাও। তারপর দ্বিতীয় জনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো। তিনি স. আরো বললেন, স্বাধীনা রমনী ও ক্রীতদাসীদের বিধান একই (সংখ্যাগত দিক থেকে নয়)। দুধ সম্পর্কীয়দের বিধানও একই।

দ্বিতীয় খন্ড শেষ